হিজলকন্যা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

করুণা প্রকাশনী /কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫

প্রকাশক :
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

শব্দগ্রন্থন :
প্রদীপ্তা লেজার
১/৫ তারণকৃষ্ণ নস্কর লেন
কলকাতা-১০

মুদ্রণ :
শিবদুর্গা প্রেস
৩০বি, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : প্রণব হাজরা

প্রথম পর্ব

বাঁধটা প্রায় চৌদ্দ ফুট উঁচু। খরায় হলুদ মাটির টুকরো এলোমেলো চাপিয়েছিল। এক-বর্ষার জলেই ঠিকঠাক হয়ে গেছে। বেশ তেল-চুকচুকে মোলাম। দু-পিঠে অল্প ঘাস। ব্যানা-কুশ-কাশের ঝোপঝাড়ও মুখ তুলছে। বুদ্ধি খাটিয়ে কেউ কেউ বটগাছের চারাও পুঁতে দিয়েছে কিনারায়। জাফবির ভেতর লুকিয়ে আছে কচি-কচি পাতা। চলার পথে উঁকি মেরে দেখে যায়। মনে মনে খানিক ছায়ার আরাম লাগে রোদপোড়া গতরে।

বাঁকের মুখে পুরনো গাবগাছ। তার নিচে ঘণ্টা বাজছে। হাতি, হাতি! বানবন্যার জলের শব্দ যেমন—হৈ হৈ করে বেরচ্ছে ন্যাংটো ছেলেমেয়ের দল। খানিক দৌড়েছে। তারপর কাছাকাছি গিয়ে একদম চুপ। লবাবের হাতি, লবাব এসেছে! ফিস ফিস করছে তারা।

যাঃ! লবাব কই?

হুই দ্যাখ্ না. মোড়ায় বসে ঢুলছে।

উটা মাহুত, আকাশ আলি বলল, ম্যানেজারবাবু এসেছেন. লবাব লয়। ম্যানেজারবাবু এখন আবেদালির বাড়ি।

আস্ত কলাগাছ উপড়ে দিয়ে গেছে কে। হাতিটা শুঁড়ে জড়িয়ে মচমচ করে ভাঙছে। খালের জলে নেমে যাচ্ছিল চুমকি। হাতে মাছধরা পোলো। পুরুষালী ঢঙে শাড়ির ওপর একটা গামছা পেঁচিয়েছে। কাছাও টেনেছে শক্ত করে। চেঁচিয়ে বলল : খালি খেতেই আসে হিজলে। হিজলে সুখ বড়ো আঠালো। লাগলে ছাড়বে না। হাসছে চুমকি। রমজান বেদের মেয়ে। জলপোকার ব্যারাম আছে। সকাল সন্ধ্যা জলের ধারে ঘোরা স্বভাব দাঁড়িয়েছে।

আকাশ মুখ তুলে দেখল। ওপারের পুরনো বাঁধে ছোটখাটো আরেকটা দল দাঁড়িয়ে গেছে। পেরোবার কথা ভাবছে। সকলেই কিন্তু পারবে না। জল এখানে বেশ গভীর। তাতে ঘন কচুরিপানার দাম। নীলচে থোকা থোকা ফুলে কানকুটোরী পোকা ভনভন করছে।

আকাশ বাড়ি ঢুকেই চেঁচাল, চাট্টি খেতে দে দিনি, ও মা!

রাজত্ব কত্তে যাবি নাকি বাছা! ঘরের পেছনদিকে দেয়ালে একগাদা গোবর হাতের থাবায় চাপড় মেরে সেঁটে দিচ্ছে ভুলিবিবি। কানে সারবন্ধ মোটা মোটা রুপোর আংটা ঠুনঠুন করে বাজছে ঝাঁকুনিতে। এ সময় দেয়ালের সঙ্গে দারুণ কথাবার্তা চলে ভুলিবিবির। ঘরসংসারের যাবতীয় দুঃখ নিবেদন করে। যেন ঠিকঠিক জবাব শোনার প্রত্যাশা একটা থাকে। তাই একসময় ফিক করে হেসে বলে, আ মরণ! কাকে কী বুলছি!

ভুলিবিবির দুঃখটা নিতান্ত একটি বৌ সম্পর্কিত। ঘরে জোয়ান ছেলে, বৌ একটা চাই-ই। একা-একা সামলাতে মুখে রক্ত উঠে যাচ্ছে। চাষির সংসার। কুটোকাটা কাজের

বিরাম নেই। বাড়ছেও দিনে দিনে, হিজলের মাঠে আবাদ যত বাড়ছে। ব্যানাবনের ওপর চাষাদের লাঙ্গলের ফাল ক্রমে ক্রমে চকচকে হয়ে উঠছে। কী ছিল, কী হয়ে গেল। দুবছর আগের চলে যাওয়া মানুষ ফিরে এলে অবাক হয়ে যাবে। নেশা ধরে যাবে চোখে।

নেশা যেন এই ছোঁড়াটাকেও ধরেছে। আবেদালি আকাশের আনাগোনা দেখে বুঝতে পারে। সারাদিন টোটো করে মাঠে ঘুরছে। ব্যানাবন ওপড়াতে চেষ্টা করছে দুহাতে দারুণ ঝুঁকে। এ্যাই ছোঁড়া, উখেনে কী কচ্ছিস?

অপ্রস্তুত আকাশ হাসে নিঃশব্দে।

গতরের বল জানাচ্ছিস বুঝি? তা দ্যাখা যাবে, মালামোয়। আবেদালির ওই এক নেশা। বর্ষায় মালামোর বন্দোবস্ত। রাধু বায়েনের কাঁধে ঢোল চাপিয়ে হাতে একখানা 'পত্র' লিখে দেবে : হে হিজলবাসী মরদগণ, আপনারা মাসের অমুক তারিখে অমুক ঘটিকায় নতুনগ্রামের গাববৃক্ষতলে আসিবেক। মেডেল ও গামছা প্রাইজ দেওয়া হইবেক।

বিশুদ্ধ ভাষায় এমনি করে লেখে আবেদালি। আরও অনেকগুলি কপি পাঠিয়ে দেয় লোক মারফৎ দূর দূরান্তের গ্রামে। গোঁফে তা দিয়ে বলে, এ্যাই হিজলে ছোঁড়ারা, প্রাইজগুলো যদি ভিনগাঁয়ে যায়, তোদের মায়ের তালাক হয়ে যাবে। বুঝেছিস?

বোঝে সব্বাই। আবেদালির একটা মোহ আছে 'হিজল' শব্দটাতে। তেমনি আকাশেরও। আকাশের গতরটা বেশ বাড়ছে দিনেদিনে। গা টিপে আবেদালি তারিফ করে। সামনে সনে তোকে নামতে হবে বাছা। তৈরি হ দিনি। আকাশ দিন গুনছে।

ওই ম্যানেজারবাবু তখন আসরের মাঝখানটিতে বসে থাকবেন। হাতিটা নিয়ে মাহুত চলে যাবে দূর হিজলের দিকে। বনকুল আর নাটার জঙ্গলে একটা মস্তো কয়েত বেলের গাছ আছে। একপেট গিলে নামবে ট্যাংরামারীর জলে। ফিরতে একেবারে সন্ধ্যা।

আকাশ ব্যস্ত হয়ে চেঁচাচ্ছে এদিকে। তাইলে ভাত দিবিনে?

এট্টু দাঁড়া রে সোনা, এট্টু। ভুলিবিবি ব্যস্ত। শেষ চাপ্‌ড়িটুকু দেবার ফাঁক নেই দেয়ালে। অগত্যা হাতে নিয়েই চলে আসে। উনুনের পিঠে সেঁটে ঘাটের দিকে চলে। এখন শরতকাল। খালের জল ঘাটের কাঠের সিঁড়িটা ডুবিয়ে রেখেছে। ঘন কালো জল এখন কাচের মতো স্বচ্ছ। নিচে শোলমাছের ঝাঁক স্পষ্ট দেখা যায়। ভুলিবিবি একটুখানি চেয়ে চেয়ে দেখছে ঝাঁকটা। তারপর দুষ্টুমি করে হাতের ঝাপটা মেরেছে জলে।

মুখ ধুতে ধুতে ফের একদফা জলের সঙ্গে বাক্যালাপ। ঘরে জোয়ান ব্যাটা। বৌ একটা বড় দরকার। মিলছে না মনোমত। যেখানে মিলছে পণ হাঁকছে সাধ্যির বাইরে। কনের বড় অভাব হয়ে গেছে এ তল্লাটে। তাই পুরুসুরু কনেপণের গাঁটরী না বেঁধে কোনও স্বপ্ন দেখা ঠিক না। রাজারঘরে সেদিন একদফা বেশ ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে। মস্তো ঘরকন্না। তিনটে লাঙ্গল। ছজোড়া তেজী হিরণপুরে বলদ। দুবেলা জাবনায় খোল খায় দেড়মণ। অনেকগুলি কনেবৌ ঝুলছে ফলন্ত গাছে। যেমন বাঙা, তেমনি নিটোল। রাক্ষুসীর মতো ভুলিবিবির নালা গড়িয়ে টসটস করে জল ঝরেছে। হেই বাপ পীর মাদারশা, মিলিয়ে দিস। এক পেছে বাতাসার শিন্নি দেব তোর দরগায়।

নামেও 'বড়বেড়ে' অর্থাৎ বড়বাড়ি, মেজাজেও তাই। স্বর শুনে পিলে চমকে ওঠে। উঁচু বারান্দায় বড়কত্তা লিবাস আলি শনের দড়ি কাটছিল। হাঁকরে বলল, এককুড়ি নগদ টাকা, আড়াই মণ সন্দেশ, মাছটাছ লাগবে না। একবেলা বরাত খাবে, তা তুই একশো আনিস দেড়শো, পিছু পা লই। কিন্তু অলঙ্কার চাই উনিশভরি। সঙ্গে যোগ দিল বড়বিবি : পাঁচভরি হাঁসুলী, সাতভরি হাতের চুর, দুভরি কানবালা, খাড়ুও চাই—মল চলবে না বাছা,.... শুনতে শুনতে ভুলিবিবির হেঁচকি ওঠে! ডাকাতি করে গেরস্থ হয়েছে। স্বভাবটা বইচে গায়ে-গতরে। রাজারঘরের বড়বাড়ির কনে আনতে গিয়ে পীরকে সাত সেলাম ঠুকে পালাতে পারলে বেঁচে যায়। যেমন পক্ষীটি তেমনি বাসা চাই। আসমানের পরী আসমানেই থাক। ফেরার পথে রঙিন ছিটের চাদরটা খুলে কোমরে জড়িয়েছিল। পড়শী রাহেলা ছিল সঙ্গে। দেখাদেখি সেও জড়াল। তারপর খোলা মাঠে সন্ধ্যার আবছা আলোয় দুজনে একচোট হাসল প্রাণ খুলে। মা গো! মানীলোকের বাড়ি কি যেতে আছে? গায়ে চাদর জড়িয়ে গুটিসুটি বসে থাকা—গরমে দম ফেটে মরে যাই! দুটিতে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। রাহেলা ছড়া কেটে বলল :

বাঘকে বাঘিনী মিলে, রাজাকে মিলে রানি।

ভূতকে ভূতানী মিলে, কানাকে মিলে কানি।

অনেকটা পথ এসে ঘেরে ওঠার মুখে ভুলিবিবি বলে ফেলেছিল : কনেগুলা কিন্তুক আগুনজ্বলা হয়ে জ্বলছে, বহিন, কার বরাতে আছে? আঁধার ঘর আলো করা...

রাহেলা রেগে লাল শুনতে শুনতে। থাম্ মাগী, সরম করিস এট্টুকুন। হিজলের অক্ত তুর গতরে নাই?

ভুলিবিবি টানা নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, তা ঠিক ভাই।

এই রাহেলা মেয়েটি বড় অদ্ভুত। এমনিতে বড় শান্ত, সাত-পাঁচে রাকথা কাড়ে না সচরাচর। যদি কাড়ে, তো তখন থামায় কে! পুরুষালী কণ্ঠস্বরে পাড়া গমগম করে কাঁপে। ক্ষিপ্ত মাদী মোষের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে গর্জায়। যুবোজোয়ান পুরুষেরা রাহেলাকে ভয়ভক্তি করে-টরে খানিক। সেবার হরিণমারার রাজার লোকজনের সঙ্গে ফসলতোলা নিয়ে নাকি ভীষণ হাঙ্গামা বেঁধেছিল। তারপর পুলিশ এল বন্দুক নিয়ে। নতুন গাঁয়ের গাবতলায় আড্ডা নিল। রাহেলা সব দেখেশুনে চেঁচিয়ে বলল : যদি হিজ্‌লে মায়ের দুধ খেয়ে থাকিস ছোঁড়ারা, বন্দুকগুলা কেড়ে লেদিনি। শালোদের মাথা চেঁছে রাজবাড়ি পাঠিয়ে দে।

শালো বাক্যটা রাহেলা ব্যবহার করে। আরও অনেক পুরুষোচিত ভঙ্গি তার আচার-আচরণে আছে। তা, সেবার নাকি সত্যিসত্যি একপাল বাঘের মতো আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জোয়ানেরা। বন্দুক কেড়ে নিয়েছিল। তারপর হাঙ্গামা অনেকদূর গড়ায়। মহকুমার এসডিও তখন লালমুখো সায়েব। খবর শুনে স্বয়ং চলে এল হিজলে। এল হরিণমারার রাজপুরুষ ত্রিবেদী। বন্দুক ফিরিয়ে নিয়ে গেল। রাহেলাকে অনেক প্রশংসা জানাল। তোয়াজ করল। ব্রেভ মাদার বলল। সেলাম করল হাত তুলে।

সায়েব এসডিও যতদিন ছিল, সপ্তায় একবার এদিকে এসেছে। শিকারের ছলে। দাঙ্গাহাঙ্গামায়। নানা অজুহাতে ব্রেভ মাদারকে সেলাম জানিয়ে গেছে। সত্য মিথ্যা পুরোটা রাহেলা জানে, আর জানে সেকালের কেউ-কেউ। তবে বিশ্বাস না করে পারে না।

আবেদালি সেই রাহেলার ছেলে। আবেদালি ঘোড়ায় চেপে ধেড়ে বয়সে পাঠশালায় যেত হরিণমারায়। কান্দীর স্কুলেও গেছে কিছুদিন। আবেদালি এইসব গল্প সবসময় শোনায়। তখন সে কচিকাঁচা—মায়ের কোলে দুধ খেয়ে মানুষ হচ্ছে। এখন আবেদালি মধ্যযৌবনে পৌঁছেছে। রাহেলারও চুল পেকেছে। আর সেই জোয়ানেরা কেউ বুড়ো হয়ে বেঁচে আছে। কেউ গোরের নিচে খোদার কবজায় মুক্তির দিন গুনছে।

রাহেলার বুকে দুঃখটা বেজেছিল সেইদিন। এত নামডাক, বড়বেড়েরা গেরাহ্যি করল না! বুড়ো গেরস্থ শনের দড়ি ছেড়ে নড়ল না একটিবারও। উঠোনের চারপাশে বড় বড় খেড়ো ঘর—মাটির দেওয়াল। একপ্রান্তে খেজুরতালাই বিছিয়ে দিয়েছিল বসতে। দুজনকে দু গেলাস গুড়ের শরবত। না একখিলি পান, না পা ধোবার জল। ভুলিবিবি একবার বলতে চেষ্টা করেছিল : ইটা সেই রাহেলা খাতোন... লতুনগাঁয়ের রাহেলা... চিমটি কেটে থামিয়ে দিয়েছিল রাহেলা। তার আগেই চিনতে পেরেছিল বড়বেড়েরা। লিবাস আলি বলেছিল : শুনিছি ইকথাটো। শুনিছি! বাস এখানেই শেষ। ভুলিবিবি করুণ চোখে তখন রাহেলার দিকে তাকাল। যেন বলতে যাচ্ছিল : বহিন, গোরা সায়েবের কথাটো ইদের শুনিয়ে দেদিনি। রাজারাজপুরুষ তুর দুয়ারগোড়ায় সেলামবাজী করে গেছে। একবার বুল কথাটো ইদিকে!

অভিমান একটু না হল, এমন নয়। এ অভিমানের পিছনে একটুখানি ইতিহাসও লুকিয়ে আছে। কিন্তু রাহেলা সইতে পারে সব। আবেদালির বাপ শওকত আলি, অমন পাঁচহেতে মরদ, জমিদখলের দাঙ্গায় মাথার ঘিলু বেরিয়ে চোখ বুঁজল, একফোঁটা কাঁদেনি। বলেছে, কী হবে কেঁদে! হিজলদ্যাশের ঘর, কাঁদতে বসলে গলেধুয়ে ক্ষয় হয়ে যায়। এটা হিজলের অলিখিত বিধান। পুরুষতা এখানে মাটির মালিক। রক্ত আর মৃত্যু তার খাজনা। লিবাস আলির ঘরেই হয়তো একদিন ভিন্ন জীবনের ভিন্ন স্বাদ অনুভব করত রাহেলা। আব্বাস লিবাসের বড়ছেলে, তার হাত ধরেছিল প্রথম যৌবনে। ওই রক্তের প্রতিযোগিতায় সে পিছিয়ে গিয়েছিল। স্মৃতিটায় পুরনো রঙের কালো ছোপ।...

জলের সঙ্গে বকুনি একনাগাড়ে চলেছে। দুঃখের ভ্যাপসা গন্ধ। মন কটু হয়ে ওঠে। ভুলিবিবি হাত ধুচ্ছে পা ধুচ্ছে। কুলকুচো করে টোপাপানার দামে ছুঁড়ে মারছে।

দেখতে দেখতে আকাশের বাপ বিলাস সেখও রেগে লাল। হাঁক্‌রে উঠেছে ঘাটের উঁচুতে দাঁড়িয়ে। এ্যাই মাগী হারামজাদী, ছেলেটো চিল্লায় কানে শুনিস না? নাকি যাব নেমে ঠ্যাঙনা হাতে?

ফিক করে হেসে ফেলল ভুলিবিবি। না হাসলে রক্ষে নেই। মুখের যা বচন এই বুড়ো বয়সে, কানে কাপড় গুঁজতে হবে। তবু অইটুকুই সার। শুধু মুখ। হাত-টাত তেমন চলে না। যৌবনে তেড়েমেড়ে এসেছে পাচন হাতে। এসেই থেমে গেছে। মারবো-মারবো

করেই কাল কাটাল লোকটা। ভুলিবিবির এইখানটায় গভীর সুখের ব্যাপার আছে। অর্থাৎ ভালোবাসার ঘাটতি হয়তো। অন্য 'হিজলে' স্বামীগুলো মাগ পিটতে বড় পটু। কথায়-কথায় দু-চারটে কিলথাপড় কিংবা পাচনবাড়ি মেয়েদের গা-সওয়া। জানে এটাই নিয়ম। বৌ হলেই মরদ থাকবে। তখন বৌ-এর নাম হবে মাগ। এবং মাগ মানেই মরদের গোয়ালে পোষা গরু। জোয়াল কাঁধে নিতে বা চষতে-মাড়তে একটু এদিকওদিক হলেই দে মার। রগে রগে রপ্ত হয়ে গেছে এসব। বলে, ভাতারে না মাল্লেধল্লে বড় ভয়ের কথা। পীরিতে কমতি ঘটেছে কোথাও।

তবু হাসে ভুলিবিবি। হাসে, ব্যাটা জোয়ান হয়ে উঠছে। নিজের জীবনের যেটুকু গেল, গেছে। সামনে ঐ ভবিষ্যত। গাছের চারা। ডাগর হয়েছে। পুষ্ট ডালে রঙ ধরেছে নতুন পাতা। অনেক ছায়া, ফুল, ফল নিয়ে একটা জীবন গড়ে উঠছে দিনে দিনে। জল চাই, হাওয়া চাই, চাই প্রচুর রোদ। ঘেরের ধারে পোঁতা আছে যেমন। পালনের সুখ, সৃষ্টির আনন্দ। ভুলিবিবি সৃষ্টির আনন্দ পুরোপুরি পেতে চায়। তার মনে চাষা মানুষের সংসারের একটা নিটোল ছবি আছে আঁকা। অবিকল কোনখানে কী রং, কতখানি ঘন, সব হিসেব মনস্থ হয়ে রয়েছে। একটির পর একটি সাজাবে। এতেই তার সাধ আহ্লাদ মিটবে। কিন্তু ভাগ্য যেন বিরূপ। পা ফেলতেই হোঁচট খাচ্ছে। বাপ তো শুধু মুখটুকু নিয়েই বাদশা—অকম্মার ধাড়ী। কেবল বসে বসে পেছে-ঝুড়ি বোনা, মাথাল বোনা। দিনরাত কাটারী আর বাঁশ নিয়ে ব্যস্ত। বরং গোকরণের হাটে বেচে এলেও দুপয়সা অভাবের সংসারে কাজে লাগত। তা নয়, ভাঙা আর গড়া। গড়া আর ভাঙা। কিছুই মনঃপুত নয় লোকটার কাছে। একটা মাছধরা পোলোর জন্য বলেছিল আকাশ। বছর ঘুরতে চলল, সেটা শেষ আর হল না, আজ অব্দি।

এ হেন মানুষ যাবে কনেবৌর তল্লাসে? ভুলিবিবি প্রথম-প্রথম বলেটলে দেখেছে। শেষে নিজেই কোমর বেঁধেছে। রাহেলাকেও বাগাতে পেরেছে। এখন ভুলিবিবির ধারণা আসলে রাহেলা যেন তার সুনাম বা খ্যাতিটা ভিন্ন গাঁয়ে ঘুরে ফিরে যাচাই করে নেয় এমনি করে। যেন লোকজনকে জানাতে চায় দ্যাখো, দ্যাখো আমি সেই রাহেলা খাতোন, লিবাস সাকিম নতুন গাঁ, মৌজা হিজল পরগনে হরিণমারা....

কথাটা বলেছিল এই বিলাস সেখই। ভুলিবিবিকে বলেছিল। অভ্যেস মতো মা-মাসি একশোখানা করে শেষে বলেছিল উ মাগীকে ক্যানে তু লিয়ে গেলি! উ কি তুর বেটার কনে দেখতে যায়? উ যায় নিজের ঢোল পিটাতে। হুঁঃ! কোনকালে খেয়েছি ঘি, এখনও আঙুল শুঁকি....

ভাত বাড়তে বসে রাহেলার ওপর রাগল ভুলিবিবি। বরং এবার খোঁজ খবর পেলে একা একা যাবে। কাকেও সঙ্গে নেবে না। সে যতদূরই হোক, হরিণমারা ছাড়িয়ে, এদিকে কান্দী, ওদিকে বহরমপুর, তারপর যদি মেলে নবাববাহাদুরের দেশে লালবাগ মুর্শিদাবাদ।

নবাববাহাদুরের প্রজা এই নতুন গাঁ। হাতি চড়িয়ে ম্যানেজার পাঠান মাসে মাসে। হিজলের সংবাদ নেন। নতুন ঘের ও আবাদের কথা ভাবেন। ম্যানেজার এখন ঘরের কুটুম হয়ে গেছে। ইন্দ্রনাথ চৌধুরী হাতি চেপে এলে উৎসবে মেতে ওঠে নতুন গাঁ। আবেদালি

তার ডান হাত। এবং আবেদালির ডান হাত হয়ে উঠছে আকাশ আলি—বিলাস শেখের ছেলে।

হঠাৎ ছেলের কাঁধে হাত রাখল ভুলিবিবি। হাসিমুখে তাকিয়ে থাকল। আকাশও মাকে এমনি করে তাকাতে দেখে অল্প একটু সলজ্জ হাসে। যাঃ, তুর তাকানো কী রকম যেন!

তুকে দেখছি মাণিক। ভুলিবিবি পাশে সরে এসেছে। পিঠে হাত বুলোচ্ছে।

অমন কল্লে খাবো না কিন্তুক! স্বভাবমতো চটে যায় আকাশ। যেন কোরবানীর ছাগল—টিপেটুপে মাংসের ওজন কষছে।

বাছা, এট্টা কথা শুনবি? ফিসফিস করে উঠল ভুলিবিবি।

বুল।

আবেদালির কানে তুললে ফল ভালই হবে। আপন মনে দেয়ালের সঙ্গে কথা বলছে ভুলিবিবি।—মেনেজারটাকে বুলবে, উদের দ্যাশে যদি থাকে কনে দু-একটো...মুখ ফিরিয়ে আকাশকে বলল, একবার বলিসদিনি আবেদালিকে। বলিস মা ডেকেছে। সনজেবেলা আসে যেন।

কথাটা কানে গেছে বিলাস সেখের। তেড়ে মেরে ঘরে ঢুকেছে সঙ্গে সঙ্গে।...খবরদার, মেরে মুখ ভেঙে দেব মাগীর। উদ্যাশের কনে চলাচল নাই ইদ্যাশে, জানিস কথাটো? একঘরে করবে।

ভুলিবিবিও জানে। ঝোঁকের মাথায় ভুলে গিয়েছিল। এখন মনে পড়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। তারপর অভ্যাসমতো মন-ভুলানো হাসিটা ফিক করে হাসে।...মোনের গলায় দড়ি জুটে না একটো! সব ভুল-ভাল করে দেয় পোড়া মোনখানি।

হিজলে—অর্থাৎ হরিণমারা পরগনার নিচু মাটির ওপর অজস্র বাঁধের ঘের, তার পরিসরে দ্বারকা, সোনামুখি, ট্যাংরামারী, বেহুলার গেরুয়া জলের তোড় বাঁচিয়ে যে নয়া পত্তন, সেখানে মনের রকমটা ঠিকঠাক জলের মতো। কখনও স্রোত কখনও শান্ত। যেখানে থাকে, সেখানের রঙ ধরে। পাত্র থেকে অন্য পাত্রে রূপ হয় অন্যরূপ। কখনও যে তৃষ্ণার নিবৃত্তি, কখনও স্নানের তৃপ্তি। কখনও ভাসিয়ে নিয়ে যায় মাটির ধস ছাড়িয়ে উন্মুল গাছের মতো।

এই জলে আছে সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও হাহাকার, অমৃত ও গরল পাশাপাশি। এর রস গভীরে সিঞ্চিত হয়ে প্রাণও মেলে, পচনও ধরে অন্তঃশায়ী মূলদেশে। এর স্বচ্ছতা তলটুকুও দেখিয়ে দেয়। এর গাঢ়তা নদীর ক্ষিপ্ত গেরুয়া জলের মতো কপটও হয়ে ওঠে। পদ্মপাতার জলের মতো চঞ্চল টলটল করে কাঁপে হিজলিয়া মন। কী হবে কী হবে এই একটা ব্যস্ততা নিরন্তর। প্রসারিত তৃণভূমিতে, জলায়, জঙ্গলে, উদ্‌ভ্রান্ত এই সব মন চাষি পুরুষের। নখের ক্ষিপ্র আঁচড়ে নরম হলুদ পলিমাটির স্তূপ ছিন্নভিন্ন করে দিতে ইচ্ছে। ইচ্ছে একটা কিছু ভিন্নতর গড়ে উঠুক। ভিন্ন জীবন, ভিন্ন স্বাদ।

আবেদালি এই তল্লাসে ফেরে। হরিণমারার রাজবাড়ি যায় সপ্তায় একবার। মহকুমা

শহরে ঘুরে আসে কোর্টকাছারির আনাচে-কানাচে টহল মেরে। তারপর যায় পাম্পস্ বোঝাই গেরুয়া ধুলো নিয়ে মুর্শিদাবাদ নবাব বাড়ি। ঝুঁকে পড়ে তিনবার কুর্নিশ ঠোকে। মৌজার গুরুতর বিষয়গুলো একদমে বলে যায় দেওয়ানসাহেবের মুখোমুখি বসে। নবাববাহাদুরের সঙ্গেও মোলাকাত হয়ে গেছে এই সুবাদে। কথা আদায় করে ছাড়ে : হুজুরকে একবার চরণধুলো দিতেই হবে হিজলমৌজায়। দেওয়ানসাব সমঝে দেন কথাটা যথাস্থানে।

জরুর বেটা। মওকা মিল যায় তো জরুর যায়েগা।

হেই বাপজান! আবেদালি তার সাধারণ ভঙ্গিটুকু ভুলেটুলে একেবারে হিজলিয়া মানুষ তখন। হেই বাপজান, তুমাকে দ্যাখার লেগে মৌজার আবাদিরা চিল্লেচেঁচিয়ে মল ইদিকে। কথাটো তু দে হুজুর মেহেরবান!

সঙ্গে ছিল হরিণমারার মধু দত্ত। আরজি ছিল কিঞ্চিত দরবারে। আবেদালির কাণ্ড দেখে হাঁ হয়ে গেছে। কুট করে চিমটি কেটে থামাল। বাইরে এসে বেদম গজগজ করল : কাণ্ডজ্ঞান নাই হে ভায়া, নরবাহাদুরকে তুই-তোকারি একেবারে...ছি ছি ছি...জিভ কেটে হাসলও খানিক। শেষে বলল, অবশ্যি ওসব ওঁরা কানেটানে তোলেন না। নবাববাহাদুর তো বাংলা বোঝেন না। দেওয়ানজি ট্যারা চোখে তাকাচ্ছিল। মুচকি হাসছিল। জানে তো হিজলমৌজার খবর।

আবেদালি ঘেমে জবজবে। গঙ্গার ধারে এসে হাওয়া মাখল খানিক। কেন যে এটা হয়ে যায়! আবেগের মুহূর্তে পুরোপুরি হিজলিয়া বনে যায়—রুখতে পারে না এইটুকু। পস্তায় মনে মনে। দুঃখ করে বলেই ফেলেছিল দত্তকে : বাঞ্চোত, আর জন্মে সব সাঁওতাল ছিলাম গো দত্তদাদা।

আস্তে আস্তে অনেক বদলেছে আবেদালি। অনেকখানি ভদ্রগোছের অনেকটা সংযত। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করে। হুট করতেই লাঠি-সড়কি বের করে বসে না। কিছু কিছু বই পড়ে। শিয়রে লম্ফ জ্বলে। পাশে চারটি বাচ্চা নিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে বানুবৌ। হঠাৎ পাশ ফিরে ঘুমন্ত মুখটা দেখে চুপি চুপি আলতো পস্তানি। বিয়ে করাটা ঠিক হয়নি অত সাত-তাড়াতাড়ি। স্কুলের জীবন সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট। ধারাল হিজলযুবতীর যৌবন আরও অনেককিছু হিংস্রভাবে পেঁচিয়ে কেটেছিল। কিছু-কিছু সাধ ছিল জীবনে। দত্তবাড়ির মেয়েদের মতো কোন মেয়ের ছবি ছিল কোন অন্ধকার তাকে তোলা। এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে দ্যাখে। পস্তায়। হরিণমারার মিয়াবাড়িতে খুঁজলে দু-চারটে 'ভদ্রলোক' মেয়ে না মেলে এমন নয়। কিন্তু সেখের ঘর—তাতে জংলা হিজলে কে পাঠাতে পারে মেয়েকে নির্বাসনে! তাতে মা রাহেলার কানে উঠলে এই ধেড়েবয়সে সাতহাত নাক ঘসতে হবে মাটিতে।

বানুবৌকে বলেছিল, খানিক লেখাপড়া শিখবি রে?

প্রথম-প্রথম কথাটা কানে নিত বানুবৌ। তারপর পর পর বাচ্চা হল গোটাকয়। সামলাতে অবসরটুকু গেঁজিয়ে ওঠে। সংসারে কাজকম্ম লেগেই আছে একটানা। ঘুঁটে দেওয়া থেকে শুরু করে রান্নাবান্না—তারপর গরু মোষের দেখাশোনা! তবু বানুবৌ

তল্লাটে ভাগ্যিমানী বলতে হয়। রাহেলা ওকে আদরযত্ন করে-টরে খানিক। শাশুড়ি বৌ-এর এহেন মিলেমিশে থাকা দেখে সারা হিজল তাজ্জব।

ইন্দ্রনাথ চৌধুরীকে আগে বলত ম্যানেজারবাবু। এখন শুধু চৌধুরী। শুনতে শুনতে বয়স্ক মানুষেরাও আজকাল বলে চৌধুরী। সে এলে হইচই শুরু হয়ে যায়। আবেদালি সর্বক্ষণ পড়ে আছে পাশেপাশে। বাঁক বেরিয়ে যেখানে এই নতুন বাঁধের গায়ে আরেকটি পুরনো শাখাবাঁধ চলে গেছে দুর্গম জলাজঙ্গলের দিকে, তারপর পড়ে চৌধুরীর কাছারি। লোকে বলে লবাবের কাছারি। নিচে বইছে দ্বারকা। মাইলটাক বাঁধ ধরে নদীর পাশে উল্টো হাঁটলে কাপাসিয়ার ঘাট। পাকা সড়ক চলে গেছে নদী পেরিয়ে মহকুমা সহর থেকে সদরে বহরমপুর।

চৌধুরী আবেদালির বাড়িও যায়। সে আবেদালির গুরুত্বটা বেশ বোঝে হিজল অঞ্চলে। লেখাপড়া জানা চালাকচতুর বা সভাভব্য একেলে লোক বলতে একমাত্র এই একটি। তাতে মায়ের নামডাক একসময় ছিল খানিক। অন্তত অন্য কোথাও না হোক, নতুন গাঁয়ের মানুষ কিছুকাল থেকে আবেদালির মতো তরুণকে মোড়ল বলে মান্যি করছে। অথচ কবছর আগে মোড়ল বলতে ছিল বুড়ো-হাবড়া কেউ গেরস্থ জমিওলা। ছিল ওই বড়বেড়েরা রাজারঘেরের।* মৌজার বিচার-আচারে তারাও ছিল অগ্রগণ্য। আবেদালি জন্মে সে-দাপটটা কমেছে খানিক। এতে বড়বেড়েরা কিছু ক্ষুব্ধ—সেটা বোঝাও যায় ঘাট-আঘাটে কদাচিৎ। মৌজা এখন আবেদালির দিকে তাকিয়ে আছে। আবেদালিকে তার নতুন খেতাব দিয়েছে : পণ্ডিত। নাম ধরে আর কেউ ডাকে না। এমন কি হরিণমারার রাজবংশ ত্রিবেদীরাও না। বলে : পণ্ডিত।

ইন্দ্রনাথ চৌধুরীও বলল এতদিনে : ওহে পণ্ডিত, আজ তোমার বাড়ি দাওত নিলাম। কাছারিতে যাচ্ছিনে আর। হাতির ওপর থেকেই বলল কথাটা। শুনে আবেদালি হা হা করে হেসেছে। হাত ধরে বাড়ি নিয়ে এসেছে। ও মা, শীগগীর এট্টা মোরগ ধরদিনি, ঘরে মেহমান।

পেছন-পেছন চৌধুরীও ঢুকেছে। ...সেলাম ব্রেভ মাদার!

আবেদালির বুক ফুলে উঠেছে আড়াই হাতটাক। 'ব্রেভ মাদার' শব্দটা প্রথম মায়ের মুখে শোনা। স্পষ্ট বুঝতে পারত না। 'বেব্ মাদার' চীজটা কী হতে পারে? পরে মধু দত্ত, শেষে রাজা ত্রিবেদী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। পণ্ডিতের মা ঐতিহাসিক রমণী। বুঝেছ? মধু দত্তকে বলেছিলেন। মধু দত্ত ভুঁড়ি দুলিয়ে দারুণ হেসেছিল। তবু আবেদালির গর্ব এই আখ্যা ও আখ্যানভাগে। ফিরে এসে মাকে বলেছিল : ওটা ব্রেভ মাদার। মানে সাহসিনী মা। বুঝেছ?

কে জানে বাছা! ব্যাটা বুলত, শুনতাম। মানে লিয়ে ধুয়ে খাবো? রাহেলা বলেছিল।

চৌধুরী সত্যিসত্যি হাত তুলে সেলাম করল। বানুবৌ টুকটুক করে তাকাচ্ছে। আবেদালির সঙ্গে ভোরবেলা অহেতুক একটা কাজিয়া হয়ে গেছে তার। তখন বানুবৌ

* ঘের অর্থ বাঁধ।

বলছিল : ভারী আমার মানসম্মান! তাও যদি বাপের দুখান হাল থাকত, দুজোড়া হিরনপুরের গরু....*

তোর বাপের তো আছে। তাতেই হবে! এই বলে বেরিয়ে এসেছিল আবেদালি। মায়ের ভয়ে বৌর সঙ্গে চেল্লানি চলে না। মনে মনে কিন্তু বেশ নীরস হয়ে বেড়াচ্ছিল। হায় রে বুনোজাত, তু আমার সম্মানটো কী বুঝবি? তু চিনিস শুধু লাঙ্গল আর গরু।

এবার বানুবৌকে তাকাতে দেখে আবেদালির দারুণ ব্যঙ্গ করতে ইচ্ছে করে। তুর বাপমাকে এই লোকটো সেলাম বাজাবে না। জুতোর শুখ্‌তলা গণ্যি করে রে মাগী! না পেরে ট্যারচা তাকিয়ে অল্প হাসল। বানুবৌ হাতখানেক ঘোমটা টেনে ঘরে ঢুকেছে সঙ্গে সঙ্গে।

ঝকঝক করছিল উঠোন। খড়কুটোটি নেই কোথাও। শরতের রোদ খেয়ে মাটি এতদিনে শক্ত হয়েছে। দেয়াল রাঙা লেপন। আতপ চালের গুঁড়ো গুলে আঁকা হয়েছে পদ্মফুল, পাখি, ধানের শিষ। চৌধুরী তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে। প্রতিবার এসে এমনি অনেককিছু তাকিয়ে দ্যাখে। খোঁজ-খবর নেয়। বলল, ছবিগুলো টাটকা মনে হচ্ছে। কে আঁকল?

বৌমা। রাহেলা বলল। মোটাসোটা কাঠের একটা চেয়ার দাওয়ায় রাখছিল। ঘোমটা একটু-একটু টেনেছে। কিন্তু বাকি অঙ্গ বেসামাল। মস্তো কাঠামো। থলথলে বিরাট ভুঁড়িতে নাভির নিচে খাটো কাপড় কোনমতে পেঁচানো। বড়ো বড়ো দুখানি হাত ঝুলছে দুপাশে—বেমানান। বয়স বেড়েও গতরখানিতে ঘুণ ধরতে পারেনি। ফের বলল : বৌমাটি বেশ সরেস বাছা। হাতের কাম দেখলে তুমি তারিফ করবে। বলতে বলতে ঘরে ঢুকেছে। তারপর কখানা তালাই এনে ধপাস করে ফেলল। মেলে ধরল একে একে। খেজুরপাতার মিহি বুননিতে রঙচঙ আলতার ছোপ। আবেদালি বিরক্ত হচ্ছে মনে মনে। কিছু বলার নেই। মায়ের অভ্যাস। আরও কিছু আনতে রাহেলা যখন ফের ঘরে ঢুকেছে, ফিসফিস করে বলল : দেখুন না মেলা বসিয়ে দেবে একখানা।

সত্যি তাই। পাখা, ঝুড়ি, ভাত ঢাকবার সরপোষ, প্যাঁটরা, বাচ্চাদের মুড়ি খাওয়া টুকি। চৌধুরী একটা একটা করে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। বাহবা দিচ্ছে। আমায় কিন্তু দিতে হবে কিছু কিছু। ওহে পণ্ডিত, বৌকে বলো। অপূর্ব!

আবেদালি দেখল বানুবৌ সিঁড়ির পাশ থেকে মুখ বের করে আছে। শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। আবেদালি একটু হাসল। একটু-একটু গর্ব তার মনেও না হচ্ছে—এমন নয়। অন্তত চৌধুরীর ভালো লেগেছে বা সে তার কাছে এসব দাবি করছে, এটুকুই আবেদালির আহ্লাদের কারণ।

রাহেলা দাঁড়িয়ে দেয়ালে ঘষঘষ করে পিঠ ঘসল। পদ্মফুলটা ছরকুটে যাচ্ছে দেখে আবেদালি বিরক্ত। মা যেন আর জন্মে আস্ত মোষ ছিল একখানা। কী অভ্যেস!

উঠোনে ইতিমধ্যে ছোটখাটো ভিড় জমেছে। বুড়োরাও কয়েকজন। বেশিরভাগ ছেলেপুলে। তাদের মনোচিত নায়কপুরুষ 'চৌধরী'কে দেখছে। পাঁচিলের পাটকাঠি সরিয়ে জোড়া জোড়া মেয়েমানুষের চোখও। আবেদালি বুড়োদের আপ্যায়িত করার পর

* বিহারের হিরনপুর গোরু মোষের বিখ্যাত হাট।

সেদিকে তেড়ে গেল।—কী দেখছো যাদুমণিরা, দেখার কি আছে? একই ব্যক্তি একই চেহারা। ঠাকুর লয় যে দশটা হাত তিনটে মাথা!

ওপাশে মটমট শব্দ পাটকাঠিতে। কেউ সরছে, কেউ সরে না। ফের সে ধমকাল : তুদের ভাতার-পুত কি ঘরে নাইরে? বেইজ্জত খবিস আওরত সব!

উঠোনের একপাশে ঠেসে গেছে ছেলেপুলেরা ওদিকের তাবড়ানি শুনে। আবেদালি এসেই কপট রাগ দেখাল খানিক। শেষে বলল : মা, পানিছেঁচা শিন্নিখান দ্যাওদিনি! ছেঁচে বার করে দিই পানিগুলা। শুনেই ওরা পালাচ্ছে। তামাসার কথা শুনে চৌধুরী প্রচণ্ড হাসছে। বুড়োরাও থেমে নেই। সেই সময় আকাশ এল। ন'হাতি নতুন ধুতিখানা পরেছে। ভীষণরকম কোঁচকানো—হাঁড়িতে ঠেসে রেখেছিল। পেটটা বেশ উঁচু হয়ে আছে। ঠোঁটের দুপাশে জলের ছোপ, কিঞ্চিত বুকেও—সদ্য আহারের নিশ্চিত চিহ্ন। কানের আধপোড়া বিড়িটা দেখে আবেদালি ইসারা করছে। বোকাটা বুঝতে পারে না। শেষে চৌধুরীকে আড়াল করে নিজেই এসে ফেলে দিল। বলল : এসে পড়েছিস তো এক কাম করদিনি।

বুলো। আকাশ ধন্য। এজন্যেই সে এসেছে হুটোপুটি করে।

চাহা লিয়ে আয় খানিক। আকুলচাচার দোকানমুখো যা। খানিক চিনিও আনবি। ফিসফিস করে বলল আবদালি।

আকাশ বলল, পয়সা?

দাঁত খিচিয়ে উঠল আবেদালি। যা না। আমার নাম করে বুলগে।

তাড়া খেয়ে আকাশ ছুটেছে মুখ উঁচু করে। দোরের কাছে গিয়ে চাপা গলায় চেঁচিয়ে আবার বলে দিল : তেজপাতা আর আদরক আনিস এট্টুক্ষণ।

তেজিঘোড়ার মতো ঘাড় ফিরিয়ে আকাশ বলল : আনব।

বড়বাড়ির ইজ্জত শুধু রাজারঘেরেই মৌ মৌ করে না—শ্রীকান্তপুর সাবিত্রীরঘের, ওদিকে রেললাইনের বুক ঘেঁষে কাঁঠালিয়া এদিকে হরিণমারা অব্দি। হরিণমারার ত্রিবেদী খাটো ধুতি নগ্ন গা আব্বাস আলিকে হুঁকোহাতে দেখলে শশব্যস্ত মোড়া টেনে দেন। ওই বেশে চলাফেরা করে লোকটা। লিবাসবুড়োর বড়ো ছেলে। সাতভাই সাতবোন। সাতভাই-এর বংশধর চল্লিশটি। দুপুর-সন্ধ্যা দুবারে পাত পড়ে ষাট থেকে সত্তর। মুনিশ আছে। রাখাল আছে। আব্বাস আলি বলে, বড়বেড়েরা সারা হেজলটায় পোনা ছাড়বে। জায়গা থাকবে না চরবার। হাসতে হাসতে বলে। ভেতরে একটা মতলব বা স্বপ্ন আছেই। নিষ্ফলা বুনো মাঠটা পোয়াতি করার কুমতলব। নানান ধরনে থাবা বাড়াচ্ছে। অনেকখানি গ্রাস করেছে ইতিমধ্যে। তিনখানা হালে পাত্তা পাওয়া যায় না। এখন চৈতালীর প্রস্তুতি চলেছে মাঠে। দেখেশুনে আর একখানা বাড়ানোর কথা ভাবছে। ভাবছে কবে হিরনপুর রওনা হবে একজোড়া বলদ আনতে। নগদ টাকা পয়সার দরকার। বারোটা মরাই ভরতি ধানে, সতেরোটা মাটির গোলায় গত সনের চৈতালী, আখের গুড়ও আছে বড়ো বড়ো জালা

বোঝাই। শেষ অবধি বুড়োকত্তা লিবাস বলল, বরঞ্চ গুড়গুলা ঝেড়ে দে রে বাছা। ছোঁড়াছুড়িরা হাত ভরে আদ্দেক বিনেশ করেছে। কতখানি আছে তলানি, কে জানে! হারামীরা রাক্ষসের পাল।

আব্বাস এতে ক্ষুব্ধ। বাপটা নাতিপোতাদের দুচক্ষে দেখতে পারে না যেন।

দত্তকে সম্বাদ দে দিনি। লিবাস বলেছিল। পথে ত্রিবিদ্দি মশাইকেও দরশন দিবি। বুদ্ধিটা লিবি আগে। বুঝলি? আব্বাস মাথা নেড়েছিল, বুঝেছে। ত্রিবেদী বহুকালের মুরুব্বী। সব ব্যাপারেই তাঁর শলা দরকার হয়। তাঁর বাবার ছেলেবেলায় এই রাজারচক তখন অনাবাদী জঙ্গল। হাতির পিঠে হাওদায় ত্রিবেদীর ঠাকুরদা গোলকরাজা শিকার করেছেন বাঘ, শূয়ার, পাহাড়ে চিতিসাপ। নাকি হরিণও। হরিণ ছিল একজোড়া। একটা মারা পড়ল। অন্যটা মরল না। সেটা হরিণী। সে বেঁচে থাকল। আজও নাকি আছে কোথাও—দূরের অনাবাদে। চাষারা নাকি দেখতে পায়। কোন কোন বুড়ো চাষা দেখেছিল। তারা আর বাঁচেনি। সে এক দৈবী হরিণী। হুজুর পীর মাদারশাহের পালিতা কন্যা তিনি। অন্তরালে চরে ফিরে শিন্নি পান পালায়-পরবে।

মোড়ায় বসে চারপাশের দেয়াল দেখছিল আব্বাস। বাঘের মুণ্ডু, চামড়া, হরিণের সিং, তলোয়ার, ঢাল, লালচেরঙের মেয়েমানুষের ছবি। ছবি ঘরে অনেকগুলো। ত্রিবেদীর আগের পুরুষদের। ব্রিটিশ রাজার। এমন কি পাশাপাশি বসে থাকা কিশোর ত্রিবেদী ও সেই তরুণ জমিদার রবার্ট মোরেল। এই ছবিটা দেখে গা শিরশির করে আব্বাসের। পাকা চুলগুলো বেছে বেছে তোলে পটাপট—শিরশির করে ওঠে মাথা। কেবল মনে পড়ে : নতুন গাঁয়ে কী কাজ ছিল, যাওয়া হল না একদিনও। বৌ আমিনা যেন টের পায়। সে রাতে বলছিল : আজ নতুনগাঁর মানুষ এসেছিল গো।

কে, কে? আব্বাস চমক খেয়ে সারা।

সেই হেজলকন্যেটা! মুখটিপে হেসেছিল সাতছেলের মা আমিনা বিবি।

সেটা আবার কে? আব্বাস উসখুস করছিল ক্রমাগত।

ন্যাকা সেজো না। আমিনা পাঁজরে খুঁচিয়ে দিল। রাহেলা গো, রাহেলা খাতোন।

আব্বাস ক্ষেপে উঠেছিল। কিন্তু চেঁচামেচি করেনি। আশ্চর্য আমিনারও চুল পাকছে, দু ছেলের বৌ এসেছে, বড় মেয়ে বাচ্চা দিয়েছে, মেজটিও দেব দেব করছে, ছোটটি বিয়ের-যোগ্য, সেই আমিনা মনে মনে একটা অহেতুক ঈর্ষার সাপ পালন করে। আব্বাস বলেছিল, কদিন পরে গোরে যাবি, মোনটো এট্টু শুদ্ধু করিসদিনি। ফের দারুণ ক্ষোভে বলেছিল, মানুষটো বুড়িয়ে গেল, এখনও তু তাকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে রাখলি!

অপ্রস্তুত আব্বাস বাঘের মুণ্ডুটা খুঁটিয়ে দেখছে। চওড়া হলঘরের ছাদে রকমারি ঝাড়বাতি জ্বলছে। ছায়া ঘন হয়ে এলে আলো জ্বালিয়ে দিল চাকর-বাকরেরা। ত্রিবেদী আহ্নিকে গেছেন। বেমানান বসে রইল আব্বাস। এতবড় বাড়িটা সারাদিন লোকজনে গমগম করে। বিরাট প্রাঙ্গণের চারপাশে একতলা দালান। কাছারি, অতিথিশালা, চাকরদের বাসস্থান; একফাঁকে মাথা উঁচু দেউড়ি। লোহার গেট আর্ধেক বুঁজিয়ে দারোয়ান

টুলে বসে আছে চুপ করে। ধাপবন্দি সিঁড়ির ওপর গিয়ে দাঁড়াল আব্বাস। ত্রিবেদীর বেরোতে কতক্ষণ কে জানে! বড় অসময়ে এসেছে। প্রাঙ্গণে নির্জনতা থমথম করছে এখন। পায়রার ঝাঁক উঠে গেছে কার্নিশের খোপে খোপে। এত বড় বাড়ি খালি হয়ে এলে কেমন ভরাট বিষণ্ণতা ঝাঁ ঝাঁ করে বুকে বাজে। আব্বাস ধুপ করে বসল ধাপের ওপর। হুঁকোটা ঠেস দিয়ে রাখল পায়ের কাছে। কোমরের ছোট্ট থলে থেকে নারকোল ছোবড়া বের করে গুলি পাকাল। কল্কের আগুন কখন নিভেছে। তাই ফের জ্বালাল চকমকি ঠুকে। হারাধন ঠাকুর বালতি হাতে অন্দর থেকে বেরচ্ছে। গেটের বাইরে খামারবাড়ি ঘেঁষে লম্বা গোয়ালঘর। এতক্ষণ দুধ দুইতে বসেছে নকড়ি ঘোষ। সেই নির্জলা দুধ বালতি ভরে আনবে হারাধন। ভোগ রাঁধবে। ওদিকে ঢঙঢঙ করে ঘণ্টা বাজতে থাকল ঠাকুর বাড়িতে। আব্বাস চমক খেয়ে দারুণ কাশছে। ফেরার পথে হারাধন চোখে পড়তেই সেলাম জানাল একহাতে। সেলাম গো সেখমশায়।

সালাম, সালাম! আব্বাস পুলকিত। রাজবাড়ি এসে মেজাজ যখন কেমন ছমছমানির সাঁড়াশিতে কায়দা হয়ে থাকে, চেনা লোকের সালামবাজী পলকে হিজলিয়া আভিজাত্যের উদ্রেক করে।

হারাধন ফের থেমে হাতটা একবার অন্দরমুখো করে তার দিকে খোঁচাল। মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, দেখা হয়েছে? আব্বাস মৃদু হেসে মাথা দোলাল।

হারাধন নাক ঝাড়তে যাচ্ছে। অন্দরের দরজার চৌকাঠে হাতটা মুছছে সে। আব্বাসের গা ঘিনঘিন করে। বাবুমশাইয়ের সঙ্গে কাজের সুবাদে যত খাতিরই থাক, ভেতরে একটা ধারণা পুষেছে। বাইরে চেকনচাকুন, ভেতরে ভ্যাপসা বেগুন। আদিখ্যেতা দেখে হাসি পায়। মনে পড়ে, ছেলে কামালুদ্দি বলেছিল, বাপ, আমি ইস্কুলে পড়তে যাব।

আব্বাস হুঙ্কার দিয়েছিল, থাম হারামীটো! বাবু সাজলে চুলোতে হাঁড়ি ঠনঠন বাজবে, সিটো জাঁনিস? তারপর হাসতে হাসতে বলেছিল : হিজ্‌লে মরদ হ দিনি। দিনে দু সের দুধ টানবি চোঁচোঁ করে। ভাত গিলবি দু সেরটাক। পাঁচ দরিয়ার পানি বইছে চৌদ্দটো লদী ছাপিয়ে। সাঁতার কাটবি। মাছ ধরবি। আর জানিস রে বাছা? এক-দুপহর হাল বেয়ে এসে বাপকে বুলবি : দ্যাওদিনি একখান লতুন কাজলকামিনী গামছা কিনে, একপাছাড় মালামো করে আসি! ইস্কুল-টুল বোঝে না আব্বাস। একটা মত্ততা চায় হিজলিয়া জীবনে। বানবন্যার মাদকতা তার অমৃতের স্বাদ। ভাঙতে যেমন পটু, গড়তেও—এমনি কোন যৌবন।

পেয়েছিলও এমনি কোনও যৌবন হয়তো। ফুরিয়ে এল যখন, দেখল অনেক বাকি থেকে গেছে। ছেলের জীবনে তা দেখতে চায়। খোলাখুলি একটা শক্তির পাঁয়তারা চায় হিজলের মাঠে—ফসলের শিষে রক্তের ছোপ ফেলে যা সফলতা লাভ করে।

তাই রাজারঘেরে আজও একটা পাঠশালা হল না। লিবাস আলির ইচ্ছে ছিল। বুড়ো কত্তা গোরের দিকে ক্রমশ গড়াচ্ছে—এবার আব্বাস হবে বাড়ির প্রধান, গ্রামের প্রধান। সে না বললে সবই না হয়ে যায়।

ত্রিবেদীও চান না। হিজল মৌজায় আজও কোনও পাঠশালা হল না সে-কারণে।

ওদিকে আবেদালি চাইছে। চৌধুরী মারফৎ দরবার চলছে নবাববাহাদুরের খাসে। ত্রিবেদী তার পেছনেও রয়েছেন। অর্থাৎ চৌধুরীর পায়ের বুড়ো আঙুলে পিঁপড়ে লুকিয়ে কট্‌কট্‌ কামড় দেয়। আবেদালি বেচারা জানে না। জানে কেবল আব্বাস। ত্রিবেদী তার কাছে তাঁর হিজলকথার অনেকখানি ঢাকনা উদোম করে দেন।

শওকত যেন নতুনগাঁয়ের মাটিতে এইসব গোলযোগের চারা পুঁতে গেছে। আবেদালি তাতে জল ছেঁচছে। শওকত-ত্রিবেদীর সম্পর্কটা ছিল অহি-নকুলের। আব্বাসও এই দফায় আরেক অঙ্কের যোগ-গুণ। আবেদালি খানিক টের পায়, খানিক না। তবু মুখে খাতির করে ত্রিবেদীকে। হরিণমারা ও কান্দীর স্কুলে অল্প-স্বল্প লেখাপড়ার পিছনে ত্রিবেদীর ডানহাত বাঁহাত দুই-ই ছিল। ত্রিবেদী ভেবেছিলেন, ছেলেটি বুদ্ধিমান। পরে কাজে লাগবে। এবং এখনও সেই আশাটা টিকে আছে।

এই যে বড়বেড়ে! ত্রিবেদী এসে গেলেন খড়ম পায়ে। কোঁচানো ধুতি, গলায় চাদর। পৈতেটা ঝকমক করছে আলো-আঁধারিতে।

আজ্ঞে! আব্বাস উঠল।

ত্রিবেদী ধাপ বেয়ে প্রাঙ্গণে নামলেন। পায়চারি করে কথা বলা অভ্যেস। আব্বাস জানে। আব্বাস পাশাপাশি পায়ে তাল রেখে ঘুরবে।

খবর বলো। ত্রিবেদী বললেন।

খবর খারাপ্ কি থাকবে রাজাবাবু! আব্বাস বলল। আজ সকালে চৌধুরীবাবু এলেন শুনেছি। আবেদালির বাড়ি নাকি মোরগ-টোরগ খুব হয়ে গেছে। আব্বাস হাসল বলতে বলতে। রাজারঘেরে তো আসবেন উনি! লোক পাঠিয়েছিলাম দুপহরে। আজ দিনটা ওখানেই কাটবে। কাছারি ফিরতে মাঝরাত... ধরুন...

কেন, কেন? ত্রিবেদী বিস্মিত।

আবেদালির আগ্‌নেতে বাউলগানের আসর চলেছে। শুনলাম, চিকান্তপুরের চমৎকার স্যাকও যাচ্ছে পাল্লা গাইতে লতুনগাঁর সালাম আলির সঙ্গে। দুজনে আবার দোস্তজী কিনা!

চমৎকার সেখ? ত্রিবেদী ফের অবাক। একটু হাসলেন। কদিন আগে এসেছিল ও। বন্দোবস্তের খোঁজে।

পেলে নাকি? আব্বাস কান খাড়া করল। সোনামুখির ওপারে ব্যানাবনটা বন্দোবস্ত চলছে। গত বর্ষায় পলি জমেছে বুক অবধি। আব্বাস দেখে এসেছে। এখনও চৈতালী বুনলে ব্যানা ওপড়ানো খরচ ভালোরকম পুষিয়ে যাবে।

ত্রিবেদী কথা বলছেন না। বুকে হাতটা চেপে আঙুল ঠুকছেন। চর্বির ওপর টকটক শব্দ উঠছে। আব্বাসের ইচ্ছেটা তিনি টের পেয়েছেন। বেশ কিছুদিন থেকে সে ঘুরছে; কিন্তু সমস্যা আছে কিছু। সোনামুখির বাঁওড়াটা বেশ লম্বা চওড়া। উত্তরসীমা সোনামুখি। দক্ষিণে শেষ সীমা হচ্ছে চাঁড়ালমারির খাল। গতবর্ষায় খালটা অনেক সরে গেছে দক্ষিণে। ওপারে নবাববাহাদুরের খাসমহল। কোলাকুলি না বেধে যায়, এই ভয়। ভরসা অবশ্য আছে। আছে সরকার বাহাদুর। এসডিও। সদরে ম্যাজিস্ট্রেট। এখানে বাঙালি, ওখানে সায়েব। কোলাকুলি বাধলে ভয় হচ্ছে আবেদালি বা তার দলবল। সেবারের মতো

হাঙ্গামা না হয়ে যায়। এক ধাক্কায় ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন প্রায়। যুবক বয়স বলে সামলে নিয়েছিলেন। এখন পারবেন না। জৌলুস সেই থেকে অনেক কমেছে। এখন বরং অন্য জমিদারেরাই হাতির মতো ফুলছেন। হিজলের মাটি তাঁর আয়ত্তে এলে তিনি তাঁদের চেয়ে সত্তরগুণ বেশি ফুলতেন।

প্রধান ভরসা এই প্রধান বড়বেড়েরা। এরা অনুগত থাকলে অনেক দূর এগোনো যায়। ত্রিবেদী বললেন, চৌধুরীর কাছে লোক পাঠিও না। আমি দেখছি। তুমি বরং কাল সন্ধ্যায় একবার এসো।

আজ্ঞে। আব্বাসের বলার কথা আরও ছিল। আগামীকাল যখন আসতে বলছেন, সেই ভাল হবে। যেতে যেতে পেছন ফিরে হঠাৎ ডাকল সে, রাজাবাবু!

সিঁড়ির ধাপে ত্রিবেদী দাঁড়িয়েছেন। কী হল? আলোটালো দিতে হবে? জবাব না শুনেই হাঁকলেন, ওরে কান্ত, কান্ত! একটা আলো নিয়ে বড়বেড়েকে পৌঁছে দিয়ে আয়।

আব্বাস ক্ষুব্ধ শুনতে শুনতে। কাছাকাছি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় আলো আর বল্লম হাতে কান্ত রাজবংশী। সে তৈরি থাকে সন্ধ্যা থেকে। আব্বাস হা হা করে হেসে উঠল, কান্ত, তুমি বরঞ্চ রাজাবাবুর ঘরের দরজাটো আগলাও, রাজারানির বড় ভয় ডর... উদ্দাম হাসতে হাসতে আব্বাস বলে চলল, হিজ্‌লে ডাকপুরুষ ছিলেন ইন্নাস আলি। বাঘের সাথে লড়াই করে হিজলে আবাদ পত্তন কল্লেন। তেনার পুত্তুর লিবাস আলি। সেও কম করেনি। বানবন্যা রুখতে বাঁধের মাটি প্রথম কোপে তুলেছে। মাথায় বয়ে ফেলেছে। তবে এত জৌলুষ হেজলের। রাজাবাবু, বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়....

দ্রুত চলে গেল আব্বাস অবিকল বাঘের ভঙ্গিতে। ত্রিবেদী প্রথম দিকে চাষাড়ে কুৎসিত রসিকতাটায় ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন। শেষে ভীষণ হাসি পেল। বিশেষত কান্তর সুমুখে একটা বুনো লোক এসব কথা তাকে বলল। ঢাকতে হচ্ছেই কোন মতে। ত্রিবেদীও এত জোরে হেসে উঠলেন যে দালানের ছাদে আশ্রয় নেওয়া চড়ুইগুলো ফরফর করে উড়ে পড়ল ঝাড়বাতির গায়ে।

আর কোনদিন সন্ধ্যা করেনি আব্বাস এ বাড়িতে। তাই ত্রিবেদী ওর ব্যাপার-স্যাপার আঁচ করতে পারেননি আদতে। এখন ভাবলেন, এই বুনোগুলোর সেন্টিমেন্ট বুঝে না চললে কখন উল্টোপাকে ঘুরতে সুরু করবে।

দেউড়ি পেরিয়ে সুরকি ছড়ানো পথ। খানিক ঝোঁকের মাথায় টগবগ করে পা ফেলে হেঁটে আব্বাসের মনে পড়ল, যাঃ আসল কথাটা বলাই হল না। দত্তকে গুড় বেচতে হবে। দত্ত বড় সেয়ানা মানুষ। হিজলের চাষাদের কতখানি ঠকায়, হাড়ে-হাড়ে জানে আব্বাস। কেন না আব্বাস যদি ধানের দর পায় তের আনা অন্যে পাবে দশ আনা। আব্বাসের এইটুকু খাতির ত্রিবেদীর সুবাদে। তবে মনে মনে যত গর্ব আসে তত দুঃখ। হিজলের লোকগুলো শুধু চাষবাসেই মত্ত থাকল, ব্যবসাটা হাতে করতে চায় না। আজকাল অবশ্যি দু-চারটে মুদিখানা বসেছে তল্লাটে। তারাও বড় ঠগ। আজকাল বেশির ভাগ তৈজস কান্দী বাজার থেকে মাসকাবারী নিয়ে যাচ্ছে লোকে। দত্তের বাবা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বয়ে দিয়ে আসত। নতুন আবাদ। সবে দু-এক পুরুষ পত্তন গেড়েছে। সেদ্ধ

পোড়া খেয়েই কাটিয়েছ। জংলা দেশ। পায়ে পায়ে জল। কাঁচা-সেদ্ধ নুন ছিটিয়ে খাওয়াতে ঝক্কি নেই। বরং এতে তুষ্টিটা বেশিই ছিল এক সময়। হিজলের জলে ভেজা চালের স্বাদ ভুলতে পারে কোন চাষা। তারপর আবাদ যত বাড়ল, বাথানের অস্থায়ী ডেরা তুলে দূরদেশের লোকজন এল বসত বাঁধতে মাগ-ছেলেপুলের সঙ্গে নিয়ে।

মধু দত্তের বাড়ি চলল আব্বাস। শরতকালের রাত। পথের দুপাশে গাছগাছালি। রাঙচিতার বেড়া। শিশিরে ছপ ছপ করছে ঘাস। আকাশে নক্ষত্রের উকিঝুঁকি পাতার ফাঁকে। তাদেরও ভেজা ভেজা দেখায়। আব্বাস আজ শুধু হুঁকোটা এনেছে, লাঠিগাছটা ভুলে গেছে। এখন পস্তানি আসে। সাপখোপের সময়। পথ কমপক্ষে ক্রোশটাক বাঁধের ওপর। বাঁধের দুপাশে ঝোপঝাপ ঘন হয়ে আছে। হিজলে সাপের একটা রাজ্য আছে গভীরে লুকানো। চাষারা সেটাও খুঁজছে কতদিন ধরে। একদর বেদে এসেছিল বর্ষায়। অন্যরাও আসে দলে দলে সাপ ধরতে। তা, বলে-কয়ে দলটাকে বসিয়েছে রাজারঘের আর নতুন গাঁয়ের মাঝখানে। কুঁড়েঘর বানিয়ে দিয়েছে তাদের। হাবভাব যা, জীবনে নড়ছে না এ-মাটি থেকে। রমজান বেদে তো কোদাল নিয়ে দিনমান ব্যানা ওপড়াচ্ছে ট্যাংরামারীর ওপারে। বুড়ো বয়সে দেখলে অবাক মনে হয়।

শীগগির একাট কবচ নেবে আব্বাস। রমজান বলেছিল।

মধু দত্তের দোকানে বারান্দায় আলো জ্বেলে ছক্কাপাঞ্জা খেলছে কারা। দত্ত দোকানের ভেতর কানে চশমা এঁটে খাতা লিখছে। আব্বাসকে দেখেই খাতা রাখল। এসো বড়বেড়ে। তামাক দিই। দত্ত হাঁকল। ওরে বঙ্কা, এট্টু তামাক দিয়ে যা বাবা। তারপর বলল, অসময়ে যে? ভাল তো? আব্বাস ঘাড় নাড়ল।

পাল্লাক্রমে কল্কেবদল চলেছে দুটি হুঁকোয়। থেকে থেকে গোঁপে চমকারি দিচ্ছে মধু দত্ত। খাড়া নাকের ওপর তিলক কাটা। মধ্যে মধ্যে রব 'জয় গৌরহরি নিতাই।' গল্প চলছে চাষাবাদের। খানিক বকে আব্বাস দেখল দত্ত শুনছে না যেন। তাই সে থামল। তারপর গুড়ের প্রসঙ্গে কী ভাবে আসা যায় ভাবতে থাকল। সোজাসুজি পাড়লে গরজ দেখাবে খানিক।

হঠাৎ মধু দত্ত আব্বাসের চোখে চোখ রেখেছে তীব্র করে। কী অন্য প্রকার বলতে চায়। আব্বাস টুক টুক করে তাকাচ্ছে। এই লোকটি কেমন জন্তু-জন্তু ভাবসাব নিয়ে থাকে যেন। আব্বাস ভাবে। কেমন গা ছমছম করে ভঙ্গি দেখে। মনে হয়ে ভেতরে হিজলের নিচে অর্থাৎ সম্ভাবিত সকল সুখের গভীরে গোপন একটা কারচুপি চলেছে, যার খবর পুরোটা ও রাখে। আব্বাস সামলাতে না পেরে বয়সোচিত আটঘাটটা ভাঙল। গুনগুন করে এক কলি 'শব্দ-গান' গেয়ে উঠল। ছেলেমানুষী কায়দায় পা দুটো নাচাল। দত্ত তেমনি তাকিয়ে।

বড়বেড়ে!

বলো। আব্বাস সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে।

কিছুদিন থেকে একটা কথা ভাবছি! শুয়ারের মতো মুখ উঁচু করে আছে মধু দত্ত। বড় কুচ্ছিত।

হুঁ হুঁ, বুলোদিনি।

ব্যবসা যখন কচ্ছি—তখন লাভলোকসান তো ললাটলিপি।

হু হুঁ।

ছক্কাপাঞ্জার খেলা দাদারে। দত্ত স্বরটা দাঁতের হামনদিস্তায় ছিবড়ে-ছিবড়ে করে দিচ্ছে। কেমন?

হুঁ হুঁ। আব্বাস অন্তরঙ্গভাবে বলল। যেমন তুমার লদীর কুলে বসত। যেমন তুমার আমরা ঘর বেঁধে আছি।

ঠিক ঠিক। বুলো।

বাবাও যা সাহাস করেনি, আমি তা করতে চাই বুঝেছ।

বেশ তো!

তোমাকে বাপু একটু পাশে-টাশে চাই-টাই। দত্ত আচমকা হাত ধরল আব্বাসের। আমি এবার থেকে আগাম দাদন দে রাখব। যার যার নাম তুমি বলবে, তাকে-তাকে আমি টাকা দেব। মরশুমে ফসল উঠলে সুদ কষে শোধবোধ....

এমনি করে অবিকল বলেছে আবেদালিকেও। আবেদালি সরাসরি কথা দেয়নি। বলেছে, শুধিয়ে দেখি লোক সকলকে। বড় চতুর ছোকরা। দত্ত ভেবেছিল, ওর মাকেই বলবে। রাহেলাবিবিও একটা মস্তো ঘুঁটি। তবে আপাতত আবেদালিকে চেলেই দেখতে চায় সে। হিজলের চাষারা সোজাসুজি দাদনের টাকা নিতে চায় না। অনেক দেখেছে মধু দত্ত। লোকগুলো একেবারে নির্ভেজাল টাটকা রকমের চাষা। শুধু বোঝে মাটি আর ফসল। অভাববোধ আসলে দানা বাঁধেনি রক্তে। যা পায় হাতের নাগালে, তাই তৃপ্তি দেয়। দত্ত একটা স্বপ্ন দেখছে তবু। এ সব থাকবে না, দিন একটা আসছে।

লিবাস আলি শুনলে হাঁকরাবে। হয়তো হুড়কো ছুঁড়েই মারবে চুলে পাকধরা বুড়ো বড় ব্যাটাকে। আব্বাস জানে টাকার খুব একটা দরকার লোকে বোঝে না। হেলে গরু কেনা কিংবা এটা-ওটা কদাচিৎ প্রসঙ্গে নগদ টাকার দরকার হয়। সে তারা নানান ধরনে মিটিয়ে নেয়। সরাসরি ফসল বিনিময় করে। হিরনপুর কি বেলডাঙ্গা নগদ টাকা বেঁধে বলদ কিনতে বড়বেড়েরা ছাড়া কে যেতে পারে! টাকা? বাস্ রে, থোবার জায়গা কই হেজলে? যেখানে রাখবে কুটকুট কামড়াবে। মাটিও এখন বড় নরম। শক্ত সমর্থ হয়নি। সবে বাঁধ বেঁধে জলাকে আবাদী করা হয়েছে। অল্পেই ঝুর ঝুর করে খসে পড়ে।

কথাটা আকুল শেখ বলেছিল। নতুন গাঁয়ের নতুন ব্যবসায়ী আকুল শেখ। গোকরণ ওর মামাশ্বশুরের ঘর। বড় ব্যবসার জায়গা। ঘুরেফিরে টাকার দামটা জেনে নিয়েছে। তবু ভয় ঘোচে না। বেশি হলে রেখে আসে গোকরণের মজুমদার মশাইয়ের কাছে। মারফৎ হচ্ছে মামাশ্বশুর এস্তাজ শেখ। মস্তো লাল মলাটের খাতায় জমার ঘরে লেখা হয় আকুল শেখের নাম। আকুল শেখ জানে না, সেই টাকা বন্ধনী ব্যবসায়ে বাচ্চা দিচ্ছে মজুমদারের সিন্দুকে। কোরানে লেখা আছে, সুদ হারাম। এই চরম হুকুম। সুদের কথা ভাবে না আকুল শেখ।

ভাবে না মুসলমান চাষারা। দেওয়া-নেওয়া দুই হারাম। বছরে একবার করে বীরভূম থেকে পীরসাব আসেন কজন তালেবুলএলেম, ওরা বলে 'তালবিলিম' অর্থাৎ শিক্ষাভিলাষী শিষ্য সঙ্গে নিয়ে। ফসল ওঠার সময় আসেন। মাসখানেক হিজল সফর করে ফিরে যান। তিনি সুর ধরে বলে গিয়েছেন : হে মোমিন সকল, অতঃপর সুদ দেওয়া ও নেওয়া উভয় তোমাদের সকলের নিকট অবৈধ বলিয়া গণ্য হইল। এরা কায়মানোবাক্যে মেনেছে।

আর রইল এলাকার ইতস্ততঃ কিছু কিছু হিন্দু-ডোম-বাউড়ি-জেলে-বাগ্দি, রেললাইন ও কাঁঠালিয়া ঘেঁষে গয়লা ঘোষেরা। এরা হিজলে কোনওমতে বেঁচে আছে। তার মানে এরা চাষবাসে মন দেয়নি কখনও। ডোমরা হিজলের সুলভ বাঁশবন ছেঁচে সুখের মাণিক বানাচ্ছে। জেলে-বাগ্দিরা জলা হাতড়াচ্ছে। বাউড়িরা ফসল তোলার কাস্তেয় শান দিয়ে রাখছে। ভূমিহীন একদল অল্পে তুষ্ট মানুষ। সুখের ধারণাটা হাস্যকর ধরনের নীরস। চাষারা হা হা হাসে টের পেয়ে।

জয় নিতাই! খদ্দের ঢুকেছে।

মধু দত্তও বলল জয় নিতাই।

আব্বাস একসময় উঠল। আব্বাস চলে গেলে মধু দত্ত ঝিমোচ্ছে। রাজাবাবুর কথা ভাবছে। পাঠশালা একটা দরকার। দত্ত টের পাচ্ছে। হিজলকে টাকার মূল্য বোঝানো চাই। রাজাবাবুর ওই এক জেদ। ভয় থেকে জেদ। দত্ত মনে মনে ত্রিবেদীকে বলে ফেলল ভয় কিসের আজ্ঞে? মহাল আপনার হচ্ছে কিনা পাষাণপুরী। বানবন্যা ঝড়বৃষ্টি রোদে ক্ষয় পাবে কতটুকু। ওদিকে মাথার ওপর সরকার বাহাদুর। ডান-হাতে বাঁ-হাতে নবাববাহাদুর, কান্দীর অনন্ত সিং.....স্বার্থ সকলের সমান। হিজলের চাষার আবেদালি হলেও কিছু যায় আসে না। বরঞ্চ.......

বেশ উত্তেজিত হল মধু দত্ত। চৌধুরী এসেছেন। কালই ত্রিবেদী হয়ে চৌধুরীর কাছে যেতে হবে। তারপর অনন্ত সিং। চৌধুরী আর আবেদালির মুখোমুখি কথাটা তুলবে। আবেদালি গোমস্তা হোক বরঞ্চ।

লাফিয়ে উঠে তুড়ি দিল হাই তুলতে তুলতে। জয় রাধে মাধব! জয় গৌরহরি নিতাই। আবেদালি গোমস্তা হোক প্রভু!

বাঁধের পথে আব্বাস ওদিকে বিড়বিড় করছে ইয়া আল্লা, ইয়া মালিক গোফুরর রহিম। গা ছম ছম করছে তার। দুপাশে নিচে মুক্ত মাঠে হাওয়া বইছে ঘোরতর শব্দ করে। বাঁহাতে আবাদি মাঠে ধানের কচি শিষের গন্ধ আসে। ডাইনে গভীর ব্যানা-কুশ-কাশের বনে পচা মাটির গন্ধও পাচ্ছে। পলিমাটির গন্ধটা অলৌকিক মনে হয়। এখন চিরোল কাশফুলের মেলা সেখানে। ঝাঁক কাঁধে ঝিমোচ্ছে অন্ধকারে হাজার হাজার পাখি। দূর শাঁখালার বিলে বুনোহাঁসের জলভাঙার শব্দ পুবের হাওয়ায় ভেসে আসে। নক্ষত্র উজ্জ্বল করেছে গাঢ় নীলাভ রাতের আকাশ। নক্ষত্রের আলো পথে। চলতে চলতে ঈশ্বরের নাম মনে পড়ছে বারেবারে। একটা কিছু হতে পারে কি, নিগূঢ় ও মহান কোনওকিছু? আব্বাস থেমে থেমে চমক খাচ্ছে। আর কত বছর পরমায়ু কে জানে। হয়তো সব দেখে যাওয়া

বরাতে নেই। এই হিজল তখন তার স্বপ্নের হিজল বনে যাবে। ফসলের তখ্‌তে বসে সে কোন চাষা হবে শাহানশা বাদশা। সে লোকটা কে হতে পারে? আব্বাস নিজেকে মাথার শিরোপা দিয়ে অভিষেকের ঘটায় মাঝখানটিতে দেখতে ভয় পাচ্ছে। বয়স আর বাকী নেই বেশি। সে তবে কি আবেদালি, রাহেলা খাতোনের বেটা....

বুকের ভেতর শিসিয়ে উঠল পুরনো ব্যথাবোধ। রাহেলা অন্ধকারে হাঁটছে। হাঁটছে যোজন দূর পথ বনে জঙ্গলে এলোমেলো পীর মাদার শাহের দরগা খুঁজে। রাহেলা চিরজীবন অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে বুড়ি হয়ে গেল। আমিনা বলছিল, রাহেলা এসেছিল সেদিন। ছোট মেয়ে বুঁচির জন্যে বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিল কার ছেলের সঙ্গে। পরে শুনে দারুণ রাগ হয়েছিল আব্বাসের। ঘুমোতে পারেনি সারা রাত। এত নির্বিকার রাহেলা খাতুন, এক পুরুষ-পুরুষ ইচ্ছে নিয়ে বেঁচে আছে আজও। গণ্ডারের চামড়া মোড়া আছে কল্‌জের পরতে পরতে। আসতে পারল এতদিনে! একটুও বুঝি মনে ছিল না যৌবনের আদ্যিকালের কাহিনী। সেই সোনামুখি নদীতে আজও স্রোত শুকোয়নি। সেই ঘনগভীর হিজলের ছায়া, জলাভূমির ঘাস, কাশবন আজও বেঁচে থাকল অবিকল। কেবল মরে গেল সোনালি গমের শিষের মতো ডাঁটালো মেয়ে রাহেলা খাতুন। মরশুমের ফসল। ধারালো কাস্তের ঠোঁটে তুলে নিয়ে গেল শওকত আলি।

গল্পটা আজই বলবে আমিনাকে। সোজাসুজি বলবে। নৈলে একটা দায় কাঁধে চেপে থাকে যেন। আব্বাস গলা ঝেড়ে নিয়ে বলবে, তখন আমি যুবোপুরুষটি। হেজলের জলায় ঘাসের বনে মোষের পিঠে রাখাল। লতুন গাঁয়ের ভর যোবতি মেয়েটা আসত নাস্তা মাথায় সোনামুখি পেরিয়ে....

আব্বাস ভাঙা গলায় গান গাইবার চেষ্টা করল। বাঁধের বাঁক। ডানহাতে একটু গেলে নতুনগাঁ। আলো ঝিলিক দিচ্ছে গাছপালার ফাঁকে। বাউলগানের আসর চলেছে আবেদালির বাড়ি। যাবে? বাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে চকমকি ঠুকল আব্বাস। একবার তামাক খাবার ইচ্ছে। হাওয়া বড় বেসামাল। না পেরে ব্যর্থ মনে উঠল। ডাইনের বাঁধে কপা এগোতে পেছনে কণ্ঠস্বর, কে যায় গো?

দ্রুত ফিরে এল। বাঁহাতের বাঁধে রাজারঘেরের পথ। কে? আব্বাস হেঁড়ে গলায় বলল।

আমি রমজান। রমজান বেদে অন্ধকারে এগোচ্ছে।

ওস্তাদজি!

হ্যাঁ গো। এট্টুখানি বেড়ায়ে আলাম। নিদ আসে না পোড়া চোখে। হাওয়া লাগালাম। রমজান বেদের দাঁত চকচক করছে নক্ষত্রের আলোয়।

হুম! আব্বাসের গাম্ভীর্য প্রকট করছে শব্দটা।

চলেন গো, ডেরায় চলেন এট্টুকুন। এক ছিলিম খায়ে আসবেন। রমজান হাত ধরে টানছে। অ্যানেকদিন আসেন নাই। দুই বাঁধের মোড়ের নিচে একটা খাল—ওপরে বাঁশের সাঁকো। সন্তর্পণে পার হতে হয়। নিচে একবুক জল। পেরিয়ে গেলে খানিক উঁচু মাটির ঢিবি। তার ওপর পাঁচঘর বেদে। রমজান হাঁকল, বেটি চুমকিরে!

চুমকি লণ্ঠন হাতে বেরিয়েছে দাওয়ায়।

উঠোনে দাঁড়িয়ে রমজান বলল, ইখানে একটো তালাই দে। আমরা বসবোক এট্টু।

তামাক খেতে খেতে আব্বাস কান পাতাল। বাতাসে ছেঁড়াখোঁড়া গানের কলি। খুবই চেনা গানটা। মুখ তুলে থেকে বলল, কে গাইছে যেন, চমৎকার স্যাখ বুঝি।

রমজান বলল, হ্যাঁ গো। শুনছিলাম কথাটো। মেইয়াটো যেতে চাইছিলেক। দিলেক না। উয়ারা সব গেলছেক বুঝলেন? রমজান ফোকলা দাঁতে হাসল।...ছাপোনো সব শুদ্ধু। আমি আগল দিছি একা। হাত তুলে ঘরগুলো দেখাল সে। চুমকী ঘরে ঢুকছে। শুয়ে আছে চুপচাপ। মন খারাপ করে। যেতে দিল না বাপ। কেন যেতে দিল না কে জানে। চুমকি সেকথা ভাবছে।

আব্বাস ভাবছে। বারবার যাবার ইচ্ছে করে নতুন গাঁ। কী যেন কাজ ছিল একটা। যাওয়া হয় না। কে যেন যেতে দেয় না।

চৌধুরী নবাববাহাদুরের লোক। যে নবাববাহাদুর একদিন ছিলেন সুবে বাঙলা বেহার উড়িষ্যার মালিক। সেই সিংহাসন লালবাগের হাজারদুয়ারীতে এখনও শোভা পাচ্ছে দরবারখানায়। কিংখাব-জাজিম-মখমল আর সোনাচাঁদির বাহার ঝলমল করছে প্রগাঢ় গাম্ভীর্যে! সেই তলোয়ার বন্দুক উষ্ণীষ দেয়ালে থাকে থাকে সাজানো। স্মৃতির মহিমা ঝলকে ওঠে। রাজাবাবু দেখেছে, আবেদালি দেখেছে সে ঝলকানি। এখনও তামাম বাংলামুলুকে ভাঙা কাচের মতো কুচো কুচো ইজ্জতের টুকরো রোশনী দেয়। ক্ষীণ আলোকপাত ঘটে। খাস মুল্লুকের ব্রিটিশবাচ্চা খোদ ম্যাজিস্ট্রেট স্টুয়ার্ট আসন ফেলে ঝুঁকে পড়ে কুর্নিশ করে। চৌধুরী সেই ইজ্জতের বাহক।

হরিণমারায় তাকে ডাকতে অনেক ঝক্কি। হিজল নিয়ে ভেতরে একটা মনকষাকষি চলছে বহু বছর ধরে। গোলোকরাজার আমল থেকে। ত্রিবেদী এটা শেষ করতে চান। এ যেন বিছানার নিচে কালসাপের গর্ত জেনেও চুপচাপ শুয়ে থাকা। নড়লে কী জানি ছুঁয়ে দেয়!

অগত্যা রাজারঘেরে বড়বাড়ির কথা উঠেছিল। আবেদালি মুখ ব্যাজার করবে তাতে। বলবে, রাজাবাবু বরঞ্চ নতুন গাঁয়ে আসুন। কথা থাকলে খোলাখুলি বলবেন। ন্যায্য কথার মার নেই।

ত্রিবেদীরও ইজ্জত আছে। গোলোকরাজা যে ইজ্জতের শিরোপা মাথায় বয়ে এনেছিলেন লাটবাহাদুরের হাত থেকে, তা আজও মাথায় ধারণ করতে হয় কালেভদ্রে। তাই ত্রিবেদী আসবেন না।

চৌধুরী প্রথমে বিব্রত, পরে দুঃখিত হয়েছিল। এই সব গোলোযোগ যত চলবে তত মুশকিল। নতুন পত্তনের সেলামিতে নবাববাহাদুরের দেওয়ানখানায় খাজাঞ্চির সংখ্যা বাড়ছে দিনে দিনে। তার সিকিভাগ চৌধুরী কলকাতার ব্যাঙ্কে স্ত্রীর নামে সঞ্চয় করছে। কুটোকাটা এদিক-ওদিক যাচ্ছে বৈকি। আবেদালির মুখ মনে আছে। আছে আরও অনেকের। এরা মোড়ল মাতব্বর। এদেরও তুষ্ট করা চাই।

লক্ষ একরের বেশি অনাবাদি রাজারঘের-নতুন গাঁয়ের সীমানায়। এটুকু এখন আবাদযোগ্য হয়ে উঠেছে। ঘের গড়ে তোলা হচ্ছে চাষাদেরই সহযোগিতায়। বন্দোবস্ত পেলে স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁধের জন্যে মাটি কোপাবে হাজার মানুষ।

আরও আছে লক্ষ একর। আবার ভাঙছে-গড়ছে সোনামুখি বেহুলা দ্বারকা ট্যাংরামারী কুয়োনদী। অনেক ধারা, অনেক নাম। এসেছে পাহাড় অঞ্চল থেকে। গেরুয়া জলের তোড় কিন্তু সোনালি মোষের মতো গেঙায় বর্ষাকালে। সীমানা থাকে অচিহ্নিত। ঘনগভীর হিজল-জাম-জামরুল-জিয়ালা আর কাঁটাবাবলার দুর্গম বন রয়েছে। রয়েছে কাশকুশনলখাগড়ার দিগন্তলীন প্রসার। আছে জলা আর বিল। জল শুকোয় না কোনদিনও। বর্ষায় তারা সমুদ্র হয়ে ওঠে।

এইসব দেখে শুনে দূরান্তের গ্রাম থেকে চাষারা আসছে দলে দলে পত্তনি নিতে। পেলে মরশুমে এসে অস্থায়ী কুঁড়ে বেঁধে চাষাবাদ করে যায়। ফের মরশুমে এসে ফসল তোলে। স্থায়ী বসত যারা বেঁধেছে, তাদের চোখ টাটায়। দাঙ্গা মাসে দু-চারটে লেগেই রয়েছে। গতিক দেখে দূরদেশের চাষিরা আস্তে আস্তে ঘরবাড়ি বানাচ্ছে। মাগছেলেপুলে ঘরকন্না হাজির করে দিচ্ছে হিজলের মাটিতে। : ইবার এদের একজন হলাম বাছারা। এদের কপালে কপাল ঘষলাম। জন্মমৃত্যু সুখ-দুঃখুর ভাগীদার। আর যেন পর ভাবিস না।

বিকেলে চৌধুরী হাতি চেপে ফের এল আবেদালির বাড়ি। : কই, ব্রেভ মাদার কোথায়?

রাহেলা বাড়ি নেই। গেছে শ্রীকান্তপুর। খালের জলে ডোঙা বেয়ে একা চলে গেছে। সেখানে ভাইপোর মেয়ের বড় অসুখ। ভাইপোটা খুবই গরীব। তাই দেখাশুনো করতে হয়। রাহেলা বলে, আসলে কুঁড়ের বাদশা। হিজলে বাস করেও যার ঘরে অন্ন নাই, সে ছারকপাল ক্যানে বেঁচে থাকবে বাপু? তার মিত্যু ভালো। বলে এসব কথা। অথচ না দেখেও পারে না। মাথা ধরলেও কাতর হয়।

আবেদালি একা পেয়ে বৌকে খুব ঝাড়ছিল। নিজের ইজ্জতের কথা বলছিল। বলছিল : তু ই ইজ্জতটোর হকদার। বুঝে চলবি মাগী। আমার মানে তুর মান। আর তু কি না উদোম মাথায় বুক খুলে ছেলাকে দুধ দিলি—আসরে একশো লোক দেখলে, আবেদালির বৌর বুকখানা। ছিঃ! থুথু ফেলেছিল আবেদালি! সে-রাতে গানের আসরে সবই দেখেছিল সে। রাহেলার ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। এখন বাগে পেয়ে গেছে।

সেই সময় চৌধুরীর হাতির ঘণ্টা। চৌধুরীর হাতি একেবারে দোরগোড়ায়। : কই গো ব্রেভমাদার! সাড়া না পেয়ে আবার ডাকল : ওহে আবেদালি! পণ্ডিত!

আবেদালি ছুটে বেরিয়েছে। : আসেন আসেন চৌধুরীবাবু। আমি যাব যাব ভাবছিলাম। ঘুমোচ্ছেন ভেবে যাইনি।

না, ঘুমোইনি। বলতে বলতে হাতি হাঁটু ভাঁজ করেছে। চৌধুরী ছড়ি হাতে দুলছে। নামবার লক্ষণ নেই। : এস দিকি একবার। তোমাকে নিয়ে বেরোব। এস এখানে! হাওদার ওপর ছড়ি মেরে জায়গা দেখাল বসবার।

আবেদালি লাফিয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। ছেলেপুলেরা চেঁচাচ্ছে : পণ্ডিত চেপেছে, পণ্ডিত চেপেছে! আবেদালি হাসিমুখে ধমকাল। ঘণ্টার তালে তালে বাঁধ ধরে এগোচ্ছে। বাঁধের কিনারায় সুঁড়ি পথ। নিচে খাল। পা ফস্কালে তলিয়ে যাবে। গা শির শির করে। হাতিটা কিন্তু কবছরেই হিজলের ভাবগতিক জেনে নিয়েছে। নির্ভুল পা ফেলে চলেছে তালে তালে। ঘরবাড়িগুলো বাঁধের ওপরই অন্যপাশে। ওদিকে মাটি কেটে উঁচু করা হয়েছে বাঁধের গা ঘেঁসে অনেকখানি জায়গা। তার ওপর ঘর। উঠোন। খামারবাড়ি। মাটি কাটার পর ছোট ছোট গভীর ডোবা হয়ে গেছে নিচের জমিগুলো। খরাতেও জল শুকোয় না। মাছ পোষে নিশ্চিন্তে।

দুলে দুলে চলতে বেশ বনেদীপনার আমেজ এবার। প্রথম চেপেছে আবেদালি। মুখ উঁচু করে রেখেছে সে। পাশের বাড়িগুলোর ভেতরে সবকিছু দেখতে দেখতে যাচ্ছে। ইচ্ছে করে একটু কাশছে কখনও। কখনও কখনও কাকে বাড়ির ভেতরে দেখে ডেকে বলছে : কী হচ্ছে গো চাচা, এট্টু বেড়িয়ে আসি। কাকে বলল : ও চাচি, খুব ফোড়ন দিচ্ছ ডালে। ফিরে এসে ভাত খাব।

: কপাল! খুশি মুখে তাকাচ্ছে প্রৌঢ়া মেয়ে।

: এই চুমকি! চুমকিকে দেখল পোলো হাতে বাঁধের নিচে ঝুঁকে আছে!

চুমকি শুনছে না। শোলমাছের দমকাঁপানো দেখছে। ঝপ করে পোলো সমেত ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

গ্রাম ছাড়িয়ে বেদেপাড়ার কাছাকাছি চৌধুরী বলল : ত্রিবেদী ঘন ঘন লোক পাঠাচ্ছে। কী করা যায় বলো দিকি?

: আমি বলব? আবেদালি হেসে উঠল। : আমি কি বলব?

চৌধুরী সিগ্রেট জ্বালল। আবেদালিকেও দিল। বলল : তোমাকেই বলতে হবে। তোমার দিকেই সারা হিজল তাকিয়ে আছে, আমি জানি। ধোঁয়া ছেড়ে দূর মাঠের দিকে চোখ রেখেছে চৌধুরী। সোনামুখি নদীর ধারা চকচক করছে বিকেলের রোদে। কাশফুলের ওপর উড়ন্ত পাখির ঝাঁক। স্বপ্নের হিজলে নীলাভ কুয়াশা। স্বপ্ন মনে হয়। যেন স্বপ্নে চলছে। চলার দোলনে নেশা ধরে। রক্ত ঝিকমিক করে। চৌধুরী এখন এইসব গভীর কথা ভাবল। আদিম পৃথিবীর প্রান্তসীমায় কুমারী মাটির খুব কাছাকাছি চলে আসার কথা। ভাবতে ভাবতে নিরুত্তর আবেদালির হাতটা ধরল আলগোছে। : পণ্ডিত, আমিও হিজলে ঘর বাঁধতে চাই।

: আজ্ঞে? আবেদালি অবাক।

: হ্যাঁ। তাই ইচ্ছে। সিগ্রেট ছুঁড়ে ফেলল চৌধুরী। বন্দুকটা আলগোছে তুলে নিল। : কথাটা বলো না কাকেও। তোমাকেই বললাম।

: তা ভালই হবে। আবেদালি কেমন নিস্তেজ হয়ে গেছে হঠাৎ। তার গা ছমছম করছে. বন্দুক তুলে চৌধুরী একটা সারসকে নিশানা করছিল। সেটা উড়ে পালালে আবেদালি ফের বলল : হিজলে বাস করতে হলে অনেক কুকর্ম করতে হয় ম্যানেজারবাবু। সেটা জানেন তো?

চৌধুরী হাসল। জানি। কুকর্ম তো হাতের ময়লা হয়ে গেছে হে পণ্ডিত। করছি না? যতদিন এই এলাকায় এসেছি? আবেদালি ঘাড় নাড়ল।

তবে? আর কোন কর্ম করতে হবে বল? চৌধুরী আড়চোখে আবেদালিকে দেখছে।

নিজে হাতে মানুষ খুন করতে পারেন তো? আবেদালি হো হো করে হেসে উঠল। অনেক মানুষের ভিতরে বেছে বেছে একটা মানুষ?

তা পারি বৈকি। চৌধুরীও হাসল জোরে।

তাহলে ঘর বাঁধেন। আপনাদেরই মহাল, আপনাদেরই মাটি। কে রুখবে? আবেদালি বলল। বলতে বলতে হঠাৎ পেছন ফিরে নতুন গ্রামটা দেখে নিল সে। আর কদ্দুর যাবেন গো?

রাজারঘের।

আবেদালি হাওদার ওপর লাফিয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে। রাজারঘের সে জীবনেও যেতে পারবে না। রাহেলার হুকুম। রাহেলা বলেছিল : যেতে হলে আমি যাবো। তু কখনও যাসনে বাছা। খবরদার। আমার গায়ে হাত দ্যায়, এমন মরদ হিজলে নাই। তু কিন্তু যাসনে। আবেদালি ছেলেমানুষের মত হইচই করে উঠল। : ওরে বাপ্‌রে, ও ম্যানেজারবাবু না, না.....উঁহু.. .তা হয় না।

কেন? চৌধুরী গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল।

আমার মায়ের বারণ।

তোমার মা তো গিয়েছিল সেদিন শুনেছি।

তাও কানে উঠেছে আপনার? আবেদালি শিউরে উঠল।

তাহলেই দেখুন ম্যানেজারবাবু, দুশমন আছে কিনা।

আমি সঙ্গে আছি তোমার। ভয় করো না পণ্ডিত। চৌধুরী তাকে ধরে রাখল। হাসতে থাকল : নিরাপদে পৌঁছে দেব মায়ের কাছে।

আবেদালির মুখ করুণ হয়ে উঠেছে। আমি জীবনে মায়ের কথা অমান্যি করিনি ম্যানেজারবাবু!

চৌধুরী ঝুঁকে পড়ল মুখের কাছে। ফিসফিস করে বলল : শুধু মায়ের কথা, না অন্যকিছু? বলবে খুলে?

নাঃ! আবেদালি জোরে মাথা দোলাল। আমি জানের ভয় করিনে। ভয় করি মায়ের। আমাকে মাপ করবেন.... চৌধুরী অবাক হয়ে গেছে। আবেদালির মাতৃভক্তি এত গাঢ়, তা সে জানত না। ভেবেছিল, কোনমতে সঙ্গ ধরিয়ে নিয়ে আসবে রাজারঘের। সবগুলি পক্ষ একত্র করে একটা ফায়সালা করে দেবে। রাগও হয়েছিল চৌধুরীর। আসলে অবান্তর একটা সমস্যার কোন বাস্তব কিছু নিয়ে মনান্তর নেই। এই হিজলের কর্তৃত্ব নিয়ে অকারণ একাট রেষারেষি। সকলেই চায় চাষারা আমায় মান্য করুক। বরং ত্রিবেদীর সঙ্গে নবাববাহাদুরের সম্পর্কটা বাস্তব কারণের ফলে গড়ে উঠেছে। অথচ এরা—হিজলের এইসব বুনো চাষাগুলো পরস্পরকে শত্রু ভাবছে, এই বড় আশ্চর্য। একটুকরো মাটিকে ঘিরে যত অকারণ ভয়।

আবেদালি আবার বলল : আমাকে নামিয়ে দেন স্যার। আমি ফিরে যাব।

বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে চৌধুরী। রাজারঘেরের সঙ্গে নতুন গাঁয়ের শত্রুতার উৎস কী, স্পষ্ট সে জানে না। শোনেনি কোনও গূঢ় কারণ। কেবল শুনেছে ও গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে এদের প্রায়ই হাঙ্গামা বাধে। গ্রাম্যমন্যতা, যা বাংলাদেশের গ্রামে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে চৌধুরী জানে, ঠিক সেটুকুই কি এর মূলে? কিংবা অন্য কিছু—যা আজও কানে ওঠেনি; হয়তো এই কারণের সূত্রে একমাত্র নবাববাহাদুর পক্ষই সকলের শত্রু। চৌধুরী হতভম্ব হয়ে গেছে। তারও একটা সাধ দানা বাঁধছিল হিজলকে নিয়ে। এখন ভারি হতাশ হতে হয়। একদল বুনো মানুষের খপ্পড়ে পড়ে বেঘোরে সবই হারাতে হবে।

মাহুতকে বলল চৌধুরী : রোখো এখানে। মাহুত রুখল। হাতি হাঁটু দুমড়ে বসছে। দুজনে নেমে পড়ল এক লাফে। হাতি দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। ঘণ্টাটা বাজছে না। সেও যেন হতভম্ব।

বাবলাগাছের নিচে এসে দাঁড়াল দুজনে। আবেদালি বলল : আমি যখন ঘোড়ায় চেপে পাটশালা গেছি তখন থেকেই রাজারঘেরের চাষারা আমাকে ঠাট্টা তামাসা করত। বলত, বাবু হতে চলল শওকতের ব্যাটা। বড়বেড়েরা বলত, শালোর ঠ্যাঙ ভেঙে দেব। আবেদালি টানা নিশ্বাস ফেলল। চৌধুরীবাবু, আমি তখন বয়সে বালক। ফিরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলতাম। মা কোমরে কাপড় জড়িয়ে ছুটে বেরতো। বাপজান তখন বেঁচে। বাপজান মাকে রুখতো।

চৌধুরী সিগ্রেট টেনে পায়চারি করছে। মধ্যে মধ্যে থেমে আবেদালির মুখটা দেখে নিচ্ছে।

ইস্কুলে কবছর পড়লাম টেনেটুনে। বৃত্তি পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলাম বলে মুনু পণ্ডিত এ্যান্দুর গড়িয়ে নিয়ে গেল। কামাই করলেই বাড়ি এসে ধন্না দিত। সঙ্গে করে নিয়ে যেত। কেউ কুবাক্যি বললে পাল্টা শুনিয়ে দিত। সেই মুনুপণ্ডিত মারা গেল। মা তখন সঙ্গে আসে, সঙ্গে যায়। হঠাৎ বাপজানটা গেল খুন হয়ে। দুনিয়া আঁধার দেখল মা। তারপরে...খুবই ধীর আর শান্ত আবেদালির কণ্ঠস্বর। বিকেলের রোদে তলানি জমছে। মাথার ওপর বুনোহাঁসের শব্দ। চৌধুরী একবার ঘাড় তুলে দেখল শুধু। স্বভাব মতো বন্দুক ছুঁড়ল না। সে আবেদালিকে বোঝার চেষ্টা করছে।

খুব গরীব লোকের ছেলে ছিলাম সার। আপনি তো জানেন। আপনার দয়ায় কিছু জমিজমা করেছি। আবেদালি নতমুখে বলল : কিন্তু আপনি আমাকে পাঁচটো মানুষ খুন করতে বলেন, করবো। শুধু উটা না। রাজারঘেরের মাটিতে পা রাখলে আমার খুনের বেইজ্জতি হয়। আমার মায়ের অবিশ্বাসী হতে হয়। মা বলেছিল, ওরা আমার ভালো চায় না। বাস, আমি জানি ওরা আমার ভালো চায় না।

ভদ্রোচিত স্বরে, শব্দে ও ভঙ্গিতে আবেদালি তার কথা শেষ করে বলল : এবার বলুন কী করি?

তোমার মা হুকুম দিলে তুমি যাবে? চৌধুরী মুখোমুখি দাঁড়াল।

আবেদালি হাতে তালি মারল : একশোবার। মা যদি বলে, জাহান্নামে যা, হাসিমুখে চলে যাবো চৌধুরীবাবু।

চৌধুরী ফের হাতি চাপল। মুখ ফিরিয়ে হাতি চলেছে সোজাপথে কাছারির দিকে। আবেদালি হাঁটতে থাকল গ্রামের পথে। সন্ধ্যার নীলাভ কুয়াসা জমেছে কাশবনের ওপর। গ্রামের ওপর। নদীর জলে। সবখানে। চৌধুরীর কাণ্ডটা আঁচ করে শিউরে উঠেছে সে। শুধু মায়ের হুকুমই নয়, সারা নতুন গাঁ তাকে বিশ্বাসঘাতক বেইমান বলে থুতু দেবে। আর সেই সব উঠতি জোয়ানেরা? তারা রাজারঘেরের সঙ্গে দাঙ্গা বাধলে সবার আগে ছোটে লাঠি সড়কি নিয়ে। আবেদালি আকাশের কথাটাও ভাবল। আকাশের জন্যে সম্বন্ধ নিয়ে গিয়েছিল তার মা রাহেলা। ফিরে এল মানইজ্জত খুইয়ে। বারণ শোনেনি আবেদালির। আকাশের মা কেমন বৌপাগলা হয়ে গেছে। আবেদালির রাজারঘের যাওয়া মানে বড়বাড়ির মজলিসে আসন পেতে বসা। আকাশ আলিই বলবে : ইটো তুমি পাল্লে পণ্ডিত ভাই?

এইসব ভাবল আবেদালি। অনেকখানি বড় করে ভাবল। তারপর অন্যমনস্কভাবে তাকাল বেদেপাড়ার দিকে। উঠোনে উনুন জ্বেলেছে। ধোঁয়া উঠছে পেঁচিয়ে। অল্পস্বল্প হল্লার শব্দ কানে আসে। আবেদালি দাঁড়াল। এই লোকগুলো বেশ আছে। সকলেরই বন্ধু। সকলের আদরযত্ন পায়-টায় খানিক। চালডাল যোগায়। সাপে কামড়ালে ডাক পড়ে রাতবিরেতে। বেশ আছে সব।

অথচ একটুতেই কাজিয়ার ফেনা গেঁজিয়ে উঠে। পাঁচঘরে পাঁচবার গালমন্দ হইচই না করে দিন চলে না। আগে সালিশি করতে যেত বড়বাড়ি। এখন আসে নতুন গাঁ আবেদালির কাছে। ফলে এক সময় সাঁজসকালে রাজারঘেরের যে জোয়ানরা আড্ডা দিত বেদেপাড়ায়, তারা আসতে সাহস পায় না। এখন নতুনগাঁয়ের দখল চলেছে। আবেদালির হাসি পেল। হাসিমুখে এগোতেই আকাশ আর চুমকী। আবেদালি ঝোপের আড়ালে দাঁড়াল। চুমকী নিঃশব্দে হাত মুখ নেড়ে কী বোঝাচ্ছে আকাশকে। আকাশ একটা পোলো ধরে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। আবেদালি বিরক্ত। ছোঁড়াটা আবার এখানে জুটল কবে থেকে!

তারপর অন্ধকার গাঢ় হয়েছে হিজলে। কাছারির বারান্দায় হ্যাশগ জ্বলছে। অজস্র শাদা পোকা ঘিরে ধরেছে উজ্জ্বল আলোটাকে। টেবিলের ওপাশে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে চৌধুরী। তার মুখের আধখানায় হিজলের অন্ধকার! সেই অন্ধকারে তার একটা চোখ জ্বলছে যেন।

আবেদালি চুপ করে বসে ছিল এতক্ষণ। চৌধুরী কোন কথা বলছে না দেখে সে বলল—রাত বেড়ে গেল চৌধুরীবাবু, মা বকবে।

চৌধুরী মুখ ফেরাল। কে বকবে বললে?

মা।

ফের কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চৌধুরী একটু হাসল। তারপর বলল : আচ্ছা আবেদালি, এদেশে হিজলকন্যা বলে একটা কথা আছে। তাই না?

আবেদালি একটু হাসল। কথাটা নিতান্ত গালাগালি। তা ওকথা কেন ম্যানেজারবাবু?

এমনি। কেন জানি না, আমার মনে হয়, কথাটা গালাগালি নয়, বরং যদি কোন মেয়েকে হিজলকন্যা বলা হয়, তার তো গর্বিত হওয়া উচিত।

আবেদালি নড়ে বসল। বলল : আমিও তাই মনে করি। লোকে আমার মাকে বলে হিজলকন্যে, মা রাগ করে। কিন্তু চৌধুরীবাবু, আমি হিজলকন্যের বেটা হয়ে জন্মেছি, এটা আমার গর্ব মনে হয়।

নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে চৌধুরী বলল : ঠিক তাই-ই। জানো আবেদালি, তোমার মাকে যখনই দেখি, আমার একটা গল্প মনে পড়ে যায়। এই হিজলেরই গল্প। মনে হয়, সেই ঘটনা চিরকাল ধরে এখানে ঘটে আসছে, ঘটতে থাকবে।....

আবেদালি ততক্ষণে ভিন্ন চিন্তায় ব্যাপৃত। সন্ধ্যায় বাঁধের পথে সেই কথাবার্তার পর হঠাৎ ফের চৌধুরী ডেকে পাঠিয়েছে কাছারিতে—অবশ্যই এর পিছনে কোনও জরুরি উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু আসার পর দেখছে, চৌধুরীর আচরণে তেমন কিছু প্রকট হচ্ছে না। তারপর এখন হিজলকন্যার প্রসঙ্গ তুলে সে কি আবেদালিকে আগেভাগে প্রস্তুত করে রাখছে?.... তবু স্তব্ধভাবে বসে সে কান পাতল। চৌধুরীবাবু যা বলতে হয় তার মায়ের কাছেই বলুন—তবে গল্প....তা মন্দ লাগে না শুনতে।

আবেদালি, চৌধুরী বলতে থাকল—গল্পটা তুমিও হয়ত জানো। হিজলের সব মানুষই জানে। তবু আজ তোমাকে শোনাতে চাই। কেন জানো?

আবেদালি মাথা নাড়ল। না, সে জানে না?

ওই গল্পের মূল কথা যেটা, সেইটাই আজকের সব অশান্তির পিছনে আছে। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি। এ গল্প শুনে তুমি যদি ভাবো, তোমার মাকে আমি অপমান করছি, তুমি ভুল করবে পণ্ডিত। তোমার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় বারবার আমার মাথা নুয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি করে নুয়ে পড়ে ওই গল্পের সেই মেয়েটির প্রতি। ফজল শেখের মেয়ে ফুলকির কথাই আমি বলছি। অনেক অনেক বছর আগের এই কাহিনী। শুনবে?

আবেদালি কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল—শুনবো। বলুন।

দ্বিতীয় পর্ব

অনেক বছর আগের একদিন। সেদিন নদীর বাঁকের মুখে উঁচু বাঁধের উপর দাঁড়িয়েছিল রবার্ট। বিলিতি জমিদার কোম্পানি মোরেল ব্রাদার্সের তরুণ প্রতিনিধি রবার্ট মোরেল। সামনে দিগন্তবিস্তৃত হিজলের তৃণভূমি। কাশফুলের হিল্লোলিত শুভ্রতা। শরতের উজ্জ্বল রোদে ঝকমক করে কাঁপছে একটা আদিম বিহ্বলতা যেন। মায়া হরিণীর মতন একটি মেয়ে কখন একটু করে মুছে গেছে সেই অপরূপ দুর্গমতায়।

স্বপ্ন না সত্য? জলজঙ্গলের আদিম জগত বুঝি এতদিনে তারই শেষ কথাটি শোনাতে চায়। কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে রবার্ট। ফাদার পিয়ারসন তাকে সেদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন—দ্যাখো হে ইয়ংম্যান, আর যতকিছু যা-খুশিই করো এদেশে, ঈশ্বরের দিব্যি,

'কোন নেটিভ মেয়েকে ভালোবেসে ফেলো না। তাহলেই মরবে। তোমার সব স্বপ্নের কবর তাহলে নিজের হাতে খুঁড়তে হবে তোমাকে।...একটু হেসে ফের বলেছিলেন ফাদার—না, আমি তামাসা করছিনে। তুমি আমার ছেলের মতন। ছেলের সঙ্গে কেউ তামাসা করে না।

রবার্ট খুব হেসেছিল অবশ্য। ফাদার পিয়ারসন একরকম ছেলেবেলা থেকেই এ অঞ্চলে কাটাচ্ছেন। এখন চুলদাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেছে। নেটিভদের ঘরে-ঘরে তিনি খুবই চেনা মানুষ। তাকে এরা কেউ আর পাদরি বলে না, বলে ডাক্তার বাবা।

সুতরাং তাঁর কথাটার অবশ্যই একটা গূঢ় অর্থ থাকা সম্ভব। রবার্ট প্রশ্ন না করে পারেনি—এ হুঁসিয়ারীর অর্থ কী?

তখন ফাদার বলেছিলেন রবার্ট তুমি এ জমিদারি কিনেছ কী উদ্দেশ্যে? তোমার জমিদারিতে তো সারা বছরের কালেকটরির টাকাও ওঠে না! শুধু জঙ্গল আর জল....

—আমি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছি, ফাদার।

বুকে ক্রুস একে একমুহূর্ত চোখ বুজে তারপর বলেছিলেন ফাদার পিয়ারসন—সে সকলেই তাকিয়ে থাকে। কিন্তু তোমার লক্ষ্য ভুলে যেও না। অনাবাদি মাটিতে যদি আবাদ করতে চাও, এই নেটিভদের সাহায্য ছাড়া তা তুমি পারবে না। তাই বলছিলাম, এদের মনে বিন্দুমাত্র আঘাত যাতে না পড়ে, তা লক্ষ্য রাখতে হবে তোমাকে। এরা দরিদ্র, কিন্তু এদের আত্মসম্মানজ্ঞান খুবই টনটনে। তোমাকে আমি চন্দ্রকুঠির মিঃ স্টোনের গল্প বলেছিলাম.....

কুঠিবাড়ির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ঘাসের উপর দুজনে চেয়ার পেতে সন্ধ্যাকালীন গল্পে মেতেছিলেন সেদিন। সেই সময় এল গ্রেগরী। রবার্টের সদ্যনিযুক্ত ম্যানেজার বুলডগের মতন চেহারা, সবে হোম থেকে ভাগ্যার্জনে কালোদেশে পাড়ি জমিয়েছে। তার স্বপ্ন যেমন অসমান্য, তেমনি স্ফূর্তিবাজ চটপটে চালাক চতুর লোকটি। সে এসে প্রসঙ্গটা শুনে বলেছিল—মিঃ স্টোনের বন্দুকে কার্তুজ ভেজা ছিল। এও একটা সত্য, ফাদার। কিন্তু আমরা সব সময় তাজা শুকনো কার্তুজের মালা পরে থাকি।

ফাদার প্রথম থেকেই এই লোকটিকে এড়িয়ে চলেন। তিনি চুপ করে থাকলেন। তারপর এক সময় উঠে দাঁড়ালেন।—আমি চলি। রবার্ট।

রবার্ট ব্যস্তভাবে বলেছিল—সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সঙ্গে লোক দিই.....

হাত নেড়েছিলেন ফাদার—থাক্।

কিন্তু আপনার সঙ্গে তো আলো নেই। এতখানি পথ—সাপ আছে........

ফাদারের মুখে স্মিত হাসি। নক্ষত্রের আলোয় তাঁর দাঁতগুলি চকচক করছিল। তিনি বলেছিলেন বাঘ, শুয়ার, হায়েনারাও আছে ঈশ্বরের রাজ্যে সবই আছে রবার্ট। শয়তানও আছে।

অন্ধকারে মিশে গিয়েছিলেন ফাদার পিয়ারসন। গেট পেরিয়ে নির্জন রাত্রির জঙ্গলের পথে দুইমাইল চলে রূপপুরে পৌঁছানো তাঁর পক্ষেই সম্ভব। লোকে বলে, ফাদার নাকি অনেক অলৌকিক কাজ করতে পটু, এমন কি নেটিভ ডাইনিরাও নাকি তাঁকে দেখলে প্রাণভয়ে ছুটে পালায়।

গ্রেগরী বলেছিল—তারপর স্যার, বুড়োটা ভয় দেখাচ্ছিল আপনাকে?

ভয়? বিস্মিতভাবে রবার্ট অন্ধকারে গ্রেগরীর মুখ দেখার চেষ্টা করেছিল।—কেন?

স্যার, উনি সংসারত্যাগী পাদরি। ধর্মকর্মের কথা ওঁর পক্ষেই ভালো মানায়।

কিন্তু গ্রেগরী, আমরা অবশ্য অধার্মিক নই।

নিশ্চয়।

আচ্ছা, গ্রেগরী....

বলুন স্যার।

সাবিত্রীঘেরের ওখানে কোথাও কারও সঙ্গে তোমার মারামারি হয়ে গেছে কি?

গ্রেগরী যেন গর্জন করতে গিয়ে সামলে নিল। তার চেয়ে কমবয়সী এই কর্তাটির কথাবার্তা কেমন অসম্মানজনক মনে হয় সবসময়। তবু ভাগ্যের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে—তাই নিঃশব্দে হজম করে। 'কারও সঙ্গে তোমার মারামারি হয়ে গেছে'—কী কুৎসিত গন্ধ ছড়াচ্ছে প্রশ্নটা। নেটিভদের সঙ্গে—বিশেষ করে যারা তার জুতোর চাকর প্রজামাত্র, তাদের সঙ্গে কুঠিবাড়ির জাঁদরেল ম্যানেজারের 'মারামারি'..... ও... গ্রেগরীর বলতে ইচ্ছে করে—স্যার, প্লিজ বলুন, সাবিত্রীঘেরের কোন্ নেটিভ চাষাকে তুমি জুতো মেরেছ হে?

গ্রেগরী বলেছিল—আমার ভয় হয় স্যার সাবিত্রীঘেরের ওই বুড়ো মুসলমান ফজল শেখের কী একটা মতলব আছে। লোকটা একসময়ের দাগী ডাকাত। ওকে জমি দেওয়া ঠিক হয়নি।

কেন? রূপপুরের মণি সিং ওর জন্য সুপারিশ করেছিলেন। মণি সিংকে আমি ভদ্রলোক বলেই জানি।

গ্রেগরী হেসে উঠেছিল। নেটিভ রাজাদের বংশধর যে কী জিনিষ, আপনার পরে এসেও আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি স্যার। লোকটা রাজ্যহারা—মানে মুকুটহীন রাজা এ অঞ্চলে। দারুণ প্রভাব আছে। কিন্তু আমার ধারণা ও একজন বিদ্রোহী.....রিবেল....

বিদ্রোহী মানে?

দি ভেরি ওয়ার্ড কনটেনস দি একজ্যাক্ট মিনিং স্যার। কথাটার মধ্যেই তার মানে রয়েছে।

কার বিরুদ্ধে, সেটাই জানতে চাই গ্রেগরী। আমাদের বিরুদ্ধে নিশ্চয় নয়।

ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে।

দ্যাটস রাইট, গ্রেগরী। লেট হিম ডু দ্যাট, আই শুড নট বদার—আমি তার লক্ষ্য নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইনে। আমার লক্ষ্য নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইনে। আমার লক্ষ্য অন্যত্র।

গ্রেগরী উত্তেজিতভাবে বলেছিল—কী আপনার লক্ষ্য।

একটি দ্বিতীয় কলকাতা পত্তন করা।

হোয়াট? চেয়ার থেকে কয়েক ইঞ্চি খাড়া হয়েই আবার বসে পড়েছিল গ্রেগরী।—ক্ষমা করুন স্যার আশা করি আমরা এখন সিরিয়াস কথাবার্তা বলছি।

গাঢ়গম্ভীর কণ্ঠস্বরে রবার্ট বলেছিল—গ্রেগরী হেয়ার উই আর লাইক ফ্রেন্ডস। আমি

তোমাকে বন্ধু রূপেই দেখতে চাই। তুমি কি দেখেছ, এই নদী মাত্র তিন মাইল পূর্বে গিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে?

দেখেছি।

তুমি দেখেছ, দুমাইল উত্তরে ওই হাইওয়েটা? নেটিভরা যাকে বলে বাদশাহী সড়ক?

ইয়েস স্যার।

একদিকে রাজপথ, অন্যদিকে গঙ্গা। দুপাসে দুটি ঐতিহাসিক প্রতীক চিহ্ন। গ্রেগরী, আমার একটা স্বপ্ন গড়ে উঠেছে—আমি ভবিষ্যতকে অবিকল দেখতে পাচ্ছি। আমি একটা নতুন ইতিহাস গড়তে চাই।

একটু চুপ করে থেকে গ্রেগরী বলেছিল—ঈশ্বর আপনার স্বপ্ন সফল করুন। কিন্তু স্যার সব নগরই গড়ে ওঠে ব্যবসা-বাণিজ্য বা ইন্ডাস্ট্রি সরকারি দপ্তর কেন্দ্র করে। এখানে তার কোনও চিহ্নও নেই।

এখানেও সব আছে, গ্রেগরী এগ্রিকালচার আমার উপলক্ষ্য মাত্র। মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের দিকে আমার লক্ষ্য আছে। আমি রেশম কুঠিও তৈরি করবো। তারপর—

গ্রেগরী বলতে যাচ্ছিল—তারপর মিঃ স্টোনের মত...বলতে না পেরে বলেছিল—হিজলের জঙ্গলে বাঘ সাপ শুয়ার অজস্র আছে স্যার। তারা যতদিন আছে কেউ এ মাটিতে পা বাড়াবে না। শুধু পাবেন ওই চাষাভূষো নেটিভদের। তাদের মধ্যে ফজল সেখের মত লোক যে থাকছে না, এর গ্যারান্টি কে দিতে পারে?

যারা এই বনে জঙ্গলে প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে আমাদের কাজে সাহায্য করছে তাদের প্রতি একটু সহিষ্ণু হওয়া আমাদের কর্তব্য। বুঝেছ গ্রেগরী?

ইয়েস স্যার।

উঠে এসে হঠাৎ তার কাঁধে হাত রেখে রবার্ট বলেছিল—এবং বিশেষ করে তাদের সঙ্গে তাদের মেয়েরাও এসে যখন পাশাপাশি কাজ করছে, তাদের সম্মান রক্ষাও আমাদের কর্তব্য।

ইয়েস স্যার।

নাথু এসে নালিশ করেছিল, তুমি তার মেয়ের সঙ্গে কী সব মস্করা করেছ, তাই নিয়ে ওদের সমাজে মেয়েটিকে দোষারোপ করছে।

গ্রেগরী রাগে কাঠ হয়ে চুপচাপ বসে ছিল। রবার্ট মোরেল, তুমি কেমন সাধুসন্ত আমি চোখের উপর দেখবো। ইউ ব্যাচেলার.... যুবাপুরুষ সঙ্গিনীবর্জিত কালো দেশে কেমন করে ইন্দ্রিয়ের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করো আমি.... আই মাস্ট সী....

রবার্ট তার বন্দুকটা হাতে করে ছায়ার দিকে এগিয়ে গেল। বাঁধের দুপাশে নরম হলুদ মাটি ভেদ করে মাথা তুলেছে কাশ, কুশশর। কোথাও ছায়াঘন হিজলগাছ, কোথাও স্যাওড়া ভাট বনজাম জিয়ালার জটিল বিন্যাস। আদিম নারীর বিস্রস্ত কেশপাশের মতো অমসৃণ গাঢ় ছায়ার বিস্তার। অনাবাদি ঢালু একটা মাঠ তার ওপাশে। গ্রীষ্মে দূর গ্রামের

লোকে এসে খড় কেটে নিয়ে যায়। তাই সে-মাঠের বুকে অজস্র এলোমেলো গাড়ির চাকার দাগ। এখন শরতে সেখানে জল আর কাদায় সব প্যাচপ্যাচ করে।

বাঁধের এপাশে নিচে দ্বারকা। বর্ষায় সে ঘনহলুদ প্রমত্ত স্রোতের ছলছল খলখল দুরন্ত ঘূর্ণীময় উচ্ছ্বাস আর নেই। শরতে তার থমথমে গভীর স্নিগ্ধ শান্ত স্রোত হিজলদেশের গ্রামীণ যুবতীর বধুযাত্রার কথাই মনে করিয়ে দেয়। তার ওপারে অরণ্যময় দিগন্ত বিস্তৃত নিচু জমি। কোথাও বাঁধ দেওয়া হয়েছে। সেখানে নয়া আবাদ গড়ে উঠছে দিনেদিনে।

রবার্ট নতুন এসেছে। সে দ্বারকার জীবনে এদেশের মেয়েদের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে জানে না। কলকাতার মোরেল এন্ড কোম্পানি বহুদিন থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অনাবাদি অঞ্চলে জমিদারি কিনছে। রবার্ট মোরেল তাদের প্রতিনিধি মাত্র। আসল মালিক বাবা রিচার্ড মোরেল আর কাকা ম্যাথু মোরেল। সাউদাম্পটনের দুই ভাগ্যান্বেষী সহোদর ভাই মহারাণীর আশীর্বাদে অনিবার্য ভাগ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে একটু করে। রবার্ট মিঃ রিচার্ডের একমাত্র সন্তান। আর মিঃ ম্যাথু মোরেলের নিজের কোন সন্তান নেই। আছে এলিজা তার স্ত্রীর আগের স্বামীর মেয়ে। সে ফ্যামিলির সঙ্গে কলকাতাতেই থাকে। ছেলেবেলা থেকে পিতৃহারা এলিজা মিঃ ম্যাথুকেই বাবা বলে ডাকে।

হিজল অঞ্চলে মেয়ে রবার্ট একেবারে দেখেনি তা নয় তবু আজ যাকে দেখল সে একটু অসাধারণ। ঘোড়ায় চেপে দুর্গম এলাকায় যেতে-আসতে সে এমনি অনেক মেয়ে দেখেছে যারা তালডোঙা বেয়ে গভীর জলায় পদ্ম-চাক আর শালুক তোলে। শাক ছিঁড়ে আনে। মাছ ধরে। কেউ জঙ্গলে শুকনো কাঠ ভেঙে বেড়ায়। এ মেয়েটিও কাশবনের ভিতর ছোট্ট একটা ডোবায় হামাগুড়ি দিয়ে মাছ ধরছিল। সারা শরীর কাদায় একাকার। রুক্ষ চুলেও কাদার ছোপ।

রবার্টের পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকিয়েছিল সে। তখনই রবার্ট প্রথম অবাক হয়েছে। এলিজার গায়ের রঙ একটুখানি শ্যামলা করে দেখলে যেমন হয়, তেমনি এরও গায়ের রঙ। হয়তো এলিজা এমনি দেশের খোলা রোদবাতাসে ঘুরে বেড়ালে তারও গায়ের রং এমন হত। বরং এলিজার রঙ স্বদেশী মেয়েদের চেয়ে একটু ভিন্ন। কাকা তাকে গ্রীন নামেই ডাকেন।

কিন্তু রবার্ট অবাক হয়েছিল সেজন্যেও নয়। মেয়েটির দেহের গঠন সর্বোপরি মুখখানি আবিশে হুবহু সেই এলিজা, তেমনি ছিপছিপে হাল্কা। ডিমালো মুখ, সরু লম্বা নাক, চুলের রঙও অবিকল এক।

সে চোখ মুছেছিল রুমালে। এই হরিবল ইন্ডিয়ান সূর্য তার উজ্জ্বলতা দিয়ে যেন একটা মিরর-ইমেজ তৈরি করেছে হঠাৎ। এই নির্জন তৃণভূমির জগতে এ এক যায়া।

রবার্ট যতটুকু জানে—এদেশে সাদা চামড়ার মানুষ সম্পর্কে একটা দারুণ আতঙ্ক আছে। বিশেষ করে মেয়েরা এদের দেখলে ঘরের দুয়ার বন্ধ করে লুকিয়ে পড়ে। কোনওগ্রামে কোনও ইংরেজ সিভিলিয়ান গেলেও তারা গ্রামে 'গোরা এসেছে, গোরা!' এই অস্ফুট সতর্কতায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য এ আতঙ্কের কারণ আছে অনেক। মিঃ স্টোনের মত মানুষরাই হয় তো এ সবের জন্যে দায়ী।

তবে হিজল অঞ্চলের কথা আলাদা। যে-সব প্রজাদের বসত এই দুর্গম জলজঙ্গলময় তৃণভূমিতে করা হয়েছে, তারা অধিকাংশই সদ্যমুক্ত দীর্ঘমেয়াদী কয়েদি কিংবা দূর গ্রামাঞ্চলের দুর্ধর্ষপ্রকৃতির মানুষ। শিষ্টসজ্জন গৃহস্থ চাষা বাঘ সাপ হায়েনা শুয়ারের বিরুদ্ধে, প্রমত্ত পাহাড়ি জলধারা দ্বারকা নদীর সর্বনাশা বন্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণে মারা পড়তে রাজি নয়।

তাই হিজলের আবাদে যারা এগিয়ে আসে, তারা অন্য মানুষ। আর তাদের রক্তে জাত সন্তানেরাও ভিন্ন প্রকৃতির। তারপর এই আরণ্য পরিবেশ আকাশ বাতাস রোদবৃষ্টি জলজঙ্গল কালক্রমে তাদের পুরোপুরি হিজলিয়া মানুষ করে তোলে।

তাছাড়া ফাদার পিয়ারসনের দীর্ঘকাল এ অঞ্চলে উপস্থিতি গোরা-ভয় দূর করতে কম সাহায্য করেনি।

রবার্ট দেখেছিল, মেয়েটি হঠাৎ যেন আতঙ্কিত হয়ে পা বাড়াতে গিয়ে, তেমনি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর দেশী ভাষায় কী বলল তাকে।

রবার্টের বিস্ময় ততক্ষণে কিছু ত্রাসে রূপ নিয়েছে। কলকাতায় থাকতে এদেশের ডাইনীদের গল্প অনেক শুনেছে সে। তারপর এখানে এসে ফাদারের কাছে প্রশ্ন করে আরও কিছু জেনে নিয়েছে। ফাদার বলেছিলেন—ডাইনি এদেশে আছে! আমি স্বচক্ষে দেখেছি ব্যাপারটা সত্যি খুবই আশ্চর্যজনক। দারুণ রহস্যময় আচরণ করে এরা। একবার গভীর রাত্রে একজন ডাইনিকে মাঠ পার হতে দেখেছিলাম। সম্পূর্ণ উলঙ্গ শরীরে। চুল লুটিয়ে পড়েছে পিঠে। হাতে একটা প্রকাণ্ড মাটির পাত্রে আগুন জ্বলছে। সে নাচতে নাচতে চলেছে। মুখোমুখি দাঁড়াতেই খিলখিল করে হেসে ছুটে পালিয়ে গেল....

রবার্ট সত্যি ভয় পেয়েছিল ততক্ষণে। এ মেয়েটিও প্রায় অর্ধোলঙ্গ। একটা ছোট্ট কাপড়ে কোমর থেকে বুক অবধি পেঁচানো। তেমনি অকারণ হাসি। গোরা দেখেও ভয় পায়নি সে।

কিন্তু এ কী করে হয়! অবিকল এলিজা! বলতে ইচ্ছে করে তুমি সত্যি সত্যি গ্রীন হয়ে গেলে এলি?

রবার্টের হাতে বন্দুক। মেয়েটি কী যেন বলল। তারপর জল থেকে উঠে এল। মুখে তেমনি অপরূপ নিঃশব্দ হাসি। কী তার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে হতচকিত বিমূঢ় রবার্ট ক্ষিপ্রহাতে বন্দুকটা তাক করে ফেলল তার দিকে।

অমনি একটা চকিত দীর্ণ আর্তস্বর হিজলের তৃণভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল। ট্রিগারে আঙুল রবার্টের হয়তো চাপ দিয়ে ফেলত মুহূর্তেই—কিন্তু যেন নিমেষে সেই মায়াবতী আদিম বনকন্যা কাশবনের ভিতর সরে গেছে। বন্দুকটা নামাল যখন, দেখল ক্রমশ দূরের দিকে কাশবন আন্দোলিত হতে হতে কাঁপনটা মিলিয়ে যাচ্ছে। সামনে পড়ে আছে একটা ছোট্ট মাছের চুপড়ি। সাহসী রবার্ট সেটা হাতে তুলে নিয়েছিল তৎক্ষণাৎ।

কাদায় জড়িয়ে আছে কিছু মাছ। নাঃ ডাইনি নয়। ডাইনি এমন সুন্দর মাছের চুপড়িতে মাছ ধরে না সম্ভবত।

ঘোড়াটা জামবনে একটা গাছে বাঁধা ছিল কিছুদূরে। মাছের চুপড়িটা জিনের পিছনে আটকে দিল রবার্ট। তারপর ঘোড়ায় চাপল। বাঁধে উঠে আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে সেই কাশবনের দিকে তাকাল সে। একটি সুগভীর শরতকালীন রোদ যথাযথ ঝরছে। একটু করে কেঁপে উঠছে যেন বিষণ্ণতা।

কুঠিবাড়ি লক্ষ্য করে হঠাৎ জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে। যেন কী একটা আশ্চর্য আর অসাধারণ ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেল এইমাত্র। কাকেও খুলে না বললে তার অস্বস্তি ঘুচবে না একটুও।

এদিকে, দ্বারকা, অন্যদিকে গঙ্গা—তার মাঝখানে বেহুলা, শংখিনী, ট্যাংরামারি, কুয়ো নামে অসংখ্য ছোটজলধারা বিস্তৃত জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে এই নাবাল দিকসীমানাহীন প্রান্তরে। আরও একশো বছর আগে ছিল এ এক স্বাভাবিক জলাধার। দূর ছোটনাগপুর পাহাড়ের শালপিয়ালের বনে ঢল-নামা মত্তমাতাল গেরুয়া-রঙ জলরাশি ধেয়ে এসেছে। রাঢ়অঞ্চলের মাটি ধুয়ে নিয়ে জড় করেছে ক্রমান্বয়ে। তারপর জলাধার পূর্ণ করে তুলেছে দিনের পর দিন। আদিম কুমারী দেহ থেকে উন্মেষিত হয়েছে নতুন এক প্রাণ প্রবাহিনী। তৃণভূমি আর অরণ্যে তারা রূপ নিয়েছে।

মুর্শিদাবাদের নবাবকে তুষ্ট করে অনেক দেশী ও বিদেশী মানুষ এই উর্বর সম্ভাবনাময় মাটির উপর নিজ নিজ স্বপ্ন সার্থক করতে চেয়েছিল।

এসেছিল দূর বিহার থেকে ভুঁইহার ব্রাহ্মণ চাষীরা। এসেছিল গরু মোষ ডাকিয়ে নিয়ে তৃণভূমির সতেজ ঘাসের জগতে বিহারী গোয়ালার দল। তারপর এসেছিল ভাগ্যহারা ভূমিহীন মুসলমান চাষিরা। হিন্দু মৎস্যজীবী সম্প্রদায় বাগ্‌দি, কুনাই দুলে, রাজবংশী। হিজলের অরণ্যভূমিতে জনকোলাহল স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল।

ফজল শেখ এসেছিল অনেক দূরের গ্রাম থেকে। সঙ্গে তার মেয়ে। সে জেলখানায় থাকার সময় বৌ মরে যায়, হয়তো অনাহারই তার মৃত্যুর আসল কারণ। মেয়ে বেড়ে উঠেছিল গেরস্থবাড়ি এঁটোকাটা কুড়ো-বাড়া খেয়ে দারুণ অনাদরে। জেল থেকে ফিরে এলে বাপ মেয়ে কেউ কাকেও চিনতে পারেনি। পারার কথাও না।

পাড়ার লোকে বলে দেয়—এই হচ্ছে তোমার বাপ, এই হচ্ছে তোমার মেয়ে।

আটবছরের ফুলী (ফুলের মতন নাকি রূপ তাই মা ডাকত ফুলী বলে, কখনও বলত ফুলকি, ফুলতন, ফুলবানু) নিঃসঙ্কোচে বাপের হাত ধরেছিল। সেই হাতধরাধরি করেই বাঁচতে চেষ্টা করছিল দুজনে।

তখন হাওয়ায় হিজলের নতুন মাটির গন্ধ ছাড়াচ্ছে পরগনায়। রূপপুরের মণি সিং আসেন ঘোড়ায় চেপে। ঘোড়ার জিনের সঙ্গে আটকানো ওষুধের বাকশো। গ্রামে গ্রামে ঘুরে অসুখবিসুখের তত্ত্বতল্লাস করেন। বলেন সাবধান, কেউ গোরাদের কাছ থেকে ওষুধ খাবে না। ও তোমাদের জাত মারবার ফিকিরে আছে। খেরেস্তান করে ফেলবে সব। সাবধান!

আধপাগলা মানুষ। এই হুঁস আছে, এই নেই। ওর কথা কি ধরতে আছে? রূপপুরের বুড়ো গোরা পাদরি পায়ে হেঁটে আদমগঞ্জে এলে তবু ধুম পড়ে যায় ছোটলোক চাষাভুষোর পাড়ায়। পরে সিংজি এসে শোনেন আর রাগে দাঁত কিড়মিড় করেন। চৌদ্দো পুরুষ তুলে গান দেন ওদের। ওরা মজা দেখে হাসে। অথচ আরও মজার কথা, পাদরি সায়েবের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল, কিন্তু সে তখন অন্য দৃশ্য। গলাগলি কুশল বিনিময়, গালভরা হাসি, পাশাপাশি মুখোমুখি রাজ্যের কথাবার্তায় কখন বেলা ডোবে বাঁশবনের আড়ালে। পাখি ডাকে। আবছা আঁধার এসে ঘেরে হাত বাড়িয়ে। ডোবার ধারে পোকামাকড়ের গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়।

তবু কথা ফুরোবার নয়।

তারপর একসময় কী ভেবে টের পেয়ে দুজনে—রূপপুর এই রাতের পথে পাঁচমাইল দূরে।

ফাদার।

বলো প্রিন্স।

প্রিন্স! অন্ধকারে মুখ দেখবার চেষ্টা করেন মণি সিং। হয়তো অস্ফুট হেসে ওঠেন।

ইয়েস, রাজ্যহারা রাজপুত্র—কিন্তু রাজপুত্রই। এইটিন ফিফটি সেভেনে কে এই বাদশাহি সড়কে ঘোড়ার পিঠে বন্দুক হাতে ছুটে গিয়েছিল বহরমপুর ব্যারাকের দিকে তাকে আমি ভুলিনি।

মণি সিং দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। সন্ধ্যারাত্রির নির্জন পথে সব স্তব্ধতাকে চিরে যেন একটা প্রচ্ছন্ন হাহাকার একবার ফুটে নক্ষত্রের আকাশে মিলিয়ে যায়। ঘোড়ার লাগামটা হাতে নিয়ে পাশাপাশি দুজনে হাঁটতে হাঁটতে কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে থাকেন।

ইয়েস প্রিন্স, এবার আমাকে যেতে দাও।

ইচ্ছে করে তো আমার পাশে আসতে পারো ফাদার। ঘোড়াটা কমজোর নয়।

না আমি একটুখানি মুসলমান পাড়ায় যাব।

ঘোড়ায় চাপতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে আসেন মণি সিং।—কী ব্যাপার?

ফজল শেখের মেয়েটি অসুস্থ। একবার দেখে যাই।

হোয়াট! গর্জন করে ওঠেন মণি সিং।

কেন প্রিন্স, চটে গেলে মনে হচ্ছে?

আর কিছু বলেন না মণি সিং। ফজল শেখ এতখানি বিশ্বাসঘাতকতা করবে, ভাবতে পারেননি। তার মেয়ের অসুখ। কী আশ্চর্য, একবারও তাঁকে বলেনি সে—বলেছে ওই খ্রিস্টান পাদরিকে! দেশের মুসলমানেরা যখন খ্রিস্টান আর গোরাদের উপর আক্রোশে ক্ষোভে অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে, তখন ফজল শেখ......

ইচ্ছে করে এখনই ছুটে গিয়ে আচ্ছা করে চাবুক মারেন খুনি ডাকাতটার সর্বাঙ্গে। কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হন।

ফজল দীর্ঘকাল জেলে ছিল। দেশের হালচাল কিছু জানে না। বেচারার দোষ নেই।

কিন্তু মণি সিং তাকে স্নেহ করেন জেনেশুনেও সে তাঁকে বলল না! মন কেমন করে ওঠে। অভিমানে কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়। মণি সিং বলেন—আমি চলি ফাদার।

হঠাৎ খুবই দ্রুত অন্ধকারে ঘোড়ার পায়ের শব্দ তুলে তিনি মিলিয়ে গেলেন। ফাদার পিয়ারসন সেদিনই ফজলকে বলে এসেছিলেন প্রিন্সকে চটিও না ফজল। বরং তাঁর কাছেই ওষুধ নিও! হ্যাঁ, কালই তুমি একবার রূপপুরে ওঁর সঙ্গে দেখা কর।

দেখা করেছিল ফজল। সত্যি, অতশত খবর সে রাখে না দেশের। একদিন সে মাটির দারুণ নেশায় খুনি লুঠেরার পথ থেকে ফিরতে চেয়ে শক্ত কব্জিতে হাল ধরেছিল ক্ষেতে। তবু রক্তে দীর্ঘকালের বিষ ছিল লুকিয়ে। তাই ওই মাটির দখল নিয়ে সংঘর্ষ বাধলে হাতে লাঠি তুলে নিয়েছিল। মাঠ রক্তে লাল করে ফেলেছিল সে।

বিশ বছর পরে দেশে ফিরে ফের দেখল, নেশা ঘোচেনি। অসুস্থ মেয়ের চিকিৎসার কথা খ্রিস্টান পাদরিকে বলার মূলে ছিল ওই নেশার কারচুপি। ফাদার যদি হিজলের নতুন জমিদার লালমুখো সাহেবকে একবার বলে দেন, কিছু মাটি সে পেতে পারে।

চুলে পাক ধরেছে, দেহের চামড়া ঢিলে হয়ে এসেছে, হয়তো বা সে রক্তক্ষুধাও গেছে স্তিমিত হয়ে,—তবু মুখোমুখি দাঁড়ালে এখনও দুষমনের বুকে দুরুদুরু কাঁপন জাগে।

কব্জির জোরও মরেনি তার। সে বলেছিল—আমার হালবলদ কিছু নাই ডাক্তারবাবা, কিন্তুক দু'খানা হাত আছে। কোদাল ধরতে জানি। হুকুম পেলেই জঙ্গল উপড়ে ফেলব। শুধু অনুগ্রহ করে সায়েবকে একটিবার বলে দেবেন।

ফাদার বলেছিলেন—ঠিক আছে ফজল। তুমি আগে প্রিন্সের কাছে যাও!

ফজল স্বভাবমত চটে লাল।—কেনে, তার কাছে কেন? শান্তকণ্ঠে ফাদার বলেছিলেন—একদিন সেই এ মাটির মালিক ছিল, ফজল। তার কথার দাম আমার চেয়ে বেশি। ফজল অবাক। এ আবার কী উল্টো কথা বলছেন ডাক্তারবাবা। নাকি ছলছুতো করে এড়িয়ে যাবার মতলব। সে ক্ষুণ্ণমনে বলেছিল—থাক্। কপালে আমার হেজ্জল লেখা নাই। লেখা আছে যা তা তো দেখতেই পাচ্ছি......

ফাদার সকৌতুকে বলেছিলেন—কী লেখা আছে?

ডাকাতি।

ফজল! তুমি আবার ডাকাত হতে চাও?

না খেয়ে তো মরতে পারব না ডাক্তারবাবা।

বেশ, চল আমার সঙ্গে। আমিই তোমাকে প্রিন্সের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। ফাদার পিয়ারসন নবাগত জমিদার প্রতিনিধি তরুণ রবার্ট মোরেলের কাছে এ-অনুরোধ জানাতে চাননি। মর্যাদাবোধের প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন আছে অন্যত্র। আজ তিরিশ বছর ধরে এ অঞ্চলে আছেন তিনি। খ্রিস্টিয়ান ব্রাদার্স অর্গানাইজেশনের আজীবন সভাপতি। যে খ্রিস্টান হবে না, তাকে এধরনের অযাচিত দাক্ষিণ্য দেখালে তিনি যতই তৃপ্তি পান, তাঁর সংঘ তাঁকে ছেড়ে কথা কইবে না। তাই নিতান্ত অসুখ-বিসুখ দেখাশোনা করে জনপ্রিয়তার পথে ধর্মবিস্তারের পরিকল্পনা ছাড়া অন্য কাজে হাত দিতে তাঁর কেমন একটা সংকোচ আসে।

সংঘকে যদি বা ভয় করেন না, মনে হয় সংঘের সঙ্গে সংস্পর্শ ছেদ করে একা হয়তো টিকে থাকতে পারবেন না এখানে। ওই সংঘ তাঁরই আপ্রাণ প্রয়াসে গড়া। চোখের সুমুখে সে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর তিনি তার কেউ নন—ভাবতেও বুক শুকিয়ে যায়।

আর এই পরিচিত মাটি ও মানুষ ছেড়ে অন্য কোথায় এ বৃদ্ধ বয়সে শান্তি পাবেন তিনি? তাই দোটানায় পড়ে অনেক হিসেব কষে পা ফেলতে হয় তাঁকে।

মণি সিং কিন্তু ফজলকে খুশিমনেই গ্রহণ করেছিলেন। বলেছিলেন জমি তোমাকে পাইয়ে দেব, ফজল। কিন্তু....

হঠাৎ থেমে কী যেন নিঃশব্দে ভাবছিলেন মণি সিং। বুকের মধ্যখানে শুকনো ক্ষতটা যেন অনুভব করছিলেন চোখ বুজে। এতদিন ওই দিগন্ত বিস্তৃত অরণ্য প্রান্তরের মাটি ছিল তারই পূর্বপুরুষের। তাঁর উত্তরাধিকার আজ জীর্ণ সিন্দুকে কীটদ্রষ্ট। কুমারী হিজল ভূমিকে নিয়ে দেখা শৈশবের সে বিহ্বল স্বপ্ন কবে ঝড়োহাওয়ায় ছিন্নপাতার মতো কোথায় ভেসে গেছে!

এসেছে সাতসমুদ্র তেরনদীপার থেকে ভাগ্যান্বেষী সাদা চামড়ার মানুষ। দুর্গম অরণ্যের প্রান্তে বন্দুক হাতে ঘোড়ার পিঠে চেপে তাকিয়ে আছে অনন্তসম্ভবা ভবিষ্যতের দিকে।

হঠাৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করে ফজলকে ফের বলেছিলেন মণি সিং—হ্যাঁ, জমি তোমাকে পাইয়ে দেব। আমার সম্মান থাক্ আর যাক্, আমি ওদের কাছে যাব ফজল। কিন্তু শোনো....

তখন ফাদারের সামনে কথাটা আর বলেননি। পরে একদিন ফজলের আবাদ দেখতে গিয়েছিলেন। সদ্য তৈরি বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ঘাসের বনে ফজলকে কোদাল কোপাতে দেখেছিলেন। তার মেয়ে মাথায় নাস্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বাপের কাছে।

ফজল, ফজল শেখ!

দেখতে পেয়ে ছুটে এল ফজল।—আদাব রাজামশাই আদাব!

মণি সিং হেসে খুন।—থাম্ ব্যাটা শেখের পো। কে রাজামশাই?

কেন? ই মাটি তো আপনার গো!

চুপ চুপ! শুনলে গুলি করে মারবে লালমুখোটা।

ফজল বাঁক্‌রে উঠল কোদাল আকাশে তুলে। মাথা আরও লাল করে দেব না? আমি আপনাকে বই জানিনে, রাজামশাই, সোজ্জা বুলে দিলাম, হ্যাঁ!

তোকে জমি তো আমি দিইনি রে। দিয়েছে রবার্ট সায়েব। এ মাটি তো তাদেরই।

তা দিলে কী হবে? আমি আপনি বই জানিনে। বাবা ফাদারের কাছ থেকে শুনেছি এ হেজলের বিত্তেন্ত। সব ইতিহেস আমার জানা আছে মশাই।

গোঁয়ার গোবিন্দ ভূতেপাওয়া লোকটাকে বোঝান মুশকিল। কিংবা বুঝেও না বোঝবার ভান করে। ফিসফিস করে বলেছিলেন মণি সিং—অনেক রক্ত খরচ করে ফসল ফলাবি ফজল, সে রক্তের একটা ইজ্জত আছে ভুলিসনে যেন। আর....

আর কী গো?

দিন এলে তখন সেই ইজ্জত রক্ষার ডাক আসবে।

ফজল চমকে উঠেছিল সেদিন। মণি সিং চলে গেলে মেয়েকে ডেকেছিল--ফুলকি!

যাই বাপযান!

ফুলকি ওদিকে একটা ডোবায় নেমেছিল শালুক তুলতে। উঠে দেখে, পায়ে মস্ত কালোকুচ্ছিত জোঁক। মান কাঁটায় সেটা সে ফুঁড়ে ফেলেছে। বাপের ডাক শুনে বলেছিল। যাই বাপযান!

ফুলকি রে, কোদালের বাঁটটা নড়বড় কচ্ছে। ভেঙে যাবে মনে হয়। শিগগির একটা ডাল কেটে লিয়ে আয়দিকি!

ফুলকি সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছে। 'ফজল চেঁচিয়ে বলল—পারবি তো?

কানে শোনেনা মেয়ে। তার না পারা কাজ কী আছে হিজলে? জবাব না দিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটেছে। হাতে বিরাট হেসো। রোদে চকচক করছে। ফজল মনে মনে তারিফ করেছিল—সাক্ষাৎ বাঘিনী!

বাঘিনীই বটে।

নায়েব কৃতান্ত ঘোষ ট্যাংরামারি নদীপথে নৌকো করে কুঠিবাড়ি আসছিলেন। প্রৌঢ় মানুষ। দারুণ ভিতু। দ্বারকায় পৌঁছতে হলে যে খাল ঘুরে সোজাসুজি আসা যায়, সেই খালের মুখে এসে দেখেছিলেন একটা হিজল গাছের মগডালে বসে পা ঝুলিয়ে আছে একটি মেয়ে।

পরক্ষণেই তাকে চিৎকার করতে শুনে তিনি নৌকা থামাতে বলেছিলেন। দ্যাখোতো, কি ব্যাপার!

মাঝি কানাই রাজবংশী চিৎকার করেছিল—এই মেয়েমানুষ!

অমনি কি চাহনি ঘাড় কাত করে! অতদূরে তবু চোখে যেন বিজলি চমকাচ্ছে! কী রে? মেয়েমানুষ-টানুষ বুলবি না!

কানাই হেসে বাঁচে না।—তবে কি তোকে পুরুষ মানুষ বলব?

তাও বুলবি না।

তবে কী বুলবো? মুখ ভেংচালে কানাই।

কিছু বলবি না।

বাস রে? কানাই হাসতে হাসতে বলল--সাক্ষাৎ হেজলকন্যে!

ফুলকি হাঁকরাল---খবরদার, গালদিবি না....

'হিজলকন্যা' শব্দটা গালাগালিই বটে। তার মানে জঙ্গুলে মেয়ে—যে শাসন মানে না। তাছাড়াও আরও কিছু বিশ্রী গন্ধ আছে কথাটায়। মাঠে ঘাটে বনে জঙ্গলে যে মেয়ে ঘুরে বেড়ায়, তার আবার সতীপনা? সে তো রাখালের, মেঠো চাষাভুষোর হাতছোঁয়া অপবিত্র মেয়ে!

—আচ্ছা, আচ্ছা, ঘাট মানছি, তা বলদিকি এবার—ওখান থেকে কী দেখে এতো চেঁচাচ্ছিস?

ফুলকি এদিকে লক্ষ্য রেখে বলল—শুয়ার।

—এ্যাঁ!

—তোদের বাগেই আসছে। পালা!

কৃতান্ত ঘোষ ভয়ে কাঠ।—ও বাবা কানাই, বরং নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দে....

গাছের উপর থেকে ওদিকে ফুলকি খিলখিল করে হাসছে—পালা, পালা!

ব্যস্ত হয়ে নৌকোর মুখ ঘোরাচ্ছিল কানাই। হঠাৎ পরক্ষণেই বন্দুকের গর্জন। তারপর যেন শুয়ারের তীক্ষ্ন করাতচেরা চিৎকার শোনা গেল।

ফের বন্দুকের শব্দ। তারপর সব চুপ।

ফুলকিও যেন বিস্মিত হয়েছে। সে একটা কাশবনের মধ্যে নরম মাটি ওপড়াতে দেখছিল একটা শুয়ারকে। হঠাৎ কোত্থেকে কে বন্দুক ছুড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে শুয়ারটা ছুটতে গিয়ে উবুড় হয়ে পাঁকে পড়ে গেল। মুখ ঘষতে থাকল। তারপর আবার বন্দুকের আওয়াজ।

শুয়ারটা স্থির হয়ে আছে এখন।

চারপাশে তাকিয়েও মানুষ দেখতে পাচ্ছে না সে। এ কেমন করে হয়? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে ক্ষিপ্রগতিতে কাঠবেড়ালির মত গাছ থেকে নেমে এল।

খালের উপর নৌকোশুদ্ধ দুটি মানুষ ওদিকে কাঠ হয়ে আছে। কোন সাড়া শব্দ নেই। কৃতান্ত ঘোষ দেখলেন ডোরাকাটা রঙিন তাঁতের হলুদ শাড়ি পরে মেয়েটি জঙ্গলের ভিতর ছুটে গেল। একেবারে বাঘিনী যেন। কার মেয়ে? কথাবার্তা শুনে মুসলমান বলেই মনে হয়। বললেন—কানাই, ওকে চিনিস নাকি রে?

কানাই বলল—চিনতে পেরেছি মনে হচ্ছে। ফজল ডাকুর মেয়ে। কৃতান্ত ঘোষ আরও ভীত কণ্ঠে বললেন—ডাকু বলিস্‌নে বাবা। যেতে দে।

কানাই ভয় পেয়েছিল সত্যি। কিন্তু এতক্ষণে বন্দুকের শব্দ শুনে সে সাহস ফিরে পেয়েছে। বলল—বড়সায়েব শিকারে বেরিয়েছেন নায়েবমশাই বুঝলেন?

কথাটা এতক্ষণে টের পেলেন কৃতান্তবাবু। তাই ঠিক। নইলে এ বনেবাদারে আর কে বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়াবে? বললেন—এক কাজ কর তো কানাই। খানিক এগিয়ে বাঁধের গায়ে নৌকো ভেড়া। সায়েব যখন কাছাকাছিই আছেন, জরুরি খবরটা এখন দিয়ে ফেলা উচিত হবে।

ততক্ষণে ফুলকি শুয়ারটার উদ্দেশ্যে অনেকটা পথ চলে গেছে। কিন্তু সেই কাশবনের কাছে পৌঁছবার আগেই অবাক হয়ে দেখেছে একটা ঘোড়া—অত না ভেবে সে তার মুখের লাগামটা খুলবার চেষ্টা করল।

নাঃ, বড় শক্ত করে আটকানো। কিন্তু ঘোড়াটাও মুখ তুলে শান্তভাবে লক্ষ্য করছে তাকে। পিঠে হাত বুলাতে থাকল সে। জিনে কি অদ্ভুত চেহারার জিনিসপত্র আটকানো। ছোটছোট বাকসো। হাত বুলিয়ে দেখছিল সে। তারপর দারুণ চপলতায় হঠাৎ এক লাফে জিনিসটা আঁকড়ে ধরে পিঠে চেপে বসল একসময়।

ঘোড়াটা যেন চমকে গেছে। পিঠ নাড়া দিচ্ছে। ফেলে দেবার চেষ্টা নাকি? ফুলকি সে-মুহূর্তে চাবুকটা দেখতে পেল। অমনি সে চাবুক তুলে নিয়ে সজোরে ঘা দিল ঘোড়াটার পেটে।

ঘোড়াটা একবার লাফিয়ে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাঝোপের উপর গড়িয়ে পড়ে ফুল্‌কি চেঁচিয়ে উঠল, বাপ, বাপজান!

কাটায় সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল তার। হাত পা ছুড়েও নিজেকে মুক্ত করতে পারছিল না সে। ক্রমশ কাঁটাঝোপটা তাকে উলঙ্গ করে ফেলেছে।

একসময় হতাশভাবে সে থামল। তারপর দেখল সেদিনের দ্বারকার ওদিকে দেখতে পাওয়া সেই গোরা সায়েব বন্দুক হাতে হাসতে হাসতে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

শুয়ে চিৎকার করতে গিয়ে চুপ করল সে। না, বন্দুকটা তাক করেনি তার দিকে। মুখে কেমন অদ্ভুত হাসি। ফুলকি বিড়বিড় করে বলল—আমি আটকে গেছি। টেনে তোল দিকি গোরা সায়েব.....

রবার্ট মোরেল তার ভাষা বোঝে না। নিঃশব্দে পকেট থেকে একটা বড় ছুরি বের করে সে ঝোপের কাছে এল।

একসময় মুক্ত ফুলকির পাশেপাশে ঘোড়াটার দিকে যেতে যেতে সে একটু হেসে বলল—ইউ গ্রীন গার্ল, ফলো মি। আঙুলের ইসারায় তাকে অনুসরণ করতে বলে সে ফের ফুলকির রক্তাক্ত শরীরটা দেখিয়ে বলল—ইউ নিড নার্সিং, কাম অন.....

ফুলকি বুঝছে। কিন্তু ঠিক ভয় নয়—কী একটা বোধশূন্যতার মধ্যে সে এই গোরা সায়েবকে অনুসরণ করছে।

ঘোড়ার পিঠে একটা ছোট্ট বাকসো ছিল। সেটা খুলে ওষুধ আর তুলো বের করল রবার্ট। আর নিঃসঙ্কোচে শরীরটা যেন তার সুমুখে মেলে ধরল ফুলকি। যন্ত্রণা ভুলে মৃদু হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠল। আদিম মানবীর হাসি।

বিকেল নেমেছে হিজলের বসতিতে। বনেপ্রান্তরে শেষ রোদ ঘিরে কোথাও নীল কুয়াসার আচ্ছন্নতা। পাখি ফিরে আসে। ফিরে যায় দূর শাঁখালা বিলের অথৈ জলের জগতে।

ফজল শেখ ঘরে ফিরে আসছিল! বাঁধের বাঁকের মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। সেই বড়সায়েব আসছে ঘোড়ায় চেপে।

কিন্তু ঘোড়ায় তার পিছনে তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ওই মেয়েটি কে? ফজল চিৎকার করে উঠল—ফুলকি, ফুলকি, তু উখেনে কেনে?

ফুলকি হাসছে।

—এই হারামজাদি মেয়ে, নাম শিগগিরি, দিব তুর মাথাটা চেলিয়ে... কোদাল তুলে তেড়ে গেল ফজল! ছি ছি কি লজ্জা!

রবার্ট হাত তুলে থামাল।

ফুলকি বলল—রাগছিস কেন বাপজান? আমি সায়েবের ঘোড়ায় চেপেছি তু রাগ করিস না।

ক্ষোভে আক্রোশে অভিমানে ফজল গজরাল চুপ জাতনাশা মেয়ে।

রবার্ট ঘোড়া থেকে নেমে বলল—হেল্‌প হার ওল্ডম্যান—শী ইজ উন্ডেড।

হেমন্তের হিম কুয়াশা পুঞ্জপুঞ্জ ছড়িয়ে পড়েছে বনজঙ্গল তৃণভূমি ঘিরে। দূরে—অনেক দূরে শাঁখালা বিলের শান্ত জলের উপর সেই নীলাভা কুয়াসা অপরূপ মায়াজগতের আভাস এনে দিয়েছে। কুঠিবাড়ির দক্ষিণ প্রান্তে দ্বারকানদীর ওপারে সিং বাবুদের বাগানে বাঁশবনে জেলেপাড়ার ধূসর রঙের কুটিরগুলির শীর্ষে সকালসূর্যের রক্তরোদেও কুয়াসার নিবিড় স্পর্শ। আর সারা রাত ধরে পুঞ্জপুঞ্জ যে শিশিরের কণা জমে উঠেছিল এখন তাদের বুকে অলৌকিক দীপ্তি। ফড়িঙেরা তার গভীরে স্তব্ধভাবে শুয়ে থাকে যেন পুনরুত্থানের শুভমুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

রবার্ট কুঠিবাড়ির ছাদের উপর পায়চারি করছিল অভ্যাসমতো। সে দেখছিল বাইরের হিজলে এক অলৌকিক মায়াজগতকে। দেখছিল, সারাটি রাতের সঞ্চারিত শিশিরের জলে থপ থপ করে পা ফেলে দূর মাঠের দিকে এগিয়ে গেল হিজলের বুড়ো চাষারা। জোয়ানেরা কাস্তে হাতে তাদের অনুসরণ করল। জেলেপাড়া থেকে বিরাট প্রজাপতির ডানার মত ভেসাল জাল কাঁধে নিয়ে মেয়েরা অগ্রসর হল শাঁখালা বিলের দুর্গমতায়। সোনামুখী ট্যাংরামারি বেহুলা বাঁকি—অনেক নাম, অনেক নদী। সংখ্যাহীন নালা আর জলাভূমি। শরহোগলার ঝোপ, ফাঁড়িঘাস হিজলের জঙ্গল পেরিয়ে বাইরের ওই মায়াজগতের দিকে সকলেই এখন অভিযাত্রা।

রবার্ট তার স্বপ্নের জগতটা দেখবার চেষ্টা করছিল। স্বদেশভূমির লক্ষ আকাশছোঁয়া চিমনি, বিষাক্ত ধোঁওয়ার রাশি, বিকট উত্তাপ, শব্দপুঞ্জ, ক্রুর অঙ্গসঞ্চালন—তারপর হঠাৎ কখন এই আদিম কুমারী পৃথিবীর নীলাভ কুয়াসাময় রৌদ্রময় অলৌকিকের শান্ত, করস্পর্শে তারা কোথায় বিলীন হয়ে গেল! সে যেন জীবনের সেই আদিম দৃশ্য ও ধ্বনিস্পন্দনকে অনুভব করতে পারছিল। এ অতি নতুন সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত তার কাছে। এতদিন ধরে যে জগতের অভ্যন্তরে বারবার যাওয়া আসা করেছে, সে জগত হঠাৎ আজ সকালে কুঠিবাড়ির উচ্চ শীর্ষদেশ থেকে পৃথক এক সম্পূর্ণতায় আত্মপ্রকাশ করে বসল।

রবার্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। একটু চঞ্চলভাবে পায়চারি করছিল সে। কেন সভ্যতার স্বপ্ন? সভ্যতা কী দিয়েছে তাকে?

হয়তো সে তাকে অনেককিছু দিয়েছে—অনেক নিরাপত্তা, আরাম, আনন্দও। কিন্তু কি যেন হারিয়েও গেছে জীবন থেকে—যা এখন সঙ্গীতের সুরে, নির্জনতায়, নিঃসঙ্গ ভাবনায়, অনেক তন্দ্রাহীন রাত্রে, হঠাৎ-হঠাৎ ভেসে আসে। যখন সে হিজলের তৃণভূমিতে নির্জন কাশবনের পথে কোনও হিজলিয়া যুবতীকে বিচরণ করতে দেখে, যখন নদীর স্রোতময় জলে, উচ্ছ্বসিত আবগাহনে মেতে ওঠে হিজলিয়া যুবাপুরুষেরা—তারও মনে হয়, জীবনের একটা গোপন অব্যক্ত নির্দেশ পালন সে আজও করেনি!

রবার্ট একটু হতাশ হয়ে পড়ল। বাবার কড়া নির্দেশ—হিজল পরগনার জমিদারি থেকে শুধু নগদ টাকা পাওয়ার জন্য যত খুশি করবে—বাট নেভার, নেভার ইন্টারফেয়ার ইন এনি ইন্টার্নাল এ্যাফেয়াব্‌স। টেক এ লেসন ফ্রম মিঃ স্টৌনস্‌ লাইক!

রবার্ট অবশ্যই মিঃ স্টোন হবে না। মদ খেয়ে কামজর্জর চিত্তবৈকল্যে ম্যানেজার গ্রেগরীকে বলবেন না—হিজলিয়া যুবতী চাই, এখনই নিয়ে এস। নিশুতি রাতে বনভূমির জগত যুবতী কণ্ঠের চিৎকারে আর্তনাদে ছিন্ন-ভিন্ন করবে না।

বাবা ছেলেকে চেনেন। অথচ কেন এরূপ বলেন? কারণ, রবার্ট একজন যুবাপুরুষ। আর এ যুগে হোম থেকে যে ইংরেজ যুবাপুরুষই এদেশে আসে, নেটিভ যুবতীদের প্রতিই সবার আগে চোখ পড়ে। এ বন্য অসভ্য দেশের যত থ্রিল নাকি এই যুবতী শিকারে, প্রথম হাতেখড়ি এখান থেকেই। অসহায় নেটিভদল সাদা চামড়ার লোক দেখলে তাই চিৎকার করে ওঠে—গোরা, গোরা! আতঙ্কে মেয়েরা খিলকপাট দিয়ে ধুকধুক করে কাঁপে।

নিচে গ্রেগরীকে দেখা গেল ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে যেতে। গেটের দু'পাশে দু'জন নেটিভ দারোয়ান দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভঙ্গীতে সেলাম দিল। সেলাম না পরিহাস, কে জানে! ওরা বাংলাদেশের নয়। একসময় কোম্পানির ফৌজে ছিল। রবার্ট জানে, দারোয়ানেরাও ম্যানেজারটিকে পছন্দ করে না। হিজলের কোনও মানুষই হয়ত পছন্দ করে না।

কিন্তু এত সকালে গেল কোথায় গ্রেগরী? মধ্যে মধ্যে কর্তাকে না বলে বা তার অজ্ঞাতসারেই সে বাইরে কোথায় যায়। ফেরে একেবারে সন্ধ্যায়। কোথায় যায়, কে জানে! রবার্ট অবশ্য তার স্বাধীনতায় বিশেষ হস্তক্ষেপ করে না। বাবার সুপারিশ যেমন আছে, তেমনি নিজের মনেও সে গ্রেগরী সম্পর্কে একটা ঔদাসীন্য অনুভব করে। আর যাই করুক, গ্রেগরী একটা কাজে খুবই পটু।....হিজলের লোকগুলিকে তটস্থ করে রেখেছে তার অদ্ভুত ব্যক্তিত্বে। নিয়মিত সালতামামী খাজনা, উঠবন্দী জমার ফসলের ন্যায্য অংশ, বন্দোবস্তের সেলামি, সকল পাওনাই সে ঠিক সময়ে আদায়ে পটু।

সাবিত্রীঘেরের ওদিকে চাষাদের মধ্যে কিছুকাল থেকে অসন্তোষ চলেছে। নায়েবমশাই খবর দিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত গ্রেগরী আজকাল ওদিকেই বেশি ঘোরাঘুরি করে। তার এখন উঠবন্দী জমার ফসল আদায়ের মরশুম।

রবার্ট আর গ্রেগরী সম্বন্ধে মাথা ঘামাল না। সে কার্নিশে বুক রেখে দূরের দিকে তাকাল। আর সেই সময় হঠাৎ সে লক্ষ্য করল—অনেক দূরে, বিলের উত্তরপ্রান্তে যে কাশবন আর কাঁটা বাবলার দিগন্তবিস্তৃত অনাবাদি জঙ্গলময় এলাকাটা রয়েছে, তার সীমান্তদেশে বাঁধের ওপর কারা ছোটাছুটি করছে। সেই ব্যস্ততার মধ্যে যেন বিষম আতঙ্ক।

ছুটে নিচে নেমে গেল রবার্ট। বাঘ কিংবা বুনোশুয়ারের আবির্ভাব ঘটেছে সম্ভবত। সে তখনই তার দূরবীণটা নিয়ে ফের উপরে এল। তারপর সেটা চোখে রেখে দেখল—এবার লোকগুলি কাকে ধরাধরি করে বয়ে আনছে। কিন্তু আনবার সময় বার বার তারা পেছনের দিকে আঙুল তুলে কি বলাবলি করছে—তাছাড়া আতঙ্কিতভাবে তারা যথাসাধ্য ছুটে আসবারও চেষ্টা করছে।

অবশ্যই বুনো জানোয়ারের আক্রমণ ঘটেছিল। পরে এক সময়ে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করা যাবে।

রবার্ট আরও দেখল ওরা আহত লোকটাকে নিয়ে কিন্তু গ্রামের দিকে আসছে না। ট্যাংরামারির এপারে এক ফকির বাবার আস্তানা আছে। লোকে তাকে মাদার ফকির নামে

ডাকে। ফকিরের আস্তানাটা ঘন হিজল আর ভেলাগাছের জঙ্গলে অবস্থিত। ছোট একটা কুঁড়ে ঘর। লোকটাকে রবার্ট একদিন দেখেছিল। অদ্ভুত চিত্রবিচিত্র রঙিন পোশাক তার পরনে। গলায় মোটামোটা পাথরের মালা। হাতে একটা কিম্ভুতদর্শন অষ্টচক্র লাঠি—হয়তো কোনও বুনোগাছের শিকড় থেকে সেটা তৈরি। সেদিন রবার্ট একটু ভয় পেয়ে সরে এসেছিল। আলাপ করতে পারেনি। ফকিরেরা অনেক মারাত্মক ক্রিয়াকলাপেও নাকি পটু।

লোকগুলি সেই ফকিরের আস্তানার জঙ্গলে প্রবেশ করল। রবার্ট আর তাদের দেখতে পেল না। তাহলে বোঝা যায়, বাঘ শুয়ার নয়। নিশ্চিত বিষধর সাপের দংশন। ফকিররা নাকি ঝাড়ফুঁক করে দিলেই সব বিষ জল হয়ে যায়। কে জানে তা সত্য কিনা—রবার্ট ফাদার পিয়ারসনের কাছে এদের সম্পর্কেও বহু গল্প শুনেছে।

হঠাৎ রবার্ট আরও অবাক হল।

শাঁখালা বিলের প্রান্তে আরও একদল লোক মেষ চরাচ্ছিল। তারাও ছুটে পালিয়ে আসছে। মেষগুলিও যেন কি দেখে ভয় পেয়ে গেছে।

তারপর রবার্ট দেখল, যেন বাতাসে সেই আতঙ্কের খবর ছড়িয়ে পড়ছে। জেলেরা জল থেকে জাল তুলে নিয়ে পালিয়ে আসছে। মাঠ থেকে চাষারাও ছুটে গ্রামের দিকে চলেছে। তারপর গ্রামের বাইরে বাঁধের উপর অসংখ্য লোক দলবেঁধে দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে কী সব বলছে।

আর উপেক্ষা করে থাকতে পারল না রবার্ট। দ্রুত অগ্রসর হল। বুকে টোটার মালা, হাতে বন্দুক। বাবুর্চি ফয়েজ খাঁ প্রাতরাশ প্রস্তুত করে বারান্দায় টেবিল সাজাচ্ছিল। সে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল শুধু। হঠাৎ ভুতেপাওয়া মানুষের মতো বড়সায়েব কোথায় চলে গেলেন—ফিরতে কত দেরি হবে কে জানে।

এই গ্রামটার নাম শ্রীকান্তপুর। রবার্ট বাঁধে যে মানুষগুলিকে দেখেছিল, তারা এই গ্রামের বাসিন্দা। সুশিক্ষিত বনচর ঘোড়া অনেক খাল জঙ্গল ডিঙিয়ে বাঁধের পথে রবার্টকে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে দিয়েছিল।

হঠাৎ স্বয়ং কুঠিবাড়ির গোরাসায়েবকে কাছাকাছি দ্রুত এগোতে দেখে মেয়েরা তৎক্ষণাৎ কেটে পড়েছিল।

রবার্ট হাসিমুখে ঘোড়া থেকে নেমে বলল—হোয়াট হ্যাপেনড? কী হয়েছে?

এগিয়ে এল বুড়োরা। তাদের গোরাবস্তুটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাতে আবার নতুন জমিদার। সেলাম দিয়ে যা বর্ণনা করল, রবার্ট এক বর্ণও বুঝল না।

কতক্ষণ উভয়পক্ষে বোবাসুলভ অঙ্গভঙ্গী দিয়ে ঘটনাটা বোঝবার ও বোঝাবার প্রচণ্ড প্রয়াস চলত কে জানে, হঠাৎ সেখানে ফাদার পিয়ারসনের আবির্ভাব। রবার্ট সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এতক্ষণে যেন তীরভূমি দেখে চিৎকার করে উঠল—হ্যাল্লো ফাদার, আই অ্যাম হেলপ্লেস।

ফাদারও খবরটা পেয়েছিলেন। রানীর বাঁধের ওদিকে একটা খালের উপর গ্রামের লোকেরা কাঠের পোল তৈরি করছে। সেটা তাঁরই তদ্বিরে ও প্রেরণায় গড়ে উঠেছে।

রবার্ট জঙ্গল থেকে প্রয়োজনমত কাঠ কেটে নেবার অনুমতি দিয়েছিল। ফাদার সকালে সেখানেই গিয়েছিলেন। তারপর রবার্টের কাছে খবরটা দিতে আসছিলেন।

ফাদার বললেন—তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম, রবার্ট, ঈশ্বরের দয়ায় এখানেই তোমাকে পেয়ে গেলাম।

বুকে ক্রশ একে ফাদার যা বললেন, শুনে প্রথমে দারুণ হাসি পেল রবার্টের, পরক্ষণেই সে কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ল। অদ্ভুত একটা আতঙ্কের শিহরন তাকে তারপর চুপিচুপি হঠাৎ-হঠাৎ স্পর্শ করছিল। সভ্য জগতের কোলাহলমুখর আলোয় ভরা পরিবেশে সে কথা শুনলে এখনই সে আরও জোরে হেসে উঠত কিংবা প্রাচ্যের কুসংস্কার নিয়ে প্রচণ্ড তামাসায় ফেটে পড়ত। অথচ এ হচ্ছে এক বনজগতের পরিবেশ। অন্ধকারের এখানে আবহমান কালের রাজত্ব। হয়তো সে-রাজত্বের বাতাসে আজ বিঘ্নের আশঙ্কা দেখে অলৌকিক প্রাণীরা ক্রমান্বয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে আক্রোশে হিংসায়। বস্তুত রবার্ট কেমন মনমরা হয়ে পড়ল আস্তে আস্তে। যে ভূতটা এই কিছুক্ষণ আগে কাশবনের ওদিকে একটা মানুষের ঘাড় মটকে মেরে ফেলেছে, সে হয়তো এখন তার আশেপাশে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে তাকে দেখছে।

ফাদার পাশেপাশে আসছিলেন। বললেন—ডিয়ার রবার্ট, আশা করি তুমি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছ।

ঘোড়ার লাগাম ধরে রবার্ট হাঁটছিল। সে জবাব দিল—আমি কিছুই করছি না ফাদার।

কেন? ফাদার থমকে দাঁড়ালেন।

রবার্ট দূরের দিকে তাকিয়ে শান্তস্বরে বলল—এখানে আসবার পর আমি ক্রমশ যেন যুক্তিজ্ঞান হারিয়ে ফেলছি আমার মনে হচ্ছে....মনে হচ্ছে কী জানেন?.... আস্তে আস্তে কোথায় চলে যাচ্ছি—ভীষণ অন্ধকারে, নিজের পরিচিত বা জানাশোনা সব কিছু পোশাকের মত খুলে লাইক এ লোনলি সোল!

নো। ফাদার হেসে উঠলেন।—এ্যানি এনচ্যান্টেড সোল।

রবার্ট বিষণ্ণকণ্ঠে বলল—দ্যাটস রাইট, ফাদার। কিন্তু এতে আমার কিছু করার নেই।

ফাদার তার হাত ধরলেন হঠাৎ।—রবার্ট তুমি কি কবিতা লেখো?

রবার্ট মৃদু হাসল।—না।

কোনও সময় নিশ্চয় লিখেছ!

তাও ঠিক নয়।

তাহলে বলব এই বন্য সৌন্দর্যের স্নেহ থেকে তোমার মধ্যে এক কবি জন্মলাভ করছে।

হবে। কিন্তু কবি হতে আমি চাইনে ফাদার।

কী চাও?

এ মুহূর্তে সেটা স্পষ্ট বলা কঠিন।

ফাদার পিয়ারসন চলতে চলতে বললেন—তুমি কিন্তু বলেছিলে, তুমি হাড়ে হাড়ে

কলোনিয়ালিস্ট। এমন কি সেদিনও তুমি এই বনবাদাড়ে একটা বিরাট শহরের স্বপ্ন দেখেছ।

রবার্ট একটু হেসে বলল—গ্রেগরী বলে, যাদুনগরী। হ্যাঁ—স্বপ্ন একটা ছিল। কিন্তু...

কিন্তু কী?

রবার্ট জবাব দিল না। নিঃশব্দে হাঁটতে থাকল। কিছুক্ষণ পরে ফাদার বললেন—একটা কথা বলব? আশাকরি, অন্যভাবে নেবে না।

বলুন।

অনেকদিনই ভেবেছি, তোমাকে এ নিয়ে কিছু বলব। পারিনি। তুমি আমার ছেলের বয়সী আমি স্নেহ করি তোমাকে!....

অধৈর্যভাবে রবার্ট বলল—কথাটা কী?

প্রিন্স মণি সিং বলছিলেন, তুমি ফজল শেখের মেয়েকে....

হোয়াট! রবার্ট স্বভাবসুলভ বিনয় ভুলে গর্জে উঠল হঠাৎ।

উত্তেজিত হয়ো না, বাছা। গত মাসে তুমি তাকে ঘোড়ায় চাপিয়ে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলে। তখন ব্যাপারটা চাষারা ভালো মনে নেয়নি। ফজল তার আহত মেয়েকে এত নির্মমভাবে আঘাত করেছিল যে আমাকে যেতে হল অবশেষে। মণি সিং-ও সঙ্গে ছিলেন। গিয়ে দেখলাম এলাকার মুসলমান চাষারা সকলেই সেখানে সমবেত হয়েছে। তারা তোমার নামে নালিশ করছিল।

আই সী।

হ্যাঁ। যাইহোক, আমরা ঘটনাটার সত্য ব্যখ্যা দিলাম। তবে বুঝতে পারলাম না তারা সন্তুষ্ট হয়েছে কি না।

মেয়েটি প্রতিবাদ করল না।

প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তার কতটুকু? শী ইজ এ নেটিভ গার্ল, মাইন্ড দ্যাট! রবার্ট ক্ষুব্ধস্বরে বলল—বাট শী ইজ কোয়াইট এ ডিফারেন্ট টাইপ—র‍্যাদার এ্যাবনর্মাল। তার সাহস আছে, জানি।

ফাদার ঈষৎ চাপা গলায় বললেন—রবার্ট, তারপর কি তার সঙ্গে আর দেখা হয়েছে তোমার? প্লিজ, গোপন করো না।

রবার্ট একটু স্তব্ধ থাকার পর বলল—হ্যাঁ, হয়েছে। সে তো জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। অনেকবারই দেখা হয়েছে। তবে তার ভাষা আমি বুঝি না। কথা বলতে চেষ্টা করেছে। আমি শুধু হেসেছি মাত্র।

পুওর বয়।

রবার্ট অস্ফুট হাসল।—হোপলেস্! হোয়াট ক্যান আই ডু, ফাদার?

ফাদারও পরিহাসের সুরে বললেন—দেশী ভাষা শিখবে? একজন ভালো পণ্ডিত আছেন আমার পরিচিত। পাঠিয়ে দেব নাকি?

বাট দি ল্যাঙ্গোয়েজ উইল বি ভেরি ডেঞ্জারাস ফর সামবডি!

উভয়ে হাসতে হাসতে বাঁধ থেকে সমতল জমিতে নামল। পরিহাসের সুরে সব অস্বস্তি ততক্ষণে দূর হয়েছে। ঘাসে ঢাকা জমি পেরিয়ে তারা আরও কিছুদূর অগ্রসর হল। সেই ভূতের হাতে মৃত লোকটিকে দেখার কথা। তারা ফকিরের আস্তানায় প্রবেশ করল। তারপর দেখল কুড়েঘরটির সুমুখে অনেক লোক বসে রয়েছে। উঠোনে মড়াটা রেখে বুড়ো ফকির তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে কী সব মন্ত্র আওড়াচ্ছে বিড়বিড় করে। ফাদার ও স্বয়ং বড়কর্তাকে দেখে তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। উভয়ে হাতের ইসারায় তাদের বসতে বলল। ফকিরের ক্রিয়াকলাপ দেখতে থাকল গভীর আগ্রহে।

মাথার ওপর হিজলগাছের ঘন পাতার আড়াল। রোদ পড়ে না। ছায়া লেপে দেওয়া হয়েছে গোটা আস্তানাটায়। আর তার মধ্যে এই রুদ্ধশ্বাস জনতা, অলৌকিক কর্মে ব্যস্ত বৃদ্ধ ফকির—পৃথিবীতে জীবনের এক বিচিত্র রূপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রবার্ট তন্ময় হয়ে গেল।

হঠাৎ ফাদার ফিসফিস করে উত্তেজিত স্বরে বললেন, রবার্ট! এরা যা ভাবছে, ব্যাপারটা মোটেও তা নয়।

রবার্ট অন্যমনস্কভাবে বলল—কী?

লোকটিকে গলাটিপে মেরে ফেলা হয়েছে।

এরাও তাই বলছে।

কিন্তু গলার পাশে, কাঁধের দাগটা লক্ষ্য করেছ?

ফাদার এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে হাঁটু গেড়ে পাশেই বসলেন। ঝুঁকে পড়ে দেখলেন দাগটা। তারপর ফের বললেন তুমিও দেখ রবার্ট, রহস্যটা বুঝতে পারবে।

রবার্ট একটুখানি দেখে হতাশভাবে মাথা নাড়ল।

ফাদার বললেন—লোকটা যখন বেঁচে ছিল, তখন বলেছিল ভূতটা মেয়েভূত ছিল। ওর কাঁধের দাগটা, নেটিভ মেয়েদের হাতে যে মোটা রুপোর বালা থাকে তারই চাপে সৃষ্টি হয়েছে। তার মানে, কোন মেয়ে তাকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। হয়তো মেরে ফেলার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু চাপটা বেশি হয়েছিল....

রবার্ট বলল—এরা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে ফাদার।

ফাদার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—লোকটা মিথ্যাবাদী।

কেন?

সে শেষটুকু মাত্র বলেছে। গোড়ার ঘটনাটা বলেনি।

কী ঘটনা?

ফাদার শান্তভাবে চোখে-চোখ তাকিয়ে বললেন—আমি এমন কেস অনেক দেখেছি এদেশে। সাধারণত দুশ্চরিত্রা মেয়েরা ডাইনি সেজে রাত্রে তাদের উপপতির কাছে যায়। মুখোমুখি কোন পুরুষ যদি পড়ে এবং সে তার কারচুপি বুঝতে পেরে তার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে, সেই হিংস্র প্রকৃতির মেয়ে তাকে মেরে ফেলতে দ্বিধা করে না। বাস্তবিক তারা

একটু অসাধারণ মেয়ে রবার্ট। আমার বিশ্বাস, এ লোকটির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তবে আজ সকালে জঙ্গলের মধ্যে ওই হিংস্র মেয়েটি কী করছিল, আমি জানি না। শুধু বলতে পারি, এসব মেয়েরাই রাতের দিকে ডাইনি সাজে।

মুহূর্তে রবার্ট চমকে উঠল।—ফাদার, হিজলে তেমন মেয়ে হয়তো একজনই আছে। এবং সে...আর বলল না সে। হঠাৎ থেমে গেল।

ফাদার পিয়ারসন বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তেমনি হঠাৎ রবার্ট কিছু না বলে এমন কি তাঁকে সৌজন্যসূচক বিদায় সম্ভাষণ না করে ছুটে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই ঘোড়ায় চেপে জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হল।

ফাদার ক্ষুব্ধভাবে অথচ দারুণ বিস্ময়ে সেদিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকলেন। তারপর খুবই ভয় পেলেন। রবার্টও কি ভূতগ্রস্ত হল নাকি? সর্বনাশ! বুকে ক্রস আঁকতে আঁকতে তিনি বিড়বিড় করে বাইবেলের স্তোত্রপাঠ কবতে লাগলেন। এখানে লোকগুলি রবার্টের আকস্মিক অন্তর্ধানের প্রতি মনোযোগী নয়। তারা শবদেহ আর ফকিরের প্রতি এখনও তন্ময় হয়ে লক্ষ্য রেখেছে।

ফাদার পিয়ারসন দ্রুত বেরিয়ে এলেন। সমতল মাঠটা পেরোলেন। তারপর বাঁধে উঠে দেখলেন শাঁখালা বিলের প্রান্তে ঘোড়া থেকে নেমে রবার্ট কাশবনের ভিতর অদৃশ্য হল। ঘোড়াটা ঘাসের ভিতর মুখ রেখে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

কী করা উচিত, ভেবে পাচ্ছিলেন না ফাদার পিয়ারসন।

সোনামুখির খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে রবার্ট চিৎকার করে ডাকল—ইউ গ্রীন উইচ, কাম হেয়ার! ফজল শেখের বুনো মেয়ে ফুল্‌কি তখন পানকৌড়ির মত ডুবেডুবে গুগলি তুলছে। কলমিদামে আটকে আছে, ভাসমান একটা ছোট্ট মাটির তেলো। তার মধ্যে গুগলিগুলো রাখছে। হাঁসের খাবার সংগ্রহ করতে ভোরবেলায় বেরিয়েছিল সে। শুনেছিল, সোনামুখির খালে নাকি ঝিনুকও মেলে। এখন দেখছে, গুজবটা মিথ্যে। ঝিনুক পেতে হলে তাকে দ্বারকা নদী অবধি যেতে হবে। কিন্তু শরীর ততক্ষণে বেশ কিছুটা ক্লান্ত। মনও কেমন ঝিমধরা হয়ে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি যতটা পারে, গুগলি সংগ্রহ করে ফিরে যেতে পারলে যেন বেঁচে যায়। সেই সময় কুঠিবাড়ির গোরা সায়েব এসে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে পাড় থেকে।

সে মুখ তুলে ভেজা চোখদুটি মুছে ফিক করে হেসে উঠল মাত্র। এই লোকটি যেন জলে জঙ্গলে সারাক্ষণ তাকে অনুসরণ করার ফিকিরে থাকে। বাগে পেলে গলা টিপে ধরত কিন্তু একে গোরা, মনে হয় গা ছুঁলে হাত পুড়ে যাবে, তায় হাতে বন্দুক। বন্দুকের মহিমা সে দেখেছে ছেলেবেলা থেকে। হিজলে শিকারিদের আনাগোনার তো বিরাম নেই। শাঁখালার বিলে কালে-কালে বুনোহাঁসের দল আসা কমে গেল যেন। শীতের প্রারম্ভে এখন থেকেই পূর্ব-উত্তর কোণ থেকে আকাশপথে তারা উড়ে আসে। এবার যেন

আসছে আর ফিরে যাচ্ছে মাথার উপর থেকে। সায়েবরা সারাদিন বন্দুকের শব্দে হিজলকে চখিয়ে রেখেছে যে। রাগে গা জ্বালা করে। তবে ওই সায়েব বলে রক্ষে।

রবার্ট উত্তেজিত কণ্ঠে ফের চিৎকার করল—ডু ইউ হিয়ার? হেই উইচ!

ফুলকি গলা অবধি ডুবিয়ে তাকিয়ে আছে। রেগে গেছে গোরাটা। কেন? সে ভয় পাবার মেয়ে নয়। কেবল বন্দুক দেখলে গা শিরশির করে।

রবার্ট বন্দুক তুলল এবার।

সঙ্গে সঙ্গে ভুস্ করে জলে ডুবে গেল ফুলকি। বেশ কিছুক্ষণ ডুবে থাকল। তারপর অনেকটা দূরে গিয়ে মাথা তুলল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের প্রচণ্ড আওয়াজ। ফের মাথা ডুবিয়ে ফেলল সে।

রবার্ট হাফাচ্ছিল। পাগলের মত বন্দুক ছুঁড়ছিল সে এলোমেলো। অবশ্য ওকে লক্ষ্য করে নয়—ভয় দেখিয়ে তীরে আনবার ইচ্ছামাত্র। কিন্তু বুনো মেয়েটি কোনমতে উঠবে না জল ছেড়ে। অন্তত ব্যাপার দেখে তাই মনে হয়।

একসময় রবার্ট হতাশভাবে বন্দুকটা নামাল। তারপর সে মাথা তোলবার সঙ্গে সঙ্গে ফের চিৎকার করল। হাত নেড়ে ডাকবার ভঙ্গী করল। এবার তার উত্তেজনা শেষ হয়েছে। প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙে পড়ছে।

ফুলকি ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে এ যেন নিতান্ত তামাসা। তখন সে প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাত জোড় করে জল থেকে অগ্রসর হল পাড়ের দিকে।

এ এক অদ্ভুত দৃশ্য! এক আদিম—প্রায় নিরাবরণা বনমানবী জল ছেড়ে সিক্ত শরীরে উঠে আসছে। মুখে অপ্রস্তুত হাসি। হাত দুটি বুকের কাছে জড়োকরা—যেন আত্মনিবেদন করছে।

কাছে আসতেই রবার্ট খপ করে তার হাত ধরে বলল—ইউ হ্যাভ কিল্ড এ ম্যান? হোয়াই?

ফুলকি তেমন অপ্রস্তুত হাসছে নতমুখে।

রবার্ট তার হাত দুটো নিজের গলার কাছে তুলে টিপে মারবার ভঙ্গী করে ফের বলল—হোয়াই?

এতক্ষণে ফুলকি বুঝতে পেরেছে। মুহূর্তে তার সারা শরীর জলে ঢিল পড়ে ঢেউ ওঠবার মত কেঁপে উঠে ফের স্থির হয়ে গেল যেন। সে চোখ তুলে নিঃশব্দে তাকাল গোরাসাহেবের দিকে। তার নাসারন্ধ্র কাঁপছিল মুখ লাল হয়ে উঠছিল ক্রমশ। দাঁতে দাঁত চাপছিল সে। তারপর রবার্ট বিস্মিতভাবে দেখল, সেই বিস্ফোরিত স্থির শান্ত চোখে আগুন ধরে যেতে যেতে হঠাৎ টস্ টস্ করে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। হিজলের তৃণভূমিতে অরণ্যে সাপ আছে বাঘ আছে শুয়ার আছে হিংস্র প্রাণীদের এই অবাধ রাজত্বে হয়তো আরও বেশি হিংস্র শ্বাপদও আছে—যারা মানুষের বেশ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

আদিম বনমানবীর অশ্রুবিন্দু কী মর্মান্তিক অবমাননার আঘাত থেকে নিস্বরিত, রবার্ট

বুঝতে পারছিল। নিজের জমিদারিতে নরহত্যার ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিচলিত রবার্ট অন্য এক অনুভূতিতে পৌঁছে গেল। সে শান্তভাবে বলল—আই কনগ্র্যাচুলেট ইউ।

হাত ছেড়ে দিয়ে হাত তুলে বিদায় জানিয়ে অভিভূত রবার্ট তার ঘোড়ার কাছে ফিরে এল। কিন্তু কী আশ্চর্য, মেয়েটি তার অবমাননাকারীকে চরম শাস্তি দিয়ে কেমন নির্বিকারভাবে জলে ডুবে হাঁসের খাবার সংগ্রহ করছিল। এতটুকু ভয়সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই, গ্লানি নেই মনে।

ফাদার বাঁধের পথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কাছে যেতেই আতঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করলেন—আশা করি, কাকেও তুমি এইমাত্র খুন করে এলে না রবার্ট।

রবার্ট মোরেল হাসল—নো। নেভার।

তাকে কি দেখতে পেয়েছিলে?

হ্যাঁ।

রবার্ট!

সে অন্য কেউ নয়, আপনার প্রিয়পাত্র ফজল শেখের মেয়ে।

ফাদার পিয়ারসন চমকে উঠে বললেন—কিন্তু এ কথা কাকেও বোলো না রবার্ট। সাবধান।

না। রবার্ট তা বলবে না।

গ্রেগরী ফিরল একেবারে সন্ধ্যায়।

তার সারা শরীর কাদায় বিচিত্র। চুলেও চাপচাপ কাদা। ঘোড়া থেকে নেমেই কুঠিবাড়ির পিছনে দীঘিটার দিকে চলে গেল সে। ওই অবস্থাতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জানালা থেকে রবার্ট তার কীর্তি দেখে চিৎকার করে বলল হ্যালো গ্রেগরী, তেমন সাংঘাতিক কিছু নয় তো?

গ্রেগরী ধূসর আলোয় সাঁতার কাটতে কাটতে হাসছে।—এ মাইনর অ্যাকসিডেন্ট।

ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলে?

কতকটা তাই।

একবুক জলে দাঁড়িয়ে সে তার ব্রিচেস আর কামিজটা খুলে ফেলল। মোজা খুলল। জুতোও খুলল। তারপর ঘাটের দিকে ছুঁড়ে দিল একে একে। প্রতাপ রাজবংশী তার খাস ভৃত্য। ছুটে এসে সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। গ্রেগরী বলল—সকালের ঘটনাটা কি আপনি জানেন স্যার?

রবার্ট বলল—কী ঘটনা গ্রেগরী? সেই ভূতের কাণ্ড।

গ্রেগরী জলের শব্দের সঙ্গে হাসল।—ভূত নয় মার্ডার। অথচ জংলী লোকগুলো এ নিয়ে সারা হিজল তোলপাড় করছে।

রবার্ট জানালায় ঝুঁকে প্রশ্ন করল—কেন গ্রেগরী কেন?

গ্রেগরী ডুবেছে। জবাবটা বোধকরি পরে দেবে। রবার্ট বুঝতে পারছিল, ওটা যে নিছক মার্ডার গ্রেগরী তা যে ভাবে হোক টের পেয়েছে। কিন্তু হিজলে তোলপাড় কেন?

একটু পরেই জানতে পারল সে। খাবার টেবিলে বসে গ্রেগরী জানল ভূতের ভয়ে হিজলের চাষারা নাকি থরথর করে কাঁপছে। দূর মাঠের দিকে যেতে সাহস পাচ্ছে না। এমন ভূত হিজলে এই প্রথম—যে দিন-দুপুরে হিজলের যোয়ান চাষার ঘাড় মটকাতে পারে।

বলতে বলতে গ্রেগরী একচোট হাসল। তারপর গ্লাসে খাস হোম থেকে আমদানি স্কচ হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে দিল রবার্টের দিকে।

রবার্ট বলল—দুঃখিত গ্রেগরী। আজ আমার কিছু ভালো লাগছে না।

গ্রেগরীর তাতে কিছু যায় আসে না। গ্লাসটা এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ করে ফের ঢালল। তারপর বলল—মার্ডার যে করছে সে ভূত নয়। কিন্তু আমাদের তাকে খুঁজে বের করা কর্তব্য, স্যার। নয় তো দেখবেন এ নিয়ে অনেকদূর অবধি কেলেঙ্কারি হবে।

রবার্ট বুঝতে না পেরে বলল—কী কেলেঙ্কারি?

লোকগুলো ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে হয়তো।

অসম্ভব। রবার্ট দৃঢ়স্বরে বলল।—সত্যি অসম্ভব গ্রেগরী। যারা বাঘ-সাপ-শুয়ারকে ভয় করেনি, জীবন বিপন্ন করে জঙ্গল আবাদ করছে, তাদের বুকে অনেক সাহস সঞ্চিত আছে। হয়তো হঠাৎ সাময়িকভাবে কিছুটা ভয় পেয়েছে, কেটে যেতে দেরি হবে না।

গ্রেগরী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল—কিন্তু আরও যে মার্ডার ঘটবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা আছে?

গ্রেগরী, স্পষ্ট করে বলো।

গ্রেগরী অদ্ভুত দৃষ্টিতে রবার্টের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—ধরুন, মার্ডারার একটি সুন্দরী যুবতী। একা সে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে....

এ পর্যন্ত শুনেই রবার্ট বলে উঠল—কী বলতে চাও তুমি?

দয়া করে চমকে উঠবেন না স্যার। আমাকে শেষ করতে দিন।

বেশ বলো।

ধরুন, হিজলের অসংখ্য যুবক তাকে ভালবাসতে চায় এবং ভালবাসা জানাবার সুযোগ খুজে বেড়ায়। তারপর.....

রবার্ট ব্যস্তভাবে বলল—তাহলে তাকে আর বাইরে না ঘুরতে দেওয়াই উচিত।

উত্তেজনার ঝোঁকে কর্তার সুমুখেই টেবিলে চাপড় মেরে গ্রেগরী বলল—রাইট ইউ আর। ঠিক কথা বলেছেন। কিন্তু যে তাকে ঘরে আটকাতে পারে বা অন্য কোনও উপায়ে সামলাতে পারে, সে একজন আশ্চর্য মানুষ। সে পুরোদস্তুর চাষা। দিবারাত্র সে জমি আর ফসলের কথা ছাড়া ভাবে না। ওকে নিয়ে তার কোনও মাথাব্যথা নেই।

এবার রবার্ট কিছুটা কৌতুকে বলল—তাহলে একটু কঠিন অবশ্য। তবে মেয়েটির বিয়ে দিলেই বোধ করি ভালো হয়।

—কিন্তু সে তো কাকেও বিয়ে করতে চায় না। বিয়ের কথা উঠলে আত্মহত্যার ভয় দেখায়।

হতাশ অথচ ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে রবার্ট বলল—একটা সাংঘাতিক সমস্যা বটে। কিন্তু মেয়েটিকে তুমি কি চেনো গ্রেগরী?

গ্রেগরী গম্ভীর মুখে বলল—ক্ষমা করবেন স্যার। আমার সঙ্গে তামাসা করা আপনার উচিত কি? আমি যা বলছি, সবই আপনি জানেন।

গ্রেগরী! রবার্ট চমকে উঠল!

গ্রেগরী দমল না। বলল—এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে, ফজল শেখকে হিজল থেকে তাড়ানো। নতুবা দেখবেন, একদিন ফের তার মেয়ে আরেকটা মার্ডার করেছে। তারপর যদি সেটা ধরা পড়েও যায়, ফজল শেখকে ঘাঁটানোর সাহস কারুর হবে না। তাছাড়া লোকে তাকে দারুণ ভয় বা ভক্তি করে থাকে। এখন বলুন স্যার, এমন গোলমেলে জংলি মেয়ে হিজলে থাকলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে কি না?

রবার্ট হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তুমি মাতাল হয়ে পড়েছ গ্রেগরী। তোমার কথাগুলোতে কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। সম্ভবত কোনও কারণে ওর ওপর তোমার আক্রোশ আছে, মনে হচ্ছে। তাই কি?

ততক্ষণে গ্রেগরী সত্যি বেশ মাতাল হয়ে পড়েছে। সে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—জানেন স্যার, বিকেলে বাঁধের পথে যখন ফিরে আসছি, সে হঠাৎ কোত্থেকে মাটি ফুঁড়ে বেরল সামনে! আর এমন ভঙ্গীতে বেরল যে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে পা হড়কে পড়ে গেল। বাঁধের নিচে জলকাদায় আছাড় খেলাম। আমি...আমি কখনও ভুলব না এই নষ্টামি। আমি তাকে স্যার!....

গ্রেগরীর বুলডগ মুখ অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছে। সে হাঁফাচ্ছিল। রবার্ট হাসতে হাসতে বলল—সাবধান গ্রেগরী, ওকে ছুঁয়ো না। ওর মধ্যে স্পিরিট রয়েছে। একেবারে গলায় হাত চেপে দেবে।

নিজের ঘরে ফিরে রবার্ট ফের একদফা দারুণ হাসল। মেয়েটি সত্যি সুরসিকা। মোরেল কোম্পানির জাঁদরেল ম্যানেজারটিকে বেশ নাকানিচুবানি খাইয়েছে। আঃ বেচারা গ্রেগরী, এত দেখেও বোঝে না—কার সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হচ্ছে!

কিন্তু সত্যি কি হিজলের চাষারা ভয় পেয়েছে এ ঘটনায়? রবার্ট ভাবল—একবার খোঁজ নেবে, সত্যি সত্যি এরকম কিছু ঘটেছে কিনা। তাহলে কি সে নিজেই সব রহস্য ফাঁস করে দেবে?

ক্ষতি কী? একটি বুনো যুবতীর জন্য মোরেল কোম্পানির জমিদারিতে আবাদ ব্যাহত হবে, এটা কোনও কাজের কথা নয়। রবার্ট এত উত্তেজিত হল যে সারা রাত সে ঘুমোতে পারল না। বারবার ছাদে উঠে পায়চারি করে এল। রাত্রির হিজলের দিকে তাকিয়ে থাকল। শান্ত রাত্রির হিজলে জ্যোৎস্নার রঙ কুয়াসায় নীল হয়ে আছে। এক প্রগাঢ় রহস্য থমথম করছে সেখানে। দিগন্তে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যেন তন্ময় হয়ে হিজলের দিকে তার মতই তাকিয়ে আছে। আর অর্ধস্ফুট স্বরে দূরে—অনেক দূরে কি একটা পাখি ডাকছে ট্রি.....ট্রি....ট্রি

যে-যুগের এ কাহিনী, সে যুগের গ্রামীণ মানুষ যেমন অলৌকিকের প্রতি ঘোরতর আসক্ত ছিল, তেমনি লৌকিক ব্যাপারেও তাদের নিষ্ঠার অন্ত ছিল না। এবং এ কাহিনী এই অনাবাদী তৃণভূমি ও জলজঙ্গলের বুকে আবাদের প্রথম দিনগুলির। সেদিনের হিজলে প্রকৃত অর্থে সকলেই ছিল পরস্পর অপরিচিত। প্রচলিত কোনও সমাজ বা সংঘ গড়ে ওঠার তখনও কিছু দেরি ছিল। পেশার ঐক্য তাদের ক্রমশ গভীরতর সামাজিক ঐক্যে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিল—বেশ দ্রুত গতিতেই যাচ্ছিল। কিন্তু সংঘাত—পরস্পর ঈর্ষা হিংসাবিদ্বেষও কম বাধা ছিল না। যেন এক গুপ্তধনের ভাণ্ডারে একদল দুঃসাহসী পরস্পর অপরিচিত মানুষ প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। তাই যে যতখানি পারে, লুটে নেবার তীব্র প্রয়াসে তৎপর। কেউ কারুর দিকে দৃকপাত করে না।

এই ছিল সেদিন হিজল বিলাঞ্চলের ইতিহাস।

তাছাড়া এই মানুষগুলি ছিল মোটের উপর দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের মত। আরণ্য শ্বাপদ ও সরীসৃপের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল তারা একাএকা। কখনও কদাচিৎ স্বার্থসূত্রে তারা দলবদ্ধভাবেও কাজ করেছিল বা বাধ্য হচ্ছিল করতে। এবং সেদিকে ফাদার পিয়ারসন বা মণি সিংহের মত মানুষের অবদান কম নয়।

আসলে তারা দূর দেশান্তরে নিজ নিজ জীবনে ব্যর্থ ভূমিহীন মানুষের দল। তাদের অনেকেই যে দুর্ধর্ষ গ্রামছাড়া হিংস্র প্রকৃতির দাগী মানুষ, একথা আগেই বলেছি। বলা বাহুল্য, সে যুগের শান্ত সরল আপাতমুখী গ্রাম জীবনের পরিবেশ ছেড়ে সহজে কোনও গ্রামীণ চাষা হিজলের মত বিপদসংকুল অনাবাদি মাটিতে বসত বাঁধবার স্বপ্ন দেখত না। স্বল্পে তুষ্ট সেই সাধারণ মানুষগুলির দুঃখদুর্দশা হয়তো প্রচুরই ছিল—সকলের। কিন্তু গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ গোলাভরা ধান ছিল না। কিন্তু হিজল? সর্বনাশ! সাপ আছে বাঘ আছে শুয়ার আছে, আছে অসংখ্য ভূতপ্রেত—সর্বোপরি কালান্তক বন্যা। পাহাড়ি নদীর গেরুয়া জলের ডাক শুনে অতি বড় সাহসীও বুক কেঁপেছে ও যেন ক্ষ্যাপা সোনালি মোষ—শিঙ বাঁকা করে মাটি ওপড়াতে দৌড়ে আসে গাঁক গাঁক্ করে।

তাই হিজলে এসেছিল যারা, তারা হিজলের বন্যার মতই দুর্বার। অথচ সমাজ নেই, একা ব্যক্তির লড়াই চলেছে। এবং মানুষ একা থাকলেই সে যত সাহসী হোক, অলৌকিক পায়ে সব সাহস গচ্ছা দিতে বসে।

হিজলে অনেক অলৌকিত ঘটনা হয়তো ততদিনে তারা ঘটতে দেখে থাকবে। ভয় পেয়ে মানুষ মরার কাহিনী সেদিন প্রচলিত ছিল না।

সেই সকালের ঘটনাটিতে তাই সত্যি তারা ভয় পেয়েছিল। পরদিন মাঠে নামতে চাচ্ছিল না। কারণ তখনও ব্যাপকভাবে ফসলের মাঠ গড়ে ওঠেনি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু জমি আবাদ করা মাত্র। মধ্যে মধ্যে কাশকুশশর হিজল বাবলা নাটাগাছের দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছিল ছড়ানো। বাঘ বা শুয়ার এসে সেখানে বসে থাকলে তাদের ঘিরে মারা চলে বা চোখেও পড়ে। কিন্তু ভূতপ্রেত—তারা বিদেহী। তাদের জব্দ করতে পারে একমাত্র ওঝারা। কিছু কিছু ওঝাও ততদিনে হিজলে আস্তানা পেতেছিল।

ফাদার পিয়ারসন বুদ্ধি বাৎলে দিলেন। ওঝারা হিজল ঘুরে মন্ত্রপূত করে দিক্। তাহলেই আর ভূত থাকবে না।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য। দশবারোজন হিন্দু ও মুসলমান ওঝা উচ্চকণ্ঠে মন্ত্র আওড়ে সারাটি দিন হিজলের বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াল। রবার্ট বাঁধে দাঁড়িয়ে দেখছিল। অতিকষ্টে হাসি দমন করছিল সে।

সেই সময়ে হঠাৎ মণি সিং এলেন। তেমনি নগ্ন শরীর, জুতোবিহীন পা, মাথায় হেলমেট, গলায় একটা সাদা চাদর জড়ানো। ঘোড়ার জিনে বেশ বড় একটা প্যাঁটরা। ওষুধে ভরতি সেটা।

এসেই বললেন—এই যে মিঃ রবার্ট, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

রবার্ট, তাঁকে দেখে সোৎসাহে বলল—ধন্যবাদ প্রিন্স। কেমন আছেন?

ভাল। কিন্তু মিঃ রবার্ট, এসব কী?

রবার্ট গম্ভীর মুখে বলল—কী বলুন তো?

এদের আপনারা মানুষ বলেও স্বীকার করতে চান না মনে হচ্ছে। নইলে এই ফার্সের কী মানে হয়?

রবার্ট একটু চুপ করে থেকে বলল—ব্যাপারটা সত্যি হয়তো ফার্স। কিন্তু আমি এদের অপমান করতে চাইনি প্রিন্স। এতে তারা যদি সাহস পায় তো কার কী ক্ষতি? আমি কি ভুল বলছি প্রিন্স?

মণি সিং গর্জে উঠলেন—হ্যাঁ, ভুল। ফজলের শয়তানি মেয়েটার শাস্তি না দিয়ে এতগুলো মানুষকে বোকা মানানোর কোনও অর্থ হয় না।

রবার্ট বিস্মিত হল। প্রিন্স এ খবর পেলেন কোথায়? নিশ্চিত গ্রেগরীর কাজ। স্কাউন্ড্রেলটা তার মানসম্মান ডোবাবে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু প্রিন্সের স্বভাবচরিত্র তার জানা আছে। আধ পাগলা মানুষ—পলকে শান্ত, পলকে ক্রুদ্ধ। তাই সে ক্ষুব্ধ হল না বিন্দুমাত্র বলল—সেই মেয়েটিই যে খুন করেছে তার কোন প্রমাণ আছে?

আছে বৈকি। যে স্বচক্ষে দেখেছে এ ঘটনা, সেই আমাকে বলেছে।

কে সে? মিঃ গ্রেগরী কি?

হ্যাঁ।

রবার্ট চিন্তিতমুখে বলল—হবে। কিন্তু সে তো কিছু খুলে বলেনি আমাকে।

জানে, বলেও কোন লাভ হবে না; তাই বলেনি।

এই বলে হঠাৎ মিটিমিটি হাসতে থাকলেন মণি সিং। রবার্ট বলল—কেন লাভ হবে না প্রিন্স?

মেয়েটির প্রতি আপনার দুর্বলতা আছে।

হোয়াট! রবার্ট লাফিয়ে উঠল।

মণি সিং বললেন—মিঃ রবার্ট আশা করি স্টোন সায়েবের কাহিনী আপনি জানেন।

রবার্ট ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল—স্টোন, স্টোন! আমি স্টোন নই প্রিন্স, আমি রবার্ট। আর আমি যে সত্যি স্টোন নই, তার প্রমাণ শিগগির আপনাদের দেব। আই প্রমিজ।

উত্তেজিতভাবে ঘোড়ায় চেপে সে কুঠিবাড়ির দিকে ছুটে গেল। মণি সিং কিছুক্ষণ হাসিমুখে সেদিকে চেয়ে থেকে বললেন—পাগলের বেহদ্দ।

তারপর দূরে ফাদার পিয়ারসনকে দেখতে পেয়েই হঠাৎ আবার ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচালেন—এই যে শয়তান পাদরি, দাঁড়াও—দেখাচ্ছি মজা। তুমিই যত নষ্টের গোড়া!

কদিন ধরে প্রায় উন্মত্তের মত হিজলের বনেজঙ্গলে জলায় ফুলকিকে খুঁজে বেড়াল রবার্ট। কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেল না। ব্যাপার কী? না কি আসল ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে, তাই বুড়ো চাষাটা আর তার মেয়েকে বাইরে বেরোতে দেয় না?

তার বাড়ি যেতেও দ্বিধা আসে রবার্টের। পরে মরিয়া হয়ে একদিন গ্রেগরীকেই জিজ্ঞাসা করে বসল সে—গ্রেগরী ফজল শেখের খবর কী?

গ্রেগরী ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল—ওর আর নতুন খবর কী? দল পাকাচ্ছে আর মাঠে ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছে। কাল দেখলাম, আমাদের খাস জায়গার বেশ কিছু অংশ পরিষ্কার করে ফেলেছে। আমাদের অনুমতিও নেয়নি। আমি ওকে সাবধান করে দিয়ে এসেছি।

অনুমতি পরে নেবে হয়তো। রবার্ট বলল—তাছাড়া ক্ষতি কী তাতে? আবাদ বাড়লেই তো আয় বাড়বে আমাদের।

কিন্তু সেলামির টাকা?

রবার্ট শান্তভাবে বলল—তাও নিশ্চয় না দিতে পারবে না। তবে গ্রেগরী বাবার নির্দেশ তো জানো, কেউ যদি আবাদের সীমানা বাড়াতে চায়, আমরা তার প্রতি নমনীয় মনোভাব দেখাব।

ওর পথ যদি সকলেই অনুসরণ করে, আর পরে সেলামি না দেয়?

রবার্ট একটু হেসে বলল—তখন তুমি তো আছ। মোরেল ব্রাদার্সের হুঁশিয়ার ম্যানেজার। তুমি ম্যানেজ করে ফেলবে।

গ্রেগরী তার বন্দুকটা দেখিয়ে বলল—হ্যাঁ। হেয়ার ইজ দি ইনস্ট্রুমেন্ট অব ম্যানেজমেন্ট।

সর্বনাশ! তুমি কি সত্যি সত্যি খুনোখুনি করবে নাকি?

তৈরি থাকুন স্যার। দিন আসতে দেরি নেই—এই বলে সে শুয়ারের ভঙ্গীতে নিঃশ্বাস টেনে ফের বলল—আই স্মেল লাইক দ্যাট।

ধন্যবাদ ব্রেভ চ্যাপ। রবার্ট তার কাঁধটা নেড়ে দিল দু'হাতে।

কিন্তু হোয়াট এবাউট দ্যাট ডেঞ্জারাস গার্ল?

গ্রেগরী সাপের মত নিষ্পলক তাকাল। —শুনেছি, তাকে আর বেরোতে দেয় না বুড়োটা। কোত্থেকে আরেকটা ডাইনি জুটিয়েছে—সে নাকি ওর বোন। ভীষণ দজ্জাল বুড়িটা। বাড়ির ত্রিসীমানায় কাকেও দেখলে বিরাট কাটারি হাতে বেরিয়ে আসে।

তুমি কি ওদিকে গিয়েছিলে নাকি?

না যাওয়ার কারণ নেই। আমার কাজের তাগিদে যেতে হয়।

তোমাকেও নিশ্চয় তেড়ে এসেছিল?

গ্রেগরী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কী বলে জানালার দিকে সরে গেল। রবার্ট বাইরে এল। সিঁড়ি বেয়ে সামনের লনে নামল সে। পায়চারি করতে থাকল। কেমন একটা বিষণ্ণতা তার স্নায়ুতে ভর করছিল। হিজলে হঠাৎ সকলই যেন অর্থহীন মনে হচ্ছে। অর্থহীন আর হাস্যকর। যেন বাবা তাকে এই অতিদূর আদিম পৃথিবীর অরণ্যে কী অপরাধে নির্বাসিতের জীবনযাপনে বাধ্য করেছেন। আর যেন সে আস্তে আস্তে একটা সুযোগ্য গ্রাম্য ভাঁড়ের ভূমিকা গ্রহণ করে শান্তি পেতে চাচ্ছে।

আজ অনেকদিন পরে এই প্রথম স্বদেশের কথা তার মনে পড়ছিল। কিছু পরিচিত মুখ ভেসে আসছিল তার বিষাদের কুয়াশানীল আবরণ ছিন্ন করে একান্ত গোপনে চুপিচুপি। শিশিরের মত সেই মুখগুলো বিন্দুবিন্দু জমে উঠছিল। স্মৃতির চকিত আলোকপাত তাদের ঝলমল রূপ যেন নিজেরই গভীর গোপন কিছু কান্না। ডরোথি এমিলি—সবশেষে এলিজা।

নাঃ, কালই একবার কলকাতা যাবে সে। নতুন প্রেরণা নিয়ে আসবে বাবার কাছে।

পরদিন সত্যি কলকাতা চলে গেল রবার্ট।

এবং রবার্ট না থাকলে গ্রেগরী তখন স্বয়ং কুঠিবাড়ির বড়কর্তা সাজে। স্বীকারও করতে হয় সকলকে। উপায় কী? সদর থেকে শিকারের আছিলায় কালেক্টর আসুন, অথবা মহকুমা অফিসার আসুন, কিংবা মুর্শিদাবাদ নবাব বাড়ির কেউ হোমরাচোমরা যেই আসুন—সকলেই গ্রেগরীকে খাতির না করে পারে না। বিশেষ করে এলাকার কিছু নেটিভ জমিদারের সঙ্গেও তার প্রচণ্ড ভাব। রবার্ট অনুপস্থিত থাকলে সে তখন তার মতই পার্টির আয়োজন করে। পিকনিকের ব্যবস্থা করে। শিকারে নিয়ে যায়।

সেদিন রবার্ট চলে গেলে সে এইরকম একটা পার্টির আয়োজন করে বসল হঠাৎ। রবার্ট চার-পাঁচ দিন থাকবে কলকাতায়। এই সুযোগে নিজের মর্যাদা ও দাপট জোরদার করার অভিপ্রায় ছাড়া তার এ সিদ্ধান্তে তখন অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল না।

সে-যুগে জেলার সদরে কিছুসংখ্যক ইংরেজ সিভিলিয়ান বাস করত সপরিবারে। তারাও আমন্ত্রিত হত কুঠিবাড়িতে। ফলে বিরাট হলঘরে নাচের আসরও জমে উঠত। নিঃসঙ্গ হিজলের জীবনের এ এক উৎসবের মরশুম। সারাটি রাত পানোন্মত্ত ইংরাজপুরুষ আর ইংরাজরমণীরা কোমর ধরাধরি করে নাচত। আদিম অরণ্য সীমান্তে কিছু সময়ের জন্য একটা অরণ্য আদিমতা জেগে উঠত যেন। কেবল রবার্ট মাথা ধরার অছিলায় তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ত। তার এসব হুল্লোড় ভাল লাগত না। অথচ এ বিভূঁয়ে জমিদারি রাখতে গেলে এই ধরনের পার্টি ও উৎসবের মাধ্যমে যোগাযোগ না রাখলেই হয়।

গ্রেগরীর পার্টিতে দিনের দিকে কয়েকজন জমিদারও এসেছিলেন। তাঁরা সন্ধ্যার আগেই কেটে পড়লেন। কারণ তাঁরা ভালোভাবেই জানেন—রাতের আসরে তাঁরা নিষিদ্ধ ফল। উঁকি মারলেই ইংরাজের ইজ্জতে ঘা লাগবে। তবে চাকর-বাকরদের কথা আলাদা। তাদের অবশ্য জীবন্ত মানুষ বলে ধরা হয় না।

রাতের আসর যখন জমে উঠেছে, গ্রেগরী বেরিয়ে এল সকলের অলক্ষ্যে। অত্যন্ত হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল।

প্রতাপ রাজবংশী সিঁড়ির নিচে আধশোয়া অবস্থায় ঝিমোচ্ছিল। একটা লণ্ঠন তার পায়ের কাছে। গ্রেগরী লণ্ঠনটা আলগোছে তুলে তার পায়ে ঠেকিয়ে দিতেই অস্ফুট কাতরোক্তি করে প্রতাপ উঠে বলল—হুজুর!

ব্যাটা ঘুমোচ্ছিস?

এজ্ঞে না। গাল থেকে লালা মুছে আমতা হাসল প্রতাপ।—একটু তন্দ্রা লেগেছিল।

একটা কথা শোন। এদিকে আয়।

গ্রেগরী দেশী ভাষায় ততদিনে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছে। দু'জনে লনের শেষ প্রান্তে ল্যাভেন্ডার ফুলের মাচার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। গ্রেগরী তখন রীতিমত টলছে।

প্রতাপ হাজোড় করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—হুজুর!

সুস্থ অবস্থায় সজ্ঞানে থাকলে—গ্রেগরী যত দুর্ধর্ষ প্রকৃতিরই হোক না কেন—এ মতলবের সাহস তার ছিল না। তাতে রবার্ট নেই। একটা আকস্মিক লুণ্ঠকারিতায় সে আক্রান্ত হয়েছিল। নাচের আসরে যুবতীদেহের কিয়ৎক্ষণ স্পর্শ তাকে তখন উন্মাদ করে তুলেছিল। সে জানে যার সঙ্গেই নাচুক, এই রাত্রে স্বয়ং গৃহকর্তা হয়ে তাকে পাশে শয্যায় পাবার আকাঙক্ষা নিছক দুরাকাঙক্ষা মাত্র! তাছাড়া এসব পার্টিতে কোনও বিবেচক ইংরেজই অনূঢ়া কন্যাদের আনে না। যাকে আনে, সে গৃহিণী অথবা বড় জোর বাগদত্তা। রক্ষিতা ইংরাজ রমণীও ছিল কারুর! সুতরাং গ্রেগরী যাতে উন্মত্ত হয়েছিল, তার নাম একান্তভাবে কামোন্মাদনা ছাড়া কিছু নয়।

এবং এরূপ উন্মত্ত মানুষের তখন জন্তুবৎ আচরণ করতে দ্বিধা থাকে না। মরিয়া হয়ে ওঠে। বুদ্ধিজ্ঞান লোপ পায়। সমগ্র ভবিষ্যত অন্ধকার করে ঢেকে ফেলে সেই পাশবতৃষ্ণার ব্যাপকতা।

একটু পরেই গ্রেগরী ফিরল।

প্রতাপ রাজবংশী এসব ব্যাপারে খুবই পটু। অভিজ্ঞতাও তার অসামান্য। সে তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে যেতেই গ্রেগরী নাচঘরে এসে ঢুকল।

শিথিল কণ্ঠে গান চলেছে। পিয়ানো বাজছে। পানপাত্র আন্দোলিত হচ্ছে প্রতিটি হাতে। গাঢ় রাত্রির অনুজ্জ্বল আলোয় প্রশস্ত হলঘরটা রহস্যময় দেখাচ্ছে। গ্রেগরী একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে ফের বেরল। বন্দুক হাতে ছাদে গিয়ে উঠল। কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়েছে। পূর্ব দিগন্তে একফালি ক্ষয়িত চাঁদ সবে উঁকি দিয়েছে। অস্ফুট জ্যোৎস্না হিম কুয়াশাঘন হিজলে ঘুমন্ত অন্ধকার পৃথিবীকে যেন জাগিয়ে দেবার জন্য চুপিচুপি স্পর্শ করেছে।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে গ্রেগরী ভাবছিল—তারপর? তারপর সকাল হবে। সারা হিজলে খবর ছড়াবে। এবং....এবং।

গ্রেগরী অদ্ভুত হাসল আপন মনে। —এ লেস্‌ন ওনলি। এ্যান্ড নাথিং এল্‌স।

বস্তুত উনিশ শতকের সেই যুগটা আসলে ছিল একটা বিদ্রোহের যুগ। সিপাহি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিদ্রোহ ইতস্তত জ্বলে ওঠা স্ফুলিঙ্গের মতো কৃষক বিদ্রোহ—সর্বত্র এই বিস্ফোরণের উদ্দাম কাঁপন। সভ্য পৃথিবীর জনসমাজ থেকে দূরে এই হিজল অঞ্চলে তার তরঙ্গ হয়তো বাইরে থেকে আসবার উপায় ছিল না। কিন্তু মহাকালের অবিরাম চলার দোলায় যা তরঙ্গায়িত, যার নাম ইতিহাসে,—সে তো হিজলকে বাদ দিয়ে নেই। একই সর্বব্যাপী প্রাণপ্রবাহের বীণা—তার তারে কোথাও কাঁপন উঠলে দূরতম সূক্ষ্মতম প্রান্তেও আপনি বুঝি বা প্রতিধ্বনি বাজে।

তাই হিজলেও সেদিন স্পন্দন দেখা যাচ্ছিল ওই একই বিক্ষোভের। কেবল বিস্ফোরণের মুহূর্তের অপেক্ষা। কেবলমাত্র ঈষৎ আঘাতের জন্য চুপ করে থাকা।

জাঁদরেল ইংরেজ কলোনিয়ালিস্ট—কুখ্যাত জমিদার স্টোনের লাম্পট্যলীলা আর পরিণামে প্রাণবিনাশ, একটা পৃথক ঘটনামাত্র। সে যুগের এমন অনেক দেশী মহাপুরুষও অমন দশাপ্রাপ্ত হয়েছেন। জনমানসে সে-ঘটনার একটিমাত্র অর্থ ছিল তা হচ্ছে—দুর্জনের বিনাশ।

কিন্তু হিজলে ততদিনে ইতিহাস তার ধ্বনিতরঙ্গ পাঠিয়েছে।

নির্বোধ গ্রেগরী জানত না—কিংবা হয়তো জানত—কোথায় সে আঘাত দিয়ে বসেছে। সে-রাতে প্রতাপ রাজবংশীরা সাবিত্রীরঘেরে যে কীর্তি করে এল, হিজলের চাষীরা হয়তো তা সাধারণ ঘটনা বলেই ধরে নিত। কুঠিবাড়িকে এর সঙ্গে জড়াতো না। কারণ খুনি মেয়ে ফুলকির বিরুদ্ধে বহু যুবাপুরুষের গোপন আক্রোশ ছিল। তাছাড়া এতদিনে ভূতের হাতে মনজুর আলির মৃত্যুর আসল কারচুপি ফাঁস হয়ে গেছে। তারা ধরে নিত—এ ঘটনা মনজুরের বন্ধুবান্ধবেরই কীর্তি। অথচ তা হল না।

বুড়ো ফজল শেখের বাহুতে আর জোর ছিল না আগের মতো। আঘাতে তার মাথা ধড়াছাড়া করে প্রতাপ রাজবংশীরা ফুলকিকে তুলে নিয়ে এসেছিল!

কেবল বেঁচে থাকল তার ফুফু—পিসি চাঁদবানু। সেও এক বাঘিনী মেয়ে। লড়াই দিয়েও রুখতে পারেনি। সে মেয়েমানুষ—দয়া করে জ্ঞানশুদ্ধ না মেরে গ্রেগরীর অনুচরগণ তাকে শুধু হাত-পা বেঁধে খালের জলে ফেলে দিয়ে এল। খানিকটা ফাঁড়িঘাস পূর্ণ ছিল। জল ছিল না ডুববার মত। সে সেই ফাঁড়িঘাস আকড়ে ধরে গ্রামের বাইরে অনেক দূরে গোঙাতে থাকল। গোলমাল শুনে হঠাৎ যারা বেরিয়েছিল, তারা ব্যাপারটা টের পাবার আগেই প্রতাপেরা চলে আসে। এত দূরে খালের নিচে মেয়েমানুষের কতরানি কারুর কানে যাবার কথা নয়।

ভোরের দিকে শ্রীকান্তপুরের গয়লারা মোষ চরাতে গিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়ে আসে। তারপর মণি সিং এলেন। ফাদার পিয়ারসনও হন্তদন্ত ছুটে এলেন। সারা হিজলের চাষারা জড়ো হল ফজলের উঠোনে।

মণি সিং প্রশ্ন করলেন—কাকেও চিনতে পেরেছ?

চাঁদবানুর বয়স হয়েছে। চোখে ভালো দেখতে পায় না। তাতে রাত্রিকাল। এবং সে এ অঞ্চলে নতুন এসেছে। কাকেও চেনে না।

মণি সিং চাপাস্বরে তবু প্রশ্ন করলেন—তাদের মধ্যে গোরাসায়েব ছিল?

চাঁদবানু বলল—তা জানি না।

ফাদার পিয়ারসন চিন্তিত মুখে বললেন—রবার্ট আজ দু'দিন হল কলকাতা গেছে। আজও ফেরেনি। কেবল গ্রেগরী আছে। কিন্তু... না, তা অসম্ভব প্রিন্স।

মণি সিং বললেন—খুবই সম্ভব। আমি এখনই পুলিশে খবর দিচ্ছি। তারপর সদরে কালেকটরকেও সব বলব।

পুলিশে খবর অবশ্য দিতেই হবে। কিন্তু প্রিন্স, আমার মতে—হঠাৎ কিছু না জেনে এর সঙ্গে কুঠিবাড়িকে না জড়ানোই ভালো।

মণি সিং ক্ষিপ্তভাবে বললেন—জাতভাই বলে তোমার এত দ্বিধা হচ্ছে, তাই না?

না প্রিন্স। দয়া করে ভুল বুঝো না। তুমি তো আমাকে চেনো। আমি শুধু নির্দোষ রবার্টের স্বার্থেই একথা বলছি। সে বেচারাকেও এর ফলভোগ করতে হবে।

মণি সিং কথার জবাব দিলেন না। উঠে গিয়ে ঘোড়ায় চাপলেন। ক্ষুব্ধ বিচলিত ফাদার পিয়ারসন চাঁদবানুর শুশ্রূষায় ব্যস্ত হলেন। বারবার তাঁর মনে রবার্টের মুখটা ভেসে উঠছিল। হতভাগ্য রবার্ট তোমাকে ঈশ্বর রক্ষা করুন।

কদিন পরেই রবার্ট ফিরল কলকাতা থেকে।

তখনও হিজল থেকে কলকাতা যাবার একমাত্র পথ নদীপথ। দ্বারকায় বজরা ভাসিয়ে চারমাইল দূরে গঙ্গায় পৌঁছান যায়। তারপর দুটি রাত একটি দিনের যাত্রা তবে আসবার সময় উজান ঠেলে আসতে হয়। আরও একটি দিন লেগে যায়।

সে এসেই বিস্মিত হল প্রথমে।

গ্রেগরী নেই। একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে সে।

....ভূতুড়ে জঙ্গলে আর কোন উচ্চাশা আমার নেই। আমার দুর্ভাগ্য আমাকে এখানে টেনে এনেছিল, এখন ভাগ্যের পথে পাড়ি জমালাম।....এবং যাবার সময় কর্তার জন্য একটি সুন্দর উপহার রেখে গেলাম। কর্তা আশাকরি তার সদ্ব্যবহার করবেন।

ক্যাশের টাকা-পয়সা কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখেনি গ্রেগরী। এমন কি কালেকটরেটে জমা দেবার জন্য তাকে রবার্ট যে টাকা দিয়েছিল, সে জমা দেয়নি; সঙ্গে নিয়ে গেছে।

হতচকিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় রবার্ট জানালার কাছে এসে বসেছিল। তারপর হন্তদন্ত হয়ে ফাদার পিয়ারসন এলেন।—রবার্ট, রবার্ট, পুওর বয়।

গ্রেগরী পালিয়েছে, ফাদার।

তার চেয়ে আরও সাংঘাতিক খবর আছে বাছা.... ফাদার সব ঘটনা বর্ণনা করলেন একে একে। রবার্ট রুদ্ধশ্বাসে শুনল। তারপর বলল—এখন আমি কী করতে পারি?

চাষারা ক্ষেপে গেছে রবার্ট। তারা গ্রেগরীকেই সন্দেহ করেছে। এবং তা মিথ্যা নয়, আশাকরি বুঝতে পারছ।

রবার্ট চুপ করে থাকল।

ফজল শেখের বোন আর মণি সিং কালেকটারকে তোমাদের বিরুদ্ধেই সব বলেছে।

অবশ্য এক্ষেত্রে কালেকটার তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে চান না। নীতিগত ব্যাপার আছে একটা। কেবল মামুলি পুলিশ তদন্ত করা হয়েছে মাত্র।

কুঠিবাড়ি সার্চ করেনি?

না তোমাদের অনুপস্থিতির অজুহাত ছিল।

মেয়েটি সম্ভবত এখানেই আছে।

জানি না সে অক্ষতদেহে আছে কি না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন ফাদার, হয়তো তার শুশ্রূষার দরকার হবে।

রবার্ট হলঘর পেরিয়ে গ্রেগরীর ঘরে গেল। বাইরে তালা আটকানো আছে সে ঘরে। একটা হাতুড়ি খুঁজে এনে রবার্ট তালাটা ভেঙে ফেলল। তারপর দরজা খুলল।

একমুহূর্ত মাত্র।

রবার্ট আচ্ছন্ন চোখে পর্দা সরিয়ে ধূসর—অতিধূসর এক অর্ধোলঙ্গ ছায়াদেহিনীকে দেখতে পেয়েছিল। পরমুহূর্তে এক অব্যক্ত আবেগে দুঃখশোকে কিংবা আনন্দ বিহ্বল হয়ে সে চিৎকার করে উঠল—গ্রীন, মাই গ্রীন ফ্লাওয়ার। আর সেই ছায়ামানবী সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল তার বুকের উপর। বুকে মুখ ঘষতে থাকল সে। তার পিঠটা ফুলে ফুলে উঠেছিল। রবার্ট বুঝল তার শার্ট ভিজে যাচ্ছে। সে দু'হাতে মুখটা তুলে ধরল।

ফজল শেখের বুনো মেয়ে পিঙ্গলকেশিনী গৌরী ফুলকি কাঁদছে। উদ্ধারের আলোয় তার অবমাননার কালো ছায়া ঘুচে সহসা যেন ঝলমল করে উঠেছে আত্মার অনুরাগ।

পিছনে ফাদার পিয়ারসন পর্দা তুলেই সরে এলেন। এ বড় পবিত্র দৃশ্য ঈশ্বরের পৃথিবীতে। তাঁর মনে হচ্ছিল নির্বাসিত আদম আজও আবহমান কাল ধরে তার ইভকে অন্বেষণ করে ফেরে। তারপর কোনওদিন পৃথিবীর কোনও প্রান্তে বুঝিবা সহসা খুঁজে পায়। তখন নীরবে অশ্রুপাত করে পরস্পর।

এছাড়া এ দৃশ্যের অন্য কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে?

কিছুদিন পরের কথা।

তখন হিজলের মাঠে ফসল ওঠার দিন।

গ্রেগরী পালানোর পর নতুন ম্যানেজার আসতে দেরি ছিল। প্রস্তুত হয়ে রবার্ট মাঠের দিকে বন্দুক হাতে বেরিয়েছিল। চাষাদের মধ্যে ফসল তোলবার সময় একটা কানাকানি শোনা যাচ্ছিল ক্রমশ। কুঠিবাড়ির বহু ভাড়াটে লাঠিয়াল পাইক মাঠের দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রবার্ট কেমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল যেন। সে হিংস্র হচ্ছিল উত্তরোত্তর কেন সে তা জানে না।

কী ভাবে শাঁখালা বিলের দিকে চলে গিয়েছিল সে! ইদানিং তাকে একা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে নিষেধ করেছিলেন ফাদার পিয়ারসন। তবু সে এমনি করে ঘুরত। ফুলকিকে তার পিসির কাছে পৌঁছে দিয়েও রবার্টের অপরাধ বিন্দুমাত্র কমেনি হিজলের মানুষের কাছে। সেও তো ওই সাদা চামড়া।

কাশবনের প্রান্তে একটা হেলেপড়া হিজল গাছের ডালে রবার্ট গিয়ে বসল। চেয়ে থাকল দূরের দিকে। উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিপাত। নির্জন কাঁটাবাবলার চিরোল পাতায় প্রজাপতি

উড়ছিল। পাখি ডাকছিল। তৃণভূমি এক প্রগাঢ় শান্তির আবেশে শুয়ে আছে। তার বুকে প্রাণের সকল স্পন্দন নীরব মনে হয়।

হঠাৎ একটা গোলমালের শব্দ কানে আসায় সে চকিতভাবে পিছন ফিরল। মাঠের ওদিকে জঙ্গলের আড়ালে কোলাহলটা ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। সে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপল। দ্রুত অগ্রসর হল। তারপর দেখল তার লোকজনের সঙ্গে দাঙ্গা বেঁধে গেছে চাষাদের।

সে তৎক্ষণাৎ বন্দুক তুলে আকাশে গুলি ছুঁড়ল। আরও খানিক অগ্রসর হল। ফের সে বন্দুক ছুঁড়ল।

বীভৎস চিৎকার আর লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকির আওয়াজ। আর্তনাদ। রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্র একটা। রবার্ট দেখল, বন্দুককেও ভয় পাচ্ছে না চাষারা। এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা তাদের পিছনে একটু তফাতে মেয়েরাও এসেছে। উঁচু ঢিবির উপর লাফ দিয়ে দাঁড়াল সে। আরও দেখতে পেল। সারা হিজলের বসতিগুলি থেকে তখনও পোকার মত পিলপিল করে ছেলেমেয়ে যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই বেরিয়ে আসছে। প্রত্যেকের হাতে লাঠিসোটা অস্ত্র। চরম বিস্ফোরণ শুরু হয়ে গেছে তাহলে!

কুঠিবাড়ির গাড়িগুলো দূরে অপেক্ষা করছে। ওতে সব ফসল তুলে নিয়ে যাবার নির্দেশ আছে। রবার্টের বাবার নির্দেশ। রবার্ট তা পালন করবে যেভাবে হোক।

আহতদের জল খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে একদল মেয়ে কলসি আর পাত্র হাতে একটু দূরে বাঁধের উপর অপেক্ষা করছিল।

রবার্ট ফুলকিকে খুঁজছিল। ফজল শেখের জমি কোথায় সে জানে না। এই প্রচণ্ড সংঘর্ষের সময় ফুলকির মতো মেয়ে তার বাবার ফসলের জন্য ভাববে না, এ অসম্ভব। কিন্তু কোথায় সে?

রবার্ট সেই চাঁদবানুকেও দেখল। প্রকান্ড কাটারি হাতে চিৎকার করে কী বলছে। পরমুহূর্তে সামনের নাটগাছের জঙ্গল থেকে অতর্কিতে বেরিয়ে এল বাঘিনীর মতো ফুলকি। সেই ডোরাকাটা হলুদ শাড়ি। সেই উদ্ধত অগ্নিশিখার মত বিশীর্ণ অবয়ব। তার হাতেও একটা লম্বা হেসো। শীতের রোদ ঝলকে উঠছে ডাইনির ক্রুর হাসির মত।

উন্মত্ত রবার্টের বন্দুক দাঙ্গাকারী জনতার দিকে গর্জে চলল অবিশ্রান্ত। তারপর কখন সে ক্লান্তভাবে বন্দুক ফেলে দিয়ে টলতে টলতে চলেছে স্মরণ নেই। সামনে একটা ছোট্ট নালা দেখে থমকে দাঁড়াল একসময়। পিছনের যুদ্ধে জয়লাভ সম্পূর্ণ হয়েছে। রক্তমাখা ফসল গাড়িতে বোঝাই করে ফিরে যাচ্ছে কুঠিবাড়ির লোকজন। তারা মুখে হাত দিয়ে ক্রমাগত বীভৎস গর্জন করছে—আ-বা-বা-বা!

কখন সে যুদ্ধধ্বনিও মিলিয়ে গেছে। শীতের দিন শেষ হয়ে এল। ধূসরতা ঘনাল হিজলের মাঠে তৃণভূমিতে, অরণ্যে। ঘননীল কুয়াশা সব রক্তের স্মৃতিকে ঘিরে ধরল কফিনের মতো। আর কোথায় আকাশের প্রান্তে উড়ে উড়ে বিষাদময় কণ্ঠস্বরে সেই পাখিটা ডাকছে ট্রি.......ট্রি......ট্রি।

পিপাসার্ত রবার্ট জলে নেমে অঞ্জলি ভরে জল তুলল ঠোঁটের কাছে। আর সেই সময়..... হেই দুষমন!

পিছন ফিরল রবার্ট। তার হাত থেকে জল পড়ে গেল ঝরঝর করে। সে লাফিয়ে পাড়ে এসে হাত তুলে ডাকল—গ্রীন, মাই গ্রীন ফ্লাওয়ার!

রক্তাক্ত আহত শরীর পিঙ্গলকেশিনী গৌরি বনকন্যার ঠোঁটে অদ্ভুত হাসি। এই ভারতীয় গোধুলি লগ্নে সে কি সংরাগ, সে কি অন্তিম আমন্ত্রণ, চুম্বনের ব্যাকুলতা—রবার্ট বুঝতে পারে না।

সে আরও কাছে গেল। —মাই সুইট গ্রীন!

বেলাশেষের রক্তরোদে ঝলকে উঠল তীক্ষ্ণধার রক্তমাখা বাঁকানো হেসোটা। রবার্ট বুকে চোট খেয়ে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকল ফুলকি। বারবার। রবার্ট প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে বলে উঠেছিল—হোয়াই গ্রীন, হোয়াই?

কিন্তু ওকি? মৃত্যুর আচ্ছন্নতা দুচোখে—তার মধ্য দিয়ে রবার্ট মোরেল একটা ধুসর মানবী মুখ দেখছে—এত কাছে, অতি কাছে। যেন বুকের উপর সে উবুড় হয়ে শুয়েছে। যেন সাতসমুদ্র পাবের এক যুবাপুরুষের ঠোঁটের উষ্ণস্পর্শ দিয়ে এক বিদেশিনী অরণ্যচারিনী শেষবারের মত আত্মনিবেদন করছে।

তুমাকে আমি মারতাম না গোরাসায়েব, মন চায়নি। কিন্তু কেনে—গোরাসায়েব কেনে তুমাকে আমি মারলাম?

রবার্টও অতিকষ্টে শুধু বলল—হোয়াই?

ফাদার পিয়ারসনের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল—রবার্ট, রবার্ট।

বাঁধের পথে ধুসর আলোয় ফিরে যাচ্ছে হিজলকন্যা ফুলবাণু। ফজল শেখের পিঙ্গলকেশিনী গৌরি মেয়ের মনের মধ্যে কী ভাবনার আলোড়ন কেউ জানে না। হয়তো হিজলের মাঠকে ঘিরে তারও একটা আশ্চর্য স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল। তাই সে কম্পিত ঠোঁটে বিড় বিড় করে বলছিল—কেনে কেনে? তুকে কেনে মারলাম?

মোরেল ব্রাদার্সের তরুণ প্রতিনিধি রবার্ট মোরেল হিজলে অলৌকিক অন্ধকারে পথ খুঁজে পেয়েও এক প্রশ্ন করে গেল শুধু—হোয়াই? কেনে?

এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না।

গল্প শেষ করল চৌধুরী বলল—পারো পণ্ডিত? তুমি দিতে পারো? আবেদালি চুপ করে থাকল। চারপাশে অন্ধকার স্তব্ধ পৃথিবী। এখানে একটুকরো আলো। কেবল তারই দীর্ঘশ্বাস কানে আসে।

একসময় হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। তারপর বলল আমি রাজার ঘরে যাব চৌধুরীবাবু। বুঝিয়ে বললে মা রাজি হবে—আমি তো তার পেটের ছেলে।

তৃতীয় পর্ব

এমনি করে অনেক রক্ত ঝরেছে হিজলের মাঠে। সাদা কাশফুল লাল হয়ে গেছে। ফসলের শিষে জমে উঠেছে থকথকে গাঢ় চাষাড়ে রক্ত। ঈর্ষা জেগে থাকছে রোদে, হিংসা বাতাসে ভেসেছে। জ্বালা রোদে। বাতাসে কটু গন্ধ। ফের সব বদলে যায়। রক্ত ধুয়ে যায়। ঈর্ষা ও হিংসার আবিলতা ঘুচে দেখা দেয় নতুন রোদ নতুন বাতাস। তখন হিজলের মাঠে উজ্জ্বল সবুজ ফসলের দিন।

আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি। হিজলে তাদের রূপ ভিন্ন ভিন্ন।

একদিন এই হিজল ছিল প্রসারিত প্রাকৃতিক জলাধার। ছোটনাগপুর পাহাড়ের শরীর গলিয়ে হলুদ পাগলা জল এসেছে দূরান্তরে। এক নদী অনেক হয়েছে। অনেক ধারায় গাঢ় গেরুয়া জল ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটেছে ঢালু মাটির ওপর। এখানে হিজল বুক পেতে নিল কোল দিতে।

লক্ষ দিনের মাটিমাখানো জল জমে থেকে স্বচ্ছতর হল। নিচে জমাট পলির স্তর উঁচু হতে থাকল। নগ্ন নিরাবরণ জলের প্রান্তরে জাগল নতুন মাটির চর।

মাটির উর্বরতা এনেছিল অরণ্যকে ডেকে। হিজল-জাম-জারুল-জিয়াল আর বাবলা বন। দুর্গম কাশ-কুশ-শর। বছরের পর বছর তারা বেঁচেছে। গৌড়ে তখন পাঠান আমল চলেছে।

ত্রিবেদীরা এসেছিল অনুর্বর বিহারের কোন পাহাড়ি এলাকা থেকে। ভুঁইঞার ব্রাহ্মণের বংশ। অরণ্যের হিজলে এসে দাঁড়িয়েছিল ঘন গাঢ়ছায়ায়। অরণ্যে বাঘ, শূয়ার, সাপ, হরিণ। অনেক রক্ত ঝরেছে।

শুরু হল দিল্লিতে মোগল রাজত্ব।

হিজল তখনও ঘনঘোর অরণ্য। অপরাধীদের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি। ত্রিবেদীরা হিজলের স্বপ্ন দেখছিলেন তখনও। স্বপ্নের হিজল জেগেছিল মনে।

বৃটিশপর্ব আনল নতুন সময়ের সংকেত। সে-ঘণ্টার ঝংকার ভেসে এল হিজলের অরণ্যে। এল কালেক্টার ম্যাকমিলান, এল জমিদার স্টৌন, ওয়াটসন, মোরেল। মুর্শিদাবাদের কালেক্টাররা শিকার করে গেছে সপারিষদ। ত্রিবেদীরা ডেকে এনেছে। তারা বলেছে : নয়া আবাদ পত্তন করো। আর সেই নয়া আবাদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত হিজলকন্যা ফুলকিদের প্রেম জিঘাংসা হাহাকার। আছে কত তরুণ রবার্টের হৃদয়ের রক্ত, কত মোহ আর বিভ্রমের বিয়োগান্ত কাহিনী। লোকের মুখে তা বেঁচে থেকেছে। বেঁচে থেকেছে পরবর্তী কালের হিজলকন্যাদের প্রেমে-জিঘাংসায়-রক্ত ও অশ্রুর আরও আরও মর্মান্তিক প্রতিধ্বনিতে।

ওদিকে নবাববাহাদুর। নবাব হুমায়ুন জাঁহা লালবাগে হাজারদুয়ারি বানালেন। বিলিতি ইঞ্জিনিয়ার এল। তারাও শুনল হিজলের অরণ্যের কথা। বন্দুক হাতে ছুটে এল। ক্যাম্প, শিকার, স্ফূর্তি।

তারপর এল চাষারা।

শান্ত-ব্যস্ত মানুষ সব। ঝামেলা এড়িয়ে চলতে চায়। তবু নাড়ীতে মাটির গন্ধ ছিল। হিজলের মাটিতে সেই একই গন্ধ তারা পেল। ডাক দিলেন ত্রিবেদীবা। নবাববাহাদুর ডাকলেন। লক্ষ লক্ষ প্রত্যাশী বহু কোদাল হাতে ছুটে এল। বাঁধ বাঁধল। অরণ্যের ছায়া গেল সরে। ফসলের শিষ এঁকে দিল প্রান্তরে। প্রান্তরে এখন রোদ। সে রোদ মোহময়। তবু শান্তি নেই।

বর্ষার নদী ক্ষ্যাপা মোষের মত শিং নেড়ে ছুটে আসে। বাঁধ ভেঙে যায়। শত্রুতা করেও কেটে দেয় কারা। হাজার চাষার চোখের অশ্রু যেন ওই ফসল ডুবানো গভীর অথৈ বন্যার জল। জলের নিচে পচা ফসলের দামে নিস্ফল স্বপ্নের দুঃখ। ঘর ভেঙে যায়। সাজানো সংসার যায় ভেসে। মানুষ ও জন্তুর লাশ ফসলের লাশে মিশে হিজলের বাতাস করে তোলে কটু।

আবার ঘর বাঁধে নতুন করে। নতুন ঘরকন্যা। হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ। ঈর্ষা ও হিংসা। রক্ত ও অশ্রু সর্বোপরি ভালোবাসা। ভালোবাসা বেঁচে থাকে। চাষাপুরুষ ও চাষামেয়ের হৃদয় জেগে ওঠে অমৃতে।

বড়বেড়ে লিবাস আলি কথাটা বলছিল মধু দত্তকে। মধু দত্ত মেয়ের বিয়ে দিয়েছে গোকরণে। বারমাসে তেরটা ব্যাধি। মধু দত্তের ছেলে নেই। ওই এক মেয়ে। বড় ঝঞ্ঝাট। তখন লিবাস হাঁ-করে উঠল : কী ব্যারাম-ব্যারাম কচ্ছিস রে দত্তব্যাটা, লিয়ে আয়দিনি তুর বেটিকে ই হিজলে। নদীর জলে ছেড়ে দে, বুকে তোড় লাগুক। লোহু যাবে বদলে সারা গতরে। হাওয়া খাক্দিনি বাঁওড়ের। রোদ মাখুক খানিক ঘেরের ওপর চলেফিরে। কালির অঙ্গ সোনা হবে রে বাছা......লিবাস প্রথমে ক্ষিপ্তভাবে বলছিল। শেষে হেসে উঠল ফোক্লা দাঁতে। শনের দড়ি কপাক জড়িয়ে নিল ঢ্যারায়। ফের বলল : কথাটো আমি সকলকেই বুলি। যার যা নাই, সে তা পাবে ইখানে। আমি জানি। আমি অনেক দেখেছি। হঠাৎ ঘুরে হাত উঁচিয়ে নিজের পরিবারের লোকজনদের দেখাল। : দ্যাখদিনি ব্যাটা, তাকিয়ে দ্যাখ কী গতর, কী চেহারা! কুথায় পেল এসব? আমাকে দ্যাখ আর ইদের দ্যাখ। আমার বাড়ির মেয়েগুলানকে দ্যাখ। আছে রাজবাড়িতে? দেখেছিস্। এক-একখানা পিতিমা—তুদের ঠাকুর। দশখান হাত জুড়লেই......

ভীষণ হাসল লিবাস আলি।

মধু দত্ত ঘাড় নাড়ছে মোড়ায় বসে। বুড়ো যথার্থ বলে। যৌবন রূপ আর শক্তি হিজলের দান। উজ্জ্বল গৌর গায়ের রঙ, বিধাতার হাতে তৈরি—বেশ মন-টন দিয়ে গড়েছেন। মনে মনে বলে কথাটা। শেষে বলে : জয় নিতাই, প্রভু হে!

ঘাড় ফিরিয়ে বিলাস বলল : সিটা আবার কে? খোদার ছোট ভাই?

উঁ? মধু দত্ত অন্যমনস্ক। সক্কাল-সক্কাল চলে এসেছে আগাম। ত্রিবেদী আসবেন। চৌধুরী আসবে। নাকি আবেদালিরও আসবার কথা। খুব খুশি হয়েছিল সে। একটা শান্তি-টান্তি বজায় না থাকলে বড় মুশকিল। দাদন দেওয়ার ঝক্কি থেকে যায়। ত্রিবেদীও বলেছিলেন। ত্রিবেদী জানেন এটা পুরোপুরি। লালবাগের নবাব বাহাদুরও জানেন। সেবার

মধু দত্তকে খোলা-খুলি বলেছিলেন : ফায়সালা জরুর হোনা চাহিয়ে। নিঁদ নেহী বেটা... বুড়ো হয়ে গেছেন নবাববাহাদুর। ক'দিন বাদে গোরের আঁধারে চলে যাবেন। তার আগে মহালটাতে নিজের ইজ্জত আর শান্তি দেখে যেতে চান।

ইজ্জত আর শান্তি। এই হচ্ছে আসল সমস্যা। চাষারাও এটা নিয়ে ভাবছে। অথচ এই মাটির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেলে, খুব গভীর কোনখানে এসে পড়লে, রক্ত যায় বদলে। ঝনঝন করে বাজে। ইজ্জতের ঝাঁঝ ওঠে তীব্রতর। শান্তির ইচ্ছেটা চুপসে যায়।

মধু দত্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সেজে আছে। অর্থাৎ সালিশীর সব দুতিয়ালিতে সে সমর্থ। অনেক কাঁচা টাকা দত্তর সিন্দুকে। ত্রিবেদীও হাত পাতেন মাঝে-মাঝে। অনেক মামলা এখনও আদালতে ঝুলছে। প্রজার সঙ্গে। খোদ নবাববাহাদুরের সঙ্গেও। একদা হিজল পুরোপুরি বন্দোবস্ত হলে নয়া আবাদের যুগে ত্রিবেদীর আর কোন অভাব থাকবে না। দত্তের অধিক টাকা তাঁর আয়ত্তে আসবে।

অথচ মধু দত্ত বেশ বোঝে অশান্তি থাকলেই ত্রিবেদী হাত পাতবেন। ভবিষ্যত এমনও হতে পারে, অনেক জমির মালিক হতে পারে দত্ত এই সুবাদে। কিন্তু জমি সে চায় না। হিজলের মাটির মালিক হওয়া আর কাঁটার সিংহাসনে বসা একই কথা। সে-মাটি রাখতে হাড় চিতেয় উঠবে। এই চাষাগুলো জীবনের কোন মূল্য বোঝে না। জীবনের প্রতি যত তাদের ভালোবাসা, তত নিষ্ঠুরতা। মধু দত্ত অত চরমে নেই। সে জীবনকে স্বচ্ছন্দে দেখতে চায়। আর চায় টাকা, শুধু টাকা। টাকার ঈশ্বরকে সে জেনেছে জীবন নামে।

একটু পরেই ত্রিবেদী এলেন ঘোড়া চেপে। কান্ত রাজবংশীও এল পেছনে পেছনে দৌড়ে। বাবার আমলে এটা সম্ভব ছিল না কোনওমতে। ঘর থেকে বাইরে বেরনো রাজবংশের পক্ষে বেইজ্জতের সামিল ছিল। কদাচিৎ বেরলে সঙ্গে ডজন দুই পাইক-বরকন্দাজ চাকর-নফর থাকত। ত্রিবেদীর আমলটা ভিন্ন। ত্রিবেদী যেন খাঁটি চাষাপুরুষ হয়ে গেছেন দিনেদিনে। পাল্কী চাপেন না। গড়গড়া টানেন না। মাথায় শিরোপা পরে বের হন না। নগ্ন গায়ে একখানি সাদা চাদর। কোঁচানো ধুতি। পায়ে খড়ম। এবং ওই বেশেই ঘোড়ায় চাপেন। হিজলের মাঠে আসেন কদাচিৎ। চাষাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেন কম। কেবল বাঁধের ওপর কদমবাজি করে ঘোড়া ফিরে যায় হরিণমারার দিকে। কেউ কেউ ফসলের ক্ষেত থেকে বলে ওঠে : রাজাবাবু না? হুই দ্যাখ, দেখতে বেরিয়েছে মাঠ!

ত্রিবেদী এসেই বললেন : চৌধুরী আসেনি?

লিবাস শেখ হাত তুলে সেলাম করল। উঠে দাঁড়াল না। বলল : এট্টা ছড়া শোন রাজামশাই। বেটালে পড়লে হাতি, চামচিকেতে মারে লাথি! স্বভাবমতো হাসছে ফ্যাকফ্যাক করে! : তুমাকে দেখে ভাবলাম গো। গোলাকরাজার কথাটো বাপ বলত। আমরা ছেলেমানুষ তখন। সব মনে আছে বাছা, সব......

ত্রিবেদী ভুরু কুঁচকে হাসলেন। এই বুনো লোকটি যা বলতে চায়, বুঝতে পেরেছেন। তবু গায়ে মাখবেন না। লিবাস শেখ হিজলের সবচেয়ে বয়সী চাষি। এক সময় দাপট ছিল ভীষণ। লাঠি ধরলে একশো জোয়ান কাবু হয়ে পিছিয়েছে। সেই হিম্মতের ঝাঁঝ মনে মনে পোষণ করে আজও। কারুর খাতির-টাতির বোঝে না। সেবার মুখের ওপর

কালেকটরকে বলেছিল : ইটো আমাদের ঘরের বেপার, তু বেটা মাথা বাড়ালে বেলফাটা হবে মাথাটো। শুনে দেশী পুলিশ সাহেব রুল তোলেন আর কি! কালেক্টর থামাল। শুধু তাই নয়, স্বয়ং নবাববাহাদুর একবার এসেছিলেন কাছারিতে। লিবাস তাঁকেও কড়া কথা শোনাতে ছাড়েনি। একে বুনো, তাতে হিম্মতও আছে খানিক। ডাক ছাড়লে তখন হাজার চাষা ছুটে বেরিয়েছে মাথায় গামছা বেঁধে। হাতে ছ'হাতি লাঠি কিংবা সড়কি।

বুড়ো অজগরের মতো ঝিমোচ্ছে লিবাস। ঢুলুনি চেপেছে পুরনো কথা বলতে বলতে। আশ্বিনের রোদ নেমেছে সুমুখে সবুজ মাঠে। ওপাশের খামারে রাশিকৃত পাট ছাড়াচ্ছে মেয়ে-পুরুষ। ঝুরিনামা পুরনো বটগাছের নিচে ছায়ার আরাম। সরে এলেন ত্রিবেদী। মধু দত্তও এল। টিবির ওপর বৈঠকখানা ঘর। শতরঞ্জি আর চেয়ার সাজাচ্ছে আব্বাস আলি। কান্তও জুটেছে। ওগুলো আগাম পাঠিয়েছিলেন ত্রিবেদী। চৌধুরী আসতে বড় দেরি করল দেখে তিনি মাঠের পথে তাকালেন।

আব্বাস সব ঠিকঠাক করে খালের জলে নেমেছিল। স্নান সেরে উঠেই ঘণ্টার শব্দ শুনল। বাঁধের ওপর হাতি আসছে হেলতে দুলতে। মাথা মুছতে মুছতে হঠাৎ থেমে গেল সে। চৌধুরীর পাশে বসে আছে কে ও? চোখ মুছে ভালো করে তাকাল। হ্যাঁ, আবেদালিই। আব্বাস অবাক হয়ে গেল। এ যে সম্ভব হবে ভাবতেও পারেনি। সকালেও চৌধুরীর কাছে লোক গিয়েছিল। খবর পেয়েছিল যে আবেদালি আসছে না। তখন আব্বাস বলেছিল : আমি জানি ও আসবে না। না আসুক। একটা প্রচ্ছন্ন অভিমানবোধ তার মনে ছিল। আবেদালি এলে যেন কী একটা সুখের ব্যাপার ঘটে যায়। সকাল থেকে এরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও প্রত্যাশার টানপোড়েন চলছিল মনে মনে।

হাতি দেখে ছেলেপুলেরা ভিড় জমিয়েছে। পেছনে পেছনে হল্লাও করছে। মেয়েরা উকি ঝুকি মারছিল। শেষে বেরিয়ে পড়েছে পথে। ছড়া কাটছে কেউ কেউ : হাতি তুর কুলোর মতন কান—হাতি, যাবে গঙ্গাচান।

আব্বাস কেমন ঝিমধরা হয়ে গেল। রাহেলা খাতুনের বেটা আবেদালিও এল রাজারঘেরে। রাহেলা খাতুনও এসেছিল। বড় বাড়িতেই এসেছিল। একটা কারচুপি চলেছে কোথাও। কিছু কি ভিন্নতর ঘটবে? ঘটা সম্ভব! আব্বাস কাঠ হয়ে তাকিয়ে আছে। আবেদালিকে দেখছে। আবেদালির জোয়ান শরীরে রোদ জ্বলছে হু-হু করে। হিজলিয়া কাঠামো পেয়েছে বাপের কাছে পুরোপুরি। অথচ তার মুখের আদলে রাহেলাকেই যেন দেখছে নতুন করে। বুকের ভেতর থেকে একটা আক্ষেপ শিরশির করে গলা অবধি এল। বুড়ো-বুড়ি হতে হতে হিজলের পাকা ধানের মত ঝরে যাচ্চি। বয়স যেন জলের সোঁত। বয়স হু-হু করে চলে কোথায়। চুলে পাক ধরল। শরীর হল শিথিল। অথচ ভেতরে গূঢ় ইচ্ছা বেঁচে থাকল। কী হওয়া উচিত ছিল, হয়নি।...এইসব মনে মনে ভাবল আব্বাস। থরে থরে সাজাল কথাগুলো। রক্তের যোগ রাখতে চেয়েছিল—আজ তা নিস্ফল গোরের মাটি। আব্বাস ফের বলতে চাইল : বেটা আবেদালি, তু এসেছিস, ভালো হয়েছে। ইটো খুব ভালো হয়েছে রে।

শুধু একথাটাই বলতে ইচ্ছে করল। তারপর মৃদু হাসল আব্বাস। তারপব জোরে চেঁচিয়ে উঠল : ভালো আছিস রে বাপধন? কতদিন দেখিনি তুকে! আয় দিনি।

হাতির হাওদায় সোজা হয়ে বসেছে আবেদালি। সে অবাক। অবাক চৌধুরীও।

বটের ছায়ায় গিয়ে হাতি রুখেছে মাহুত। ঠুংঠাং ঘণ্টা বাজছে শুঁড় নাড়তে। ক্রমশ ভরে উঠছে ছায়া লোকজনের ভিড়ে। চৌধুরীর পাশে পাশে ত্রিবেদী এগিয়ে যাচ্ছে বৈঠকখানার দিকে। আবেদালি ঘরবাড়ি দেখছে বড়বেড়েদের। অনেকদিন পরে। সেই ছেলেবেলায দু'একবার এ পথে এসেছিল। কেন এসেছিল ভুলেই বসে আছে। আজকের আসাটায় ভিন্ন স্বাদ। চেখে পুরোপুরি দেখার ইচ্ছে। রাহেলা বলেছে : বড়বেড়েরা যদি তোকে ডাকে, যাবিনে ক্যান রে বাছা? রাহেলার চোখে জল এসে গিয়েছিল তখন। আশ্চর্য, জীবনে মাকে কাঁদতে দ্যাখেনি আবেদালি। : অনেক লোহু হিজলে ঝরেছে, ইবার থামা দিনি বাপ আবেদালি। তু মুরুক্‌কু লয়, তু পণ্ডিত। তু যদি থামাতে না পারিস, কেউ পারবে না।

হয়তো বাপের কথা ভেবে কান্না পাচ্ছিল মায়ের। আবেদালি বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তারও চোখ ছপছপ করছিল। চৌধুরীকে বলল তখন : আজ যেন মায়ের আমার নবজন্ম হল মশায়, জানেন?

কেন, কেন? চৌধুরী চমকাল।

মা এতদিনে যেন আমার বাপের জন্যে কাঁদলে। পাষাণ গলেছে চৌধুরীমশায়, সুদিন আসতে দেরি নেই। কিছু ভেবেচিন্তে একথা বলেনি সে। তার মনে হচ্ছিল, একটা রূপান্তর আসন্ন। হয়তো তা হিজলের চাষাদের মিলিত হাতের প্রয়াসে। তালে তালে হাজার মানুষ এবার হাঁটবে।....ঠিক এইগুলোই আবেদালি অনুমান করতে পারে।

হাতি তৈরি ছিল। চাপবার মুহূর্তে হঠাৎ ডেকেছিল আকাশ।

পণ্ডিতভাই!

আবেদালি ঘুরে দ্যাখে আকাশের মুখটা বিষণ্ণ। কিংবা সলজ্জ। মেয়েলি ঢঙে তাকিয়ে পেট চুলকোচ্ছে। উজ্জ্বল হলুদ গতরের ওপর নীলচে শিরাগুলো ফুলেছে। বড় বড় লালচে চুল কপালে ছড়িয়ে পড়ে ছোঁড়াটাকে বিপন্ন মানুষ দেখায়। আবেদালি চমকে উঠেছিল। ফিসফিস করে বলেছিল : কী রে? রমজান বেদে কিছু বলেছে? অর্থাৎ সে চুমকির কথাই ভেবেছিল।

আকাশ বলল : ধেৎ।

তবে কী? আবেদালি বলল। : শিগগীরি বুলদিনি। সময় কম।

তুমি বড়বেড়েদের উখেলে চললে তো! মুখ নিচু করল আকাশ!

হুঁ তা কী হল?

আমি যেতাম।

পায়ে হেঁটে আয় না! হাওদায় জায়গা কম। আবেদালি বিব্রত। ছোঁড়াটা হাতি চেপে রাজারঘেরে যেতে চায়। হাওদার ইজ্জত জানে না।

আমি যাবো না। তুমাকে এট্টা কথা বুলছি পণ্ডিতভাই।

লে বাব্বা! বুল না?

মা যেয়েছিল কনে দেখতে বাড়বাড়িতে....

আবেদালি বুঝেছে। উৎকট হেসে চলে সে। চুমকির সঙ্গে বুঝি সুখ পাচ্ছে না হারামজাদা! এখন মনে পড়েছে কথাটা। আবেদালি জামার পকেট খুঁজে বিড়ি বের করল। কিন্তু জ্বালাল না। কেউ দেখার আগেই চুপিচুপি পকেটে রাখল ফের। বিড়ি টানা উচিত হবে না এখানে। মানইজ্জত নিয়ে এসেছে। বরং চৌধুরীর সিগ্রেট খাবে। ত্রিবেদীর সামনেও খাবে। এখন বয়স্থ হয়েছে। মোড়ল হয়েছে গাঁয়ের। আবেদালি ফের আকাশের প্রসঙ্গ নিয়ে ভাবতে থাকল।

আব্বাস বাড়ি ঢুকে শুকনো খাটো থানটা পরেই সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছে। খাওয়ার ইচ্ছে নেই এখন। বটগাছের ছায়ার আবেদালিকে দেখে ছুটে নেমে আসছে সে। '

ভালো আছিস্ রে বাপ?

আবেদালি খুশি। : হ্যাঁ চাচা।

কতকাল পরে এলি! আব্বাস দীর্ঘশ্বাস ফেলল। : ক্যানে রে, ডর করতিস ক্যানে?

আবেদালি পলকে রেগে লাল। : ডর? আবেদালি গর্জে উঠল।

শওকতের ব্যাটা ডর কী জানে না। ক্যানে ডর বুলোদিনি? কাকে ডর? কে সেটা? হিজলে কার এত হিম্মত....

কিসে কী হয়ে যাচ্ছে। আব্বাস অপ্রস্তুত। লোক জমে যাচ্ছে। উঁচু বৈঠকখানা থেকে কেউ ছুটে এসেছে এখানে। লোকজনের যা স্বভাব এ তল্লাটে।

চৌধুরী এসে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল। আব্বাস বিড়বিড় করে : দ্যাখোদিনি কাণ্ড। কী বুললাম, কী বুঝলে ছেলেটা। হারে বাপধন, আমরা কি তুর দুশমন? আব্বাস দুঃখিত মুখে ফিরে গেল সেখান থেকে। মজলিশে আপাতত যাচ্ছে না। খুবই কুচ্ছিত মনে হচ্ছে ঘটনাটা। শওকত তার ব্যাটার রক্তে আজও বেঁচে থাকল তাহলে।

বাহাদুর ব্যাটা আবেদালি। গোবরের চাপড়ি দেয়ালে সেঁটে ফিকফিক করে হাসছে ভুলিবিবি। দেয়ালের কানে তুলছে কথাগুলো। শুকনো গোবরে ভর্তি কুচ্ছিত দেয়ালে সে এখন অগুনতি মুণ্ডু দেখছে মানুষের। আঁকিবুকিতে মুণ্ডুর নাক মুখ চোখগুলো নানা রকম ভাবভঙ্গীও দেখায় শুনতে-শুনতে। ভুলিবিবি আরও উৎসাহে কথা বলে। বিলাস বলে : কাকে বুলে কে শুনে! কথার নাই মাথা, গাছের নাই মুখ...ছড়া কেটে চেঁচিয়ে এরপর একরাশ গাল বমি করে হাঁফায়। : ওরে মাগী হারামজাদীর বেটি হারামজাদী... ইদিকে আসবি এট্টুকুন?.....

এখন বিলাস শেখ ঝিম মেরে উনুনের পাশে হুঁকো খাচ্ছে। হাঁড়িতে মুড়ি ধান সেদ্দ হচ্ছে। পাটকাঠির জ্বালানি ঠেলে দিচ্ছে চুপচাপ। কখনও কান পাতছে। হেসে উঠছে বকুনি শুনতে শুনতে।

বাহাদুর ব্যাটা! সালাম, তুকে সাত সালাম। ভুলিবিবি গোবর মাখা হাত কপালে ছোঁয়াল : তুর মা যা পারেনি তাই পাল্লি মাণিক রে! আবার ফিকফিক করে হাসি।

বিলাসও হাসছে। বলল : এখন তো মুচকি মুচকি হাসছ। বৌ ঘরে এলে তখন চিলশকুন উড়িও না বাড়িতে। আগে ভাগে বুলে দিই কিন্তুক।

ভুলিবিবি ঘাড় ফেরাল।

যে-সে ঘরের বেটি নয়, বড়বেড়েদের, হুঁ হুঁ বাপধন!

মাথা নেড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। মানকদর রাখবেই বৌমার। দুধে খাওয়াবে দুধে নাওয়াবে। পালঙ্ক তো নেই, দড়ির খাট রয়েছে একখানা। শিমুল তুলোয় গদি বানিয়ে দেবে বরং। হাত-ফুল্‌ফুল্‌ পা-ফুল্‌ফুল্‌ বসে থাকবে কনেবৌ। আলতা মুছবে, তাই নামবে না। কাজলকামিনী গামছা মাথায় জড়িয়ে শাশুড়ির কোলে চেপে দুধলদীতে লাইতে যাবে.... একটানা বলছে রূপকথার বাক্যিগুলো। আওড়ে যাচ্ছে তালে তালে।

বিলাস, চেঁচাল : থাম্‌, থাম্‌। দেখা যাবে তখন। আমি তো বেঁচে থাকবো। কদিন বা দেরি ধান উঠতে। দু-একটা মাস।

ভুলিবিবি গোবর হাতে বেরলো দেওয়ালের ঘুপটি কোণ থেকে।

হা আল্লা, কী মানুষ ইটো! কি মানুষ? মোন হতে সব ভুল ভাল করে দিয়েছে গো! লোকে বলে আমি ভুলিবিবি.....

কিরূপ, কিরূপ?

ধান উঠতে তর সইবে উনাদের? পণ্ডিত কী বুলে গেল তুমাকে? ছামুনে শুক্‌কুরবার, তার পরের শুক্‌কুরবার।

বিলাস অবাক। : সিটো তো উখড়ো-আঁচল! কনেকে কোলে করে তার আঁচলে উখ্‌ড়ো (মুড়কি) দিতে হবে। আমি জানি না ইটো? তারপর কিনা দিনখ্যান ঠিক। তারপরে তুমার বিহা! বিজ্ঞ মুরুব্বীর মতো বলল বিলাস। একেবারে বদলে গেছে সে একদিনে। ঝুড়িপেছে ফেলে শুধু বৌর কাছে বসে থাকছে। শলা করছে। কখনও রেগেমেগে চেঁচাচ্ছে মাত্র।

ভুলিবিবি এবার চেঁচাল। : তুমার মাথা! কী শুনলে কানে? যাওদিনি আবেদালির কাছে।

বিলাস হন্তদন্ত হয়ে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় আকাশ হাজির। ব্যাপারটা আঁচ করে সে হেসে ফেলল। : মা ঠিক বুলছে বাপ। উরা দেরি করতে বুলছিল। পণ্ডিত বুললে, না। আগে বিহাটো না হলে কোন কথা লয়। আকাশ ঢোক গিলে বলল আবার : চৌধুরী, রাজাবাবু, তুমার মধু দত্ত সব্বাই বুললে ইকথা। তখন তাই সই।

একদমে বলে আকাশ বেরিয়ে গেল তেমনি হঠাৎ। বিলাস শেখ কাঠ হয়ে গেছে। কুতকুত করে তাকাচ্ছে বৌর দিকে। একটা ভেঙে পড়া হাবভাব। একসময় ডুবো মানুষ যেমন ভোঁস করে মাথা তুলে নিঃশ্বাস নেয়, বলে উঠল সে : টাকার যোগাড় দ্যাখদিনি।

ভুলিবিবি জানে একথা বলবেই মরদটা। সাদাসিদে মানুষ। শুধু আজেবাজে কাজেই দিনটা কাটায়। সংসারের হালচাল ভালো বোঝে না। বিলাসের দুঃখিত মুখটা দেখে তার কষ্ট হল। বলল : ভেবো না। আমি দেখছি। বিলাস শেখ ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

ফিসফিস করে বলল ভুলিবিবি। : রাহেলাও যাবে সঙ্গে। হরিণমারার দত্ত নাকি দাদন দেবে বুলছে। ফসল দিতে হবে উকে। দরের হিসেব দেড়া ফসল লিবে! তা লেক্। এট্টা মোটে ছেলে। ধুমধাম কত্তে হবে খানিক। কী বুলো?

লিশ্চয়। বিলাস কেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। একটু পরে ফের বলল : ভুলিবৌ!

বুলো।

আমি এত গাল মন্দ করি, তুই রাগ করিস না তো?

না।

দ্যাখরে ভুলি, যৈবনকালটা কাটালাম ব্রেথায়। বড় কষ্ট হয়। আবার যদি ফিরে পেতাম... হাসি মুখে বলছে বিলাস।....ছেলেটার এখন যৈবন কাল। সেই বড় সুখ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। ভুলিবিবি রোদভরা উঠোনে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এই লোকটার কতটুকু চিনেছিল সে সারা জীবন ধরে! ছেলের বিয়ে যেন একটা আড়াল তুলে দিল দেখার। হঠাৎ কান্না পাচ্ছে! উনুনের পাশে গিয়ে বসল সে। সুর ধরে কেঁদে উঠল। মরা বাপের নাম ধরে কাঁদতে থাকল। শরতের রোদে ছায়ায় ভরা হিজলে কান্নাটা বড় লোভনীয় মনে হয়।

আকাশ খাল পেরিয়ে ওপারের বাঁধে দাঁড়িয়েছিল। শুনল মা কাঁদছে। একটু-একটু রাগল সে। বড় কুচ্ছিত লাগে এসব। ডুমুর গাছে উঠে এক কোঁচড় ডুমুর পাড়ার মতলব ছিল তার। চুমকিদের বাড়ি দিয়ে আসবে। চুমকি বলেছিল : আমি গাছে উঠতে পারিনে। চুমকি মাছ ধরতে এসে প্রতিদিন বাঁধের গায়ে ঝুঁকে থাকা এই গাছটা লক্ষ্য করত। থোকাথোকা কাঁচা-পাকা ডুমুর ঝুলছে। চেষ্টা করেছিল একবার। পিঁপড়ের ভয়ে পিছিয়ে গেছে।

আকাশ বলেছিল : হা রে চুমকি, তুরা সাপধরা বেদে, পিঁপড়েকে এত ডর!

ডর লয়। চুমকি বলেছিল। : গা ঘিনঘিন করে।

সকৌতুকে আকাশ প্রশ্ন করেছিল : আর সাপ গায়ে লিতে?

চুমকি হেসে উঠেছিল। : মজা লাগে। খুব সুখ লাগে। বাপ ঝাঁপি বুকে লিয়ে নিঁদ যায়। আম্মো একরেতে বুকে লিয়েছিলাম। স্বপন দেখলেক একটো।

কী স্বপন?

সাপটো আমাকে লিয়ে পালিয়ে যায়। এই জঙ্গলের বাগে। সাপটো তখন মানুষ হয়ে গেলছেক। সাপটো আমাকে বুললেক....হঠাৎ থেমেছিল চুমকি।

কী বুললে?

যাঃ! ফালতু কথা থোওদিনি। ডুমুর খেতে খুব ভাল লাগে আমার। কিন্তু ওই ডর.... এলোমেলো অনেক বকে চুমকি। ছোঁড়ারা আড়ালে অনেক ফন্দীফিকির ভাঁজে। সাহস পায় না কোনও মতে। সাপধরা বেদের জাত। হয়তো আস্ত একটা জ্যান্ত সাপ লুকিয়ে রেখেছে আঁচলে। বাপ রমজান বেদে ওস্তাদের শিরোমণি। মন্ত্রবলে কড়ি চালায়। সাপের মাথায় কড়ি সেঁটে গেলে সাপ আসে ছুটফট করে। হিজলে এসব গল্প ভীষণভাবে চালু। আকাশও ভয় পায় শুনে। আকাশ ভয়ে-ভয়ে মেশে। অথচ চুমকি বড্ড গায়েপড়া মেয়ে।

তাকে দূর থেকে দেখলেই চেঁচায় : হেই মানুষটো! আকাশ ভেবেছিল ডুমুর দেবার ছলে চুমকিকে খবরটা দিয়ে আসবে। বড়বেড়েদের মেয়ে তার বৌ হবে, এটা ভাবতেও যত আনন্দ, বলতেও তত। মায়ের কান্না শুনে এখন খাপছাড়া ঠেকে সব। জীবনের একটা উৎসব আসছে, তাকে রুখে দাঁড়াতে চায় যেন ঐ মড়াকান্না। ডুমুর পাড়তে ভাল লাগল না আকাশের। আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকল সে। বেদেপাড়ার দিকে চলল। রমজান ঘরে থাকার কথা না এখন। এখন সে হয়ত দূরে মাঠে ব্যানা ওপড়াচ্ছে। খানিক জমি তাকে পাইয়ে দিয়েছে লোকে। বুড়ো বেদে মজে গেছে মাটির সঙ্গে।

চুমকি ঘরে নেই দেখে আকাশ বাঁধের ওপর দাঁড়াল।

হিজলের মাঠে এখন নির্জনতা। চৈতালির চাষ সেরে চাষারা ঘরে ফিরে গেছে। সোনামুখির স্রোতে মোষ ভাসিয়ে কেউ ঝিমোচ্ছে গাছের ছায়ায়। দূরে ব্যানাবনের প্রান্তে রমজানকে দেখল হুমড়ি খেয়ে বসে থাকতে।

আকাশ কাছে গিয়ে ডাকল : সালাম ওস্তাজি!

সালাম, সালাম! রমজান বসল মাটিতে জানু বিছিয়ে। : রগে রগে খিল ধরে যায় গো। অব্যেস নাই এট্টুকুন। হাসছে রমজান।

আকাশ বলল : তুমার দাওত আমার বাড়ি। বুঝলে ওস্তাজ? খামাকা বলেই একটু চিন্তিত হল সে। কিন্তু না বললেও ভালো দেখায় না। বড়বেড়েদের কুটুম্ব হতে চলেছে বিলাস শেখ। লোকজন তো খাবেই দুমুঠো : আমার বিহা হবে। হুই বড়বাড়িতে। এটুকুও বলল শেষে।

বা রে যাদু বাঃ! রমজান দোওয়া করছে হাত তুলে। : বসো ইখেনে, বসো বাপধন। বড় রোদ লাগে গো। গতরটা দেখছ না? মাটিও তেতে আছে। মাটি দেখিয়ে রমজান বলল।

মাটি পুরোপুরি উদোম করে ফেলেছ লোকটা। ঘাসের চাবড়াও তুলে ফেলেছে। দেখতে দেখতে আকাশ বলল, আটক দিয়েছ তো? সাপটাপ খুব থাকে কিন্তুক। বড় দুশমন মাটি।

রমজান হাসল। : সি আটঘাঁট না বেঁধে কি নেমেছি রে মাণিক?

হঠাৎ আকাশ উঠে গিয়ে ব্যানা ওপড়াতে থাকল। রমজান হাঁ হাঁ করে উঠেছে। আকাশ কানে নেয় না। একদমে অনেকখানি সাফ করে হাসি মুখে দাঁড়াল সে। বলল : আম্মো রোজ একবেলা ইসব করি ওস্তাজ। খুব অব্যেস আছে। হেজলে জন্মালে ইটো শিখতে হয় না। রক্তে-রক্তে থাকে।

রমজান তা ভালোভাবে জেনেছে। বীরভূম সীমান্তের পাহাড়তলীর জীবনের সঙ্গে এ জীবনের ফারাক বড় কম। এ নদী সেই দেশের প্রান্তর ভেদ করে বয়ে এসেছে। একই স্রোত, একই গন্ধ জলে, রঙ একই। অথচ এখানে তার দান হোক উজোড় করা। ফসলের মাঠ দেখে একদিন সে স্তম্ভিত হয়েছিল। অল্পশ্রমে এত সুখের পাহাড় জমে ওঠে! রমজান উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল : চুমকি, চুমকিরে, আমি চাষা হবো।

তুমার সাপগুলা?

উদের ছেড়ে দিব জঙ্গলে।

সব্বোনাশ! চুমকি চমকে ওঠে কথা শুনে। : মানুষ ছুঁয়ে দিবেক রে বাপ! ইখেনে মানুষ সব মাঠে জঙ্গলে ঘুরঘুর কচ্ছে। পা দিবেক তো.....বাস্‌রে!

তাইলে থাক। রমজান ঝাঁপিগুলো আজও রেখেছে যত্ন করে। তার ইচ্ছে আছে, কোন একদিন ফুরসৎ পেলে চলে যাবে জটারপুরের নাগমন্দিরে। পুরনো বটের হাজার ঝুরিতে গভীর বন জমেছে—তার মাঝখানে ফাটলধরা মন্দির। জষ্টিমাসের সংক্রান্তিতে মেলা বসে মা-মনসার। নাগগুলো দলে দলে বেরিয়ে আসে শিরে সিঁদুরের লাল ছোপ—দুধের মতো সাদা শরীর তাদের। চুমুকে চুমুকে ভোগপান করে ফিরে যায় নিজের গভীর ঘরে। ঝমর ঝমর মল বাজিয়ে নাচে বেদেনিরা। বেদের দল ঢোলক বাজায়। সুরেলা মন্ত্রের ঝংকারে ছায়াঘন মন্দির কেঁপে ওঠে। ঝাঁপি খুলে ফিরে দেবে, যার ধন তার চরণতলে। তারপর ফিরে আসবে রমজান। হিজলের ফসলের দেশে চাষাপুরুষের হৃদয় ও ইচ্ছা নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

ও বাপ, তুর সময় হল না এখনও? চুমকি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল

জষ্টিমাসের সংকেরান্তি আসছে।

যেতে হবে। যাবো রে বাছা। কিন্তু ইদিকে মাঠের ডাক চলেছে—কাছারিতে। মোড়লেরা টাকা দিবে বুলেছে। এখন মরশুম কিনা! যাওয়া হল না। এখন শরতকাল। চুমকি আবার জষ্টিমাস এলে মনে করিয়ে দেবে। রমজান মনে মনে বলে—হেই খোদা হেই পাঁচপীর! তারপর বলে : হেই মা মনসা-কালী-দুর্গা, সামনে বছর যেন বেঁচে থাকি।

চুমকি তখন চুপিচুপি বলেছিল : হুই জঙ্গলে একটো থান আছে বাপ। আমি একদিন যেইছিলাম। মাদারপীরের থান। আমি উখেনে মানত করেছিলাম।

কী মানত রে?

আমার বাপটো যেন অনেকদিন বাঁচে! চুমকি হু হু করে কেঁদে আকুল। কাঁদতে কাঁদতে খোঁপা থেকে চুল খসে গেছে। তখন চুল দিয়ে মুখ ঢেকেছে। তখন ফুলে ফুলে কাঁদছে বাপের জানুতে মাথা রেখে। রমজান বলেছিল : চুপ কর বেটি, চুপ কর। আমি তুর বরের মুখ না দেখে মরছি নে.....

ওই এক যন্ত্রণা! চুমকির বিয়ের বয়স চলে যাচ্ছে। জঙ্গুলে দেশ। কখন বেইজ্জতী হয়ে যায়। সব বুনো জন্তুর চলাফেরা বনেবাদাড়ে। চুমকি না কাঁদলে তখন একা অতদূরে যাবার জন্যে ধমকাত সে। জানে, মানবার মেয়ে এ নয়। মানে না। যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। আসলে বেদের মেয়ে। রক্তটা ধারালো, ঝাঁঝালো! নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা থাক না থাক, মনের বলটা আছে। রমজান তা জানে। রমজান জানে তার ডেরায় জোয়ানেরা কী জন্যে আড্ডা দিতে আসে। বলে না কিছু। ভয় খানিক আছে। তবে ভরসা কেবল চুমকি নিজে। এ মেয়ে অনেক ঘাট ফিরেছে বাপের সঙ্গে। কোথায় মন দিতে হয়, তা ঠিক জানে। অন্তত রমজানের এটুকু বিশ্বাস করতে ভালো লাগে।

কিন্তু বর কোথায় মেলে! তাহলে তো যেতে হয় জেলা বীরভূম, সেই জটারপুর, মহিষের চটি হরিণপুর। কাকে পাঠায়! এরা সব স্বার্থপর বড়। এই অন্য চারঘর বেদে।

চাষবাসে মন কেউ দ্যায়নি। দিনমান সাপের ঝাঁপি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। জাদুর খেল দ্যাখায়। কবচ বিক্রি করে। মেয়েদের কেউ চুড়ির ঝাঁপি নিয়ে চুড়ি বেচতে যায়। চালডাল আনে। খায় আর ঘুমোয়। তারপর ঝগড়া করে। রমজান জানে, চাষারা এদের যতই সাহায্য করুক, সুযোগ পেলেই পালাবে। তখন রমজান একা পড়ে থাকবে দলছাড়া হয়ে। জাতছাড়া চাষা রমজান। ঘরে তার চুমকি—উঠন্ত বয়স। হিজলের মাঠে আগুনের শিষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাষারা কেউ জাতে নেবে না। ঘরে নেবে না বেদের মেয়ে। শরীয়তে যাই বলুক, এর নাম হিজল। পীরসায়েবও মুখ বুজে থাকেন। রমজান এইসব অনেক ভেবেছে। রাতের পর রাত তার চোখে ঘুম আসে না। সে মরে গেলে চুমকি তখনও তার দুরন্ত বয়স নিয়ে একা হিজলের মাঠে ঘুরে বেড়াবে।

রমজান ক্লান্ত। অথচ প্রতিটি সকাল তাকে যেন যুবক করে তোলে। সকালের রোদজ্বলা প্রসারিত মাঠ তাকে খুব গভীর থেকে টান দেয়। সোনামুখির জল ছল ছল করে কথা বলে ওঠে। ফসলের উদ্ধত শিষ হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে নেশা ধরিয়ে দেয় হৃদয়ে। রমজান তার কুঁড়েমি ভুলে চেঁচিয়ে ওঠে · ও চুমকি চুমকিরে, আমি মাঠে যাবো।

রমজান আবার মাঠে যায়। কিছু মনে থাকে না। মাটির গন্ধ তাকে পাগল করে তোলে।

ওস্তাজ, ও ওস্তাজ! আকাশ গায়ে হাত রেখে ঠেলল।

রমজান ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। : ঘুম ঘুম লাগল গো। বেশ খানিক ঘুম হল বটে! উঁচু কাশঝোপের ছায়ায় রমজান আড়মোড়া দিচ্ছে। আকাশ বলল : তাকিয়ে দ্যাখো, অনেকটা ফাঁক করে ফেলেছি।

বাস রে! রমজান অবাক! : হুঁ গায়ের জোর আছে বটে। জানিস বেটা, ইবার মালামোতে তুকে একটো মাদুলি দিব। কঠিন মাদুলি। দেখবি। চোখঠার মারল রমজান। আকাশ খুশি হয়েছে।

ফেরার পথে বাঁধের ওপর চুমকির সঙ্গে দেখা। আকাশ দাঁড়াল। চুমকি বাবলাগাছের ছায়ায় বসে আছে। হাত তুলে তাকে ডাকছে।

আকাশ এগিয়ে গেল। : তুমার বাপের কাছে ছিলাম!

চুমকি মাথা নাড়ল। বলল : দেখেছি।

ইখেনে একা একা কী কচ্ছো? আকাশ পাশেই বসল ধুপ করে। তুই-তোকারি না করে তুমি বলে ফেলল সে।

চুমকি ঘাস ছিঁড়ে দাঁতে কুটো করছে। আঙুলে জড়াচ্ছে পাকে পাকে। কানের রূপোর আংটা দুটো ঠুং ঠুং করে বাজাচ্ছে। বাজছে এক গোছা লাল নীল রেশমি চুড়ি। রুক্ষ চুল লালচে মেরে গেছে। উড়ছে বাতাসে। ফরসা গালের ওপর একটা মোটা তিল ওর চেহারাকে দুঃখিত দেখায়। কী যেন ভাবে সব সময়। কি সব অন্য ধরনের ইচ্ছে ছিল যা মিটছে না কোনওমতে এই ক্ষোভ। জলের ধারে ধারে তাই বুঝি খুঁজে বেড়ায়। : ও চুমকি, কী দেখছিস?

মাছ।

দেখতে পাচ্ছিস?

পাইনে আবার! হুই দ্যাখো, মুখপোড়াটা শোলাগাছের শেকড়ে মুখ ঘষছে। ইস্, মাছ লয়, যেন কী.....

আকাশ সেদিন এমনি করে প্রশ্ন করেছিল। চুমকি চমক খাচ্ছিল জলের দিকে তাকিয়ে। : পানি ইখেনে অতল-তল! মাছটো কিন্তুক ভারি মজার, তাকিয়ে আছে আমার দিকে। দেখছো? চুমকি ওর গায়ে খুঁচিয়ে দেখাতে চাচ্ছিল। : ঠিক দেখতে পাই। পানিটো কাঁচের মতো পাতলা....দ্যাখো, দ্যাখো, হুই.....

আকাশ দেখতে পাচ্ছিল না। বিকেলের পাটকিলে রৌদ্রে খালের জল ছুঁতে পাচ্ছিল না। তাই ছায়া জমেছিল আরও কালো হয়ে, থমথম করছিল জল। ভয় করে দেখতে। নিচে যেন একটা জগত আছে। সে জগতটা স্বপ্নের জগতের মত গভীর। সে গভীর জগত দেখতে পাচ্ছে চুমকি। বেদের মেয়ে মন্ত্রপূত কাজল পরেছিল নাকি। তাই এই দৃষ্টি। : ও চুমকি, আমি কিছু দেখি না রে।

তুমি দ্যাখোনা, উ কিন্তুক তুমাকে দেখেছে।

আকাশ ভয়ে-ভাবনায় ছন্নছাড়া। বেদের মেয়ে তাকে একটা কুহকের খেল দেখাচ্ছে। চাষারা যাকে বলে কুহোকিনী। আকাশের রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করছিল। যে অলৌকিক মাছটা সে দেখছে না, সেটা তাকে কিন্তু দেখছে। অবিকল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ওর দেখার থেকে বাঁচোয়া নাই। কিংবা যতদূর আকাশ যাবে, ও তাকে একইভাবে দেখতে পাবে। শেষটা হিজলে রাগ এসে বাঁচাল। আকাশ ক্ষিপ্ত হল। : দে দিনি পোলুইখান, দিই শালাকে কানা করে।

ঝাঁপিয়ে জলে পড়তেই চুমকির খিলখিল হাসি। : এক ভেল্কি দেখালাম, কাগের গু খাওয়ালাম! কী মজা! সেই সময় আবেদালি পেছন থেকে বলে উঠেছে : ছোঁড়াটাকে এত খেল দেখাসনে রে চুমকি, খাবি খাবে। আবেদালি জোর হাসছিল। আকাশ লজ্জায় কাঠ।

আকাশ এখন ভাবল, চুমকিব এই দুঃখ-দুঃখ ভাবটা ঢাকতেই বুঝি যত ভেল্কি খেলে। এই হচ্ছে ওর আসল ভাব। কোথায় ঘর ছিল কোথায় এল ফেলে! তেপান্তর মাঠে দুঃখের জীবন। আকাশের নাড়ীটা মোচড় দিল এসময়। আকাশকে যদি কোনওদিন এই হিজল ছেড়ে কোথাও যেতে হয়... অ্যাই বাপ্ আমি মরে যাবো তাইলে!

আকাশ ভাবল ওকে খুশি করা দরকার। চুমকির চুপচাপ শান্তিভাবটাও যেন আকাশের জীবনে যে হইচই খুশিটা শুরু হচ্ছে, তার মস্তো আগড়। মায়ের কান্নার মতো। খুবই শান্ত ও সহজ করে বলতে ইচ্ছে করে : চুমকিরে, আজ আমার জীবনে বড় সুখের দিন। তুকে লিয়ে যাবো। তু আমার বিহার লাচ করবি, গান করবি। চুমকি, আমার গায়ে তু হলুদ মাখিয়ে দিবি।

কেবল বলতে পারল : কী কচ্ছিস ইখেনে?

চুমকি মুখ তুলে তাকিয়েছে। চোখ দুটি পিট পিট করছে। একটু ক্ষীণ হাসি ঝিকমিক করছে আঁধার মুখের গাঢ়তায়। : তুমার বিহা হবে, না? হুই বড়বাড়িতে?

আকাশ ঘাড় নাড়ল।

কনেটো কেমন গো? দুষ্টুমি আর হাসি। চুমকির দুঃখিত ভাবটুকু ঢেকে দিয়েছে পলকে।

যাঃ! আমি কি দেখেছি? আকাশ হেসে উঠল।

চুমকি যেন অবাক। : ছেলেটো কী গো! দেখিসনি, তাকে বিহা করবি?

হঁ্যা। আকাশ সহজ হতে পেরেছে। : মা দেখেছে, পণ্ডিতের মা দেখেছে। কনে খুব ভালো।

চুমকি আবার চুপচাপ থাকল। সে সত্যিসত্যি অবাক হয়েছে। তাদের জীবনে এই সহজ মানা-মানির ব্যাপার বড় কম। বয়স পেলেও বাপ-মা মেয়ের মুখ চেয়ে থাকে। জ্ঞাতিগোত্রের কাকে কোথায় মনে ধরবে, এই অপেক্ষা। মেলায় যায়। ভিন গাঁয়ে যায়। মেলামেশা করে। মনের মত মানুষ বাছে। বাপ-মা রুখলে মেয়ে তখন কাল-নাগিনীর মতো ফণা তোলে। কণ্ঠে গরল রয়েছে। ক্ষিপ্তা নাগিনী মৃত্যুর হাত ধরে উঠে দাঁড়ায় জীবনের স্বপক্ষে। চুমকি এসব জানে না। যৌবন নিয়ে হিজলে এসেছে। যৌবনের সঙ্গত কথা তার মনে ঠুং ঠুং বাজে। ফের সে বুড়ো বাপের দিকে তাকায়। মমতায় করুণ হয়ে ওঠে। মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। ফুরু বেদেনি একদিন রমজান বেদের হাত ধরেছিল নাগমন্দিরের মেলায়। রমজান মেয়েকে তার মায়ের গল্প অনেক শুনিয়েছে। শুনিয়েছে কেমন করে ফুরু বেদেনি আবার নাগিনী হয়েছিল। আবদুল ওস্তাদের সঙ্গে চুমকিকে ফেলে ঘর ছেড়েছিল। চুমকি তখন বাচ্চা মেয়ে। ঝিনুকে ছাগলের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছিল সুবাসিনীফুফু। সুবাসিনী এখন জটারপুরে চুড়িওয়ালি। বেঁচে আছে কিনা কে জানে। কিংবা ফুরু বেদেনি? থেকে থেকে চুমকির মনে হয় কোন একদিন ফুরুবিবির ফিরে আসবার সময় হবে। তখন চুমকি আরও বয়স পেয়েছে। তখন চুমকির কোলে হিজলের ধানের শিষ। রমজান বেদের জমিতে সেবার অনেক ফসল। ঘরের দেওয়ালে পদ্মফুল পাখি ধানের ছড়া আল্পনা।... .এই চুপিচুপি সংকল্প চুমকিকে টেনে নিয়ে যায় পীরের থানে—দূর দুর্গম হিজলে ট্যাংরামারির ওদিকে ঘন জঙ্গলে। রমজান জানে না, চুমকি পীরকে বলেছিল : আমার মাটো যেন বেঁচে থাকে... আমার বাপটোর মিত্যুকাল একটুকুন পানি দিয়ে যায় এসে, হেই বাপ পীর, মানত দিলম লিজের জানটো....

আকাশ আলি! চুমকি হঠাৎ ডাকল।

বুলো।

চুমকি আবার চুপ করেছে। কী ভাবছে।

তুমাকে আজ কেমন-কেমন ঠেকছে বাপ! আকাশ জানতে চাচ্ছে।

চুমকি মুখ তুলে বলল : তুমার বিহাতে আমি লাচব-গাইব। তুমাকে হলুদ মাখাব। তা'পরে...বেশ সংযতভাবে বলছে সে। হাসে না অভ্যাসমতো। : তা'পরে...তুমার বৌটোকে এট্টা মন্তর শিখিয়ে দিব......

আকাশ এবার দুলে দুলে হেসে উঠেছে। : বশীকরণ দিও দিনি এট্টুকুন। আমাকেও দিও।

হাসি লয়। চুমকি ধমকাল। : হুই পীরের থানে গাছ আছে। সাপের বরণ লতা। গন্ধ লাগে নাকে। আঁধার রেতে এক নিশ্বেসে তুলে আনতে হয়। আঙুলের আংটি বানালে....চুমকী চুপ করল।

আকাশ শিউরে উঠেছে। জানাশোনা জগতের বাইরে—খুবই ভেতর দিকে কোথাও একটা জগত আছে। অন্য হিজল অন্যরকম মানুষ অন্য জীবন। চুমকিরা তার খোঁজ পেয়েছে। : ও চুমকি, আমাকে এট্টুকুন দিস্‌দিনি। তু যা চাইবি দেবো। আকাশ স্খলিতকণ্ঠে বলল। : উটো বড়বেড়ের মেয়ে। উর রূপের দেমাক আছে, ধোনের গৈরব-গিদের অনেক আছে। আমি গরীব লোকের ছেলা। উ আমার ভাত খাবে না। আমার মনে হয় ইটো। ইটো যেন ঠিক হল না। আক্ষেপে মাথা নাড়ছে আকাশ। চুমকি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

মধু দত্ত খুশি মনে বলেছে : জয় নিতাই। প্রভু হে! মধু দত্ত হিজল মৌজার আকাশে শান্তির রঙ দেখে পুলকিত। তেমনি পুলকিত বড়বাড়ির আব্বাস। নতুন গাঁয়ে মেয়ে দেবে। মেয়েকে দেখতে যাবে দু'বেলা। আবেদালির উঠোনে বসে তামাক খাবে। রাহেলার সঙ্গে কথাও বলবে কিছু কিছু। কথাগুলো অন্যরকম। কী ছিল হিজল, কী হতে যায়। আব্বাস বলবে : সেই সব এক হল, সেদিন যদি কথাটো ভাবতো কেউ.....

কেউ ভাবেনি সেদিন। জেনেছিল রক্ত আর মৃত্যু খাজনা এইসব ফসলের। আব্বাস সুখে আপ্লুত এখন। লিবাস আলি কেবল মর্মাহত। বুড়ো মনে ভীষণ আঘাত পেয়েছে। ইটো তু কী কল্লি আব্বাস! ইজ্জত খোয়ালি বড়বাড়ির! বুড়ো আব শনের দড়ি কাটছে না। যখন তখন হাঁকরে উঠছে না। চুপচাপ শুয়ে আছে দড়ির খাটে। পেছনের কথা ভাবছে। যে-যুবকের ক্ষমতা দিয়ে একদিন আবাদ পত্তন করেছিল, গোরের মুখে এসে সে-বুক ভেঙে দিল তার নিজের ছেলে!

আব্বাসের ভাইগুলো কেউ খুশি কেউ অখুশি। হয়তো পরিবারটা এবার ভেঙে যাবে টুকরো টুকরো হয়ে। মেজ ফুলবাস বলছিল : কী দরকার ছিল ইটোর? পণ্ডিতের মান রাখতে লিজের মানটো গেল!

দরকার ছিল। আব্বাস বলেছে বুঝিয়ে। : শান্তি এট্টা চাই হেজলে। সকলে মিলে চষবো। বান-বন্যার ভয় আছে। দল বাঁধলে সিটো থাকবে না। বাঁধ কাটবে না কেউ। ভাঙলে হাজারখানা কোদাল-পেছে ছুটে যাবে তড়িঘড়ি। এমনি করে অনেক বুঝিয়েছে আব্বাস। তারপর নির্জনে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মনে হয়েছে, আসলে সে নিজেই বদলে গেল রাতারাতি। খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেল যেন। কেন এমন হল!

ওদিকে ইন্দ্রনাথ চৌধুরী মুর্শিদাবাদে খবর পাঠিয়েছে। ফায়সালা হয়ে গেছে সব গোলমালের। পত্তনী বন্দোবস্ত দেবার সময় সব পক্ষই একত্র মিলে ব্যবস্থা করবে। এতে হুজুরবাহাদুরের ইজ্জত ও স্বার্থ দুই-ই রইল। চৌধুরী মজলিসে বলে গেছে বিয়ের সময় বর আসবে হাতি চেপে। মজলিস হাসিতে তোলপাড় তখন। কে বর? না, কোন বিলাস

শেখের ছেলে আকাশ। আবেদালি ভুল শুধরে দিল সঙ্গে সঙ্গে : আসল নাম আক্কাশ আইল। সুপুরুষ। কনের তুলিমুলি। চৌধুরী এই উপলক্ষ্যে কিছু জমি দেবে ওর নামে বিনা সেলামীতে। ত্রিবেদী? ত্রিবেদী ইস্কুল খুলে দেবেন। বড় ইস্কুল। ইংরাজী পড়ার জন্যে। চাঁদা ওঠাবে আবেদালি মৌজা ঘুরে। মাঝামাঝি জায়গায় ইস্কুলটা থাকবে। আব্বাস পস্তেছিল তখন : মুনুপণ্ডিত বেঁচে থাকলে রাজারঘেরে একটা পাঠশালা খুলতাম।

পাঠশালাও খোলা হবে। লেখাপড়া জানা লোক যোগাড় করে দেবেন ত্রিবেদী। কথা দিয়েছিলেন। নতুন গাঁয়ে যে পাঠশালা আবেদালি নিজেই চালাবে ভাবছিল, গোমস্তাগিরির দায় চেপে সেটা আর সম্ভব হচ্ছে না কোনওমতে! লোক দরকার। দত্ত বলল, আমার শালা আছে পণ্ডিত লোক! কাজ-কম্ম করে-টরে না। বাউণ্ডুলে সন্নেসী গোছের লোক। সেই বরঞ্চ.....

খুবই দ্রুত হিজলের জগতে এই বাঁক ফেরার সময় এসে গেছে। নতুন দিনের অন্ধকার সুড়ঙ্গ ভেদ করে টেনে আনতে চায় এরা। হাওয়ায় নতুন গন্ধ। রোদে ভিন্ন রঙ ধরেছে।

রাহেলা চোখ বুজে বসেছিল রোদে পিঠ রেখে। আরাম পাচ্ছিল। চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল বানুবৌ। বানুবৌয়ের কোলে বাচ্চাটা আধখানা মাটিতে লুটোচ্ছে। স্তন চুষছে সে। বানুবৌর হাতে আশ্চর্য স্বাদ পায় রাহেলা। চোখ বুজে উপভোগ করছিল। সেই সময় তার মনে হল, রোদের রঙ বদলেছে। হাওয়ায় কেমন গন্ধ। স্বপ্ন-স্বপ্ন ঝিমুনি মনে। রাহেলা মনে মনে বারবার দুর্গম ঘাসের বন ছাড়িয়ে ট্যাংরামারির দিকে হাঁটছে। মাদারপিরের থানে যাবার ইচ্ছে কতদিন থেকে। যাওয়া আর হয় না। আলসেমি পথের বাধা হয়। যেন বড় দেরি হয়ে গেল। চুলে পাক ধরেছে, গতর ঝুলে পড়েছে, চামড়া কুঁকড়ে যাচ্ছে। অদেখা জলের স্রোতে ভাসতে ভাসতে গোরের দিকে চলা। পথের পাশেই ছিল পীর। কূল পেল না। পৌঁছতে পারল না।

আমার কী হবে! হঠাৎ ফিসফিস করে বলল।

বানুবৌ চমকেছে। শাশুড়ি মধ্যে মধ্যে আচমকা ভুল বকে ওঠে আনমনে। সে ডাকল ও মা, ও বিবিজান! পিঠে হাত রেখে ঠেলল। নিদ আসছে? তালাই পেতে দিই ইখানে। নিদ যাও রোদে।

রাহেলা চোখ মুছে তাকাল! নিদ আসছে বটে। স্বপন আসছিল যেন.....

তালাই আনতে গেল বানুবৌ। ছেলেরা ঘুমিয়ে গেছে। রাহেলা কোল দিল। তারপর তালাই পেতে দিলে বুকে নিয়ে শুল। রোদ বড় মিষ্টি লাগছে। জ্বরজ্বালা নাকি কে জানে!

কী স্বপন বিবিজান? বানুবৌ পাশে বসে প্রশ্ন করল।

রাহেলা চোখে চোখ রেখে বলল : বিবিজানটো ছাড়লি না এখনও? মা বুলবি, আমি তুর মায়ের মতন। ক্যানে বুলিস উটা? চার-পুতের মা হলি, এখনও জ্ঞানগম্যি হল না বাছা!

বানুবৌ লজ্জা পেয়েছে। আসলে শাশুড়িকে মনে মনে যত শ্রদ্ধা তত ভয়—এই থেকে এই ভুল-ভাল হয়ে যাওয়া। মধ্যে মধ্যে সে ভেবেছে, একা একা সংসার হলে, বেশ হাওয়া পেত খানিক। আবেদালিকে মুখোমুখি পেত তখন। স্পষ্ট করে বলতে পারত : কী তার পছন্দ, কী নয়। রাহেলা যাদের বলে ঘর-ভাঙানি বৌ, শাশুড়ির সঙ্গে উঠতে-বসতে বচসা করে, শেষে ফারাক হয়ে যায় স্বামীকে নিয়ে....বানুবৌ একটা ঈর্ষা পোষণ করে তাদের সম্পর্কে। অথচ রাহেলা এত ভালবাসে তাকে! বুঝতে পারে না, কেন নিজের এই থমথমে চালচলন! ক্ষিপ্ততা চায় একটা! খানিক হইচই, খানিক তীব্রতা। নদীর জলের মতো তোড় নিয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছে যেন। হয়তো হিজলের সব মেয়েই এটা চায়। কেবল বানুবৌ পেল না। শাশুড়ি একটা আড়াল তুলে রয়েছে। অন্য কোনও শাশুড়ি হলে, এসব আগড় উপড়ে ফেলা যেত। এ হচ্ছে খোদ রাহেলা খাতুন। ভালোবাসা আছে, বাঁধনও আছে কঠিন।

এট্টা স্বপন দেখছিলাম। রাহেলা বলল। আবার চোখ বুজেছে। আর বলবে না। বানুবৌ জানে। সে এও জানে, মধ্যে মধ্যে উঠোনের রোদে শাশুড়ি চুপচাপ শুয়ে থাকে। তখন কেউ ডাকলে দারুণ হাঁকরে ওঠে। তাই আর প্রশ্ন করল না। বাইরে মুনিষেরা পাট ছাড়াচ্ছে। উঁকি মেরে একবার দেখে এল। মুনিশেরা ফাঁক পেয়ে গল্প-গুজবে মেতে গেছে। আবেদালি এখন নবাবের কাছারিতে। কাজ বুঝে নিতে গেছে। দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল : তুমরা বসে থেকো না বাপু, হাত চালাও দিনি।

ওরা ব্যস্ত সঙ্গে সঙ্গে। বাপ রে, এবার পণ্ডিতের বৌ মুখ খুলতে শুরু করেছে। খুলবে বৈকি। দিনে দিনে মানইজ্জত বাড়ছে বাড়ির। আবেদালি এখন নবাববাহাদুরের লোক হয়েছে। শওকতের ব্যাটা আবেদালি। যে শওকত একটুখানি জমির জন্যে রক্ত উগরে মরে গেছে, আজ বেঁচে থাকলে সে এসব দেখে খুশি হত। বানুবৌ ফিরে এসে উঠোনে দাঁড়াল। একটু পরেই লাঙ্গল কাঁধে অন্য মুনিশেরাও আসবে। তাদের ভাত বেড়ে দিতে হবে। নাইবার তেল দিতে হবে। গতিক যা, এ বেলার মতো শাশুড়ি আর গা তুলছে না। বানুবৌ আস্তে আস্তে অনুভব করল, এই সংসারটা ফলন্ত গাছের মতো ভরে উঠেছে ক্রমেক্রমে। দায় জমছে অনেক। এবং এ সবই তার। শাশুড়ি গোরে চলে যাবে একদিন। তখনও সে বেঁচে। চার ছেলের মা বানুবৌ, স্বামী তার খ্যাতিবান পুরুষ, এতবড় সংসার। সে ক্রমশ বিহ্বল হল এইসব ভেবে। হঠাৎ নতুন করে যেন জানল। ঠিক করল, এরপর কোনদিন আবেদালিকে কটুকথা বলবে না। খুব ভালো কথা বলবে। কথাগুলো তার আদর ও সাধ-আহ্লাদকে প্রকট করবে। মনে-মনে স্বামীর সঙ্গে বলাবলি করল বানুবৌ, পণ্ডিত, তুমি আমাকে মাপ করো গো। আমি মুরুক্ষু অবলা মেয়ে-মানুষ। আমাকে তুমি লেখাপড়া শিখিয়ে দিও। তুমার মানে আমার মান, গৌরব তুমার গৌরবে।

মনে মনে আবেদালির পায়ের ধুলো মাথায় রাখল। জিভে নিল। তারপর ভাবল, এইসব সুখের স্বাদ পাচ্ছে, পীরের থানে একদিন যাওয়া বড় দরকার। শাশুড়িও যাবে-যাবে করে; যায় না। কী যেন খাপছাড়া মানুষ! এতদিন এ বাড়ি এসেছে, একবারও নামাজ পড়তে দ্যাখেনি শাশুড়িকে। কট্টর মুসল্লী ঘরের মেয়ে বানুবৌ, বাপের কপালে

নামাজের ছোপ পড়ে গেছে কালচে, সে একটুও খুশি নয় এসব দেখে। সে নিজে নামাজ পড়ে। রাহেলা তাকিয়ে দেখে। বলে : বৌটো আমার বড় ইমানদার। আর কিছু বলে না। গোরের দিকে ডাক পড়েছে, কী হবে তোমার ভাবো না গো! বানুবৌ এরূপ ভাবত। হঠাৎ একটু আগে রাহেলা আপন মনে বলেছে : আমার কী হবে! স্পষ্ট শুনেছে সে। বড় কষ্ট হচ্ছে এখন। শিয়রে দাঁড়িয়ে পাশাপাশি সুখ ও দুঃখকে নিয়ে কী করবে, ভেবে উঠতে পারে না এখন।

আকাশ এল।

পরনে সেই নতুন ধুতিটা রয়েছে। সবসময় ধরে পরছে। বিয়ের বর। কদিন বাদে হলুদ মাখবে গতরে। সোঁদাসোঁদা গন্ধ নিয়ে মেহেদিরাঙা লাল হাত বাড়াবে বড়বাড়ির কনেবৌর দিকে। ভারি রূপের ছটা নাকি। রাহেলা বলছিল। রূপের বর্ণনা শুনতে শুনতে তখন বানুবৌর ইচ্ছে করছিল, তীব্র ঝাঁঝে বলে ওঠে : অত যদি ভালো, আনো না একটা বেটার লেগে! আমি তো কুরূপ দাসীবাঁদী, ছেলে রূপবতী কন্যা পেয়ে তোড়ে ভাসুক।

ইস্ গিদেরে পা পড়ছে না মাটিতে রে! বানুবৌ বলল। : মদুগ্যা আনছিস কি না!

আকাশ অল্প একটু হাসল মাত্র। বলল : দুগ্যার দশখান হাত, দ্যাখোনি হরিণমারায় যেয়ে?

বানুবৌ বলল : কে জানে বাপু! লোকে বুলে, শুনেছি। হরিণমারা আমার বাপও যায়নি এ জন্মে।

একবার যেয়ো। আমি দেখে এলাম সকালে। খুব ধুমধাম। মেলা বসবে। হাজার ঢাক। হাজারটো বলিদান।

থাম ছোঁড়া। বানুবৌ ধমকাল। : হিসেবের খাতা খুলে বসল যেন। বানুবৌ ফিসফিস করে বলল : তুর কনেটো দেখিসনি, হারে ছোঁড়া?

নাঃ! খুব জোরে মাথা নাড়ল আকাশ। : বুললাম না, দশখান হাত! কে সামলাতে পারে!

হাত দিয়ে ইশারায় ঘুমন্ত শাশুড়িকে দেখাল বানুবৌ। বলল : দেখে এসে বুলছিল। তু ভাগ্যিমান রে। থানে মানত দিস্।

আকাশ আড়মোড়া দিয়ে বলল : ভাগ্যির মুখে ছাই! কী হবে কে জানে।

ক্যানে উকথা বুলছিস? বানুবৌ অবাক।

বড়বেড়ের বাডির মেয়ে। পারবে মাঠে ভাত লিয়ে যেতে? মায়ের মতন দেয়ালে গোবর চাপড়াতে? আকাশ বয়সী মানুষের মত মাথা নেড়ে বোঝাতে থাকল। আমার মন বুলে, কাজটো উচিত হল না! বুঝলে?

মরবে নামুনেটো! বানুবৌ শিউরে উঠল। আবেদালির ইজ্জত সে বুঝে নিয়েছে। আবেদালি বলছিল, ইটা আমার জয়। উদের হার স্বীকার। আকাশ কি অন্য কিছু ভাবছে? বানুবৌ চাপা গজরাল : ইকথা তখন বুলিস নি ক্যানে? পণ্ডিতের কানে গেলে, কী হবে জানিস?

আকাশ ঘাড় নাড়ল। : জানি।

তবে?

বিহা করবো না, তা তো বুলছি না।

কী বলছিস তু?

সিটা তুমি বুঝবে না। আকাশ হঠাৎ বেরিয়ে গেল।

আবেদালি ফিরতে একেবারে সন্ধ্যা। সঙ্গে একবোঝা কাগজপত্রের বাণ্ডিল লাল কাপড়ে জড়ানো। একমুখ হাসি নিয়ে মায়ের সুমুখে দাঁড়াল। রাহেলা দাওয়ায় সেই কিম্ভূত চেহারার চেয়ারে বসেছিল। ছেলেকে দেখে সেও হাসল : সব বুঝে লিয়েছিস তো বাছা? হিসেবের কড়ি, খুব সাবধান। বেটাল হলে ইজ্জত যাবে।

আবেদালি তা জানে। সঙ্গে পাইক থাকবে। চাকর-বাকরও পাবে কাছারি থেকে! এবার থেকে নবাবী ইজ্জতের ভাগীদার সে। এতদিন ধরে পদটা খালি ছিল। কাছারিতে গিয়ে জমা দিতে হত টাকা খোদ চৌধুরীর কাছে।

অনেক রাত অবধি পরচা-খতিয়ানের পাতা ওল্টাল আবেদালি। তারপর বিড়ি জ্বালতে গিয়ে দেখল বানুবৌ ঘুমোয়নি। তার দিকে তাকিয়ে আছে। আবেদালি বলল : কী রে, ঘুমোসনি?

বানুবৌ একটু মাথা নাড়ল। আবেদালি এতক্ষণে দেখল যে আজ ছেলেদের একপাশে সরিয়ে তার বালিশের পাশে নিজের বালিশ পেতেছে বানুবৌ অনেকদিন পরে। এতদিন আবেদালি নিজেই জেদ ধরত পাশে শোয়ার। তাই সে অবাক হয়ে গেল। একটু হাসল। বিছানায় কনুই রেখে অল্প ঝুঁকতেই টের পেল বানুবৌ কাঁদছে। কী হয়েছে রে? ফিসফিস করে প্রশ্ন করল। মা পাছে শুনতে পায় পাশের ঘরে।

কিছু না।

তু কাঁদছিস্......একটু ভেবে নিয়ে ফের বলল : মা কিছু বুলেছে?

না।

তবে?

শুয়ে থেকেই হঠাৎ হাত দুখানি বাড়িয়ে দিল বানুবৌ। আবেদালির হাত ধরল। তারপর ছিলেপরানো ধনুকের মতো বেঁকে পা দুটি জড়াল বুকের সঙ্গে। : তুমি আমাকে মাপ করে দ্যাও। তুমি মানী লোক। আমি বুঝতে পারি না। আমি তুমাকে গালমন্দ করি....

গভীর সুখে আপ্লুত আবেদালি বুকে চেপে ধরেছে তাকে। সে ভাবছে, হিজলে এবার এইসব প্রীতি ও সুখের দিন আসছে। ঘরে ঘরে এই সব ভালোবাসা। চাষাপুরুষ ও চাষামেয়ের হৃদয়গুলো বদলে যাচ্ছে। আবেদালি খুব শান্তভাবে বলল : প্রথম মাইনের টাকায় তুমাকে একটা ময়ূরপঙ্খী শাড়ি কিনে দিব।

ময়ূরপঙ্খী শাড়ি। হিজলে এরা পরস্পর বলাবলি করে। অপরূপ সেই শাড়ি, রাজার মেয়ের অঙ্গে শোভা পায়। সেই শাড়ি পরে এবার আকাশের বৌ আসবে নাকি নতুন গাঁ। পাঁচটাকা দাম।

পাঁচ টাকা? বাস্‌রে! গলায় ভাত আটকে যায় শুনে। হিজল চমক খেয়েছে। আট দশ মণ ধান বেচে একখানা শাড়ি। পেখম তুলে ময়ূর নাচে তাতে। রঙ ঝিলমিল রামধনু পাড়। কান্দির বাজারে স্বচক্ষে এতদিনে দেখল আবেদালি। সঙ্গে মধু দত্ত। ভুলিবিবি পাঁচটা নাড়া রাজার টাকা দিয়েছে গুঁজে। সে টাকা ওই দত্তের সিন্দুকে ছিল। আবার ফিরবে সেদিন, সেদিন তার বাচ্চা থাকবে একপাল। দত্তের টাকা বড় জ্যান্ত টাকা। ভয় করে ছুঁতে।

বিলাস শেখ ভয়ে ভয়ে সঙ্গে আসেনি! গেছে শ্রীকান্তপুর সাবিত্রীচক রানীচক। যেখানে-যেখানে কুটুম আছে, একটি করে সুপুরি বিলি করবে। মুখে একটু বলতে হয় বিষয়টা। কিন্তু সুপুরি একটা দিতেই হবে। নৈলে কেউ আসবে না।

আবেদালি বলেছিল : ওরে আকাশ, তুর বৌর শাড়ি, তু চল দিনি!

আকাশ প্রবল আপত্তি করেছিল। আবেদালি ভাবল, ছোঁড়া বড় মুখচোরা তো, বিয়ের ব্যাপারে লজ্জা পাচ্ছে। পাবেই এরূপ। হিজলের সব ছেলেই লাজুক হয়ে ওঠে এখন। কিছু-কিছু পালন-টালন করতে হয়। সাঁজসকালে একা একা বেরাতে নেই। কুদৃষ্টি লাগবে। সোনার অঙ্গ কালি হবে লোভাটে পরী মেয়ে আসমানচারিণীদের চোখের ছটা লেগে। আর হলুদ মাখলে তো আরও সাবধান হতে হয়। হাতে গুঁজে দেয় সুপুরিকাটা লোহার জাতি। বিয়ের পর রেখে দেয়। কনেবৌর বেলাতেও একই ব্যবস্থা। আব্বাসের মেয়ে আর মুখ দেখাচ্ছে না বাইরে। ঘরের দাওয়ায় বসে বসে আয়োজন দেখছে। কিছু ভাবছে এসব নিয়ে। কেউ জানে না কী ভাবে কনেবৌ। এবং ভাবতে গিয়ে অকারণ কাঁদে সে। মা ধমক দেয়। কেউ চোখের জল মুছিয়ে দ্যায় না।

শাড়ি নিয়ে ফিরতে সারা গ্রাম ভেঙে পড়েছে। ভুলিবৌ তটস্থ। ও পণ্ডিত, কার মনে কী আছে বাছা, ইখান তুমি থোওদিনি তুমার সিন্দুকে। ভুলিবিবির গা কাঁপছে শিরশির করে। শাড়ি ছুঁতে ভয় করে।

আবেদালি তখন একটা গল্প বলল। : তুমার হল সেই অবস্থা। এক ছিল চাষা আর তার বুড়ি মা। চাষার ছেলের বরাত ঘুরল। রাজা হল সে। সিংহাসনে বসল। বললে, ও মা, একবার বসবে তুমি? বুড়ি মা তো হেসেকেঁদে বাঁচে না। রাজার জননী হয়েছে, সিংহাসনে বসে দেখবে কত সুখ। বসল গিয়ে সেখানে। তাপরে তুমার মশাই, চাষা ডাকছে : ও মা নেমে এস ইবারে। বুড়ির হাঁ-চা নাই। গায়ে হাত রেখে ঠেলছে, নড়ে না। একদমক হেসে আবেদালি বলল : খুশির চোটে বুড়ি মরে গেছে তখন। শেষে বলল, তুমার হল সেই অবস্থা।

শেষ অবধি শাড়ি নিয়ে এল আবেদালি। মাকে দেখাল। বৌকে দেখাল। বানুবৌ বারবার হাত বুলিয়েছে শাড়িতে। রামধনু পাড়, ময়ুর নাচে পেখম তুলে জমিনে। বানুবৌ ফিসফিস করে বলল : সত্যি, বড় ডর লাগে ছুঁতে! গন্ধটো কেমন যেন.... কেমন!

উদাস চোখে তাকাচ্ছে রাতের আলোয়! আবেদালি বলল : কিনে দেব, তখন ভিরমি ব্যারাম ধরাস না যেন!

বানুবৌর গা শিরশির করছে ভাবতে। সে ভাবল, এই শাড়ি যেন তার মনের মতো

নরম। তার মেয়ে হৃদয়ের মতো হাল্কা। যে পরবে, সে হবে সোনামুখির দহের মতো গভীর। আধো আলো আধো আঁধারির খেলা।

আকাশও বিচলিত।

তার কনেবৌকে ময়ূরপঙ্খী শাড়িতে মনে মনে সাজিয়ে দেখছিল। মুখের আদল গায়ের গড়ন সবটা তার এই চুমকির অনুরূপ। আকাশ দেখছিল হিজলের দূর দিগন্তটা যেন মাঝে মাঝে এই বেশে কনেবৌ সেজে থাকে। অনেক দূরের অনেক অচেনা।

চুমকিকে দেখল সোনামুখির বাঁওর থেকে ফিরতে। বাপের জন্যে নাস্তা নিয়ে গিয়েছিল। কাশবন দু'হাতে সরিয়ে হঠাৎ আকাশের মুখোমুখি। আকাশ আলি!

তুমাকে খুঁজছিলাম।

ক্যানে গো? চুমকির চুলে কাশফুলের গুঁড়ি। চুল ঝাড়ছে সে।

সেই ওষুধটো.... আকাশ মনে করিয়ে দিল। ময়ূরপঙ্খী শাড়িপরা কনেবৌর মন পেতে সে হঠাৎ যেন অবুঝ হয়ে উঠেছে। দিন যত ঘনিয়ে আসছে, একটা আকুলতা তাকে উত্যক্ত করে মারছে। বড়বেড়ের মেয়ে, মন না পেলে জোরজবরদস্তি দেখানো চলবে না। গায়ে হাত তুললে রক্ষে নেই। খবর পেয়ে একগোছা লাঠি ছুটে আসবে গাঁমুখো। দাঙ্গা বেধেই যাবে শেষটা। এমন দাঙ্গা দু'চারটে লেগে আছে হিজলে। বিয়েসাদীর ভুলে অনেক ভুল দানা বাঁধে। অনেক রক্ত ঝরে পড়ে। আকাশ ফের বলল : আঁধার রাত চলেছে। ক'দিন বাদে চাঁদ উঠবে। দেরি হয়ে গেল চুমকি।

চুমকি কথা বলছে না। নাকের নাকছাপিটা খুঁটছে।

বুলো? আকাশ রেগে উঠল।

উঁ?

ওষুধটো?

হুঁ। চুমকি একটু হাসল। আমার ডর লাগে যেতে। অনেক দূর। খাল পেরিয়ে জঙ্গলে.....

আকাশ ঝাঁঝালো স্বরে বলল : না পাল্লে ভালো। তুমার বাপকে বুলবো কথাটো। তুমার বাপ আমাকে ভালবাসে।

চুমকি হাত নাড়ল তীব্রভাবে। আঁত্কে উঠল : না, না। আকাশ আলি, বাপকে বুলো না।

ক্যানে বুলবো না? উ আমাকে মালামোর মাদুলি দিবে বুলেছে।

চুমকি ফিসফিস করে বলল : ওষুধটো বাপ জানে না। বাসিনীফুফু জানে। জটারপুরের বাসিনীফুফু। সে আমাকে বুলছিল। চিনায়ে দিয়েছিল মূল। চুমকি বিব্রতভাবে বলল : চিনতে ভুলও হতে পারে। তবে দেখেছিলাম পীরের থানে। চন্দ্রমূল আছে, অনন্তমূল আছে, তার ফাঁকে লতিয়ে উঠেছে—গন্ধলতা....বেতের বেলা গন্ধ দ্যায়। মো মো করে চারপাশ। চুমকি নিষ্পলক চোখে বলতে থাকল রূপকথার স্বরে।

সেই গন্ধ পেলে সাপের রাজার ঘুম ভেঙে যায়। বিষের থলি গালে ভরে ছুটে আসে। মাথায় মাণিক জ্বলে হু হু করে।.....

আকাশ ধমকে উঠল : যা যা! উ সব গল্পকথা আমি মানি না। তুর যদি ডর হয় চুমকি.....আকাশ এবার জোরে হাসল, আমি যাবো তুর সঙ্গে। হাতে হিজলে লাঠি লিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো।

চুমকিও হাসল মুখ টিপে। : বেশ দ্যাখা যাবে তখন। মরি তো দুজনেই মরবো। তোমার কনেবৌ কাঁদবে। আমার বুড়ো বাপটো কাঁদবে। বেশ, বেশ। আকাশ আলি, বিহার আগের রেতে তুমি এসো। দুপহরে। ঠিক ইখানটোতে। এই শ্বেত-আকন্দর ঝোড়ে বসে থেকো।

পাগলের মত হাসছে চুমকি। হাসতে হাসতে হাতের শূন্য থালা ঝনঝন করে গড়িয়ে পড়েছে। অজানা ভয়ে আকাশের বুক কাঁপল। বেদের মেয়েটা ভেল্কীর খেল দেখাচ্ছে তাকে। একটা হিজলিয়া জোয়ানকে।

ছপছপে ঘাসের ওপর পা ফেলতে ভয় করে। ঘাসের ফুলে পা দুটো কুটকুট করছে বারবার। কুয়াশায় অন্ধকারের রঙ নীল হয়ে আছে। আকাশে-নক্ষত্র। নক্ষত্রের আলো ঝিলমিল কাঁপছে কাশবনের পাতায়। শিশিরের ফোঁটার ওপর। অনেকদূর ছল ছল খল খল শব্দ। শাঁখালার বিলে বুনোহাঁসের ভালবাসা এইসব শব্দে গড়ে উঠেছে ভেঙে যাচ্ছে।

অনাবাদী হিজলের পথে কেবল মনে পড়ে পেছনে একটা ফসলের মাঠ বয়ে গেছে। ডাঁটালো ছিপছিপে ধানের বুকে জেগে আছে লক্ষ লক্ষ শিষ। অমৃত জমেছে তাদের হৃদয়ে। এই শরতকালীন গভীর রাতে তারা একে একে উঠে আসছে গুচ্ছ গুচ্ছ হৃদয় নিয়ে। শিশিরের তৃষ্ণায় তারা ঠোঁট খুলেছে।

একদিন এই ঘাসের মাঠটাও চাষাদের ভালোবাসা থেকে জেগে উঠবে ফসলের পৃথিবীতে। অমৃতহৃদয় নিয়ে মঞ্জরীর ঠোঁটে সঞ্চারিত হবে শিশিরের তৃষ্ণা।

চাষাদের হৃদয়ও গলে গলে পড়বে শিশিরের মতো শরতকালীন নক্ষত্রের রাতে। ভালোবাসা বিন্দু বিন্দু জমে উঠবে মন থেকে মনে। চাষামেয়েব চোখে তখন সে এক অন্য ফসল, অন্য পৃথিবী।

রক্ত নেই। দ্বন্দ্ব নেই। তখন এক ভলোবাসার দিন হিজলে। সেদিনের জন্যে প্রতীক্ষা করছে এরা।

বিশশতকের গোড়ার দিকে এইসব ঘটেছিল। রাজারঘেরে আর নতুনগাঁ, এই নয়াআবাদের দেশে।

হিজল মৌজা। হরিণমারা পরগনা। মহকুমা কান্দি। জেলা মুর্শিদাবাদ। তৌজি নম্বর চুয়ান্ন থেকে একষট্টি। খতিয়ান নম্বর তের থেকে বাইশ। তিরিশ থেকে একান্ন। দুশো ছয়।.....

এই খতিয়ান-তৌজি নবাববাহাদুর আর ত্রিবেদীর। কিছু অনন্ত সিং-এর। অজস্র খাস। পত্তনী বড় কম। রায়ত মোকবরী বেশি। স্থিতিবান কদাচিৎ। উঠবন্দীও কম নেই। ইজারা রয়েছে জলার। বাগদিরা পায়টায়। বছরে একবার পুজোপার্বনে মাথায় লাল পাগড়ি লাঠি হাতে নেচে আসে জমিদারের কাছারিতে। আর রয়েছে রাজবংশী, রায়বেশে, পাল্কীবাহক কাহার। তারাও পেয়েছে কিছু কিছু। আসলে মাটির সঙ্গে নাড়ীর টান বড় কম। জলের সুখে সুখ খোঁজে। মাছ ধরে। খড় কাটে। বেচে আসে ডাঙাদেশের গ্রামে। বিধু রাজবংশী খড়ের জমি ডেকে নিয়েছিল সেবার। মুসলমান চাষারা আগুন জ্বাললে বিধু গেল পাগল হয়ে। পাগল বিধু এখন মহকুমার আদালতের চারপাশে ন্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। বিড়বিড় করে বলে : আগুন? দ্দে শালারা, যত পারিস দে। এক বর্ষার তোড়ে সাত নদীর জল আসছে ছুটে। ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে জড়ো করে। আগুন জ্বেলে পোড়ায় বসে বসে। দিলাম শালা চেকপরচা জ্বেলে। কী করবি ইবার! ভেংচি কাটে। জিভ দেখায়।

বিধু রাজবংশীর দুঃখ ঢেকেছে ফসলের মাঠ। সেই খড়ের জমিতে এখন সবুজ সমুদ্রের রূপ। বিধুর সত্ব চলে গেছে অনন্ত সিং-এর সিন্দুকে। সেই সমুদ্রে জোয়ার এসেছে। সমুদ্র বাড়ছে। তটভূমি ধসে যাচ্ছে। অবিশ্রান্ত তটপতনের ধ্বনি শোনা যায়।

লিবাস শেখ শুনতে পায়। উঁচু দাওয়ায় খাটিয়া পেতে সে শুয়ে আছে। মনমরা হয়ে গেছে নব্বুই বছরের বুড়ো বড়বেড়ে। সুমুখে অন্ধকার মাঠ। হাওয়া দিচ্ছে অল্প অল্প। শুয়ে শুয়ে কান পাতছে। আব্বাস ইজ্জতের খেলাপি করল। আব্বাস জেনেশুনেই এসব করতে পারল। আশ্চর্য! এই আব্বাস ছেলেবেলায় দেখেছে কেমন করে কোদালের পাত হলুদ মাটির চাঙড় তুলে তুলে সঞ্চিত হয়েছিল ইজ্জতের স্তূপ। লিবাস শেখ এসেছিল দূর গ্রাম থেকে একমাত্র একটি কোদাল সম্বল করে। ঘেরের মাটি তুলেছে সেই কোদালে। আরও হাজার বাহুব ভিড়ে লিবাস শেখের বাহু দুটি ভিন্নতর শব্দ তুলেছে।

লিবাস শেখ কান পেতে শুনছে সেই আদ্যিকালের হিজলে কোদালের ধুপ ধুপ শব্দ। শব্দে শব্দে ইজ্জত দানা বাঁধছে রক্তে। রক্ত যাচ্ছে বদলে। ধারালো গরম রক্ত টগবগ করে ফুটছে শিরায় শিরায়। তখন সে ককিয়ে উঠল : হা বাপ আব্বাস, ইটো তু কী কল্লি!

এবং তখন নীলাভ অন্ধকারে নক্ষত্রের আলোতে হঠাৎ চুমকি ফাঁড়ি ঘাসের বনে আকাশের হাত ধরে ফেললে—আকাশও বলে উঠল : ইটো তু কী কল্লিরে চুমকি! আমি বিহার বর, গায়ে আমার হলুদ—আইবুড়ো মেয়ে ছুঁয়ে দিলি রে! তু মরবি....

আকাশ চুপি চুপি হাসল : তুর আর বিহা হবে না, জেনে লে ইটো।

চুমকি কথা বলছে না। হাতটাও ছাড়ে না সে। গা ঘেঁষে চলছে আকাশের। পীরের থান আর বেশি দূরে নেই।

চুপচাপ অনেক পথ এসেছে। এখন লোকজনের ভয় আর নেই। তাই কথা বলতে ইচ্ছে করে। আকাশের বুক কথাব চাপে টালমাটাল হচ্ছে। সে বলে উঠল : হলুদ

মাখাবো বুলেছিলি, গেলি না তো! লাচবি গাইবি বুলছিলি। তু কী মেয়ে রে? মা তুর জন্যে পথ বাগে তাকালে কতক্ষণ।

জবাব না পেয়ে ফের আকাশ বলল : জানিস্, তুর হাতে গায়ে হলুদ চড়াতে ভারি লোভ ছিল আমার।

চুমকি যেন রুখে উঠল : তবে ক্যানে বলছিস্, আইবুড়ো মেয়েদের ছুঁতে নাই?

ঠাট্টা করেছি। আকাশ বোঝাল তাকে। : হঠাৎ ধল্লি, তাই বুললাম কথাটো।

আমার গা কাঁপলেক এট্টুখানি। চুমকি ফিসফিস করে বলল।

তু পর, আমি পর, আলাদা-আলাদা হাঁটছি। তাইতে একা-একা মোনে হয়। তখন আমি তুর হাতে ধরলেক।

পীরের থানে পৌঁছে একটা ঢেলা কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারল চুমকি। পেঁচা ডাকছিল। থেমে গেল হঠাৎ। দুজনে এবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেছে। থমথম করছে জায়গাটা। কেমন অদ্ভুত হাওয়ার শব্দ। শিশিরের হিম এখন ছায়ার নিচে কম। ঈষৎ গরম টের পাচ্ছে। অথচ না-ভয় না-সাহস এক আশ্চর্য ঘনতা আড়ষ্ট করেছে। দৃষ্টি আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছে। পীরের উঁচু মাজার আর কাঁটামাদারের গাছও অনুমান করতে পারছে। আকাশ গায়ে হাত রেখে ঠেলল।

চুমকি নাড়ছে না।

আকাশ ফিসফিস করল : দেরি করো না। উঁদিকে খুঁজবে আমাকে। আবার ঠেলে দিল সে।

হঠাৎ চুমকি ঘুরে দাঁড়াল। আকাশের হাতের সুপুরিকাটা জাঁতিটা কেড়ে নিল। ফেলে দিল নিচে। আকাশ হতভম্ভ হয়ে গেছে। তারপর চুমকি খুবই কাছে, বুকের ওপর সোজা হয়েছে। ওর নিঃশ্বাস এসে লাগছে আকাশের নাকে। আকাশ নিজেকে আঁটোসাটো রাখবার চেষ্টা করল। টুকরো-টুকরো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে যেন সে। চুমকির এই গভীর উপস্থিতি প্রবল চাপের মতো ধাক্কা দিচ্ছে কোথাও। আকাশ বর্ষার বন্যায় দেখেছিল, এমনি করে হলুদ মাটির বাঁধে ক্ষ্যাপা জল ধাক্কা মারে তোড়ে। শব্দ করে ঝরে পড়ে নরম মাটি। ভয়ের স্বাদ সেই শব্দে।

তুমার বিহা হবে কাল? চুমকির নিঃশ্বাস আগুনের হল্কার মতো চিবুক লাগল। আর তুমি যাবে হাতিতে চড়ে বিহা করতে? চুমকি কাঁদছে না হাসছে, বোঝা যায় না। এট্টা লাল কনেবৌ আসবে সঙ্গে। তার জন্যে বশীকরণ গন্ধলতা.....

আকাশ আস্তে আস্তে সরে এল। চুমকি বলল : ইটো পীরের থান। ছেঁচা কথা বুলো আকাশ আলি। আমাকে তুমার খুব ঘেন্না হয় না?

ব্যাকুলভাবে আকাশ বলল : চুমকি, তু অন্যকথা বুলদিনি! আমাকে ক্ষ্যাপা করিস নে।

আকাশের রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করে কাঁপছে। ইচ্ছে করে ভয়ানক কিছু একটা করে ফেলে।

এ ঠিক যৌবন না, এ যেন এক বানবন্যার ভয়াল তোড়। হু হু ছুটছে। আকাশ দেখল চুমকি তখন মাজারের দিকে চলে যাচ্ছে। অন্ধকারের দিকে হারিয়ে গেলে জাঁতিটা খুঁজে নিল। হাতে তুলে দাঁড়াল।

অন্ধকারে ছেঁড়াখোঁড়া লতাপাতার শব্দ! তারপর চুমকি এল। দারুণ হাঁপাচ্ছে। বলল তাড়াতাড়ি চলো। সাপ আসবে, কালসাপ!

আকাশের হাতটা শক্ত করে ধরে আছে চুমকি। দুজনে ছুটেছে ভেজা ফাঁড়িঘাসের বনে। পেছনে যেন বিষের নাগিনী মণির আলো ফণায় রেখে ছুটে আসছে তাড়া করে। কাশফুলের ঝোপ পেরিয়ে বাঁধে উঠল একসময়। ধুপ করে বসল দুজন পাশাপাশি।

অনেক সময় ধরে বসে থাকল চুপচাপ। তারপর আকাশ বলল : দে লতাটো, বাড়ি যাই।

চুমকি আঙুলে জড়িয়ে রেখেছে। আংটি বানিয়েছে কখন। আঙুল তুলে আকাশের নাকে রাখল। আকাশ বলল : বেশ সোন্দর! ভাল লাগছে রে।

চুমকি যেন হাসছে। নক্ষত্রের আলো দাঁত ঝিকমিক করছে। : কী?

গন্ধটো।

চুমকি সত্যি হাসল। : তু শুঁকলি তো! মরেছিস আকাশ আলি।

বুক কেঁপেছে আকাশের। : ক্যানে ক্যানে?

তু আমার বশীকরণ হয়ে গেলি। চুমকি হেসে আকাশের গায়ে ঢলে পড়ল। আকাশকে পলকে পাথর করে সে তার জাঁতিটা কেড়ে নিল। ছুঁড়ে ফেলল নিচের খালে।

আকাশ আর্ত চিৎকার করে উঠেছে। মুখে হাত ঢাকল চুমকি। লতাটা এগিয়ে ধরল। এই লে, পর।

হতভম্ব আকাশ আঙুলে পরল লতার আংটিটা। তারপর বলল : এই লে, তু শুঁকে লে খানিক। শুঁকিয়ে দিল জোর করে। দুজনে খুব হাসছে। আকাশের নক্ষত্র আলো ফেলেছে দুজনের চোখে। তারপর হঠাৎ আকাশ চুমকির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চুমকি ককিয়ে উঠে চুপ করে গেছে। মুখের ওপর আকাশের কণ্ঠস্বর : চুমকি, চুমকিরে, আংটিটো আমার চোখ খুলে দিলে। গন্ধলতার গন্ধ আমাকে মাতালে। তু রাগ করিস না,.....

চতুর্থ পর্ব

হিজলের বাঁধে কাঁটাবাবলার ছায়ায়, জলায়জঙ্গলে ফাঁড়িঘাসের বনে, আর ওদিকে হিজলজিয়ালা বুনোজাম-জরুলের দুর্গম অরণ্যে অনেক হৃদয়পতনের কাহিনী আছে। আছে মাঠের ফসলে তাজা রক্তের লাল লাল রেখা।

এইসব মাঠে অনেক আলেয়ার আলো আছে। দিগ্‌ভ্রান্ত চাষাপুরুষের বিপন্ন চিৎকারের ধ্বনি আছে। তখন কাস্তে-কোদাল আর লাঠি খসে গেছে হাত থেকে। সেই

নগ্ন ক্ষুধিত হাত ছুটে গেছে চাষামোষের হৃদয়ের দিকে। মাদারপীরের গোরে দাঁড়িয়ে বিপন্ন হিজলিয়া হাঁকরে উঠেছে : হা বাপ, বুলদিনি কী করি ইবারে! আমার মোনের হিজল জ্বালায়ে দিলে রে....

ঘাসের বনে আগুন জ্বলছে। ট্যাংরামারির ওপারে কোথাও চৈতালির চাষ পড়বে। কাছারির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ চৌধুরী দেখল শেষ রাতের নীল কুয়াশা মাঠের আকাশে ঝুলে আছে। কিছুকিছু নক্ষত্র জ্বলছে। দূর দিগন্তের ওপর ছোপ পড়েছে লাল হলুদ সোনালি রঙের আভা। এখন এই শেষ যামে কোথাও হট্টিটি পাখির ডাক.... ট্রি....ট্রি....ট্রি।

চৌধুরী শেষরাতে এই ডাক শুনতে পায়। ঘুম ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসে। একটু পায়চারি করে। তারপর বন্দুক হাতে বাঁধের ওপর হাঁটতে থাকে। অনেক দূর হাঁটে। শাঁখালার বিলে বুনোহাঁসের পায়ে-পাখনায় ঠোঁটে জলভাঙার শব্দ শোনে। অলৌকিক মনে হয়। মনে হয় চেনাশোনা হিজলের বাইরে, এই কুয়াশার গভীরে, কোথাও একটা ভিন্নতর হিজলের জগত বেঁচে ছিল। সেই জগত আস্তে আস্তে ফুরিয়ে যাচ্ছে। হিংস্র ক্ষুধিত নখের আঁচড়ে মানুষ প্রকৃতির হৃদয় তার লক্ষ্য। পাবে কি না পাবে, কেউ জানে না।

তবু রক্তে একটা অমানুষিক ক্ষিপ্রতা আছে। হিজলের নদীতে, মাঠে, আকাশে, রোদে ও অন্ধকারে তা জেগে ওঠে।

চৌধুরী কদাচিৎ ভাবে, কোথাও একটা ভুল ঘটে চলেছে ক্রমগত। বুনোহাঁসের দলে বন্দুক তুলে নিশানা করার মুহূর্তে এইটুকু তাকে বিষণ্ণ করে। নিশানা ফিরিয়ে নেয়। আকাশের দিকে লক্ষ্য করে।

তখন শেষ রাতের শান্তির আকাশ চুরমার করে দিয়েছে জ্বলন্ত বারুদের চিৎকার। দুর্গন্ধ ধোঁয়ার বিষে কটূ বাতাস।

বুনোহাঁসেরা উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

বাঁধের পথ চলতে চলতে চৌধুরী বন্দুকটা তুলে ধরল। হট্টিটি পাখির ডাক কিংবা কান্না। বড় অসহ্য লাগে। হিজলে কোথাও এক চিরন্তন বিয়োগের দিক রয়েছে। তার সবটুকু প্রকাশ করে ওই কণ্ঠস্বর।

চৌধুরী বন্দুক নামাল। কী হবে!

সিগ্রেট জ্বালল সে। বাঁ পাশে পাটের বনে সব চড়ুইয়ের ঝাঁক কথা বলতে শুরু করেছে। কোথাও ফাঁকা ক্ষেতে কাটা পাটের মুড়োগুলো উঁচু হয়ে আছে। একটু হাঁটলে আমবাগান। এটা গোলকরাজার হাতে তৈরি। ত্রিবেদীর মহাল এখান থেকে শুরু। বাগানটা দেখতে দেখতে চৌধুরী একটু হাসল। ত্রিবেদী নিজের চালে নিজেই মাৎ হয়ে গেছে। আবেদালিকে হাতে রাখতে চেয়েছিল। তাই ভাবল রাজারঘেরের সঙ্গে ভাব ঘটিয়ে দিলে সেটুকু আস্তে আস্তে পাওয়া যাবে। আবেদালি চায় মৌজার মোড়লি। বুনো বড়বেড়েরা আবেদালিকে স্বীকার করে নিলে। তার মানে রাজারঘেরেও আবেদালির

ইজ্জত গড়ে উঠল। চৌধুরী প্রথমে বুঝতে পারেনি চালটুকু। শেষে যখন বুঝল, কিছু ভাবনা এসেছিল তার মাথায়। শেষরক্ষা করল মধু দত্ত। আশ্চর্য, এতদিন ধরে মৌজার আদায়ে কোনও যোগ্য গোমস্তা মেলেনি। হরিণমারার মোতাই মিয়া দিনকতক আদায়ে গিয়ে মাথা লাল করে ফিরে এল। খাজনা আদায় বড় ঝামেলা হিজলে। তেমনি ঝামেলা উঠবন্দী জমার ব্যাপারটা। এক বছরের পত্তনীগুলো বড় জ্বালায়। আবেদালি গোমস্তা হলে চোখ বুজে ঘুমনো চলে। তার হাতে বিনা ঝামেলায় কড়ি গুনে দেবে হিজলিয়া চাষারা। কেউ অমান্য করবে না আবেদালিকে। তবু ভাবনা আছে। হিজলের লোকগুলোর মতিগতি বোঝা বড় কঠিন। একরোখা জাত সব। কখন কোনদিকে মোচড় খায় বলা যায় না।

হয়তো ত্রিবেদী আবার কোনও চালের কথা ভাবছে। আবেদালি গোমস্তা হল—এটা তার পছন্দ হবার কথা। মধু দত্তকে ডাকতে হবে আজই। রাজারঘেরেই ডাকবে। বড়বেড়েদের বাড়ি যেতে হবে বর নিয়ে। তখন লোক পাঠাবে। হাতিটা কাল সন্ধ্যা থেকে নতুনগাঁয়ে রয়েছে। কলাগাছের স্তূপ সাজিয়ে রেখেছে ওরা। বেশ সুখেই কাটাচ্ছে ভানুমতী আর মাহুত ইসমাইল। ইসমাইল আফশোস করে বলেছিল : ব্যান্ডপার্টিকা বন্দোবস্ত কিজিয়ে না সাহাব, লালবাগসে! বহুত বঢ়িয়া হোতা ইন্তেজাম.....

চৌধুরী হাসতে হাসতে বলেছিল : ইয়ে তো পণ্ডিতকা শাদী নেহী।..... পণ্ডিতকা দুসরা শাদী হোনে সে হাম জরুর ব্যান্ডেপার্টি লায়ে গা লালবাগসে।

আবেদালিও হাসল শুনে। বলল : বড়বেড়েরা ওদিকে কান্দী থেকে মালাকার এনেছে। রেতের বেলা বাজী পুড়বে।

শুধু বাজীই পুড়ছে না। সারা হিজলের নেমন্তন্ন বড়বাড়িতে। বুড়োরা বলছিল : কবে সেই একবার চিকান্তপুর মোড়ল এমনি খাইয়েছিল। তেনার নাম হয়েছিল—আহারি মোড়ল। এবারে সেই এলাহী কাণ্ড। সারা নতুনগাঁয়ের আণ্ডাবাচ্চাশুদ্ধ বরযাত্রী। লিষ্টি করে ফেলেছে আবেদালি। গত রাত থেকে পঞ্চাশ-ষাটজন বাগদি আর চাষা মিলে জাল ফেলেছে দহে, বিলে-খালে। মাছ উঠছে পাহাড় সমান। সারা রাত ধরে গানবাজনা চলেছে। চমৎকার আর সালাম শেখ বাউল গাইছে। মেয়েরাও ঢোল বাজিয়ে নাচছে-গাইছে। সারারাত ধরে সেই শব্দ শুনেছে চৌধুরী। এখন ভোরের দিকে সব ক্লান্ত। ঘুমোচ্ছে উঠোনের ওপর তালাই বিছিয়ে। বেলা এক প্রহর হতে হতে হলুদস্নান সেরে বর উঠবে হাতির পিঠে।

অবশ্য রেওয়াজ হচ্ছে ঘোড়ার। ঘোড়া একটা চাই-ই। ঘোড়ার পিঠে বর চাপবে জাঁতি হাতে। তখন মা এসে দাঁড়াবে সুমুখে। হাতের ডালায় চাল, ছোলা, গুড়। দুব্বোঘাস আর সিঁদুর আমপাতায়। ঘোড়ার কপালে ঘষবে সেই সিঁদুর। দুব্বো দেবে মুখে। দেবে মুঠোয় তুলে চাল, ছোলা, গুড়। এক বালতি জল ধরবে সুমুখে। ঘোড়ার কানে কানে বলবে : ফিরিয়ে এনো ছেলেটাকে! সঁপে দিলাম। লাগামহীন ঘোড়া বশ মেনে হাঁটছে শান্ত পা ফেলে। কনেবাড়ির উঠোনে সাতপাক দেবে ঘোড়াশুদ্ধ বর। তারপর কোল দিয়ে নামাবে কনেবৌর বাপের তুল্য কোনও স্বজন।

চৌধুরী অনেক দেখেছে। এবং সে এখন হেসে উঠল। হাতিশুদ্ধ বর সাতপাক দেবে নাকি! যত সব বুনো লোকের কাণ্ডকারখানা!

আমবাগান অবধি গিয়ে ডানপাশের নতুন বাঁধে এল চৌধুরী। একটু দূরেই কাপাসিয়ার ঘাট—দ্বারকানদীর ওপর। পাকা সড়ক চলে গেছে সদরের দিকে।

পাটক্ষেতের পর ফাঁকা জমি। চৌধুরী কপা এগিয়ে দারুণ চমকাল।

চুমকি ও আকাশ। মুখ ফেরাতেই একেবারে চোখে চোখ।

এলোমেলো ছুটছে তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো। ঘাসের বন ডিঙিয়ে ছুটেছে। চৌধুরী মুহূর্তে ক্ষোভে হিংসায় উত্তেজনায় জ্বলে উঠল। দারুণ সর্বনাশের দরজা খোলা হয়ে গেছে চোখের সুমুখে। চৌধুরী চিৎকার করতে চাইল : পণ্ডিত, পণ্ডিত! পারল না। ক্ষিপ্রহাতে বন্দুক তুলে ধরল। চুমকিকে তাক করল।

তাবপর একটু হেসে উঠল ঠোঁটের ফাঁকে। বন্দুক নামাল চৌধুরী।

ভোরের হিজলে প্রচণ্ড হাসির শব্দ তুলে টলতে টলতে ফিরে এল সে। তার আগেই আবেদালি কাছারিতে হাজির!

সারারাত ধরে হল্লা চলেছিল। ভোরে একটু থামে। ফের শুরু হয়। বড় বড় উনুনের ওপর হাঁড়ি রাখা হচ্ছিল সারবন্ধ। স্তূপাকৃতি কাঠের পাঁজায় সাত তাড়াতাড়ি অনেকগুলো কাক ও শালিক জড়ো হয়েছিল। আব্বাস মাথায় গামছা বেঁধে ছোটাছুটি করছিল অন্দর থেকে বাহিরে। তারপর খবরটা পৌঁছে গেছে। বেজন্মা বর বেদের মেয়ে নিয়ে লুকিয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে উৎকট চেঁচিয়ে হেসেছে লিবাস আলি। শনের দড়ি লেপটানো ঢেরাটা ছুঁড়ে বলে উঠেছে : এই আব্বাস, দড়িখান লেদিনি। গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুল্‌গে বটগাছে। বুড়ো নড়বড় করে বেরিয়েছে উঠোনে। : এই হারামজাদা, ওরে হারামীর বাচ্ছা.....

শেষে একখানা চেলা কাঠ নিয়ে তাড়া করেছে চুলে পাকধরা বড় ছেলেকে। ছেলেমানুষের মত আব্বাস তখন চলে যাচ্ছে গ্রামের বাইরে। ঠিক ছেলে মানুষের মতো কেঁদে চলেছে হাউমাউ করে!

বিয়ের কনে গায়েহলুদ মেখে জাঁতি হাতে বসে বসে ঢুলছে। নাইতে বসিয়েছিল। তুলে এনেছে পিঁড়ি থেকে। নাওয়া হয়নি। মেয়েরা কেউ কেউ অশ্লীল খিস্তি করছে। কেউ কাঁদছে সুর ধরে।

খবর পেয়ে অনেক মানুষ এল বড়বাড়ি। বটতলায় জড়ো হল। মধু দত্ত এল। ত্রিবেদী এলেন ঘোড়া চেপে। আব্বাস নাকি পাগলের মতো মাঠের দিকে বেরিয়ে গেছে। কাশবনে জামরুলের জঙ্গলে লোকজন তাকে খুঁজতে গেছে। নদী-নালার দিকেও গেছে কয়েকজন।

সারা রাজারঘের চুপচাপ একেবারে। চাষারা মাঠে যেতে ভুলে গেল। বড়বাড়ির বটগাছের নিচে ছমছমে মুখে বসে রইল হতবুদ্ধি হয়ে।

তারপর স্বভাবমতো তর্জন-গর্জন হল্লা শুরু হয়ে যাচ্ছে। লাঠি সড়কিও বেরিয়ে আসছে হাতে হাতে! বেইজ্জতির বদলা না নিলে বেঁচে থাকা বড় কুচ্ছিত দেখায়।

রাহেলা ও তার ছেলে আবেদালির কারসাজি সবই। তাই তাদের মা-ব্যাটার মুণ্ডু বটগাছে না ঝুলানো অবধি শান্তি নেই।

ত্রিবেদী গতিক দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। চৌধুরীর কাছারির দিকে চললেন। জীবনে প্রথম এই নবাবের কাছারিতে তিনি পা ফেলবেন। মধু দত্ত ঘাড় চুলকালো কিছুক্ষণ। বড় হতাশ হয়ে গেছে সে। মধু দত্ত আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বাঁধের পথে। কোথায় যাবে, কেউ জানে না। কিংবা কেউ লক্ষ্য করছে না তাকে। বানের জলের মতো এখানে অগুণতি মানুষ ফুঁসছে বসে বসে। শুধু বড়কত্তা লিবাস শেখের হুকুমের অপেক্ষা।

লিবাশ শেখ ফের তার খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছিল। একসময় বাইরে এসে দেখল সব। বুঝতে পারল সবটুকুই। রক্ত যেন চনচন করে উঠল মুহূর্তে। হাঁকরে উঠল সে : হেই জোয়ানেরা যদি আপন আপন মায়ের স্তন চুষে থাকিস,......

সেই সময় কে এসে বলল, বর আসছে। হাতি সাজছে। হাওদায় নতুন কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। চৌধুরী বরকে নিয়ে রাজারঘেরে আসতে দেরি নেই।

হইচই করে প্রশ্ন উঠল : বর? বর কে, কে বরটো? আকাশ আলি তো?

যে খবর এনেছিল, তাকে খুঁজছে সকলে। কে বলল? নাকি মধু দত্ত বলল। কেউ বলল : না, মধু দত্ত না, মধু দত্তের শালা খবরটা এনেছে। মধু দত্তর শালার নাম নরহরি। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। কালা কুচ্ছিত রঙ। মস্তো টিকি।

নরহরি খবর পেয়ে নতুন গাঁ এসেছিল সকালে। আবেদালির বাড়ির দরজায় পৌঁছে সে অবাক। শুনল : ইস্কুল-টিস্কুল আর হচ্ছে না। ফ্যাকড়া বেধেছে। বাধিয়েছে কোন বেদের মেয়ে। নরহরি দেখল এক বুড়োকে ধরে রেখেছে কোমরে দড়ি বেধে। বুড়ো বেজায় কান্নাকাটি করছে। নরহরি বলল, আহা, বুড়োমানুষ, ওকে কেন কষ্ট দিচ্ছ বাপু?

হাঁকরে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে · থামো দিকি মশাইটো। হুই লোকটো যত কাণ্ডর মূল। হুই তো বেটিকে দিয়ে বশীকরণ করালে! অত সরল ছেলেটাকে!

বুনো দেশের ব্যাপার-স্যাপার দেখে তাক লেগে গেছে নরহরির। ওরে বাবা, এ মগের মুল্লুকে পণ্ডিতি করে লাভ নেই। পা পা করে পালাচ্ছিল সে। তখন কে যেন বলল, তুমি দত্তর কুটুম না? আমাদের লতুন পণ্ডিত! নরহরি পেছন ফিরে দেখল, মধু দত্ত দাঁত ছরকুটে হাসছে। · আরে এস এস। পালাচ্ছ কেন?

আরো অনেক কাণ্ডকারখানা বসে বসে দেখেছে নরহরি। আবেদালি গোমস্তার বাড়িতে শাশুড়ি-বৌর ভীষণ চেঁচামেচি শুনেছে। বৌটাকে বুঝি আচ্ছা করে মাটিতে রগড়াল শাশুড়ি। দারুণ দস্যি বুড়িটা। হাঁসফাঁস করে বেরল বাইরে। হেঁড়ে গলায় বলল : কইরে আবেদালি, চড়দিনি হাতির ওপর।

নরহরি আবেদালিকে চিনল। সে ভেজাবেড়ালের মতো হাতির দিকে এগোচ্ছিল। সারা নতুন গাঁ মাদারপিরের নাম ধরে চিৎকার করছিল। বেদবুড়ো তখন ছুটে গিয়ে পা ধরেছে আবেদালির। আবেদালি বলল : একে ছেড়ে দাও। বেদে কাঁদতে কাঁদতে মাঠের দিকে গেছে। লোকে বলছে : ঘরে যেয়েই সাপ ছাড়বে কড়ি চেলে। যেখানেই থাক মেয়ে,

আসতে হবে নাড়িতে পাক খেতে খেতে। কাঁদতে কাঁদতে। রমজান বেদে খুব বড় ওস্তাদ।

আর আকাশ? সেই ছোঁড়াটো?

তাকে দংশাবে কাল। মরবে মুখে খুন উঠে।

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে ভুলিবিবি। : ক্যানে, ক্যানে মরবে রে হারামির বাচ্চারা। আমার বেটা আমার কোলেই জান জুড়োবে এসে। হলই বা বেদের কনে, মানুষ তো বটে। চোখ কান মুখ চেহারা একখানা আছেই। কনেবৌ তো বটে। লিব, লিব আমি তাকে কোল পেতে। লগদ পাঁচটাকায় ময়ূরপঙ্খী শাড়ি কিনেছি কান্দির বাজারে। বেদের মেয়া পিঁধরে-পরবে। লোকে দেখবে.....

বিলাস শেখ বৌকে ধরে নিয়ে গেল। শিগগির ঘরে চ দিনি। তুর কৃত্তিমান ব্যাটাটো ঘরে ঢুকেছে মাগ লিয়ে। জাতকূল সব গেল রে বাপ!

শাড়ির কথা ভুলে গেছে অমনি। ছুটতে ছুটতে চলেছে কোমরে আঁচল জড়িয়ে। বলতে বলতে যাচ্ছে : হাত ফুল ফুল, পা ফুল ফুল, বসে থাকবে ঘাটে। আলতা মুছবে—তাই নামবে না। কাজলকামিনী গামছা মাথায় শাশুড়ির কোলে কোলে চেপে দুধলদীতে লাইতে যাবে। .... জোয়ানেরা বেদম হাসছিল। ফয়সালা না হলে, আকাশের মাথা এতক্ষণ লাল হয়ে যেত।

বটতলায় বসে বসে একদমে সব বলে দিল নরহরি দত্ত। : পণ্ডিতী? বাস্‌রে নতুন গাঁয়ে না। বরঞ্চ তোমরা যদি বলো এখানেই খুলে বসবো একটা পাঠশালা।

বর আসছে শুনেই সব জল হয়ে গেছে। উনুনে কাঠ জ্বেলেছে। গুণ গুণ করে গান গেয়ে উঠেছে মেয়েরা। সেই শওকত আলির বেটা আবেদালি হবে বড়বেড়ের জামাই। সে কি? হ্যাঁ, তাই। রাজারঘেরে আবার হেসে উঠেছে। কালের বন্ধনকে বাধা দেবে সাধ্যি কার?

বানুবৌ অনেক কান্নাকাটি করছিল। মাটিতে শুয়ে পড়ে পায়ে ধরেছিল রাহেলার। অথচ রাহেলা যেন হঠাৎ রাক্ষুসী হয়ে গিয়েছিল।

তারপর বানুবৌ ফুঁসে ওঠে : বুঝেছি, আমি সব বুঝেছি।

রাহেলা চমকে বলল : কী বুঝেছিস?

তুমার যৈবনের নাগরকে দেখে সব ভুললে তুমি। বানুবৌ ধুলোমাথা গতরে খসেপড়া কাপড় জড়াতে জড়াতে সাপের মতো হিসহিস করল। চুলে পাক ধরেছে, সরম কল্লে না একটুকুন! পীরিতের লোকটা তুমার পা ধরতে এল, তুমি হার মানলে। আমার ছেলেগুলার দিকে তাকালে না। আমার সোনার সংসারে আগুন জ্বালালে ডাইনিটো। পরের ব্যাটার নাম করে লিজের ব্যাটার বৌ দেখতে গিয়েছিলি, হা খোদা!

এই অবধি শুনে আর স্থির থাকতে পারেনি রাহেলা। তার ইজ্জতের ওপর কিংবা গভীর কোন ক্ষতে নখ বসিয়ে দিচ্ছে মেয়েটি। ছুটে এসে লাথি মেরেছিল মুখে। প্রচণ্ড হাঁসফাঁস করে মাটিতে রগড়েছিল। আবেদালি বসে বসে এসব দেখছিল শুধু। রুখে ওঠার ক্ষমতা ছিল না তার। চারটি বাচ্চা একটানা চিৎকার করছিল। তবু কোনও কথা বলল না

সে। হয়তো এ তার কাপুরুষতা। কিংবা শওকতের মতো কঠিন কলজের অগাধ নিষ্ঠুরতা জমে আছে তার।

এখন রাতের অন্ধকারে রাহেলা এসব ভাবছে।

ঘাসের পথে পীরমাদারের থানের দিকে চলেছে সে। আর না গেলে চলে না। বানুবৌর জন্যে কান্না পাচ্ছে। বারবার তার মুখটা মনে পড়ছে। তার সাধের সংসার জ্বালিয়ে দিল ডাইনি রাহেলা!

বানুবৌ তারপর আবেদালির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে : তুমি চুপ করে থেকো না? জবাব দাও কথাটোর। বুলো তুমি ক্যানে বিহা করবে? ক্যানে ক্যানে.....

আবেদালি নিষ্পলক লাল চোখে তাকিয়েছিল। যেন এ সব খুবই ছোট-খাট ব্যাপার মনে হচ্ছিল তার। দু-চারটো বৌ রাখা হিজলে বড় মামুলি ঘটনা। সে তখন কেবল দশের কথা ও দেশের কথাই ভাবছিল। ভাবছিল তার ইজ্জতের কথা।

পীরের থানে শান্তভাবে দাঁড়াতে চেষ্টা করল রাহেলা। ফিসফিস করে প্রশ্ন করল—হা বাপ, ইটো কী ভুল হলো? আবার একটো কী ভুল কল্লাম রে? হেই পীর, একটো ভুল ঢাকতে হুজুর ভুলে দোষ লাগে...

রাহেলা তীব্রভাবে চেঁচিয়ে নির্জন অন্ধকার মাজারকে কাঁপাল : ক্যানে, ক্যানে, ক্যানে... বানুবৌর মতো স্খলিত কাপড়ে মাটিতে ছটফট করতে থাকল সে। তার শরীরে শিশিরের ফোঁটা চুইয়ে পড়েছিল। এক সময় বিড় বিড় করে বলে উঠল : শান্তি দাও হেজলে, হেই মাদারপীর!

রাজারঘেরে আব্বাসও নামাজে বসে একই প্রার্থনা করছিল। ঘরে ঘরে সুখ ও শান্তি। নয়া আবাদ। ফসলের মাঠ। একটা বৃহৎ সুখী জীবনের কথা ভেবে সে আপ্লুত হচ্ছিল।

তারপর সকালে হিজল জেগে উঠেছে। কাছারির ওদিকে কোথায় চৌধুরীর বন্দুক চিৎকার করল। হাতির পিঠে আবেদালি ফিরে এল বড়বাড়ির রূপসী কনেবৌ নিয়ে। হাতি হাঁটু ভাঁজ করছে। দরজায় ছেলেকে দেখতে গিয়ে রাহেলা শুনল, বানুবৌর খোঁজ পাওয়া গেছে। ময়ূরপঙ্খী শাড়ি পরে বাঁকের গাবগাছে ঘনপাতার ভেতর ঝুলছে বানুবৌ। 'াব ছেলের মা। ছোটটি এখনও মাই টানে। সে এখন মাকে খুঁজে খুঁজে রাহেলার কোলে শুকনো মাই টানছে। পিট পিট করে তাকাচ্ছে। হাতি দেখছে। ঘণ্টার শব্দ শুনছে।

আবেদালি আর্তচিৎকার করে পা বাড়াতেই তাকে ধরে ফেলেছে কজনে। : যেও না দেখতে পাববে না। উটো দেখতে নাই। আমাদের মুখের দিকে তাকাও পুণ্ডিত!

আবেদালি ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল, হিজল—সকালের মোহময় নীলাভ হিজল ঘিরে একফালি আলো রক্তের মতো লাল হয়ে আছে। ফের আবেদালি চোখ মুছে তাকাল। চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে জোয়ান চাষাগুলো। তার শোক-দুঃখের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা চায় হিজলের জনপদে শান্তি আর সমৃদ্ধি। তারা পবিব্যাপ্ত শ্যামলিমায় আর রক্তের ছাপ দেখতে চায় না। বানুবৌ নামে একটি সন্তানবতী বধুর মৃত্যু তাদের আশা ও স্বপ্নের কাছে অতি তুচ্ছ হয়ে গেছে। বড়বেড়েদের জামাই হয়ে আবেদালি পুণ্ডিত এখন সারা হিজলের একচ্ছত্র নেতা। তার আর নিজের জীবন বলে কিছু নেই।.....

স্বর্ণলতার উপাখ্যান

এক

ভুগোল ও ইতিহাসের দু'চার পাতা

হাওড়া-বারহারোয়া লুপলাইনে চিরোটি নামে এই ছোট্ট স্টেশনটা পড়ে। ভাগীরথীর পশ্চিম পাড় বরাবর এঁকেবেঁকে চলে গেছে এই রেলপথ, দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে। কাটোয়া জংশন পেরোলে ডানদিকের জানলায় জহ্নুকন্যার লুকোচুরি খেলা নজরে পড়ে। এই দেখা যায় তার সন্ন্যাসিনী শরীর, এই ঢেকে ফেলে সবুজ গাছপালা কিংবা ধূসর গ্রামপুঞ্জ। কিন্তু সময় যে আর কাটে না! কী দূরদূরান্ত একেকটা স্টেশন! ভুষকালো লজঝড় ইঞ্জিন ঘট-ঘটাং ঘট-ঘটাং করে হাঁফাতে হাঁফাতে এগোচ্ছে, ভোঁস ভোঁস করে প্রশ্বাস ফেলে উজ্জ্বল নীল গাঙ্গেয় আকাশটা কুচ্ছিত করে দিচ্ছে। থুত্থুড়ে সবজে কামরাগুলোর হাড় মটমট করছে। চাকায়-চাকায় 'টিকিটবাবুর কত টাকা....টিকিটবাবুর কত টাকা' বুলি ছড়িয়ে যাচ্ছে, তারপর অজয় নদীর পুলে এসে 'এক ধামা চাল তিনটে পটল......এক ধামা চাল তিনটে পটল' হাঁকতে-হাঁকতে বাজারসাহুতে পাক্কা আধঘণ্টা হুসহুস জলখাওয়ার পালা। চিরোটি পৌঁছতে আরো একটা ঘণ্টার ধাক্কা।

কলকাতা যাওয়া-আসা করতে এই রেলপথ ও-তল্লাটে কেউ বাছে না সচরাচর। গঙ্গা পেরিয়ে লালগোলা-শেয়ালদা লাইনই ভালো। দু'পাশে কত বাজার কত মানুষজন। হই হই করে কখন পাঁচটা ঘণ্টা কেটে যায়। কিন্তু এপারের লাইনে চেহারাচরিত্র অন্যরকম। মাইলের পর মাইল ফাঁকা ধু-ধু মাঠ। কদাচিৎ মানুষজন গাঁঘর সুন্দরী বউঝি। হ্যাঁ, সুন্দরী বউঝি। চিরোটি স্টেশনের প্রায় ছাঁচতলায় গোরাংবাবু ডাক্তারের (এইচ এম বি) ডিসপেনসারি। তিনিই বলেন—বাংলা সন তেরশো আঠারো সালে এ লাইন চালু করল রেল কোম্পানি, আমি তখন থেকেই আছি। হা পোড়াকপাল। আজ অবধি গাড়ি থেকে একটাও দেখনসই রূপসী নামতে-উঠতে দেখলুম না গো! দূর, দূর! ঝাঁটা মারো!....রাঙামাটির কেরু বাউরি লাইন পাতার সময় মাটি কেটেছিল—দিন দুপয়সা মজুরি। সে বরাবর বলে গেছে—গোরাং ডাক্তারের আলুপটলের দোষ আছে। বাউরির মুখ, মুখ তো নয়—ইয়ে (অশ্লীল শব্দ)!

চৌরিগাছা ছাড়ালে দু'ধারে বিশাল ঢেউখেলানো শক্ত মাটির মাঠ। এই উঁচু, এই নিচু বিস্তার। কোথাও হলুদ, কোথাও লালচে মাটি। আবার কোথাও মাটি ক্ষীরের বরণ হলেও রক্তের মতো লাল অজস্র ছিটে আছে। একফসলা ধানক্ষেতগুলো ধাপবন্দী; মোটাসোটা আঁকাবাকা আল, যেন হাজার অজগর শুয়ে নিজ নিজ মালিকানাসত্ত্ব পাহারা দিচ্ছে—ঝিমধরা নির্জীব নিস্পন্দ। গায়ের চামড়ায় খসখসে পিঙ্গলবর্ণ ঘাস। রুক্ষু বাঁজা ডাঙায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ফেট্টিবাঁধা চাঁড়ালের মতন তালগাছ। এখানে-ওখানে পোড়ো অনাবাদী মাঠে শেয়াকুল-বইচি-শ্যাওড়ার ক্ষয়াখর্বুটে ঝোপঝাড়। কোথাও বাজপড়া প্রকাণ্ড শিমুলগাছ। তার ডগায় টিয়াপাখির গর্ত। টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে আনমনা ট্যাসকোনা পাখি! মাথার ওপরটা ফিকে বেগুনি, ডানা আকাশি নীল, বুকের তলা উজ্জ্বল

সাদা। ঠোঁটদুটি লাল টুকটুকে। হঠাৎ চমকে গেলে ডাকে ট্যা-ট্যাঁ-ট্যাঁ.......ট্যাট্যাঁ-ট্যাঁ! একটু কর্কশ একটু স্বর—কিন্তু পোষ মানাতে পারলে মানুষ নাকি রাজা হয়।

হাউলির সোঁতা পার হয় রেলগাড়ি। ফের বেজে ওঠে—এক ধামা চাল তিনটে পটল! বাঁয়ে আঁরোয়ার গভীর জঙ্গল। ভিনদেশী (বিহারি) ভিনভাষী অসমসাহসী গয়লাদের বাথান। অনেকটা দূরে গাছের ডালে তাদের ঝুলন্ত হাঁড়িকুড়ির সিকে দেখতে পাওয়া যায়। ওখানে লোকজন কেউ নেই। সবাই চলে গেছে দূর পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে বাঁকি নদীর অববাহিকায়—সেখানে হিজলভাঁট আর বিষাক্ত ভেলাগাছের (প্রবাদ : কেউ ভেলাফল খেয়ে মরে, কেউ মরে তার বাতাসে) ছায়ায় দাঁড়িয়ে উলুকাশসমাকীর্ণ বিলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হাতে রয়েছে ছ'ফুট লাঠি, মাথায় লাল ফেট্টি।

ডাইনে মুসলমান চাষীদের গাঁ ডাবকই। উঁচু রেললাইন থেকে স্পষ্ট দেখা যায় মেয়েরা ধবধবে সাদা উঠোনে ধান শুকোতে দিয়েছে। মাই খুলে দিয়েছে ন্যাংটো ছেলেপুলেকে। নিমগাছের ছায়ায় বসে বুড়ো মাথায় টুপি পরে (নির্ঘাৎ হাজি সাহেব) শনের দড়ি বানাচ্ছে। ইঁদারা থেকে জল তুলছে ঘোমটাপরা নতুন বউ। নয়ানজুলির জলে ঠেলে নামিয়ে দিচ্ছে বলদদুটো কোন মাঠফেরত লাঙ্‌লে মুনিশ। পাকুড়তলায় খেলা করছে একপাল ন্যাংটো ও আধন্যাংটো ছেলেমেয়ে। কে একজন কুলঝোপে বসে কুকর্ম সেরে নিচ্ছে। ওরা সবাই চখে ওঠে। আপ আজিমগঞ্জ লোকাল এসে গেল! সবাই মুখ ফেরায়। কেউ কেউ গা তুলে আকাশ দেখে নেয়। কী কাজ ছিল তার সময় হয়ে গেছে। কুলঝোপের লোকটি উঠে দাঁড়িয়েছিল—এবার উঁচু পাড়ওয়ালা পুকুরের দিকে জল সারতে এগিয়ে যায়। নতুন বউটি হাতে দড়ি বালতি নিয়ে কতক্ষণ ঘোমটার ফাঁকে এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এলগাড়ি! এর নাম এলগাড়ি! কোত্থেকে আসে এলগাড়ি?...

ডিসট্যান্‌ট সিগন্যাল পেরোয় গাড়ি। ডাইনে অসমতল মাঠ উঠে গিয়ে মিশেছে আকাশে। টিলার মতন বাঁজা ডাঙা দেখা যায় অনেকগুলো। বাঁয়ে গাছপালার আড়ালে আঁরোয়া। রেলকোম্পানির জমির ওপারে পুরনো বটগাছ। একটা দোকান মোটে। আর গোরাংবাবুর ডাক্তারখানা। চাঁদঘড়ি চাঁড়ালের কুঁড়েঘর। শুওরের খুপড়ি। রেলগাড়ির শব্দে চখেওঠা সোনালি ধাড়ি শুওরটা ঝোপের দিকে পালায়।

ডাইনে স্টেশনঘরের পিছনে স্টাফ কোয়ার্টার ছাড়িয়ে ধাপে-ধাপে পুবে নেমে গেছে মাঠ। তারপর উঠে গেছে দিগন্তে সেখানে মাটির রঙ ঘোর লাল। তার পিছনে আচমকা তিনশো ফুট নিচে ভাগীরথীর মজা খাত। তেরশো বছর আগে জহ্নুকন্যার এই ছিল পথ। খাড়া পাড়ের মাটি দগদগে লাল! রাঙামাটি-চাঁদপাড়া গ্রাম। যদুপুর গ্রাম। তাদের দুদিকে সব টিলার মতো উঁচু বাঁজা ডাঙা। মাঝে মাঝে কোত্থেকে সায়েবসুবো কারা আসেন সেখানে। মাটি পরখ করেন। জায়গায় জায়গায় মজুর দিয়ে মাটি খোঁড়ানো হয়। ভাঙা পোড়া মাটিরপাত্র খুঁজে ব্যাগে রাখেন। লোকেরা বলে, দাতা কর্ণের রাজধানী ছিল রাঙামাটি। সেইসব লোকেদের ঠাকুরদারা বলে গেছে, মূল নাম কানাসোনা। কেরু বাউরি মুরুক্ষু ছোটলোক মানুষ। সে মহাভারত পড়তে পারে না, আঁরোয়ার পালিতবাবুর কাছে শুনেছে, কুন্তীর জারজ ছেলে যিনি—কর্ণ তাঁর নাম, এখানেই থাকতেন। তাঁর পুত্র

বৃষসেন। বৃষসেনের অন্নপ্রাশনে লঙ্কার রাজা বিভীষণকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। সেদিন দাতা কর্ণসেন মুঠোমুঠো সোনাবৃষ্টি করেছিলেন নগরে। তাই নাম হল কর্ণসুবর্ণ। আর, মজার কথা—ওইসব ডাঙা খুঁড়ে ঘরদাওয়া নিকানোর লালমাটি আনতে গিয়ে কেউ কেউ নাকি দু-চার ভরি সোনাও পেয়ে গেছে। ডাবকইয়ের ইজু শেখ পেয়েছিল। মধুপুরের মান্যবর মোড়ল একবেলা লাঙল ঠেঙিয়ে দুপুরে একদিন জিরোচ্ছে রাজবাড়িডাঙার কয়েতবেল গাছটার ছায়ায়। বলদদুটো শুকনো ঘাস চিবোচ্ছে খানিক তফাতে। এদিকে জোয়ালে মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছে মান্যবর। হঠাৎ স্বপ্ন হল : ওঠ, ওঠ হে মান্যবর, তোমার পিঠের নিচেই রয়েছে। মান্যবর তখন স্বপ্নে তার আঁটকুড়ি বাঁজা বউ সুখেশ্বরীর সঙ্গে ঝগড়া করছিল। ঝগড়া রেখে চেঁচাল—কী, কী আছে পিঠের নিচে?...ঘুম ভেঙে লালা মোছে আর ফ্যালফ্যাল করে তাকায় মান্যবর। দূরে সড় সড় গুড় গুড় আওয়াজ তুলে লোকাল ছেড়ে যাচ্ছে স্টেশন থেকে। সে লাফ দিয়ে উঠে বসে পাচন দিয়েই পিঠের নিচের রাঙামাটি খুঁড়তে থাকে।

পরে হাঙ্গামায় পড়ে গিয়েছিল সে। পুলিশ এসেছিল। বহরমপুরের সদর কোতোয়াল ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। গোরা হাকিম হল সায়েব ধমকায়—সট্য কটা বোলো, বখশিস পাবে। মান্যবর কেঁদেকেটে বলে—লা হুজুর মা-বাবা, লা ধর্মাবতার। আমরা বাঁজা মাগ-মরদ। ধনসম্পত্তি লিয়ে কী করব? এইরকম গল্প প্রচুর আছে এ তল্লাটে। একটা অদ্ভুত লোকের কথা আছে—যে মাথায় বাতি নিয়ে সারারাত ঘুরে বেড়ায়। আলো বিলিয়ে বেড়ানো ছিল তার কাজ। রাক্ষুসিডাঙায় পীর তুরকানের মাজার আছে। এক রাক্ষুসি এসে আড্ডা নিয়েছিল। জ্ঞানীদের নেমন্তন্ন করে মহাভারতের বকের মতন প্রশ্ন করত—জবাব না দিতে পারলে কড়মড় করে মুণ্ডুটি চিবিয়ে খেত। সাধু তুরকানকে সে প্রশ্ন করেছিল, মলে মানুষ কোথায় যায়? সাধু তুরকান টুপি খুলে বললেন, এই যে এখানে যায়। এবং টুপির ঘায়ে রাক্ষসি চিৎপটাং হল, আর উঠল না। নিশিরাতে জনমানুষহীন ন্যাড়া টিলার কাঁটামাদার গাছের ঝোপে সাধু তুরকানের নামে কে পিদিম জ্বালিয়ে রাখে, তাকে কেউ চেনেই না। দেখতেই পায় না, কখন এককম্মটি সেরে যায়। কবে দেখে ফেলেছিলেন গোরা স্টেশনমাস্টার কলটন সায়েব। সূর্য ডুবুডুবু বেলায় ডাউন পাশ করিয়ে অভ্যাসমতো হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন একা। ধরে ফেলেছিলেন তাকে। রাঙা টুকটুকে বউ—এ যে নিতান্ত বালিকা! কলটন ফিরে এলেন স্টেশনে। কিন্তু বোবা হয়ে। পরে ডাক্তারি পরীক্ষায় দেখা গেল তাঁর স্বরযন্ত্রটি একেবারে টেঁসে গেছে।

এই সেদিন এলেন একদল পুরাতাত্ত্বিক। তাঁদের মধ্যে একজন অধ্যাপক ছিলেন বেজায় খামখেয়ালি। তাঁর বক্তব্য : তেরোশো বছর আগে রাজা শশাঙ্কর রাজধানী ছিল এখানে—এই সেই কর্ণসুবর্ণ। হিউয়েন সাঙ এসেছিলেন এখানে। লিখে গেছেন, 'লো-টো-মি-চী' বা 'লো-টো-মো-চিহ্'র কথা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে। 'রক্তমৃত্তিকা' মহাবিহারের ধ্বংসস্তূপ আছে এখানেই। ত্রিশটি সংঘারাম ছিল। দু'হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করতেন। সকালসন্ধ্যে সে কী গম্ভীর গমগমানি!

মাটি খোঁড়ার আর পরীক্ষানিরীক্ষার কাজ চলল অবিশ্রান্তভাবে। এক মধ্যরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে। খামখেয়ালি তরুণ অধ্যাপক বেরিয়ে পড়েছেন তাঁবু ছেড়ে। উষর টিলায় নির্জনতা থমথম করছে। ঝাপসা জ্যোৎস্নায় ভদ্রলোক দেখলেন, এক বিশালদেহী মানুষ একটা গর্তে ঝুঁকে রয়েছে—তার পরনে মাত্র একটুকরো কপনি। চেঁচালেন—কে, কে! মানুষটা হাঁটতে লাগল। দৌড়ে গিয়েও তাকে ধরা গেল না। ভাগীরথীর মজাখাত তিনশো ফুট নিচে—পাহাড়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে হুঁস হল অধ্যাপকের। আর একটু হলেই পড়ে হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যেত।

এই ব্যাপারটা নিয়ে দলে ভীষণ হাসাহাসি হয়। আসলে লোকটা ছিল চোর। আজকাল বিদেশে পুরানো আমলের জিনিস ভারি দামে বিকোয়। একসক্যাভেশানেব ফলে পাওয়া দুর্মূল্য মূর্তি শীলমোহর ইত্যাদি চুরি করতে এসেছিল কেউ। পরদিন ডাইনামো চালিয়ে জায়গাটা আলোকিত রাখা হয। কাঁটাতারের বেড়াও দেওয়া হয়েছিল। তবু তরুণ অধ্যাপকের মন মানে না। তাঁর মতে জায়গাটা রহস্যময়। তেরশোবছর আগে ওখানে ছিল বহতা ভাগীরথী। ওই ঘাট থেকেই মহানাবিক শ্রীবুদ্ধ গুপ্ত নৌকো ছেড়ে তাম্রলিপ্ত যেতেন। বানভট্ট লিখেছেন—মহাসামন্ত শশাঙ্ক কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্ধনের বোন রাজ্যশ্রীকে হরণ করেন। কূটবুদ্ধি শশাঙ্ক আমন্ত্রণ করলেন রাজার ভাই রাজ্যবর্ধনকে। রাজ্যবর্ধন নিজের তাঁবুতে খুন হয়ে গেলেন। তাঁবুটা কোথায় ছিল অধ্যাপকটি স্পষ্ট দেখতে পান। ওই আপ ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে, ধুলোওড়া মেঠো পথের পাশে হাজামজা বিশাল পুকুর, তমাল গাছের জঙ্গল, ওখানটায়। ঘোড়াগুলো জ্যোৎস্নার রাতে এখনও মনে হয় চরে বেড়াচ্ছে। খোলা আকাশের নিচে সেনানিরা হাত-পা ছড়িয়ে গল্পগুজব করছে। দূরে বৌদ্ধ শ্রমণদের সমবেত কণ্ঠে গম্ভীর স্তোত্রধ্বনি বাজছে : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি! চোখ বুজলেই শোনা যায়।....

অবশ্য এই পুরাতাত্ত্বিক অভিযানের ব্যাপার অনেক পরের কথা। সেবার একদা আপ আজিমগঞ্জ-হাওড়া লোকাল চিরোটি স্টেশনে ঢুকতে ঢুকতে গোকর্ণের দাসজীমশাই যখন প্রকাণ্ড কাপড়ের গাঁটটা ধুম করে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন হেরু, হারাধন রে! তখন গোরাংবাবু বেঁচে। ঘোড়ায় চেপে রুগী দেখতে যান আশপাশের গাঁয়ে। দু-চারজনের বেশি যাত্রী নামে না যেমন, তেমনি রুগীপত্তরও মাত্র দু-চারজন সবে হাতে এসে লাগছে। কেরুর ছেলে হেরু বাউরি মোট বয় স্টেশনে। প্রকাণ্ড মানুষ—সাড়ে ছ'ফুট লম্বা। স্টেশনের বটতলায় একটা মোটে দোকান—মুড়কি আর নুন তেল পাওয়া যায় সেখানে। পিছনে পুকুর আর জঙ্গল। ক'ঘর মাত্র বসতি। আঁরোয়া গ্রাম। কেমন যেন প্রাক আর্য পুরনো পুঁথির ঘ্রাণ নেই নামটায়।

কিন্তু স্টেশনের নাম চিরোটি। তিন চার মাইল দূরে বহতা নদী ভাগীরথীর পাড়ে চিরোটিকোদলা গ্রাম। বেলকোম্পানির মাথা খারাপ। আঁরোয়ার স্টেশন—নাম দিলে চিরোটি! গোরাংবাবুর তদ্বির আমলই দেননি রেলবাবুরা। বেশিরভাগই তখন গোরা ইংরেজ, গট্‌মট্‌কট্‌ করে কেউ কেউ বাংলা বলতে শিখেছে। গোরাংবাবুকে বলল, দ্যাটস

ফাইনাল ব্যাবু! আসলে ব্যাটাদের মুখে 'আঁরোমা' নামের চেয়ে 'চিরোটি' উচ্চারণ করা সহজ ছিল কি না!

যাত্রী কদাচিৎ নামে এ স্টেশনে। অত বাবু ভদ্রলোক আশেপাশের গাঁয়ে কোথায় যে পয়সা দিয়ে রেলগাড়ি চাপবে? একটা স্টেশন যেতে আনা দু-আনা ভাড়া। এদিকে তখন বাজারদরের সামান্য নমুনা :

চাল	টাকায় কুড়ি সের
মজুর প্রতি	রোজ শুখা দুপয়সা।
তাঁতের গামছা	দুই থেকে তিন পয়সা
ডিম	আনায় আটটা বা এক আধলা
বেগুন	সিকি পয়সায় একধাড়া বা পাঁচসের
	(গঙ্গার ধারে প্রচুর ফলে) ইত্যাদি ইত্যাদি....

আগের বছর খরা ছিল প্রচণ্ড। সেই খরায় এ তল্লাটে জলাভাবে অনেক মানুষ ও জীবজন্তু মারা পড়েছিল। স্টেশনের ইঁদারাটি অতি প্রসিদ্ধ। এখান থেকে উপকারী জল রেলকর্তাদের জন্যে রেলগাড়ি করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় জংশনে-জংশনে। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরও এখানের জল আনতে লোক পাঠান। বাইশ সনের খরায় রেলপুলিশ রীতিমত বন্দুক হাতে ইঁদারা পাহারা দিত। স্টেশন মাস্টার কলটন সায়েব থাকলে সবাই জল পেয়ে প্রাণে বাঁচত। নতুন মাস্টার অগস্তিবাবু পচ্ছিমে লোক। আত্মাটা পাথর দিয়ে গড়া। পুলিশ বসিয়ে দিলেন একেবারে। হেরু বাউরি স্টেশনে খুব চেনা মানুষ। অগস্তিবাবু বেতো বাবাকে কাঁধে বয়েছিল তবু সে জল পায়নি। হেরু রাগে দুঃখে বুক ফেটে মরার দাখিল হয়েছিল।

তবু সে ডাকাত হয়নি তখনও। ডাকাত হল পরের বছর। সে কি বর্ষা, সে কি বৃষ্টি! জষ্টির মাঝামাঝি থেকে পুরো আষাঢ় পচিয়ে দিল এলাকাটা। আর তার কিছু আগে কখন আচমকা হেরু বাউরি ডাকাত হয়ে গেল। তার মাথার মূল্য সরকারবাহাদুর ঘোষণা করলেন—একশত টাকা।

এবং সে আমলে টাকায় চাল পাক্কিসেরের ওজনে (৮২ তোলা) বিশ সের। হেরু মোটঘাট পেলে একটা সিকিপয়সা রোজগার করত। তাই দিয়ে কুড়ানি ঠাকরানের কাছে দুকাঠা মুড়ি কিনত। একচিলতে সর্ষেতেলও পেত। উঠোনের গাছ থেকে দুটো ধানী লঙ্কা নিলেও ঠাকরান রাগ করত না। রাঙামাটি যেতে যেতে মুড়িগুলো পুরো খেয়ে শেষ করে দিত হেরু। বউ রাঙির জন্যে কি নিয়ে যাবে ভেবে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতো।

তারপর একদৌড়ে চলে যেতে তিনশো ফুট নিচে মজা গঙ্গার ঝিলে। ডুব দিয়ে-দিয়ে লেকাফল তুলত এককোঁচড়। বাউরান লেকাফল পেলে আর কিছু চায় না। গায়ে-ভারি (গর্ভবতী) যোবতী সে—তার পেটে হেরুর বংশধর। ছেলে হলে হেরু তাকে রেললাইনের গাংম্যান করবে। মেয়ে হলে গোকর্ণে বিয়ে দেবে। বাজার জায়গা। সপ্তায় দু-দিন হাট বসে। পেটে যাই থাক, ভালটা মন্দটা দেখেও সুখ আছে।

দুই

একটি প্রাচীন রহস্য

হেরু ছিল জাতে বাউরি। কলটন সায়েবের মাপে ছ'ফুট ছ'ইঞ্চি উঁচু। রেলকোম্পানির তারাজুতে ওজন ছিল পাক্কি দুমন আট সেরের কিছু বেশি। বায়ুমণ্ডল থেকে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য অনেকখানি অক্সিজেন খরচ হত। তার অতিকায় শরীরের জন্যে অনেকটা স্পেস দরকার হত। দুটো বড় বড় হাত হাঁটুঅবধি ঝুলিয়ে যখন সে রাঙামাটির ঝিল থেকে সন্ধেবেলা উঠে আসত, কাচ্চাবাচ্চারা ভয় পেয়ে যেত। ভিনগাঁয়ের লোকেরা গাঁয়ে ফিরে বলত—কর্ণসেনের রাজবাড়িডাঙায় স্বচক্ষে দানো দেখলাম। ঝুঝকি সন্ধেবেলা। যেন পাহাড়ে পুরুষ উদয় হল হঠাৎ। এ্যাদ্দিন কানেই শুনতাম, আজ দেখলাম।

কিন্তু মানুষ হিসেবে এত নরম শান্ত আর হাসিমুখ ছিল না তার মতো। কান টানলেও রাগত না হেরু। দু-চার থাপ্পড় গেরস্থ তাকে অবলীলাক্রমে যখন তখন দিয়েছে। মিষ্টি কথায় তাকে দিয়ে অবিশ্বাস্যরকমের বেগার খাটানো গেছে। তল্লাটে কোথাও বিপাকে গরুমোষের গাড়ির চাকা আটকালে হেরুর ডাক পড়েছে। গোরাংবাবু বলতেন, শালা বাউরিটা জ্যান্ত কপিকল।

একবার হল কি, গোবরহাটির বাবুবাড়ির এক বউঠাকরানকে দিতে আসছিল স্টেশনে—পালকি চাপিয়ে। বাঁকি নদী তো নৌকায় পেরোন গেল, হাউলিখালে পাঁকেকাদায় একবুক জল। জোড়ডোঙাটা কে নিয়ে পালিয়েছে। এখন উপায়? উপায় হেরু বাউরি। তারই স্বজাতি এক বেহারা ছিল দলে। হাউলি পেরিয়ে সে রেললাইন টপকে হন্তদন্ত হাজির হল রাঙামাটি। হেরু এল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু পালকি—তার ধরবে কোথা? একদিক ধরলে অন্যদিক জল ছোঁয়। তখন বাবুমশাই বললেন, বরং পালকি থাক। বাবা হারাধন, (হেরুর আসল নাম নাকি) বউমাকে তুই পার করে দে—খালি হাতপায় এখন স্টেশন যেতে পারলে বাঁচি। ট্রেনের সময় হয়ে এল যে!

হেরু এই গল্পটা বরাবর করেছে। গল্পটা বলার আগে বড় বড় হলুদ দাঁত বের করে খিক খিক খিক খিক প্রচুর হেসেছে। একটু লাজুক দেখিয়েছে তাকে। মাইবি, তুলতুলে গা, একদলা মাখন, (মাখন সে চোখে দেখেছে কি না লোকের সন্দেহ আছে জেনে তখুনি অন্য উপমায় গেছে).... কি বলব, যেন একদলা উলময়দার লেচি, উঃ সে কী বলব গো, টিপলে তরমুজের মতন আঙাপনা (রাঙামতো) রস গড়ায়, কী বলব....খিক খিক খিক খিক....বাবুরা.....মাইরি বাবুরা কী সুখে বাঁচে।

হাসলে মনে হয় শালার গুয়োর ডিমটি ভাঙেনি। ....গোরাং ডাক্তার বলতেন।

পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চল থেকে ব্যাপারিরা গোকর্ণ-আঁরোয়া কাঁচা রাস্তায় ধান চাল খন্দ পাট হরেক পণ্য গরু মোষের গাড়িতে নিয়ে আসে। কোদলার ঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে চলে যায় বেলডাঙার বাজার। বাঁকি নদী পেরনো যদি বা গেল, হাউলিতে এসেই বিপত্তি

বারোমাস। কাদা শুকোয় না সোঁতার। সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। এক মাইল দূরে স্টেশনধার থেকে শোনা যায় গাড়োয়ানদের প্রচণ্ড চেঁচামেচি। হুদ্দে হুদ্দে হুদ্দে.... লে লে লে লে....হেই হা হা হা হা.... ধো ধো ধো ধো.....

বেচারা অবলা জন্তুগুলো চেষ্টার কসুর করে না। হাঁটু দুমড়ে গোঙায়। বড় বড় চোখ ফেটে সাদা পর্দা ঠেলে আসে। চাকায় কাঁধ লাগায় গাড়োয়ান। গতিক বুঝে ব্যাপারিও জামা খুলে মালকোঁচা মেরে নেমে পড়ে পাঁকে। রে রে রে রে... হুদ্দে হুদ্দে হুদ্দে। না, চলে যা রাঙামাটি। হেরুকেই ডেকে আনে।...

এই বিপত্তির সময় অবধারিত সন্ধেবেলা। দিনের রোদ্দুর থেকে বাঁচতে বিকেলে গাড়ি ছেড়েছিল। 'দিন সবরে' হাউলি পেরোতেই হবে, এমনতরো তাগিদও ছিল। তত্রাচ যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।

হ্যাঁ, সত্যিসত্যি বাঘ। গোবরহাটি পাতেণ্ডা থেকে পুবে বাঁকির দিকে নিম্নভূমিতে নালেই দুধারে বিল খাল আর ঘন জঙ্গল। আঁরোয়ার জঙ্গলের নামডাক কম নয়। ১২৭০ সালে জেমো-কান্দির রাজারা এখানে হরিণ মেরেছিলেন। এখন আর হরিণ নেই। কিন্তু বাঘ আছে। হরেক রকম জন্তু আছে। বন্দুক কাঁধে দু-চারজন দিশি-বিলিতি সায়েব আর আমল-ফয়লা সম্বচ্ছর চিরোটি স্টেশনে রেলগাড়ি থেকে নামছেই। কে জানে কী মারতে পারে, বাঘ না খেঁকশিয়ালের ছানা। তবে বাঘ আছেই। হাউলির সোঁতায় পাওট্ পড়ে প্রায়ই। স্টেশন থেকে রাতদুপুরে তার ডাক শোনা যায়। রেললাইনের ধারের জঙ্গলে ডেকে বেড়ায় কখনও সখনও। যে রাতে হেরু প্রথম ডাকাতি করে, ডবকইয়ের ওদিকের ফটকের সামনে একজোড়া বাঘ একটা মালগাড়িকে এক ঘণ্টা আটকে রেখেছিল।

সন্ধেবেলা হেরুর আড্ডা গোরাংবাবুর ডাক্তারখানার বারান্দা। হাউলির ওদিক থেকে চেঁচামেচি ভেসে এলেই গোরাংবাবু বলেন, ওই বেধেছে। হেরু, তৈরি হ বাপ।

হেরু তৈরি। বেশ খানিক রাত হলে গায়ে কাদা মেখে ভূত হয়ে ডাক্তারখানার পিছনের পুকুরটাতে—

গোরাংবাবু সবে খেতে বসেছেন, হঠাৎ প্রচণ্ড ঝপাংঝপ আওয়াজ জলে—শুনেই মেয়ের উদ্দেশে বলেন, অ মা স্বর্ণ, স্বর্ণলতা!

স্বর্ণলতা কুপিহাতে হেঁসেল থেকে বেরিয়ে বলে—কী হল?

—হাঁড়িতে দুচাট্টি আছে রে?

—কেন? ...স্বর্ণ ঝেঁঝে ওঠে। তেজি মেয়ে।...ভাত অত সস্তা নাকি? যাদের গাড়ি ঠেলছে তারা দ্যায়না কেন? দ্যায় না যদি, গাড়ি ঠেলতেই বা যায় কেন? তোমার দত্যি পোষার বড়লোকী সখ দেখে বাঁচিনে!

স্বর্ণ টের পায়। ওরে বাস্ রে! হেরুর গ্রাস দেখলে শরীর শিউরে ওঠে। একসের চালের ভাত না গিললে ওর চলেই না। তাকে খাওয়াতে চায় একআনা ভিজিটের গোরাং ডাক্তার!

ভাবে একআনা ভিজিট—কিন্তু তাই বা কে দ্যায় বাবাকে? একফালি কুমড়ো কী

দুটো বেগুন, নয়ত এককাঠা চাল—তাও রোগ কমতির দিকে যাচ্ছে দেখলে, তবেই। তার অমন দত্যি খাওয়ানোর বাতিক দেখে পিত্তি জ্বলে যায় না?

গোরাংবাবুর কাঁচুমাচু মুখে বলেন—স্বর্ণ, একমুঠো হলেই হবে মা। আজ বড়মুখ করে চাইছিল সন্ধেবেলা, কথাও দিয়ে ফেলেছি। ওই শোন, চান করতে নেমেছে। এক্ষুনি এসে পড়ল বলে। ও মা স্বর্ণলতা!.....

স্বর্ণ চ্যাঁচায়—তার চেয়ে একটা কুকুর পোষ। কাজ দেবে।

হেরু দিব্যি আশা নিয়ে আসছিল। আজ ন'খানা গাড়ি ঠেলে পেয়েছে এককাঠা ধান, আট কাঠা ছোলা, এক ডেলা গুড়—একটা গুড়ের গাড়িও ছিল। লোকে এত ঠকায় ওকে। হেরু কি বোঝে না সেটুকু? বুঝেও কী বলবে! আহা, বড় বিপদে পড়েছে বেচারা—গতর খাটিয়ে এট্টুকুন করলামই বা উব্‌কার।

স্বর্ণ আবার তেড়ে ওঠে—চুপ্ করে থাকো তো। আ তু বলে, ডাকলেই আসবে—আমি লম্ফ নিয়ে খুঁজতে যাব? বাঃ, বেশ বলছ।

গোরাংবাবু কান খাড়া করেই আছেন, হেরু আর আসে না। কতক্ষণ পরে উঠে বাইরে বেরোন। মলোচ্ছাই গেল কোথা লোকটা? বড়মুখ করে বলেছিল—আজ এবেলা একমুঠো খাব ডাক্তারবাবু।

প্লাটফর্মে মিটিমিটি পিদিম জ্বেলেছে। আপ বারহারোয়া প্যাসেঞ্জার আসবার সময় হল। আলোর ঝিলিক পড়েছে লোহার পাতে। চকচক করছে রুপোর মতো। তাকে নিমেষে কালো করে চলে গেল একটা নিঃশব্দ ইঞ্জিনের মতন প্রকাণ্ড লোক। কেন গেল?

রাগে দুঃখে মেয়ের ওপর ফেটে পড়তে চেয়েছে গোরাং ডাক্তার। কিন্তু কী আর করা! মা মরা মেয়ে—তার ওপর বিধবা হল কপাল ভেঙে। জোরজারি করবে বা দু'দশ কথা চটেমটে বলবেই বা আর কাকে—এই বাপটি ছাড়া?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কতক্ষণ অন্ধকার বটতলায় দাঁড়িয়ে থেকেছে গোরাংডাক্তার। ....মানুষ যেখানেই জন্মাক, মানুষ ভগবানের সন্তান। মানুষকে ছোট ভাবতে নেই। হেরুকেও আমি ছোট ভাবিনে। এ পোড়া নিঃঝুম চুপচাপ জায়গায় এসে মানুষকে খুব প্রয়োজনীয় লাগে। সন্ধে থেকে আর রাত কাটে না কিছুতেই। ঘুমের মাথা তো কবে খেয়ে বসে আছি। সারা রাত জেগে কাটানো যে কী অভিশাপ, কে বুঝবে? খাঁ খাঁ শ্মশানে এসে জুটেছি তার ওপর। কথা বলার মানুষ যা পাই, সে দিনেরবেলা। সন্ধে হতে না হতেই নানারকম ভয়ে যে-যার গাঁয়ে চলে যায়। যে যার ঘরে ঢুকে পড়ে। হেরু সেদিক থেকে বড্ড সাহসী মানুষ। দুপুর রাত অবধি গল্পসল্প করে একা লাইন পেরিয়ে রাঙামাটি চলে যায়। কাল কি হেরু আর আসবে?

—ওখানে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে বকবক করছ? ঘরে এস।

স্বর্ণলতা ডাকে—হাতে কুপি। গোরাং ডাক্তার আস্তে আস্তে এসে বাড়ি ঢোকেন। সারা রাত এ লাইনে যত গাড়ি যায়, সবার আওয়াজ শোনেন। হাউলির ব্রিজে উঠলে সে এক মজার বোল বলে রেলগাড়ি—এক ধামা চাল তিনটে পটল, এক ধামা চাল তিনটে পটল।....

রাঙামাটির পথে তখন হেরু বাউরি হাঁটছে অন্ধকারে। শনশন হাওয়া বইছে 'ধুলোউড়ির মাঠে'। ভাতখাওয়ার দুঃখ ভুলে হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে—

কানপাশাখান হারিয়ে এল্যাম
ধুল্যাউড়ির মাঠে
জিয়াগঞ্জর বাজার হতে কিন্যেছিল ভাসুর
(এখন) পাচন পড়বে পিঠে লো....

ঠাকুরবাড়ি ডাঙার ওপর দিয়ে লণ্ঠন হাতে নেমে আসছিল চরণ চৌকিদার। গান শুনে হাঁকে—হেই! কে যায়?

—আমি হেরু হে চৌকিদার কাকা।

—কোত্থেকে আসছিস বাপ? (চরণের গলাটি বড় আদুরে)

টিশিন থেকে, টিশিন!.... হেরু নিজেকে স্টেশনের লোক বলেই মনে করে। এই পরিচয় দিতে তার প্রচুর গর্ব আছে।

জষ্টিমাসের শুরু সবে। গতবারের মতন খরা হলেই হয়েছে! দিনমান হু হু লু হাওয়া বয়। গাছপালা ঝোপঝাড় পাংশুটে মেরে গেছে। ডাঙায়-ডাঙায় দু'চার ছোপ যা ঘাস ছিল, শুকিয়ে খয়েরি হয়ে পড়েছে। গেরস্থরা ধানের মরাইতে তালা সেঁটে দিয়েছে। চোর ডাকাতের বড্ড ভয় এখন। গাঁয়ের যুবকদের দল বেঁধে রাতপাহারায় লাগিয়েছে। ওরা বাতদুপুর অবধি গাঁয়ের চটানে শক্ত লাল মাটিতে খেলাধুলোয় মেতে গেছে।.....

...ছাগলা রে ভাই পাগলা তোর ছাগল কোথা চরে?

...ডিঙডিঙে লগরে।

...খায় কী?

...লতাপাতা।

...হাগে কী?

...বকছ্যারানি।

...মোতে কী?

...কলুর ঘানি।

হেরু শুনতে শুনতে গাঁয়ে ঢোকে। যুবতীবউ রাঙী বাউরান হাপিত্যেস করছে। গায়েভারি মেয়ে। আজ বাদে কাল বিয়োবে। আঁরোয়ার জঙ্গলে একটা শুকনো কুলগাছ দেখে এসেছে হেরু। পালিতবাবুকে বলেকয়ে কাঠ কেটে আনবে। কুলকাঠের আঙারে (অঙ্গার) পোয়াতির গা'গতর না সেঁকলে রস শুকোবে না। হেরু তা জানে...

আঁরিয়ার পালিতবাবু বলতেন—নাজানার ভান করে থাকে ব্যাটা বাউরি। ভেতরে-ভেতরে সব জানে, সব বোঝে নিমুন্‌মুখো ষষ্টিটি।

হেরু খিক খিক করে হাসত।

—দোব শালার ঘাড়ে দু'চার রদ্দা, মুড়োটা মাটিতে ছেঁচড়ে। আবার হাসে দ্যাখো।

—বাবুমশায়, আমি তো দোষ করি নাই।

—ভাগ্ শালা, ভাগ্ হিঁয়াসে।

হঠাৎ পালিতবাবু কেন খেপে যান ওর ওপর, হেরু বুঝতে কি পারে না? পারে। একদিন গোরাং ডাক্তার গাঁওয়ালে গেছে টাট্টু চেপে, বাড়িতে স্বর্ণ একা চালের ক্ষুদ বাছছে। যদুপুরের মোতি ডোমনী একটু আগে পাঁচকথা গল্পসল্প করে যেই বেরিয়েছে, খিড়কির পুকুরঘাট থেকে পালিতবাবু রাবণরাজার মতো হুমহাম করে এসে বললেন—সতী, ভিক্ষাং দেহি।

স্বর্ণ বিধবা যুবতী। একটু-আধটু প্রশ্রয় দিয়ে থাকবে কখনও। ওতেই নাই পেয়ে পালিতবাবুর মাথায় অগ্নি চড়ে বসেছিল।

ছাঁচতলায় শেয়ালে মুরগি ধরার মত জাপটাজাপটি ধস্তাধস্তি হচ্ছিল। আর এক পা গেলেই ঘর, হঠাৎ হেরু এসে হেঁড়ে গলায় হাঁকে—ডাকতোরবাবু, ডাকতোরবাবু! সায়েব এসেছে—হন্টরসায়েব!

হেরুর পিছনে রেলের হান্টারসায়েব গোরাংবাবুর সঙ্গে দুপুরবেলা দেখা করতে এসেছেন। ট্রলিটা লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্রলির ওপর রঙিন মস্ত ছাতা। আবদুল, তেনু, ইত্যাদিরা বটতলায় এসে জিরোচ্ছে। এবারও খরা হলে কী কী ঘটবে তাই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। সওয়ারি এনেছিল একটা গরুর গাড়ি। দুপুরের ট্রেনে কাটোয়া যাবে কোন নাদুসনুদুস বাবু—সঙ্গে বউ। এসব ছাড়া বিলকুল ফাঁকা থমথম করছে আশপাশটা। এদিকে হান্টারসায়েবের পরনে খাকি হাফপ্যান্ট, গায়ে শাদা হাফশার্ট, মাথায় শোলার টুপি। টুপিটি বগলদাবা। টাক চুঁইয়ে ঘাম পড়ছে। মুখটা লাল গনগনে হয়ে গেছে রোদে। হেরু ডাকতে ডাকতে বাড়ি ঢুকে পড়ল—দরজাটা খোলাই ছিল।

হেরু শুধু বলেছে, ইটার মানে কী গো পালিতবাবু? আর পালিতবাবু মসমস করে খিড়কি দিয়ে চলে গেলেন। খানিকবাদে কোত্থেকে বন্দুকের আওয়াজ হল—ফটাং ভট্! পরে জানা গেছে দোতলার ছাদ থেকে উড়ন্ত পাখি তাক করে বন্দুক গেদেছিলেন পালিতবাবু। মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল।

সেই দুপুরে স্বর্ণ ঘরের ভিতর মেঝেয় উপুড় হয়ে একবেলা হু হু করে কেঁদেছিল। হেরু দেখেছিল, গোরাংবাবুর বিধবা মেয়ের এই কান্নাকাটির ফলে তার একফুট খাপি আর ছ'ফুট ছ'ইঞ্চি লম্বা শরীরটা কেমন যেন করছে। লম্বা ভাড়ুলেড়ালের মতো বাহুদুটো কেবলই চমকে উঠছে আর শক্ত হয়ে যাচ্ছে। কী করবি হেরু, তুই কি করবি? পালিতবাবুর মুণ্ডুটা মুচড়ে নোনা আতার মতো ছিঁড়ে কামড়ে খাবি?

হেরু কারো গায়ে সেদিন অবধি হাত তোলেনি। আর পালিতবাবু রাজাউজির মানুষ। একখানা গাদাবন্দুক আছে তাঁর। তিনজোড়া হালবলদ আছে। চৌদ্দটা ধানের মড়াই আছে। হেরু সেদিন নিজের রাগে নিজেই ছটফট করে রাঙামাটির ঝিলে সিঙাড়া তুলতে চলে গেল। সারাক্ষণ একগলা প্রাচীন জলে (যে-জলের পূর্বপুরুষ তেবশো বছর আগে বুকে নিয়েছিল মহানাবিক বুদ্ধ গুপ্তের নৌকো, পেয়েছিল চীনা যাজক হিউয়েন সাঙের দুটো অমল হাতের ময়লা কিংবা আরও আগে লঙ্কার রাক্ষসরাজা বিভীষণ বৃষকেতুর অন্নপ্রাশনে

এসে বজরা থেকে হাত বাড়িয়ে আচমন করেছিলেন : গোরাং ডাক্তার বর্ণিত ভাষ্য) হেরু নিজের তাপ শীতল করে মনে মনে বলেছিল—তুই শালা অধম মনিষ্যি। ছোটজাতে তোর জম্মো। তোর এত রাগতাপ ক্যানে রে? ওরে বাউরির ব্যাটা বাউরি, বামন হয়ে তোর চাঁদ ধরার দুরাশা! ধিক তোকে, শত ধিক্।

হেরু দেখে, সে কাঁদছে। স্বর্ণলতা তাকে একসন্ধ্যা একমুঠো ভাত দিতে বাপের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছিল, সেদিন সে দুঃখ পেয়েছিল—চোখ ফেটে জল আসেনি। আজ আসছে কেন? শালা বাউরি, তুই কাঁদছিস কেন? হল কী তোর?

বিশাল আদিগন্ত ঝিলে কত লোক এখন সিঙাড়া তুলছে। গরিবগুরবো পাঁচগাঁয়ের পুরুষলোক এবং স্ত্রীলোক। এসেছে তপা বাগদিরা বাপব্যাটায়। এসেছে চরণচৌকিদারের মেয়ে বিন্নি। এসেছে ঘনা লখা মরা সরা চারভাই বাউরিকুলের। আর এসেছে ডাবকইয়ের ইয়াকুব তান্ত্রিক।

ইয়াকুব শবসাধক। কোদলার ঘাট থেকে মড়া তুলে নিয়ে গিয়ে তার বুকে চড়ে সাধনা করে। তার ঘরে অনেক মড়ার মাথা আছে। লুকিয়ে কালীপুজো করে এই মোছলমানটা। ওর সর্বনাশ হবে। (গোরাংবাবুর ভাষ্য) ইয়াকুব ডুবে-ডুবে কী হাতড়াচ্ছে। ভুস করে মাথা তুলছে আর সাদা হাতের তালুতে খানিক লাল সুরকিমেশা মাটি পরখ করছে। ছুঁড়ে ফেলছে। চরণ চৌকিদারের মেয়ে বলল—আ মর! চোখে পড়বে যে! চোখের মাথা খেয়েছে—দেখতে পায় না?

ইয়াকুব বলে—বিন্নিদিদি নাকি? কবে আসা হল মধুপুর থেকে?

বিন্নির চুল থেকে জলের ফোঁটা ঝরছে। সে চোখ বাঁচাতে মুখ ফিরিয়ে জল ঝেড়ে বলে—এবেলা। তা এত খবরে কাজ কী লোকের?

লখা বাউরি বলে—মধুপুরে খালবিল কোথা হে ওস্তাদচাচা? খটখটে মাটি। রসকষ নাই।

ওস্তাদ শুনে ইয়াকুব গর্বিত। মুখ উঁচু করে হঠাৎ যেন তন্ত্রচালনা করে সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে! তারপর বাঁয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলে—হেরু নাকি রে?

হঠাৎ অমনি মুখ বাউরিসন্তানের মাথায় চকিত লোভের ঝিলিক—যেন কেয়াঝাড়ের ওপর সড়সড় করে লাউডগা সাপ চলে গেল। যাবে নাকি একদিন তান্ত্রিকের বাড়ি? সব হয় আর এটা হবে না কেন? লোহার পাতের ওপর 'পেচণ্ড রাওয়াজ' করে কী বিষম ভয়ঙ্কর চলে যায়। মনিষ্যি সব পারে—এটা কি পারে না? তাই বলি, মনা রে মনা! শান্ত হো, ছোস্থ হো। হেরু হাসে। বড় বড় হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়ে। বলে—একদিন যাব ওস্তাদ, একদিন যাব। 'পেয়োজন' আছে।

—যাস্। বলে মাণিকসন্ধানী ইয়াকুব ওস্তাদ আবার ডুব দেয়।

এর কয়েকদিন পরে হেরু সকালবেলা স্টেশনে এসেছে। স্টেশনের বারান্দায় খোলামেলায় সিগনালের হাতল। আপের দুখানা, ডাউনের দুখানা। খালাসিটা রোগা লিকলিকে মানুষ। নতুন এসেছে। রগ ফুলে যায় হাতল নামাতে। কাছাকাছি সব মিটিমিটি

চেয়ে দ্যাখে হেরু। পাখা না কাত হলে গাড়ি কেন আসবে না—সে বুঝতেই পারে না। কিন্তু লোকটার কষ্ট দেখে ভাবে, একবার আমাকে দিলেই পারে। পাংখার কত্তাবাবাকে সুদ্ধ নামিয়ে দেবে।......

অল্পস্বল্প যাত্রী এসেছে এ-গাঁ, ও-গাঁ, সে-গাঁ থেকে। কোদলার ঘটকঠাকুর, ডাবকইয়ের সেরাজুল হাজি, পাতেণ্ডার মকরম শেখ, জিনপাড়া-কাতপুকুরের মুকুন্দ দফাদার আর গোবরহাটির নায়েব মশাই। সবাই যাবে আপে খাগড়াঘাটরোড—পরের স্টেশনে। সেখানে থেকে এক মাইল হেঁটে রাধার ঘাটে তেওয়ারিজির নৌকো পেরিয়ে সদর শহর বহরমপুর।

আপ আজিমগঞ্জ লোকাল হাওড়া ছেড়েছিল রাত দুপুরে, চিরোটি পৌঁছল সকালবেলা। গাড়ি দাঁড়ানোর আগেই মস্তো কাপড়ের গাঁট দরজা গলিয়ে ফেলে দিয়েছে গোকর্ণের দাসজীবাবু। চেঁচিয়ে উঠেছে, হেরু, হেরু!

দাসজীবাবু জানে, হেরুর স্টেশনে থাকা সুনিশ্চিত। গোরাংবাবুর ডাক্তারখানার সামনে বটতলায় গরুর গাড়ি রাখবে লায়েব শেখ—এইমতো কথা ছিল। প্লাটফর্ম থেকে এই ত্রিশগজ দূরত্ব ডিঙোতে হেরুকে চাই-ই। নয় তো আঁরোয়া টুঁড়ে একদল শক্তসমর্থ মানুষ যোগাড় করে আনতে হয়।

হেরু এসে যায় হন্তদন্ত। একবার দাসজীবাবু, একবার কাপড়ের গাঁটে চোখ বুলোয়।

—কী বাবা? কেমন আছ? ভালো তো? বাড়িতে সব কুশল তো?.... দাসজীবাবু খাঁটি বৈষ্ণব। কি মিঠে কথা। শুনতে হেরুর কান জুড়িয়ে যায়। একবার একটা প্রকাণ্ড কালো রহস্যময় বাকসো মাথায় করে ওঁর পিছন পিছন হেঁটে পাঁচমাইল দূরে গোকর্ণ বাজারে পৌঁছে দিয়েছিল হেরু। আঃ কত খাওয়া, কত! দোকানের বারান্দায় এক হাঁটু বিছিয়ে এক হাঁটু তুলে বাঁহাত মাটিতে ভর রেখে হেরু খাচ্ছে। চারটে পদ্মপাতার ওপর দু'সেরটাক ভিজে চিঁড়ে, আধ সের গুড়, কয়েক থড়ি পাকা কলা। চৌকাঠে বসে দাসজি অনবরত বলছে—লজ্জা করো না বাবা, খাও খাও। আর দেব?

ভিড় জমিয়ে রাস্তার লোকেরা খাওয়া দেখছে। চৌধুরীবাবু জমিদারদের বাতিক আছে, ফি আষাঢ়ে চটানে মালামোর আয়োজন কবেন। সে-মালামো বড় সাংঘাতিক। জানশুদ্ধ মরে যাওয়ার ব্যাপার গড়ায়। কে খবর দিয়েছিল, তাই চৌধুরীদের পাইক এসে গা টিপে দেখে যায়। বলে যায়—যাবার সময় দেখা করে যেও কাছারিবাড়িতে।

হেরু যায়নি। তাই একটু ভয় হচ্ছে—এই যা! কিন্তু বত্রিশ নাড়ী চনমন করে উঠেছে দাসজীকে দেখামাত্র। আহা কত খাওয়া, কত!

—নে বাবা। এট্টুকুন কষ্ট কর।

হেরু কাত হয়ে কাঁধ লাগিয়ে অস্ফুট আওয়াজ করে—অঁক! কী আশ্চর্য কথা, গাঁটটা কি পাহাড়, না পর্বত? বারকতক অঁক্ করেও তিলমাত্র ওঠবার লক্ষণ নেই দেখে সে ফোঁস ফোঁস করে দাঁড়িয়ে। টেরচা পায়ের দিকে তাকিয়ে বলে—দড় লাগছে। রোজন?

—ওজন আর কত হবে! ...দাসজীবাবু হাসে।.... দেখলি নে—আমি এক ধাক্কায়

গড়িয়ে ফেললাম একেবারে? নে—আবার চেষ্টা কর। তুই না পারলে কে পারবে বাছা? ততক্ষণ আমি বটতলায় যাই। লায়েবকে দেখি।....

হেরু তবু বলে—রোজন? রোজনটা বলে যান।

এ কী কাণ্ড! হেরু তো এমন করে না কোনদিন! দাসজী এসে পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন—সামান্য, অতি সামান্য। মোটে পাক্কি একমন বাইশ সের। এই দ্যাখ্ না—রেলের রসিদ রয়েছে।

হেরু পড়তে জানে না। রসিদটা দেখেই কিন্তু বিশ্বাস হয়ে যায় তার। ওরে বাবা, এল-কোম্পানির ছাপা হরপে সই-সীলমোহর দেগে দিয়েছে—এ কী মিথ্যেমিথ্যি? পুনশ্চ একটা প্রচণ্ড আঁকে সে ঠেলতে ঠেলতে বেড়ার গায়ে নিয়ে ঠেলে ধরে গাঁটটা। এখানে লোক কোথায় যে মাথায় তুলে দেবে? লোক ডাকতে হলে হেরুর আবার আঁতে ঘা লাগে।

দাসজীবাবু অবাক। যারা সেখানে ছিল অবাক। মাথায় গাঁট তুলে টলতে টলতে লাইন ডিঙিয়ে চলেছে হেরু। দাসজী দৌড়য়। বটতলায় গিয়ে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। কোথায় লায়েব শেখের গাড়ি? বটতলা ফাঁকা সুমসাম। সবে বটফল পাকতে লেগেছে। টুকটুকে লাল ফল—ভিতরটা হলুদ, পড়ে আছে খটখটে মাটিতে। অনবরত পড়ছে টুপটাপ। শালিক কাক করকটা পাখি ডালে ডালে কলকলিয়ে বেড়াচ্ছে। ঠুকঠুক ঠোকরাচ্ছে। দাসজীমশায়ের টাকে পাখির গু পড়ল। টের পেল না দেখে হেরু মুচকি হেসে ফেলে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? দাসজী হাঁ হাঁ করে আসে, লক্ষি বাবা, লক্ষি সোনা, যাদু আমার। মোটে তো একমণ বাইশসের ওজন—তোর কাছে আবার ওজন? তুই কলির মহাবীর—(হনুমান বলে না সে) কত গন্ধমাদন তুললি! এতো নস্যি। ওরে, আমার ঠাকুর মাথায় গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন, তা জানিস? তোর দেহেও—ফেলিস নে বাবা। আড়াই ক্রোশ পথ মোটে। চানটান করে খাবি। হ্যাঁ—সেদিনের চেয়ে ডবল খাবি।

হেরু তাকায়।

—পেটভরে খাবি। যা মন চায়, বলবি—পাতে দেব। আয় বাপ, হাঁটন দিই বাপব্যাটায়। তুই আমার পূর্বজন্মের ছেলে রে!

তাই শুনে হেরু অনায়াসে হাউলি সোঁতার পাঁক ঠেলে পার হয়। বাঁকি নদী খড়ি-খড়ি বালুচর। গোরবহাটির কাছে ফের চড়াই। মাথা কেন ঝিমঝিম করছে, হেরু বুঝতে পারে না। যত হাঁটে, মা বসুমতী যেন স্থির মানে না।

—দাসজীমশাই! সে ডাকে।—ভুঁইকম্প হচ্ছে নাকি গো?

—না তো? না তো!

—আমার কেমন-কেমন লাগে। চোখে অন্ধকার, পা টলে গো!

—অমন হয় বাবা, অমন হয়।

—দাসজীমশাই, ইটার রোজন কত বললেন?

—একমণ বাইশ সের রে বাবা, এক মণ বাইশ সের! এককথা বার বার বললে মুখ পচে যায়।

—দুমণ মাল আমি টেনেছি দাদাজীমশাই! কিন্তুক এমন লাগে ক্যানে?

—তোর পেট যে খালি, তাই। রেতে কী খেয়েছিলি?

—একমুঠো ছোলা আর গুড়।

—সকালে?

—কিছু না মশাই, কিছু না।.... হেরু হাঁপায়। পেটে বত্রিশ নাড়ি পাক খায়। সব রোদ মুছে অন্ধকার নামে জিনপাড়ার মাঠে। মনা রে মনা, শান্ত হো! ওই দেখা যায় গোকর্ণের রেশমকুঠির 'বানুক'—আকাশে মাথা তুলে আছে। ওই দীঘির পাড়ে হাটতলা। চৈত্র মাসে শ্যামচাঁদের মেলা বসেছিল। রাঙীর পেটে যেন মেয়ে হয় হে ভগবান! গোকর্ণে তার বিয়ে দেব। ভালটা মন্দটা কতরকম দেখবে। বাজার জায়গা।....

সেইদিনই রাতে আঁরোয়ায় একটা সাংঘাতিক ডাকাতি হল। দোতলায় পালিতবাবুর বউ সবে নিচে থেকে খেয়ে গিয়ে পানের বাটা হাতে পা ছড়িয়ে বসেছে। চৌকাঠে হেলান দিয়ে বারান্দায় বসেছে সে। সামনে কুপি জ্বলছে। কুপির ধুঁয়োর গতি সবসময় মানুষের নাকের দিকে—তাই পালিতগিন্নি মুখটা একপাশে কাত করে নাক কুঁচকে পানের বোঁটা ছাড়াচ্ছে। বারান্দাটা ছাদ বরাবর লোহার সিকে ঘেরা—চিড়িয়াখানার বাঘসিংহের খাঁচা যেমন। বারান্দার একদিকে তক্তাপোষ, অন্যদিকে বাড়তি খন্দ রাখবার জন্যে মাটির কুঠি। দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর আলমারিতে থাকে থাকে কাঁসার বাসনপত্তর চকচক করতে দেখা যাচ্ছে। লোহারামটা কোণে অন্ধকারে রয়েছে। পালিতবাবু বন্দুকটা তক্তপোষে বিছানায় রেখে বউর দিকে কাত হয়ে তাকিয়ে শুয়ে আছে। সিঁড়ির মুখের দরজা তখনও বন্ধ করা হয়নি। পালিতগিন্নি পান সেজে মুখে ভরে রাতের মতো একবার 'জল সারতে' নিচে যাবে, তাই।

রাত দশটায় মেলগাড়ি গেল। নিচের দুই ঘরে দুই ছেলে বউ নিয়ে খিল কপাটে এঁটে ফেলেছে। এত গরমেও ভিতরে শুতে হয়। জঙ্গুলে জায়গা। চোর-ডাকাতেরও ভয় আছে। উঠানে ধানের মড়াইগুলোর পাশে ভীম রাজবংশী বল্লম-পাশে নিয়ে খাটিয়া পেতে শুয়েছে। গাঁজাখোর মানুষ। বাইরে খামারবাড়িতে মুনিশ-মাহিন্দার চাকর সবাই উঠোনে তালাই পেতে রূপকথা শুনছে। গানের সময় হলে সবাই মিলে চড়া সুরে ধুয়ো গাইছে :

একো মাস, দুয়ো মাসো রে তিনো মাসো যায়
দন্তে না কাটেরে ঘাসো কী হবে উপায়.....

ভিতরবাড়ির উঠোনে ভীম রাজবংশীর গলায় অজগর সাপ—সে ধড়ফড় করে কাঠ হয়ে গেছে কয়েকদণ্ডেই। বিশাল কালো ছায়া পালিতের ঘরের ওপর দোলে। দুলতে দুলতে সিঁড়ির ভিতর দিয়ে ওপরের বারান্দায় যায়। পালিতবাবু ভীমের মতোই স্থির হয়। পালিতগিন্নি চেঁচিয়ে উঠেছিল।

পালিতগিন্নির মাথাটা শক্ত দেয়ালে ঠুকে নারকোল-ভাঙা করেছে। দেয়াল মেঝে সবখানে ঘিলু আর চাপ চাপ রক্ত। বাকি দুটো লাসে রক্ত নেই। জিভ বেরিয়ে গেছে। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে।

পালিতগিন্নির চেঁচিয়ে ওঠাটা শুনেছিল নিচের ঘর থেকে ছোট ছেলের বউ। সবে খোকা হয়েছে। খোকাটার পেচ্ছাবের কাঁথা বদলাচ্ছিল সে।

কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না নামটা। কানের ভুল। হেরু বাউরির মতো লোক এই কর্ম করবে, এ কি না জলে শিলা ভাসার ব্যাপার! পুলিশের ভয়ে লোকটা দেশ ছেড়েই পালিয়েছে হয়তো। গোরাংবাবু বলেন—এ একটা রহস্য। রাঙী বাউরান কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল পরে। সে বলেছে, গোকরণের দাসজীমশাই ভুলিয়ে-ভালিয়ে একমণ বাইশ সের বোঝা বইয়ে নিলে—তার বিচার নাই? মরদটা ঘরে ফিরে সেই যে উপুড় হয়ে শুল তো শুলই। কথাটি নাই, বাত্তাটি নাই। শুধু চুপচাপ শুয়ে রইল—তো কাছে গিয়ে দেখি, চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা নেমেছে। অ মিনসে, তোমার হল কী? কী দুখ বাজল বুকে অবেলায় গো? তখন—তখন বললে কী জানেন ডাক্তারবাবু? আঙী রে, আঙী! মনিষ্যি কী বলদিকিনি?....ক্যানে, ক্যানে—ইকথাটো ক্যানে গো বাউরির পো? চোখে ধারা নিয়ে পুরুষ বললে, দাসজীমশায় একমণ বাইশসের বলে আড়াই মণ বোঝা বওয়ালে! খাবার সময় কান করে শুনি—ভিতরে বলাবলি আর হাসাহাসি করছে, ব্যাটা বাউরিকে একমন বাইশ সের বলে আড়াই মন বইয়েছি। ঠিকঠাক ওজনটা শুনলে ওর বাপের সাধ্যি ছিল না এ মাল মাথায় বইতে পারে। শুনে সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীল লীলবন্ন হয়ে গেল। চোখে আন্ধার দেখলাম। আ-ড়া-ই-মো-ন! ছাতি ফেটে গেছে না, ফাটেনি? আমার সন্দ হল! আমি কী আর বেঁচে আছি? মনা রে মনা! আমি, না আমার ছেঁয়া বসে ভুজুন করছি? আমি কি প্রিকিতই সেই হেরু বাউরি—কেরু বাউরির ব্যাটা? তা আঙী, কথাটি বুঝে দ্যাখদিকিনি। হুঁ, বুঝে দ্যাখ্। না-জানাতে সাপের বিষ হজম হয়। কিন্তু আমার তো হল না। আমি কী করব রে আঙী কী করব? আমার যে অক্ত টগবগ করে ফুটছে। ইচ্ছে কচ্ছে পিথিমীটা দিই শালা ইদিক-উদিক করে! উঃ মনিষ্যি কী, কী শালা এই দুপেয়ে জীব! ডাক্তোরবাবু, মরদটাকে বাগ মানাতে পারিনে। সে কী ভুঁইকম্প, সে কী হুলুস্থুলু কাণ্ড! এ ঝড় কোত্থেকে আনলে বাউরির ছেলে—এ তো দেখি নাই ডাক্তোরবাবু, এ তো দেখি নাই!

তারপর রাঙী সবার সামনে মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগল।—এলকোম্পানি টিশিন না দিলে ও মোট বইতে যেত না। মোট বইতে না গেলে ডাকাতও হত না। টিশিন দিলে ক্যানে? বিচার করো সবাই—ক্যানে টিশিন দিলে এখানটায়, টিশিন?

হেরু যাও বাঁচত, আর বাঁচার উপায় থাকে না। গোরাংবাবু মাথা দুলিয়ে শুধু বললেন—হু, ইহাই একটি রহস্য। বড়ই প্রাচীন রহস্য। হেরু ডাকাত হল কেন? কেন হেরু ডাকাত হল আচমকা? যদি বা হল, দাসজীকে বাদ দিয়ে পয়লা খেপেই পালিতকে নিয়ে পড়ল কেন?

টগরগাছে জল দিতে-দিতে স্বর্ণলতা কান করে কথাগুলো শুনছিল। হঠাৎ তার বুকটা কেন ছ্যাঁৎ করে ওঠে। দুটো জাং ভারি লাগে আচমকা। কিছু কথা মনে পড়ে যায়।

তিন

জুহা মৌলবীর কড়চা

জুহা মৌলবীর বাড়ি স্টেশন থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে গোকর্ণের পাশের গ্রাম চাটরা। মাথায় ফুট পাঁচেক উঁচু, বেশ নাদুসনুদুস সুডৌল চেহারা। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের রঙটি ফরসা। অনবরত পানজর্দা খাওয়ার অভ্যেস আছে। মুখের প্রসন্নতায় আত্মসুখী ভাব আছে। ঈষৎ মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখটি স্বভাবত মাকুন্দে। অল্পকিছু নীলচে 'চুরুকদাড়ি' চিবুকে ঝুলছে, গোঁফের চিহ্নমাত্র নেই। তিনি 'ফরাজী' (গোঁড়া পিউরিটান) সম্প্রদায়ের মুসলমান এবং ধর্মগুরু। এঁরা পৃথিবীর সবখানেই সংখ্যালঘু। সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছেন 'হানাফী' সম্প্রদায়ের মুসলমানরা। তাই হানাফীরা বলেন, 'জুহা মৌলবী গোঁফ ক্ষুরে কামান না -ধান দিয়ে একটা করে টেনে উপড়ে ফেলেন। ক্ষুর ব্যবহার না করার কারণ, ক্ষুর অপবিত্র কেশও কাটে কিনা! এবং ফরাজীরা তাই ক্ষুরকেও অপবিত্র বা 'না-পাক' মনে করেন। ওঁরা হেঁদুর বোষ্টম—শুচিঅশুচির বড্ড ভয়। দেখে রাস্তা হাঁটেন।'

এই শুনলে কার না রাগ হয়! ফরাজীকুলগুরু জুহা সাহেব জোব্বার আস্তিন গুটিয়ে ক্ষেপে-তেতে বলেন, 'হানাফীরা জাহান্নামী—নারকী। ওরা হারামখোর অর্থাৎ নিষিদ্ধাচারী। ওরা গানবাজনা করে বা শোনে। ওরা বিড়ি তামাক খায়। ওরা কাছা দিয়ে কাপড় পরে। ওরা মেয়েদের পর্দায় রাখে না। ওরা 'মহরম' উৎসবে তাজিয়া গড়ে—লাঠি খেলে—মাতমজারি (বিলাপ) করে—অবিকল হিঁদুদের পুজোর শোভাযাত্রা যেমন। তাছাড়া ওরা নমাজের সময় নাভির ওপরে দুহাতে জোড় না বেঁধে তলপেটের নিচে বাঁধে। নমাজে ওরা সুরা বা শ্লোকপাঠের শেষে 'আমিন' শব্দটা মনেমনে বলে—পুরো শ্লোকের চেয়ে আরও সশব্দে নয়।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

জুহা মৌলবী খবরের কাগজ পড়েন। অনেকগুলো সাহিত্যের কাগজের গ্রাহক তিনি। প্রায় সবগুলোই কলকাতার মুসলিম সম্পাদিত পত্রপত্রিকা। 'আল এসলাম', 'নওরোজ,' 'বুলবুল', 'গুলিস্তা', 'সওগাত', এবং বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ ফরাজী মৌলানা আক্রাম খাঁয়ের 'মোহাম্মদী'। গোরাংবাবু 'প্রবাসী' রাখেন। কথায় কথায় একদিন বলে ফেলেছিলেন, প্রবাসীর রামানন্দ চাটুয্যে তোমাদের মৌলানা আক্রাম খাঁকে কী বলেছেন জানো? আক্রমণ খাঁ!'

এই শুনে জুহা মৌলবী তাঁর প্রাণপ্রতিম বন্ধু গোরাংবাবুর বাড়ি আসা ছেড়েই দিয়েছিলেন কিছুদিন। তখন গোরাংবাবুরই ভীষণ দুঃখ হয়েছিল।.... 'বুঝলি মা স্বর্ণ, মৌলুবী নির্ঘাৎ রেগেছে। ব্যাটা নেড়ের রাগ, সহজে পড়বে না। হুই, হুই, দ্যাখ্ স্বর্ণ', হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছিলেন গোরাংবাবু। স্টেশনে একটা গাড়ি ছেড়ে গেল সবে। জুহা মৌলবী 'সফর' শেষে বাড়ি ফিরলেন ওই গাড়িতে। কাঁহা কাঁহা মুল্লুক সেই বর্ধমান হাওড়া মেদিনীপুর অবধি ঘুরে বেড়ান উনি! শিষ্য বা পরিচিত অনুগতজন থাক বা নাই থাক, ওঁকে ঘুরতে হয় এই রকম সফরে। কু-লোকে বলে, নিছক পেটের ধান্দা ছাড়া কিছু নয়।

উনি বলেন—খোদার মিশন। মুসলিম গাঁয়ে গিয়ে সটান মসজিদে উঠতে হয়। তারপর...

সেকথা পরে। সেদিন জুহা মৌলবী আড়চোখে গোরাংবাবুর ডাক্তারখানার দিকে তাকাতে তাকাতে বটতলা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর মনেও দুঃখ প্রচুর। হঠাৎ দৌড়ে এসেছে ডাক্তারবাবুর বিধবা মেয়ে স্বর্ণলতা। 'চাচা, মৌলুবীচাচা!'

জুহা মৌলবী দাঁড়িয়ে গেছেন। সাদা গোলটুপির ওপর জড়ানো সাদা পাগড়ি, সাদা জোব্বা পিরহান, গোড়ালির ওপর অবধি কাবুলী পাজামা, কাঁধে দেওবন্ধ শরিফের (উত্তরপ্রদেশের সেরা মাদ্রাসা) সাংস্কৃতিক প্রতীকস্বরূপ সোনালি ডোরাকাটা বিশাল গামছা (অর্থাৎ যেমন শান্তিনিকেতনী চাদর), কাঁধে একটা ঝোলা। জুহা মৌলবীর পাগড়িতে পাকা বটফল পড়ছে। চোখ পিটপিট করছে। যেন এইমাত্র চোখে ছানি পড়ে গেল।....'কে, কে বাছা?'

স্বর্ণ মিটিমিটি হাসে। ....'আমি স্বর্ণ, চাচা। আসুন, বাবা ডাকছে।'

জুহা মৌলবী ফ্যাঁচ করে নাক ঝেড়ে বলে, 'অ—তাই বটে। মা স্বর্ণলতা। তা আমি যাই বেটি। কদ্দিন ঘরছাড়া। আমাকে যেতে দে রে আজ।'

স্বর্ণ পথ রোখে। ....উঁহু। মোটেও না। আমি বুঝি আপনার মেয়ে না? 'সফর' থেকে কত কী আনলেন—আমি বুঝি ভাগ পাব না?'

কে জানে, কেন, জুহা মৌলবীর চোখে জল চিকচিক করে। একবার ডাক্তারখানার বারান্দায় চেয়ারে আসীন গোরাংবাবুকে দেখে নেন। একটু ইতস্তত করেন। শালা হেঁদুটা....মনে মনে বলেন। ....শালা আমাদের শ্রেষ্ঠ ফরাজী মৌলানা আক্রাম খাঁকে আক্রমণ খাঁ বলেছিল। বাড় হয়েছে শালার। আর ক'দিন বাদে তো যাবে কোদলার ঘাটে—কাঁকড়াপোড়া হবে!

দুরন্ত স্বর্ণ অতর্কিতে ওঁর ব্যাগ ধরে টানে।....'কার ওপর এত রাগ, তা কি বুঝিনে? কিন্তু বাবাও যে ওদিকে দিনরাত্তির জপছেন—নেড়ের রাগ হয়েছে মা স্বর্ণ....'

জুহা মৌলবী আর পারেন না। হা হা হো হো হাসেন।....'ওরে শালা বামুন! রোস—মজা দেখাচ্ছি!'...বলে এক দৌড়ে গোরাংবাবুর সামনে ঝোলা থেকে একটা পত্রিকা বের করে বলেন, 'দ্যাখ, দ্যাখ হে ডাক্তার—কেমন ঠুকেছে তোমাদের রামানন্দ চাটুয্যেকে!'

দুই বন্ধু আবার একত্র হয়। সন্ধেবেলার ভাঙা আসর জমে ওঠে। পত্রপত্রিকার খবর, বৃটিশ সরকারের হালচাল, গান্ধীজি, মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয় নানান প্রসঙ্গ। মৌলানা আক্রাম খাঁকে ঠাট্টা করে কথা বলেছে যারা, তারা এখনও ওঁকে ঠিক বুঝতে পারেনি। আসলে কী জানো ডাক্তার? মৌলানা বাঙালি-মুসলমানদের মধ্যে একটা রেনেশাঁস ঘটাতে চান। ভীষণ কুসংস্কার অন্ধতায় ওরা ভুগছে। মুসলমানরাই ওঁকে গাল দেয় তো অন্যেরা দেবেই। সবার বিশ্বাস হজরত মোহম্মদ সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। মৌলানা লিখলেন—না, ওটা পয়গম্বরের স্বপ্ন। সবাই বলে—হজরত চাঁদকে আঙুলের ইশারায় দু'ভাগ করে দিয়েছিলেন। মৌলানা বললেন, ওটা গল্প। হজরত মোহম্মদের ওপর অলৌকিকতা চাপানো কেন? তাহলে যে তাঁর শক্তিকেই অস্বীকার

করা হয়। আর খোদাতালার রাজ্যে ন্যাচারাল ল বলে কানুন রয়েছে। যা কিছু ঘটে, সেই ল অনুসারেই ঘটে। ওরা বলে, হজরত মোজেস বা মুসা 'আছা' অর্থাৎ লাঠির সাহায্যে সমুদ্র দু'ভাগ করে পালিয়েছিলেন অনুচরসহ। মৌলানা আক্রাম খাঁ সনতারিখ কষে দেখালেন ওই সময় চাঁদের ওই তিথিতে লোহিত সাগরের ওই অংশে ভাঁটা পড়ত এবং হেঁটে পার হওয়া যেত। 'আছা'র প্রকৃত প্রাচীন অর্থ লাঠি নয়—গোষ্ঠী বা মণ্ডলী। পরে যখন ফেরাউন বা ফ্যারাও তাঁদের তাড়া করে এল—তখন জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। ফ্যারাও সদলবলে ডুবে মরল।

গোরাংবাবুর বলেন, 'তা যাই বলো মৌলবী সাহেব—আক্রাম খাঁর 'ছ' আমিও সইতে পারিনে। সাহেবকে ছাহেব বললে হাসি পায় না? তার ওপর বাংলা ভাষাটা গোল্লায় দেবার যোগাড় করেছে। রাজ্যের আরবী-ফার্সী ঢুকিয়ে দিচ্ছে।'

সেই সময় স্বর্ণ এতদঞ্চলে সেকালে দুর্লভ এবং বিস্ময়কর পানীয় চা এনে ধরেছে সামনে। মৌলবী চা দেখে সব ভুলে যান।....'আহা-হা মা, আমার বেটি রে, জানের চেরাগটি আমার!'

চেরাগ শুনে খেতে খেতে গোরাংবাবু বলেন, 'লানটিনটা জ্বেলে দিয়ে যা স্বর্ণ।'

তখনও ওখানে হেরিকেন আসেনি। কাচঢাকা লণ্ঠন—ভিতরে কুপি, তাই লানটিন। স্বর্ণ সেটা রেখে যায় বারান্দায়। জুহা মৌলবী বলেন, 'উঠি ডাক্তারবাবু। আড়াই ক্রোশ রাস্তা ভাঙতে হবে। ক'দিন পরেই আবার আসছি। যাব বর্ধমান। একটা ধর্মসভা আছে। মা স্বর্ণমণি, যাই রে!'

গোরাংবাবু বলেন, 'যেও না। বাঘে ধরবে।'

জুহা মৌলবী হাসেন। বাঘের ভয় থেকেও নেই তাঁর। রাতবিরেতে কতবার স্টেশন থেকে বাড়ি গেছেন। অবশ্যি বর্ষাবাদলা হলে ডাক্তারের এখানেই থেকে যান। এখন তো খটখটে খরা। আর বাঘ! বাঘের ডাক কতবার আশেপাশে শুনেছেন, সামনাসামনি দেখেছেনও। কোন বিপদ হয়নি। একবার দু-দুটো বাঘ তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছিল—রাতটা ছিল জ্যোৎস্নার—সে গল্প স্বর্ণ কতবার শুনেছে। মৌলুবীচাচার কাছে এসব গল্প শোনার চেয়ে আনন্দ আর কিসে আছে তার? জীবনে তো আর কিছু নেই—সামনে খরা চলেছে। বৃষ্টি-বিহীন ধু ধু মাঠ। মাটি পাথর হয়ে গেল দিনে দিনে। কী হবে!

স্বর্ণ বলে, 'না চাচা। যেতে নাই। আরেক ভয় বেড়েছে, এখন। শোনেননি?'

জুহা মৌলবী বলেন, 'আরে! সেই হেরুটা কই? হেরু থাকলে এগিয়ে দিয়ে আসত বরং। জ্যোৎস্না তো সেই মাঝরাত্তিরে ফুটবে। যা অন্ধকার পড়েছে! হেরু কই হে ডাক্তার?'

গোরাংবাবু অমনি গম্ভীর। 'আর হেরু!' বলে চুপ করে কী ভাবেন।

স্বর্ণ একটু হেসে বলে, 'শোনেন নি? হেরু ডাকাত হয়ে গেছে হঠাৎ। এই তো কিছুদিন আগে পালিতবাবুদের সবাইকে খুন করেছে। তারপর ডাবকইয়ের সেরাজুল হাজিকে আধমরা

করে কী সব নিয়েছে। কোদলার ঘটকের বউ গঙ্গায় চান করছিল, গায়ে গয়না ছিল। একা চান করছিল সন্ধেবেলা। লাসটা পরে বেল। সবাই বলেছে, হেরুর কাজ!'

জুহা মৌলবীর মুখটা সাদা হয়ে গেছে ভয়ে—বিস্ময়ে। একমাস প্রায় ঘর ছাড়া। এসব কাণ্ড কিছুই শোনেননি। সঙ্গে কিছু টাকা রয়েছে। বাড়িতে একপাল পুষ্যি দিন গুনছে ওঁর। বুকে ঢেকি পড়তে লাগল। বলেন, 'সর্বনাশ! অত ভালো সরল লোকটা হঠাৎ ডাকাত হল কেন?'

তারপর গোরাংবাবু ইনিয়ে-বিনিয়ে সবটা শোনালেন। শুনে তো জুহা মৌলবী থ। তাহলে রাতটা এখানে কাটানোই ভালো। মেঝেয় দুদিকে দুটো বিছানা পেতে দুই বন্ধু শোবেন। স্বর্ণ চৌকাঠে বসে গল্প শুনবে। হাই তুলবে। তারপর ভিতরঘরে শুতে যাবে। তখন গয়াপ্যাসেঞ্জার বাঁকের মুখে ঘন ঘন শিস দিচ্ছে। হাউলির ব্রিজে বেজে উঠছে : এক ধামা চাল তিনটে পটল। এইসব শুনে মন যে কোথায় চলে যেতে চায় স্বর্ণর—রেলগাড়ি চেপে চলে যায়, আর চলে যায়, সেইদিকে—যেদিকে কেবলই যাওয়া, কেবলই উদাস শিসের শব্দ, চাকায় চাকায় ধ্বনিতরঙ্গ। জুহা মৌলবী কাটোয়ায় একটা পাগলা দেখেছিলেন। সে নাকি বলত—রেলগাড়ির চাকায় কী বলে শোন্ রে শালারা! দোজখ্ থেকে দোজখে...নরক থেকে নরকে, নরক থেকে নরকে.....নরকে নরকে.... নরক থেকে নরকে....।

এইসব সময় গা শিউরে ওঠে স্বর্ণর।

গেলেন না জুহা মৌলবী। রাতের খাবারটা দরজা ভালোমত বন্ধ করে খাওয়া হবে। ফরাজী মুসলমান—তায় ধর্মগুরু; কিন্তু পেটের ব্যাপার, একটু প্রাকটিক্যাল না হলে চলে না। কত দেশ ঘুরতে হয়। সবসময় মেনে চলাও তো যায় না। এই যে উনি ধর্মসভায় (ফরাজীদের) সগর্জনে বলেন, বেনামজী (যে নমাজ পড়ে না), যে, কাফের যে, আর যে ফরাজী নয়—তাদের হাতের পানিও হারাম—নিষিদ্ধ। অথচ সবজায়গায় না খেলে 'সফরে' যাওয়া হয় না। সফরে না গেলে একপাল পুষ্যিসহ উপোস করে মরতে হয়। মজার কথা, এই গোঁড়া ফরাজী জুহা মৌলবী কত অচেনা নতুন জায়গায় হানাফী মুসলমানের সমাজে দিব্যি 'হানাফী' সেজে যান। উপায় কী? তখন নাভির নিচে হাত বেঁধেই নমাজ পড়তে হয়, মনে মনে 'আমিন' বলতে হয়। মেয়েরা তাঁর সামনে হেঁটে গেলেও গর্জে তাড়া করেন না, কিংবা তারা পুরুষের মতন গোড়ালির উঁচুতে কাপড় পরেছে বলে এবং মাটিতে ঠেকিয়ে কাপড় পরার উপদেশসহ ধমকও দেন না। মনে মনে বলেন, খোদা, তোমার অধম বান্দার সামনে এত সব পরীক্ষায় আয়োজন! কিন্তু কী করব? যদি আমি মনে মনে সৎ হই, তোমাতে আর তোমার সৃষ্টিতে বিশ্বাসী হয়ে থাকি, আমার সব গোনাহ্ ক্ষমা কি করবে না? আমার ঘরে কতজন মানুষ হাপিত্যেস করে বসে কাছে ওদিকে। তুমিই তো সবার রুজিদেনেওয়ালা মালিক, প্রভু! আমিন.... আমিন।

শোবার সময় জুহা মৌলবী বলেন, 'এক কাবুলিওয়ালার কাণ্ড! হল কী, হাওড়া জেলার একটা গাঁয়ের রাস্তায় দেখা। আসসালামু আলাইকুম বলে হাতে হাত বাড়াল ব্যাটা। আমিও প্রত্যুত্তর দিলুম—ওয়া আলাইকুম আস্-সালাম! তারপর আমার রীতি

অনুযায়ী শুধোলুম—ভাইসাহাবকা মজহাব? অর্থাৎ সম্প্রদায় কী ভায়ার? বললে—ইমাম আবু হানিফাকা মজহাব—অর্থাৎ হানাফী। হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর আরবে চারজন ইমাম অর্থাৎ ধর্মগুরু মুসলমানদের মধ্যে চারটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। ইমাম আবু হানিফার সম্প্রদায়ের নাম হানাফী; ইমাম মালেকের সম্প্রদায় মালেকী, ইমাম হাম্বলের সম্প্রদায় হল হাম্বলী, আর ইমাম শাফীর সম্প্রদায় 'শাফী' বা ফরাজী বা মোহাম্মদী। আমরা ফরাজী অর্থাৎ শাফী—কিন্তু আসলে নিজেদের বলি লা-মজহাবী অর্থাৎ কোন সম্প্রদায় স্বীকার করিনে। হজরত মোহাম্মদ যা করেছেন, সেই শরিয়তি আচার অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চাই। ইমাম শাফীর এই নির্দেশ। যাইহোক, ব্যাটা কাবুলীওয়ালা যখন পাল্টা জিগ্যেস করল আমার সম্প্রদায় কী, বললুম—লা-মজহাবী! শুনে ব্যাটা ক্ষেপে গিয়ে বললে, এ দেশটা আফগানিস্তান হলে এতক্ষণ আমাকে কোতল করে ফেলত। বোঝ কাণ্ড! আমাদের কেউ সইতে পারে না। তুমি তো তখন আরবের ধর্মগুরু আবদুল ওহাবের সম্প্রদায় ওহাবীদের কথা বলছিলে ডাক্তার। ওহাবীরা খিলাফত আন্দোলন করছেন। ভারতেও শুরু হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে। ওহাবীরা বৃটিশবিরোধী। আমরা ফরাজীরা কিন্তু ধর্মসংস্কারক আবদুল ওহাবের পন্থী—আমরা ওহাবী। কাজেই বৃটিশবিরোধী।'

গোরাংবাবু হাসেন!... 'কংগ্রেস তো তোমাদের সমর্থন করছে। গান্ধীজির ফতোয়া! তা হ্যাঁ হে মৌলুবী, তোমাকে ইংরেজ সায়েবরা খোঁয়াড়ে পুরছে না কেন?'

জুহা মৌলবী পাল্টা হাসেন। 'এখনও মুখ খুলিনি, তাই। খুলব—খুলতে হবে একদিন। একদঙ্গল পুষ্যির কথা ভেবেই দমে থাকি হে ডাক্তার!'

হঠাৎ স্বর্ণ বলে, 'বাবা! সেদিন রাতে একটা লোক লুকিয়ে থেকে গেল আমাদের বাড়ি। সে কে?'

গোরাংবাবুর চোখ টেপেন।

কিন্তু জুহা মৌলবীর চোখে পড়ে যায়। চতুর দেশচরা অভিজ্ঞ মানুষ তিনি। চাপা হেসে বলেন, 'লুকিয়ে থেকে গেল? কী সর্বনাশ! তলে তলে তুমিও ডুবে জল খাচ্ছ নাকি?'

গোরাংবাবু বলেন, 'না—না! ও একটা লোক—মানে,...'

জুহা উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'মানে টেররিস্ট, বিপ্লবী।'

'যাঃ চুপ করো হে! দেয়ালের কান আছে।' ...গোরাং ডাক্তার স্বর্ণর ওপর বিরক্ত হয়েছেন। মুখ খুললি খুললি, এই নানান জায়গা ঘোরা লোকটার সামনে? একটু ভেবে পরক্ষণে আশার আলো দেখেন। জুহা মৌলবী ফরাজী অর্থাৎ ওহাবী। বৃটিশ সরকারকে দেখতে পারে না বটে। অনেক কথা মনে পড়ে যায় গোরাংবাবুর। মৌলবী আর যাই করুক, এ নিয়ে কোথাও মুখ খুলবে না। ইংরেজ মুসলমানদের কাছ থেকে বাদশাহী কেড়েছে, মুসলমান হিসেবে মৌলবীর এতে বড্ড রাগ।

কথায় কথায় হেরু বাউরির কথা এসে পড়ল আবার। হেরুকে পুলিশ খুব খোঁজাখুজি করছে। সদর থেকে খোদ গোরা পুলিশ ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড এসে কাছারি বসিয়ে রিপোর্ট নিয়ে গেছে। এলাকার গেরস্থরা ঘুমোতে পারছে না। রাঢ় এলাকার যত গরুমোষের পাইকার আঁরোয়া হয়ে কোদলার ঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে বেলডাঙার গরু-মোষের

হাটে যায় প্রতি মঙ্গলবার, তারা আর এপথে ফেরে না। সঙ্গে টাকাকড়ি থাকে, তাই। ব্যাপারীরাও মুশকিলে পড়ে গেছে। স্টেশনে এখন একজন মাস্টার—অগস্তিবাবু। ভদ্রলোক শিগগির বদলী হচ্ছেন হান্টার সায়েবকে ধরে। কবে হেরুকে ইঁদারার জল খেতে দেননি, মনে পড়ে গেছে। তার ওপর নির্জন কোয়ার্টার মাঠের মধ্যে। একটা কিছু হলে কেউ জানতেও পারবে না।

সেদিন সদর থানার পুলিশ এবং এলাকার ধনী লোকদের অনুচর আর গোবরহাটির জমিদারবাবুর পাইকবরকন্দাজ মিলে দেড়শো থেকে দুশোজন সশস্ত্র লোক আঁরোয়ার জঙ্গল তোলপাড় করেছে। কে খবর দিয়েছিল, হেরুর আড্ডা নাকি ওখানেই। কিন্তু কোথায় সে? রাঙী বাউরানীকে প্রচণ্ড মার দেওয়া হয়েছে। সে বলেছে- –জানে না। এদিকে গর্ভবতী মেয়ে। ওতেই পেটের বাচ্চাটা বেরিয়ে আসতে পথ পেল না! মেয়ে হয়নি—ছেলে। হেরু ছেলেকে রেলের গ্যাঙম্যান করবে বলেছিল!

'হু, কতকগুলো ব্যাপারে বেশ আশ্চর্য। হেরু একা ডাকাতি করছে—এক। হেরু বউকে নাকি পালিতবাবুকে মারার দিন থেকে আর দেখাও দ্যায় নি, পয়সাকড়ি খাবারদাবারও দ্যায়নি। রাঙী বেচারির বড় কষ্ট—দুই। হেরু যা পাচ্ছে, তা কী করছে এই একটা রহস্য—তিন। হেরু খাচ্ছে কোথায়, কে দিচ্ছে খেতে এও দারুণ রহস্য—চার। ....মৌলবী! শুনছ?'

'উঁ? হু।'

'হুঁ—না। ঘুমোচ্ছ! ঘুমোও।'

'না হে বলো। তাজ্জব লাগছে।'

'ঠিক বলেছ। হেরুর ছেলেটা দেখে এলুম কাল, বুঝলে?'

'দেখলে নাকি?'

'দেখলুম। কারণ, মানুষ আমার কাছে বরাবর রহস্য। তা আমাকে দেখে রাঙী খুব কাঁদতে লাগল। কী করব? দু আনা পয়সা ছিল পকেটে। রাঙামাটির মধু মণ্ডলের মেয়ের ভূতেধরা রোগ—অনেক ওঝা দেখাল, কাজ হয়নি। তখন ডেকেছিল আমাকে। গিয়ে দেখেই বুঝেছিলুম—চোখের পাতায় ঠিক লেখা ছিল : এ কেস অফ বেলেডোনা। মাত্র সিক্স এক্সেই ফিট ভাঙল। বেলেডোনা দিতে হলে চোখটা লক্ষ্য করা চাই।'

স্বর্ণ তেড়ে আসে। ....'দু'আনা পয়সা দিয়ে খালি পকেটে বাড়ি এলে কাল! বাঃ! কী মিথ্যুক রে বাবা। তখন বললে,....'

গোরাংবাবু জিভ কেটে বলেন, 'তুই আছিস এখনও? শো গে মা। রাত বেড়েছে।'

স্বর্ণ জেদে বলে, 'শোব না। হেরুর ছেলের কথা বলো।'

'শুনবে?'...সোৎসাহে গোরাংবাবু বলেন।....রাঙী এখন শম্ভু ঘেটেল আছে না কোদালার ঘাটে—তার বাড়ি আছে। শম্ভু বুড়োর ভাইঝি যে রাঙী। শম্ভুর বউটউ নেই। একা মানুষ। ঘরখানা খালি পড়ে ছিল, দেখাশোনা করছে। খাওয়া-দাওয়া আর বস্তরের বিশেষ অভাব হবে না। রাঙীর কপাল! ওই শম্ভু একদিন হেরুকে দেখলে দাঁত কিড়মিড় করে শাপমন্যি করত। তা বুঝলে মৌলুবী? ছেলেটা তাই অবিকল বাপের মতন গড়ন—ছড়ালো হাত

পা। গায়ের রঙ মায়ের মতন ফরসা। শম্ভুর একটা দুধী ছাগল আছে। 'আর ভাবনা কী?'

জুহা মৌলবী বলেন, 'হেরুর ব্যাপারে তোমাদের বাপ-ঝির বড্ড মাথাব্যথা। কেন হে?'

গোরাংবাবুর বিষণ্ণমুখে বলেন, 'বড্ড ন্যাওটা ছিল আমার। তুমি তো জানই সন্ধেবেলা এখানে ছাড়া আড্ডা ছিল না। যা, বলতুম, শুনত—তার দিনরাত্তির সময় অসময় নেই। আমার ওই ঘোড়াটা বুঝলে মৌলবী, ঘোড়াটা ওর সাহসেই রাখা। দেখাশোনা যত্নআত্তি, ঘাস-ভুঁষি যোগানো, পুকুরধার থেকে নিয়ে আসা—সব ও ব্যাটাই করত! বেশ নিশ্চিন্ত ছিলুম। এখন বড্ড ঝামেলায় পড়া গেল। আজ বিকেলের কাণ্ড শোন। ওই কোটালদিঘি—দেখেছ জঙ্গুলে পুকুরটা? সেখানে চরতে দিয়েছিলুম ঘোড়াটা। পিছনের দু'ঠ্যাং বাঁধা! দিব্যি জলাঘাস, পাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে। আনতে গেলুম। ওরে বাবা! হঠাৎ ফাঁড়িঘাস থেকে ফোঁস করে উঠেছে ইয়াবড়ো চক্কারওয়ালা কেউটে! উঃ আমি তো ভাই পৃথিবীশুদ্ধ নিজেকে ভুলে গেলুম।'

'তারপর, তারপর'?

'কী করব? ঘোড়াটা রেখেই চলে আসতে হল। তখন স্বর্ণ—স্বর্ণ গেল। এত বারণ করলুম—শুনল না। হাতে লাঠি নিয়ে গেল। ঘোড়া নিয়ে ফিরল। সাপটাপ নাকি আমার হ্যালুসিনেশন—ভ্রম!'

দু'জনে হেসে উঠল। স্বর্ণ একবার মুখ তুলে বলে, 'আমাকে সাপে খাবে না।'

জুহা মৌলবী বলেন, 'ওকথা বলতে নেই। সেবার এক চাঁদনী রাতে বাঁকিনদীর ঘাটের ওপর একজোড়া সাপ আমাকে তিনচার ঘণ্টা আটকে রেখেছিল।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে চনমন করে উঠেছে স্বর্ণ। বয়স বাইশ বছর—কিন্তু মনে কিশোরীর বাসা।... 'সবটা বলুন না মৌলুবীচাচা!'

গোরাংবাবু বলেন, 'বেচারীকে জ্বালাস নে মা। ক্লান্ত মানুষ। রাত জাগলে ভোরে ঘুম ভাঙবে না। তখন ডাবকইয়ের কোন মুসলমান যদি দ্যাখে যে জুহা মৌলবী হিঁদুর ঘরে রাত্রিবাস করেছে!'...খুব হাসেন গোরাংবাবু।

জুহা মৌলবী বলেন, 'হ্যাঁ—সেও তো কথা। ডাবকইয়ে ক'ঘর ফরাজী মতে শিষ্য করে এক জ্বালা। হ্যাঁ হে ডাক্তার, ওরা বরাবর বলেছে, ওদের গাঁয়ে চলে আসতে। ঘর করে দেবে। দেখাশোনা করবে। আসব?'

গোরাংবাবু খুশি হয়ে বলেন, 'এসো, এসো। আমি তো বলছিই বরাবর। রেলরাস্তার ধার। স্টেশন আছে। ভালই হবে তোমার মতন মৌলুবী লোকের পক্ষে। ও স্বর্ণ, তোর মৌলবীচাচার এক জব্বর কীর্তি শুনবি? তুই জানিস নে। তখন তো তুই শ্বশুরবাড়ি গোবরহাটিতে ছিলি।'

স্বর্ণ বলে, 'কী কীর্তি চাচা?'

জুহা মৌলবী একটু হেসে বলেন, 'ও তোমাদের শুনতে নেই, মা। পাপ হয়।'

গোরাংবাবু বলেন, 'হাতি হয়! স্বর্ণর ওসব সওয়া। ওর শ্বশুরবাড়ির দোতলা থেকে মুসলমানপাড়ার সব দেখা যেত। আমি নিজেও দেখে এসেছি। বড় বড় গরু কাটা হত ঈদের পরবের সময়। স্বর্ণ হাঁ করে দেখত। স্বর্ণকে তুমি চেন না। বলে ফেলো।'

'তাই বুঝি?'...জুহা মৌলবী একটু ইতস্তত করে বলেন।...ডাবকই গাঁয়ের মাটি এক হিন্দু জমিদারের! তাই ওখানে মুসলমানদের গরু খাওয়া নিষেধ ছিল বরাবর। আমি ওখানে গিয়ে ক'ঘর শিষ্য করলুম—কীভাবে জানো মা?'

বাকিটা বলে দিলেন গোরাংবাবু। ফরাজী মৌলবীকে পাত্তা দেবে কেন ওই হানাফী মুসলমানরা? তখন জুহা করল কী—ওদের চাপা লোভের জায়গায় সুড়সুড়ি দিল। গাঁয়ের লোক জড়ো করে প্রকাশ্যে গরু কাটল। খবর পেয়ে জমিদারের লোকজন আর এলাকার অনেক হিন্দু তাড়া করতে গেল লাঠিসোটা নিয়ে। তখন এই জুহা মৌলবী সেই গরুর রান ইত্যাদি মাথায় নিয়ে হিন্দুদের দিকে এগোতে লাগল। অমনি ব্যস! সব্বাই রামনাম করতে করতে পালিয়ে গেল! সে-দৃশ্য গোরাংবাবু স্বচক্ষে দেখেছেন। আসলে একটা বীভৎস দৃশ্য তো বটে! তখন এখানে সবে রেললাইন বসছে। অনেক গোরাসায়েব ক্যাম্প করে রয়েছে। একটা বিশাল রান উপহার দিয়ে জুহা মৌলবী তাদের সমর্থন আদায় করে নিলেন। তারপর সদরে মামলা গেল। খবরের কাগজে হইচই করা হল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট গোরাসায়েব। শেষঅবধি সব নিষ্পত্তি করা হল। ডাবকইতে যখন একজনও হিন্দু নেই—তখন সেখানে কী হল না হল, তা নিয়ে হিন্দুদের মাথাব্যথা করে কী লাভ? গতবছর হিন্দু জমিদারবাবু এক মুসলমান জমিদারবাবুকে ডাবকই মহাল বেচে দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করেছেন। এখন জুহা মৌলবী জয়জয়াক্কার সেখানে। কয়েকঘর ইতিমধ্যে তাঁর মতে দীক্ষা নিয়ে তৌবা করেছে। বাকি সবাই নেবে এ আশা প্রচুর।

তবে এহেন কট্টর গোঁড়া মৌলবীকে গোরাংবাবু ভালবাসেন, এর একমাত্র কারণ গোরাংবাবুর চরিত্র। তিনি বলেন, 'মানুষ সব্বাই ভগবানের সন্তান। কেউ ছোট বড় নয়—সবাই সমান। আর মানুষের যখন রসনা আছে যা খুশি খাবে। হাতি খাবে সাপ খাবে। খাক্। পেট—এই পেট দিল কেন বিধাতা? দেখবে—এমন দিন আসবে, যখন খাবার মতন কিছু না পেয়ে মানুষ নিজেকে কামড়ে কামড়ে খাবে—নিজেকে কড়মড়িয়ে কামড়ে-কামড়ে খাবে।'

স্বর্ণ বাবাকে এতদিন ভাল চিনেছে। কী বলবে? মা নেই—একা বয়স্ক মানুষ। বললে চুপচাপ বসে কাঁদবেন নীরবে। ঠিক স্বর্ণ যেমন করে। বাপমেয়ে স্বভাবে খুব কাছাকাছি ছিল বরাবর—এখন তো সহবাসের গুণে আরও কাছাকাছি হয়েছে। এত কাছাকাছি যে অনেক সময় কে বাবা কে মেয়ে আলাদা বুঝে ওঠাও কঠিন হয়।

তা' ওইসব কীর্তি করে জুহা মৌলবীর নামডাক বেড়ে গেছে সবখানে। স্বর্ণ লোকটাকে যত দেখে, ধর্ম দূরে রেখেই দেখে, এবং কেমন অবাক লাগে। এই লোকটাও তো মানুষ—অথচ তাদের মতন নয়। পুজো আচ্চা করে না—নমাজ পড়ে। ওদের ঠাকুর নেই—খোদা আছে। খোদা আবার নিরাকার। তা কী করে হয়? হয়। বাবা বুঝিয়ে দিয়েছে—আদি হিন্দুধর্মেও নিরাকার ঈশ্বরের কথা ছিল।

রতনপুরের ওমর শেখের কথা এসে পড়ে তারপর। তার ঝোলায় আবার বাইবেল গীতা কোরাণ সব ঠাঁসা। সে আর একটা অদ্ভুত মানুষ। গোরংবাবুর আরেক নেওটা। কিন্তু

ওমরের নাম শুনেই খাপ্পা হয়েছে জুহা মৌলবী। 'তৌবা। ও ব্যাটা ভণ্ড—স্রেফ নাস্তিক। ছিঃ ছিঃ ওর মুখ দেখলে গোনাহ হয়। ও হল শাস্ত্রোক্ত কলির দজ্জাল।'

গোরাংবাবু সকৌতুকে হাসেন। ওমরের সামনাসামনি পড়লে সে এক দৃশ্য! দুজনের মুখের কথা ভাবলে হাসির চোটে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে। ওমর অবশ্যি জুহা মৌলবীকে ব্যাঙ্গবিদ্রূপ করেই ক্ষান্ত হয়। জুহা মৌলবী ওকে লাঠিপেটা করতে বাকি রাখেন। আড়ালে চোখ নাচিয়ে বলেন, 'সেই ফাদার ওমরচন্দ্র ঠাকুরের খবর কী?'

ওমর অনেকদিন আসেনি এদিকে। রাঙামাটি তার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। কে জানে, মেয়েকে ওরা তালাক দিলে নাকি! ওমরের মেয়ে নাকি এই উনিশ-বিশেই পাঁচসাতটা শ্বশুর ঘর ঘুরেছে। যাক্, সে কথাও পরে।

কথায়-কথায় রাত বাড়ে। গয়াপ্যাসেঞ্জারও চলে যায়। স্বর্ণ শুতে যায় ভিতর ঘরে। ডাক্তারখানার মেঝের দুদিকে দুই বন্ধুর নাক ডাকতে থাকে একসময়।...

সে রাতে যখন চাঁদ উঠেছে, মজা ভাগীরথীর ঝিলের মাথায় ভাঙা কাঁসার থালার মতন চাঁদ—জ্যোৎস্নার ফিং ফুটেছে, হঠাৎ কেন ঘুম ভেঙে গেল জুহা মৌলবীর। কোন গাড়িটাড়ি গেল নাকি? কান করলেন কতক্ষণ। না। কেন ঘুম ভাঙল? একটা স্বপ্ন দেখছিলেন। চমৎকার স্বপ্ন। স্ত্রী জাহানারা বেগম আর পাঁচটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছেন। খুব আনন্দময় যাওয়া। হঠাৎ সব গোলমাল হলে গেল। স্ত্রীর কথা ছেলেমেয়েদের কথা ভাবতে-ভাবতে মন নরম হয়ে গেল। চোখে জল এল। এই একটা মানুষের ওপর নির্ভর করে ওরা দুনিয়ায় বেঁচে আছে।

উঠে বসলেন জুহা মৌলবী। লানটিনটা নিভে গেছে। খোলা জানালা দিয়ে ডাক্তারের বিছানার ওপর মাখনের মতন একদলা জ্যোৎস্না পড়েছে। ডাক্তার কই? মাঝরাতে এরকম জ্যোৎস্নাপড়া খালি সাদা বিছানা দেখলে বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। হায়, কে যেন হারিয়ে গেল।

ভাবলেন, বাইরে জল সারতে গেছেন। তাঁরও পেচ্ছাব পেল। কিন্তু সদরদরজা খুলতে সাহস হল না। বাঘের ভয় একটু ছিল, ভয়টা আজ হেরুর। যা সব শোনা গেল ওর বীভৎস কাণ্ডকীর্তি। ও ব্যাটা জুহা মৌলবীর ব্যাপার জানে। সফর শেষে বাড়ি ফেরার সময় মৌলবীর কাছে কী থাকে না থাকে, সব জানে। হে খোদা আমার অবলা জেনানা আর নাবালকদের মুখের রুজি—তুমি বাঁচিয়ে দিও প্রভু! বিড়বিড় করতে করতে উঠলেন জুহা মৌলবী। আরবী শ্লোক পড়লেন—শয়তানের হাত থেকে পরিত্রাণ করো হে দীনদুনিয়ার বাদশাহ!

তারপর অন্দরের খোলা দরজায় উঁকি দিলেন। পায়খানার বালাই এ তল্লাটে হিন্দুদের মধ্যে নেই—এক জমিদার বাড়িটাড়ি ছাড়া। সবাই মাঠে ব্যাপারটা সেরে নেয়। কেবল ধনী মুসলমান—বিশেষ করে ফরাজী সম্প্রদায়ের ধনী গরীব সবাই খাটা পায়খানা বানিয়ে রাখে বাড়িতে। কুয়োর মতন গর্তের ওপর ছাদে—ছাদ খানিকটা ফুটো। একবার হয়েছিল কী, জুহা মৌলবী তাঁর বাড়ির পায়খানায় ওই ছাদ ধলে নিচের কুয়োয় পড়ে গিয়েছিলেন। গাগতরময় পচা মল—উঃ জাহান্নাম। ফায়ারব্রিগেড কোথায় যে ওঠাবে

তাকে? মই নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে এক দুঃস্বপ্ন। জুহা মৌলবী ভাবলেন, গোরাংবাবু রাত্রিবেলা বাইরে না বেরিয়ে হয়তো খিড়কির কাছের নর্দমায় পেচ্ছাপটা সেরে নেন। তিনিও তাই করবেন।

হঠাৎ চমকে উঠলেন জুহা। ভিতর ঘরের দরজা একুট ফাঁক হয়ে আছে। ওদিকের বারান্দার কিছু অংশে কুপির আলো গিয়ে পড়েছে। সেই আলোয় মহাকায় দৈত্যের মতন একটা লোক—আর কেউ নয়, স্বয়ং হেরু বাউরি বসে গোগ্রাসে খাচ্ছে। স্বর্ণ একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। গোরাংবাবু হেরুর সামনে বসে ফিসফিসিয়ে কী বলছেন।

আর পেচ্ছাপ হল না জুহা মৌলবীর। ফিরে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়লেন। গোরাং ডাক্তার লোকটি সম্পর্কে তাঁর ধারণা বদলে গেল। বুক টিপটিপ করতে লাগল। এরা বাপমেয়েরা তাহলে এই দৈত্য পুষে রেখেছে। আর সেই দৈত্যকে দিয়ে...

আর ভাবতে পারলেন না। গা শিউরে উঠল। তাঁর কাছে মোট সাত টাকা চার আনা তিন পয়সা আছে। প্রায় চার মন চালের দাম। হে খোদা, বাঁচাও দুষমনের হাত থেকে। তাঁর ঝোলায় সেলাইয়ের কৌটোয় একটা মাঝারি সাইজের সূচ আছে। সেটা শিগগির বের করে নিয়ে হাতে রাখলেন। একটা ছুরিও ছিল ছোট্ট। আপাতত বিপদের সময় তার পাত্তা নেই। অগত্যা সূচটা নিয়ে চোখ বুজে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলেন।

কতক্ষণ—কতক্ষণ পরে গোরাংবাবু চুপিচুরি এসে শুয়ে পড়লেন। বাকি রাতটুকু আর ঘুম হল না জুহা মৌলবীর। যেই না প্রথম কাক-কোকিল ডেকেছে, অমনি চুপিচুপি কেটে পড়লেন। গোরাংবাবুর তখন নাক ডাকছে।

আঁরোয়া গ্রাম পেরোলে চারপাশের গাছপালায় নানারকম পাখি ডাকতে লাগল। সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছিল বউ কথা কও। ওই গ্রীষ্মকালের ভোরবেলায় আঁরোয়ার পথে হেঁটে যাওয়া এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। শুধু পাখির ডাক নয়, কতরকম ফুলের গন্ধ কত শ্যামলতা—যেন বেহশতের ছায়া ঠিক এই সময়ই দুনিয়ার ওপর কিছুক্ষণ পড়ে থাকে। সাবধানে চারদিক লক্ষ্য করতে করতে জুহা মৌলবী প্রায় দৌড়ে চললেন। বাঁকির ঘাটে গিয়ে একদল সব্জীওয়ালা চাঁই সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে দেখা হল। ওরা গঙ্গাতীরে উর্বর মাটিতে বসতি করে থাকে। কোন আমলে বিহার থেকে এসেছিল এখানে। খোট্টাই বুলি বলে। বাংলাও বলে। তরিতরকারির চাষ ওদের পেশা। আজ গোকর্ণে হাটবার। ওরা হাটে চলেছে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন জুহা মৌলবী। গোকর্ণ চাটরার সবিশেষ খবর নিতে নিতে এগোলেন।

কথাটা কি গোকর্ণ ফাঁড়িতে পুলিশের কানে তুলে দেবেন? সেইসময় হঠাৎ স্বর্ণর মুখটা মনে পড়ল। থাক্। কতরকম মানুষ থাকে আল্লাতলার দুনিয়ায়। কথায় বলে, আমেড়ুমুরে বাগান। আর মানুষ হয়ে মানুষের বিচারক হতে নেই। নিজেকে সম্বোধন করে বললেন জুহা মৌলবী—এ্যায় বান্দা সামসুজ্জোহা! তুই নিজে হাকিম সাজিস নে! ভেবে দ্যাখ, তোরও একজন হাকিম আছেন ওপরে। যা করার, তাঁকেই করতে দে। আমিন...আমিন...আমিন।

চার

ফাদার সাইমনের দুর্বিপাক

সম্প্রতি রেললাইন আর স্টেশন হবার পর থেকে এলাকায় এক খৃষ্টান গোরা-পাদরির আবির্ভাব ঘটেছে। মাথায় হেরুর মতন উঁচু, বিশাল চেহারা। মাথায় টাক আছে। মুখে আছে একরাশ কাঁচাপাকা গোঁফ দাড়ি। হাঁটু অবধি সাদা জিনের আলখেল্লা। পায়ে গামবুট বারোমাস। পিঠে ভারি বোঁচকা থাকে। হাতে একখানি ময়ূরমুখো লাঠি। স্টেশনে নেমে কিছুক্ষণ মাস্টারের কাছে আড্ডা দেন। চমৎকার বাংলা বলেন। লিখতে পড়তেও পারেন বাংলায়। প্রথম এলেন যখন, স্টেশন মাস্টার তখন কার্লটন সায়েব। কার্লটনেরই নাকি বন্ধু উনি। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি—দুটোতেই ধুরন্ধর ডাক্তার এই পাদ্রীবাবা। গোরাংবাবুর সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। তবে লোকে বলে, পসার চটে যাবার আশঙ্কায় গোরাংবাবু ওঁকে মনে মনে বেজায় মন্দ বাসেন। কী কথায় খুব তর্কাতর্কি হয়েছিল একদিন—সেই থেকে দুজনে দুজনকে দেখলেই সরে যান। গোরাংবাবু নাকি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন, 'মানবসেবাটেবা সব ভুয়ো, এসেছেন তো খৃষ্টান করতে—তবে সে গুড়ে বালি সায়েব! এলাকার ছোট লোকগুলো বড্ড বেয়াড়া। দেখে শুনে চলবেন।'

অগস্তিবাবু বলেন, 'আরে, সাচবাত হাম সমঝ লিয়েছে না। হামারা বিলাভেড ডক্টর গৌরাঙ্গবাবুকা সাথ কমপিটিশন চলেছে। চরণ চৌকিদারকো পুছো না দাদা! সব বাতা দেগা। ইষ্ট্রাগল ফর একজিস্টেন্স!'

ব্যাপারটা হল এই।

চরণ চৌকিদারের মেয়ে বিন্নির মধুপুরে বিয়ে হয়েছিল। গত জষ্টিতে বাবার বাড়ি এল বেড়াতে। গাঁয়ের মেয়ে। গাঁয়ের মাঠঘাট বিলখাল জঙ্গলে চরে খেয়ে আর পাঁচটা মেয়ের মতনই মানুষ হয়েছে। স্বভাব যাবো কোথা? এসেই একদিন গেল ভাগীরথীর ঝিলে সিঙাড়া তুলতে! লোকে বলে, ইয়াকুব তান্ত্রিককে খামোকা চোখ রাঙিয়ে গাল দিয়েছিল সেখানে। তারপর ফিরে এসে সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ মাথা দুলিয়ে ভবের খেলা উঠল। সে কী দুলুনি, সে কী চোখের রঙ, সে কী 'তোলমাতাল কাণ্ড'! থরথর করে উঠোন কাঁপে চৌকিদারের। পাড়া-পড়শীর ভিড় বেড়ে গেল দেখতে দেখতে। বিন্নি অবিশ্রান্ত বকবক করে যাচ্ছ, কিছু বোঝা যায় না। অনেক কষ্টে কেবল বোঝা গেল, ইয়াকুব তান্ত্রিকের নাম ধরে ডাকছে। খবর তক্ষুনি চলে গেল। কিন্তু ইয়াকুব ঘরে নেই। কালীসাধক লোক—হয়তো কোথায় গঙ্গার কোন নির্জন চড়ায় গিয়ে বসে আছে সাধনায়। রাত বাড়ল। তখন সবাই বলল, 'এই তো সেদিন মজিদের মেয়ের ভূতে ধরা রোগ সেরে গেল গোরাংবাবু হোমিওপ্যাথিতে। তাকেই ডাকো না হে চৌকিদার!'

চরণ লণ্ঠন হাতে চলে এল গোরাংবাবুর কাছে। আর যাই করুন, রাতে বেরোবেন না—সে তুমি লাখ টাকা দাও, কিংবা স্বয়ং লাটসায়েবটি হও। কী করে যাবেন? ঘরে একা যুবতী বিধবা মেয়েটা থাকবে কেমন করে?

চরণের ভাগ্য ভাল। ফিরে যাচ্ছে স্টেশনের বারান্দা হয়ে—গেট পেরিয়ে। হঠাৎ দেখে কি, পাদ্রীসাহেব সাইমন বসে রয়েছে স্টেশন ঘরে। টিকিট কাটবার ঘুলঘুলি দিয়ে তাকিয়ে দেখে চরণ। কিন্তু সাহস পায় না। চৌকিদারী প্রতাপ তো এক্ষেত্রে কেঁচো। ওরে বাবা, স্বয়ং গোরা সায়েব। সে আমলে গোরা সায়েবের নাম শুনলেই বউঝিরা গাঁ ছেড়ে মাঠে ঝোপে জঙ্গলে লুকোনোর পথ দেখে। তবে সাইমনকে আর কেউ ডরায় না। জানা গেছে, এ গোরা নির্বিষ ঢোঁড়া।

অগস্তিবাবুর চোখ পড়েছিল।....'কৌন হ্যায় রে? অভি কোই টেরেন নেহী।'

চরণের মুখে তবু কথাটি নেই। রেলের লোককে সে প্রচণ্ড সমীহ করে। সেই সময় ভুতুড়ে একচোখা আলো নিয়ে খালাসি চাঁদঘড়ি (পদবী জমিদার—জাতে নাকি চাঁড়াল আসলে, তবে বেহার মুল্লুকের) তার শুওরের পাল সামলে স্টেশনে ঢুকছে। সে বলল, 'আরে বাস! চৌকিদার দাদা যে! কী খোবোর? কোথায় যাওয়া হবে?'

দুইজনেই গাঁজা খায়। সেই সূত্রে আত্মিক বন্ধনটা শক্ত।

চাঁদঘড়ি খালাসি রেলের লোক। সেই সব ঠিকঠাক করে দিল। তক্ষুনি সাইমন সায়েব বোঁচকা নিয়ে হাজির হলেন রাঙামাটি।

বিন্নি তখন মাটিতে লুটোচ্ছে। বুকটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। পেটের কাপড় খুলে দিতে বললেন সাইমন। রোগটা আর কিছু নয়—হিস্টিরিয়া। আগাগোড়া সব শুনলেন। ছেলেবেলার খবর নিলেন, হু, একবার ভয় পেয়েছিল দারুণ—তখন ছ'বছর বয়স। বাড়ির পিছনের যজ্ঞডুমুর গাছের নিচে হাগতে গিয়েছিল। কী দেখে দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল।

ফাদার বোঁচকা খুলে হোমিওপ্যাথির বাকসো বের করলেন। চারপাশে সব অগুনতি পুরুষমানুষ মেয়েমানুষ। মাঝখানে লণ্ঠন জ্বলছে। মাটিতে লুটোচ্ছে ভরা যুবতীর বেপথু দেহ। একটা স্তন অর্ধেক বেরিয়ে আছে। মেয়েরা কেউ ঢাকতে পারত গিয়ে—কিন্তু গোরা সায়েবের কাছে যায় বা কেমন করে! তা দেখে চরণ কাঁদল। মেয়ের স্তনটা দেখেই তার কান্না পেল। অমন নিষ্ঠুর চৌকিদারটা—সে কিনা হু হু করে কাঁদে আর বলে, 'আহা হা মা আমার! আহা হা রে মানবজম্মো!'

ইগ্নেশিয়াই এক্ষেত্রে ভাল কাজ দেবে। ফাদার চৌকিদারের হাতে ওষুধ দিলেন। তারপর স্মেলিং সল্টের শিশি বের করলেন। ফাদার বরাবর অবাক হন একটা কাণ্ড দেখে—এখনও হলেন। হিস্টিরিয়ার রুগীরা যখন ফিট হয়েছে, স্মেলিং সল্ট নাকের কাছে যাবার আগেই, ছিপিখোলা মাত্র জ্ঞান ফিরে যায়। যেন অবচেতনে সব টের পায়—ঝাঁঝাল খর গন্ধ সইবার ভয়ে চেতনাকে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অনেকক্ষেত্রে ফাদার দেখেছেন, স্মেলিং সল্ট নয়—নিতান্ত পোস্টকার্ড জ্বালিয়ে নাকে ধুঁয়ো দেবার জন্যে যেই আগুন ধরাতে গেছে রোগী ফোঁস করে প্রশ্বাস ফেলে চোখ খুলেছে।

সব কাজ শেষ করে ফিরে আসছিলেন ফাদার সাইমন। সঙ্গে চরণ আলো নিয়ে আসতে চাইছিল—তাকে নিবৃত্ত করলেন ফাদার। একা আসছেন রাঙামাটি থেকে ধুলোউড়ির মাঠ পেরিয়ে।

দূরে আলো দেখা গেল। আলোটা কাছে এলে দেখলেন, গোরাংবাবু ঘোড়া চেপে আসছেন—হাতে লণ্ঠন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথা বলতে হল। নির্জন রাত্রির মাঠ। '...হাল্লা ডক্টর! কেমন আসেন? বালো তো? মেয়ের কবর বালো তো? এটরাত্রে কোঠায় চলিলেন?' হাত বাড়িয়ে দিলেন ফাদার সাইমন ঘোড়ার ওপর।

হাত নিয়ে গোরাংবাবু বললেন, 'ভালো ফাদার—সব খবর ভালো। আপনার কুশল তো?'

'কুশল আছে। এটো রাত্রে কোটায় যাবেন হাপনি?'

'আর বলবেন না। চরণ এল সন্ধেবেলা। মেয়ের কি অসুখ নাকি। তা—তখন কেমন করে যাই? মেয়ে একা থাকবে! এদিকে আমার সেই লোকটা—হেরু, হেরুকে তো দেখেছেন.....'

ফাদার হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ—দ্যাট সুপারম্যান। হে—হে—হেউর!'

গোরাংবাবু বললেন, 'হেরু ছিল না। গিয়েছিল হাউলির ওখানে গাড়ি তুলতে—ওর তো ওই কাজ। আর বলবেন না!...হুঁ, তারপর ব্যাটা এল। তখন ওকে বাড়িতে বসিয়ে রেখে এতক্ষণে সময় পেলুম। আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

আবার জোর হাসতে লাগলেন ফাদার সাইমন।....'মাই গুডনেস! আমি তো চরণের বাড়ি থেকে আসছে এখন। চলুন, পেসেন্ট বালো আসে। ইগ্নেশিয়া দিলাম। আপনি কী বোলেন? ঠিক হয়নি?'

গোরাংবাবু মনে মনে ক্ষেপে বললেন, 'তা—না জেনেশুনে কেমন করে বলব, বলুন? মহাত্মা হ্যানিমানের সায়েন্স তো ডালভাত নয়!'

ফাদার সকৌতুকে বললেন, 'বালো কোঠা। বালো কোঠা ডালবাট না আসে। চলুন, গপ করতে ফিরে যাই।'

গোরাংবাবুর জেদ বেড়ে গেল। বললেন, 'না ফাদার। আমি একবার যাব। আমার কর্তব্য এটা।'

ফাদার অগত্যা চলে এলেন। ওই নেটিভ ডাক্তারটা বড্ড অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ! ওদিকে গোরাংবাবু 'টিটিঙ টিটিঙ করে' টাট্টু হাঁকিয়ে গিয়ে দেখেন, সব নিশুতি। ডেকে-ডেকে চৌকিদার উঠল না। গাঁজা টেনে এতক্ষণে পড়ে গেছে বিছানায়। রাগে অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে গোরাংবাবু সেদিন ফিরে এসেছিলেন। মাঝখানে ঘোড়া খামোকা কষ্ট পেল। কাটা আল ডিঙোতে দু'জনেই পড়েছিলেন।....

কিন্তু মজার কথা বিন্নির অসুখটা মোটেও সারেনি। এই একমাসে আরও বেড়ে গেছে। যখন তখন ভর ওঠে, ফিট হয়। ইয়াকুব তান্ত্রিককে ধরা হয়েছিল। সে গা করে না। শুধু বলে, 'সময় হলেই যাব। যখন তখন গিয়ে অশীরীরী আত্মার পাল্লায় পড়ে মরব নাকি? লোকে জেনে গেছে, খেলাটা ইয়াকুবেরই। লখা-মরা-সরা বাউরি ভাইগুলো একবাক্যে বলেছে—সেদিন ঝিলে বিন্নি ইয়াকুবকে গাল দিয়েছিল। আর হেরু—হেরু থাকলে সেও সাক্ষী দিত। তার সামনেই ওটা ঘটেছিল। হেরু তো এখন ফেরারি।'

ফাদার সাইমন কিন্তু বরাবর আসছেন আর ওষুধ দিয়ে যাচ্ছেন। কাজ হচ্ছে না। ইতিমধ্যে হু হু করে বর্ষা নেমে গেল। কী বর্ষা, কী বর্ষা! মাঠঘাট জলে থইথই। হাজার ব্যাঙ ডাকতে লাগল। লাঙল পড়ল জমিতে জমিতে। দেখতে দেখতে কর্ণসুবর্ণের ঐতিহাসিক টিলাগুলো সবুজ ঘাসে ভরে গেল। তেরোশো বছর আগের ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্বকে প্রকৃতি পায়ে লাথি মেরে সামনের জীবনকে ডেকে বললেন, আয় আমরা ভালবাসা খেলি। আমি তোকে দিলুম রঙ তুই আমাকে দে ধ্বনিসমূহ।

রাতের দিকে নিসর্গজগতে এক আশ্চর্য ধ্বনিপুঞ্জ বাজতে থাকে। কোটি কোটি প্রাণ চিৎকার করে অস্তিত্ব ঘোষণা করে চলে। তারাও আছে, তারা আছে! গোরাংবাবুর ঘরের সামনে বটগাছটা থেকে টুপটুপ করে জলের ফোঁটা ঝরে। পাকা বটফল খসে পড়ে সমানে। বৃষ্টির মধ্যে চলে যায় রাতের রেলগাড়ি। বৃষ্টি ছাড়ার পর আজকাল শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখা যায়। ঝকঝকে জ্যোৎস্নায় ভিজে ঘাস আর ক্ষেতে ক্ষেতে জল চকচক করে। শেয়াল ডেকে ওঠে। পেঁচা ডাকে। লক্ষ কোটি পোকামাকড় পরস্পর ডাকাডাকি করে। সুসময়—ভালোবাসার রেশমি পর্দার আড়ালে জন্মদানের সুসময় বয়ে যাচ্ছে—এসো, সবাই এসো! পৃথিবীকে প্রাণে প্রাণে ভরে দিই। তারপর সেই ফিংফোটা চাঁদনীতে প্রকাণ্ড ছায়া ফেলে কে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসে গোরাংবাবুর খিড়কির দিকে। খিড়কিটা সারারাত খোলা থাকে আজকাল।....

ফাদার সাইমন এসেছিলেন বিকেলে। অগস্তিবাবু ক'দিন বাদে চলে যাচ্ছেন বড় একটা স্টেশনে। নতুন মাস্টার আগামীকালই এসে পড়বার কথা। এবার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টারও বহাল করছে রেল কোম্পানি। নতুন স্টেশন মাস্টার ফের গোরা সায়েব। নাম জর্জ হ্যারিসন। অস্ট্রেলিয়ার লোক। সবে এদেশে এসেই এই ভুতুড়ে জায়গায় তাকে ঠেলেছে রেলকোম্পানি। এ এস এমটি নাকি বাঙালি। বয়সে নিতান্ত তরুণ। নাম সুধাময় চক্রবর্তী। বর্ধমানের ওদিকে কোথায় প্রথম চাকরি—দ্বিতীয় জায়গা চিরোটি। বাছাধন কেঁদে পথ পাবে না।

ফাদার সাইমনকে এই সব কথা বলছিলেন অগস্তিবাবু। গল্প করতে করতে রাত বেড়ে গেল। কোয়াটারে যাবেন গয়া পাস করিয়ে। গাড়ির সময় হয়ে এল।

হঠাৎ ফাদার বললেন, 'এখনই আসছি।' বলে বেরিয়ে গেলেন। রেলের একটা লণ্ঠন হাতে নিয়েছেন। চাঁদঘড়ি বলে গেছে, তার বউটার জ্বর। গোরাংবাবুর ওষুধে কিছু হচ্ছে না। আজই ভাবছিল, যাবে নাকি-ডাউন স্টেশন চৌরিগাছার এলোপ্যাথি ডাক্তারের কাছে ওষুধ আনতে। তা স্বয়ং ফাদার যখন এসে পড়েছেন, তখন অন্য কথা নেই।

চাঁদঘড়ির এখন নীল লণ্ঠন দোলাবার কথা—ডাউন সিগনালের কাছে। সে চলে গেছে ওদিকে। আর একজন খালাসি রামধনিয়া সিগনালের হাতলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী ভেবে একা একা পা বাড়ালেন ফাদার সাইমন। চাঁদঘড়ি নিশ্চয় ওর বউকে বলে রেখেছে। আসলে এটাই স্বভাব ফাদার সাইমনের। রোগি আছে শুনলে আর তর সয় না।

লাইন ডিঙিয়ে চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে। অগস্তিবাবুর গল্পে বেশ দেরি হয়ে গেছে। বেচারি জ্বরে হয়ত ধুঁকছে। এই বিদেশে কেউ দেখার লোক নেই। এখনও কোয়াটার

পায়নি মিনিয়াল স্টাফ। শিগগির কোয়ার্টার হয়ে যাবে। এখন লাইনের ওপর ছোট ছোট কুঁড়েঘর বানিয়ে বাস করতে হচ্ছে।

চাঁদঘড়ির বাড়ির সামনে যে ছোট্ট পুকুর—তার একদিকে গোরাংবাবুর খিড়কির ঘাট। সবে নবমীর চাঁদ বৃষ্টিধোয়া আকাশে খোকার মুখের মতন ফুটে উঠেছে। বেশ ঝকমকে জ্যোৎস্না আছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন ফাদার সাইমন।

কে একজন প্রকাণ্ড মানুষ খিড়কি দিয়ে গোরাংবাবুর বাড়ি ঢুকে গেল। চমকাতেন না ফাদার। কিন্তু মানুষটা অতিকায়। এবং তখুনি হেরুর ব্যাপারগুলো সব মনে পড়ে গেল।

অনেক রাতে অগস্তিবাবুর কোয়ার্টারে শুয়ে ব্যাপারটা ভেবে আকাশপাতাল হাতড়ালেন ফাদার সাইমন। কিছু বুঝতে পারলেন না। ক্রমশ উত্তেজনা বাড়তে থাকল তাঁর। সে রাতে আর ঘুম হল না। কিন্তু অগস্তিবাবুকেও কিছু বললেন না।

সকালে চা খেয়েই ফাদার সাইমন গোরাংবাবুর কাছে হাজির। 'হ্যাল্লো গাওরাঙ্গবাবু, কেমন আসেন? কবর বালো? মেয়ে কোঠায়? ডাকুন। ডেকব।'

গোরাংবাবু সবে চায়ের গেলাস হাতে বসেছেন। একটু অবাক নিশ্চয় হলেন। হঠাৎ সাত সকালে ফাদার সাইমন কেন? বললেন, 'আসুন আসুন ফাদার। স্বর্ণ মা স্বর্ণ! ফাদার এসেছেন রে! কী ভাগ্যি! চা দিয়ে যা না!'

স্বর্ণলতা পাদরিকে দেখে মনে মনে বরাবর ক্ষেপে ওঠে। বাবার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে নয়—ওই গোরা সায়েবের দু'টো জ্বলজ্বলে নীল চোখে একটা মতলববাজ ধূর্ত শেয়ালের ওত পেতে থাকা মূর্তি আছে যেন। সাইমন স্বর্ণর দিকে কী এক অদ্ভুত দৃষ্টে তাকান। অনেক পুরুষের অনেক চাউনি স্বর্ণের চেনা। এইটি অন্যরকম। পাদরিটা কি তার পরানপাখি খোঁজেন? এই পাদরি কি তার নিস্ফল শরীরের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে উদ্বিগ্ন?

আবার চা করতে করতে সে আনমনে পাদরিকে ওজন করে দেখল এবং ঝাঁটা পেটা করল। ইচ্ছে করেই চিনি কম দিল পেয়ালায়। এই পেয়ালাটা রেলের হাণ্টার সায়েব উপহার দিয়েছিলেন গোরাংবাবুকে। এমন সুন্দর ঝকঝকে সাদা চিনেমাটির পেয়ালা—সারা গায়ে সবুজ নকসা; হান্টার সায়েব যেখান থেকে এটা এনেছিলেন, সেখানে সে আরেক পৃথিবী সম্ভবত—যা নিয়ে স্বর্ণের মনে অস্ফুট প্রহেলিকায় ভরা এক মায়ানগর আছে। পেয়ালাটা দেখতে দেখতে তার আঁচ পায় স্বর্ণ। আর, বাবার বিবেচনায় এই মহার্ঘ জিনিসটে কেবল গোরা সায়েবদের জন্যে রাখা। অবশ্য একবার কবে অগস্তিবাবুও এতে চা খেয়েছিলেন মনে পড়ে। এতে পাদরিটাকে চা দিতে ইচ্ছেই করছে না এখন।

গোরাংবাবুর ডাকে আজ একটা চাপা উদ্বেগ আছে, স্বর্ণ টের পেল। সে একটু আড়ষ্টভাবে রেখেই চলে আসছিল। সাইমন ডাকলেন, 'এই টো! এসে গেছে। সার্‌নো! কী বলুন গাওরাঙ্গবাবু—দি গোলডেন ক্রিপার...হাঃ হাঃ হাঃ! টুমি বালো টো মা? বালো কোবোর?'

স্বর্ণ অস্ফুটস্বরে বলে, 'হুঁ। আপনি ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ।' ফাদার সাইমন ঝোলা থেকে একগুচ্চের ছাপানো রঙিন কাগজ বের করে বলেন, 'এগুলো টোমার জন্য। নাও মা! ডাকটারবাবু, আপনার মেয়েকে আমি কিসু বালো কটা শেখাবো। কিসু মনে করবেন না—প্লীজ।'

গোরাংবাবু ট্যারা চোখে খৃষ্ট ধর্মের পুস্তিকাগুলো দেখে নিলেন। কোন মন্তব্য করলেন না। দিক না। স্বর্ণতো আর খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে না। পড়ুক। পড়লে কত কী জানা যায়। চর্চা বাড়ে। যেটুকু শিখেছিল, সব তো যেতে বসেছে!

স্বর্ণের অবশ্য লোভ হচ্ছিল। কিন্তু পাদরির চোখের সেই নীল আলোটা ঠাণ্ডা হয়ে তার শরীরময় ঘুরছে টের পেয়ে সে দ্রুত সরে গেল।

ঘরে এখন রুগিপত্তর নেই। একটু পরে হয়তো এলেও আসতে পারে দু-চারটে। একথা ওকথার পর ফাদার সাইমন এবার আসল কথাটা পাড়লেন। তাঁর কষ্টকর বাংলা সংলাপ থেকে গোরাংবাবু যা বুঝলেন তাঁর শরীর হিম হয়ে রইল কয়েক মিনিট। ব্যাপারটা ঠিক এরকম : নিজের মনে খেলাচ্ছলে, যা নিঃসঙ্কোচে করে যাচ্ছি, হঠাৎ কেউ এসে তা দেখে ফেলামাত্র যেন তার অসঙ্গতিটা ধরা পড়ল।

বারবার শিউরে উঠলেন গোরাংবাবু। মনে মনে দ্রুত ঠিক করে ফেললেন, যথেষ্ট হয়েছে। আর হেরুকে পাত্তা দেওয়া ঠিক হবে না।

তবে কথা কী, বড্ড মায়া হয় ছোঁড়াটার জন্যে। এত ন্যাওটা ছিল! যা বলা গেছে, তাই শুনেছে।...

ফাদার সাইমন কিন্তু গম্ভীর নন। কৌতুকপরায়ণ পুরুষ। শুধু বললেন, 'এটা সট্টি একটা পাজ্‌ল! আমি ডাম্ব-ফাউনডেড! হটোবম্বো হয়েসি ডাকটারবাবু।'

অতি কষ্টে একটু হেসে ভীত গোরাংবাবু বলেন, 'আমি ডাকাতের সর্দার নই ফাদার। সামান্য গোবেচারা মানুষ। কেউ এসে কিছু চাইলে না করতে পারিনে!'

সাইমন একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'ঠিক। ঠিক। তো একটা কটা আমি বলসি গাওরাঙ্গবাবু।'

'বলুন।'

'হেরুকে আমার সাটে ডেকা করে দিন।' অকাট্য খৃষ্টান শপথ উচ্চারণ করেন সাইমন। 'তার কোন বয় নাই। আমি টাকে কিসু কটা বলব। বিলিভ মি, প্লীজ!'

এবার গোরাংবাবু খোলা হাসলেন। 'কী কথা বলবেন ফাদার, শুনি? ধর্মকথা! হেরু কিন্তু সব রোগের বাইরে চলে গেছে। ওকে আমিও তো কম শেখাইনে! বলি, তুই বাপু ধরা দে পুলিশের কাছে। ব্যাটা মুলোর মতন দাঁত বের করে হাসে। আসলে ওকে বড্ড ভয় করি— ও বোঝে ফাদার, শালা বাউরি এখন আমাকে পেয়ে বসেছে।'

সাইমন 'শালা বাউরি' কথাটা দুবার বলে জোর হাসতে থাকেন। তারপর মুখস্থবাক্য বলেন, 'মনুষ্য পাপী। উদ্ধারকর্তাদের সুসমাচার উহাদের নিকট পহুঁছে নাই।....ডাকটারবাবু, আপনি আজ একবার চেষ্টা করুন। কোন ডর নাই।'

গোরাংবাবু উদ্বিগ্নমুখে শুধু বলেন, 'আচ্ছা দেখছি।'

ফাদার সাইমন চলে গেলে স্বর্ণকে ডাকলেন গোরাংবাবু। সব কথা বললেন। স্বর্ণ রেগে লাল তক্ষুণি। 'তুমি তো বড্ড বোকা মানুষ বাবা! কেন উড়িয়ে দিলে না?'

'কী মুশকিল! ব্যাটা পাদরি যে সত্যি সব স্বচক্ষে দেখেছে!'

'দেখুক। বললেই হত, ও হেরু না—অন্য লোক। রুগির জন্যে ডাকতে এসেছিল!'

'যাঃ! খিড়কির দোর দিয়ে তেমন কেউ আসে নাকি!'

স্বর্ণ আরও রেগে বলল, 'কথা বলতে জানলে দিনকে মানুষ রাত করে দিতে পারে।'

মিটিমিটি হাসেন গোরাংবাবু।....'তুই পারিস বুঝি?'

'পারতুম। আমাকে বললে গোরা পাদরিটাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়তুম!'... স্বর্ণ জবাব দ্যায়।'....থাকগে, যা হবার হয়েছে। এখন শোন—হেরুকে বলে দিলেই হবে, কিছুদিন যেন আসে না এদিকে। আর, কখনো ওকে পাদরিটার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও না। তোমাকে তো বিশ্বাস নেই—হয়তো সত্যি সত্যি তাই করে বসবে। তুমিও যেমন—হেরুও তেমনি! মগজে তো খালি গোবর পোরা সব!'

সে রাতে হেরুর প্রতীক্ষা করছিলেন গোরাংবাবু। স্বর্ণও কান পেতে ছিল। সন্ধ্যা থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশ কালো হয়ে গেছে মেঘে। বৃষ্টির শব্দে রেলগাড়ির শব্দ চাপা পড়েছিল। বৃষ্টি মধ্যে দুবার একটু কমলেও ঠিক মাঝরাতে আবার একপশলা এসে গেল। আজ বছরের পয়লা কাড়ান তাহলে।

একসময় তারই মধ্যে হেরু হাজির হল। ভিজে জবজবে শরীর—কোঁচড় থেকে একরাশ কী সব বের করে বাবা-মেয়ের পায়ের কাছে রাখলে, দু'জোড়া চোখ ধকধক করে জ্বলে উঠল! এত সোনার অলঙ্কার! হেরু নিঃশব্দে হাসছে। কতক্ষণ কোন মুখে কথা নেই। তারপর গোরাংবাবু চাপা হাঁসফাঁস করে বলে উঠলেন, 'এ কী এনেছিস হেরু? কার বুকে হন্তা দিলি রে? ওরে, কার সর্বনাশ করলি তুই?'

হেরু বলে, 'এত কথায় কাজ কী ডাকতোরবাবু?' ইগুলো আপনার পেন্নামী। এ্যাদ্দিন তো ঢের নুন খেয়েছি—রেখে দ্যান। কাজে লাগবে।'

ছটফট করে ওঠেন গোরাং ডাক্তার। ক্ষেপে যান!...'কী কাজে লাগবে রে শালা বাউরি? তোর ডাকাতির ধনে আমি পেচ্ছাব করে দিই। যা—নিয়ে যা এক্ষুনি! পালা বলছি!'

স্বর্ণ হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে। একটা ভারি আর চওড়া সোনার হার—অনেকগুলো রঙিন পাথর বসানো আছে তাতে, তুলে নিয়ে গলার কাছে রাখে এবং হেসে দুজনের মুখের দিকে তাকায়। বৃষ্টির ছাঁট আসছে দাওয়ায়। কুপির আলো টলটল করে কাঁপছে। এত উজ্জ্বলতা সইতে পারছে না শিখাটা। গোরাংবাবু আর্তনাদ করেন—'স্বর্ণ। ছিঃ, ছিঃ।'

স্বর্ণ একটার পর একটা গয়না গায়ে রেখে পরখ করে। হেরু শুধু হাসে। গোরাংবাবু দাঁড়িয়ে বিশ্রি কাঁপেন। কী বলবেন, আর খুঁজে পান না।

হঠাৎ স্বর্ণ বলে ওঠে, 'ও হেরু। এ কী? কী এটা?....তারপর আঙুলে তুলে নেয় মস্তো একটা কানপাশার ওপর থেকে একচিলতে নরম কাদাটে লাল কী বস্তু।

হেরু বলে, 'অক্ত।'

'রক্ত!'....বাবা মেয়ে একসঙ্গে অস্ফুট চ্যাচায়।

'হ্যাঁ—অক্ত।'

স্বর্ণ বলে, 'ও।'....তারপর আঙুলটা বাড়িয়ে বৃষ্টিতে ধুয়ে ফেলে।....'তা বাবা, এগুলো আমরা রাখবো কোথায়?'

'তোর মাথায়।'...বলে গোরাংবাবু চলে যান। প্রচণ্ড অভিমান অসহায়তায় ছটফট করতে-করতে অন্ধকার ঘরে গিয়ে গুম হয়ে বসে থাকেন।

নির্বিকার স্বর্ণ গয়নাগুলো বৃষ্টির মধ্যে খোলা উঠোনের ধানসেদ্ধ করার উনুনটার ভিতর পুঁতে রাখে। হেরু দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে কুপিটা তুলে তাকে যথেষ্ট আলো যোগায়।

এইসব করে, ভিজে কাপড় বদলে, রাত আরও বাড়তে বাড়তে, হেরুকে খেতে দিয়ে স্বর্ণ ফাদার সাইমনের প্রসঙ্গ তোলে। যতক্ষণ খায় হেরু, জবাব দ্যায় না। খাওয়া শেষ করে নিষ্ঠার সঙ্গে আঁচায়। তারপর দেয়ালে পিঠ রেখে পা ছড়িয়ে বসে। এবং বলে, 'পাদরির সঙ্গে দেখা হবে।'

তখন স্বর্ণ বলে, 'আমার ঘুম পাচ্ছে। হেরু, তুমি এখন এসো।'

হেরু হাই তুলে বলে, 'যাই।'

হঠাৎ স্বর্ণর মনে হয়, হেরু কোথায় শোয় রাতে—দিনমান কোথায় ঘোরে, কিছু জিগ্যেস করা হয়নি এ্যাদ্দিন। আজ হেরুকে একটু মূল্যবান লাগছে। সে বলে, 'হেরু—তুমি এখন কোথায় রাত কাটাবে?'

হেরু একটু হাসে।....'বিষ্টির রাতে পড়ে আমার এদানিং খুব কষ্ট গো সন্নদি। শালা গাছপালায় আর পোষায় না। ভাবছি....'

স্বর্ণর মনে মায়া আসে।....'তা বাপু বউর কাছে গিয়ে থাকলেই পারো!'

পলকে হেরুর মুখটা বেঁকেচুরে কুচ্ছিত হয়ে যায়।...'তুমি জানো না সন্নদি, নাকি জানো? কানে আসেনি কথাটা? নাকি এসেছে?

কৌতূহলী স্বর্ণ বলে, 'কী কথা?'

'আমার বউ মাগী তলায়-তলায় জাত দিয়েছে।'

'তার মানে?'

'হ্যাঁ গো! চাঁদপাড়ার এক মোছলমানের সঙ্গে উয়ার বড্ড পীরিত আজকাল।'

...হেরু বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে উঠোনে চলে গিয়ে কেমন হাসে।....'এখন সন্নদি, আমার সন্দ লাগে, উ ছেলাটাও আমার লয়!'

অমনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন গোরাংবাবু। চাপা গর্জে বলেন, 'ওরে হেরু!' ওরে শালা পাষণ্ড বাউরি! তোর মাথায় বাজ পড়বে রে শালা?'

'ক্যানে গো ডাক্তারবাবু? ক্যানে? বাজ পড়বে ক্যানে?'

'চো-ও-প! মেরে মুখ দেব শালার। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি তোর ছেলেকে।'

কাতর হেরু বলে, 'আমি দেখি নাই। আমার ডর লাগে, বড় তরাস বাজে ডাক্তোরবাবু। আমি ডাকাত-টাকাত পাপী মানুষ—তবু আমার বুকে ঢাক বাজে। কী জানি ছেলের মুখে কার মুখ দেখি—'

'বেরো শালা, এক্ষুনি বেরো!'

স্বর্ণ ফোঁস করে ওঠে।...'শোও গো তো বাবা! রাতদুপুরে পাড়া মাথায় করো না। কে কোথায় ওৎ পেতে আছে। হেরু, তুমি এসো।'

'যাই।'...বলে হেরু আস্তে আস্তে খিড়কির ওদিকে অদৃশ্য হয়।

স্বর্ণ এক দৌড়ে খিড়কির দরজা বন্ধ করে এসে কতক্ষণ চুপচাপ ভাবে—হেরুর কথা, তার বউর কথা—আর উনুনের অলঙ্কারগুলোর কথা। মায়ামমতা আর লোভে তার ঘুম কেড়ে নিল আজ। গোরাংবাবুও ঘুমোতে পারছিলেন না। স্বর্ণ করল কী! ছি, ছি—এ অন্যায়, এ অধর্ম।...

এর কদিন পরে এক পাখিডাকা সকালে রাঙামাটির চাষারা ফাদার সাইমনকে মাঠে অদ্ভুত মূর্তিতে আবিষ্কার করল।

ফাদারের গায়ে আষ্টেপিষ্টে বুনো আলুর শক্ত মোটা লতা দিয়ে বাঁধন—আলের ওপর একটা শেয়াকুলকাঁটার ঝোপের সঙ্গে টানা দেওয়া। তাঁর মাথাটা ন্যাড়া, একটা প্রকাণ্ড টিকি রাখা হয়েছে, দাড়িও জায়গায় জায়গায় সাফ এবং পোশাক-আশাক সমেত সারা গায়ে যত কালো, তত মেটেহাঁড়ির তলার কালিতে কুচকুচে। অধিকন্তু, তাঁর গলায় আস্ত একটা হাঁড়ির মাথা মালার মতন বসানো রয়েছে।

ফাদার সাইমন কথা বলতে পারছিলেন না। ধরাধরি করে সবাই মিলে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এল। সেখান থেকে ট্রেন তাঁকে কাটোয়া নিয়ে গেলেন রেলের হান্টার সায়েব।

খবর শুনে স্বর্ণ হাসতে হাসতে মারা পড়ার দাখিল। কিন্তু গোরাংবাবুর মুখ সাদা ছাই। এবার পুলিশে-পুলিশে লাল ফুল ফোটাবে তাঁর ঘরবাড়ি জুড়ে। ভাবলেন, গয়নাগুলো চুপিচুপি তুলে কোন জংলি পুকুরে ফেলে দিয়ে আসবেন।

কিন্তু স্বর্ণ সজাগ বড্ড। উনুনের কাছে গেলেই তার সাড়া আসে। হল না।

কয়েকটা দিন গেল। পুলিশ এল না তবু। তখন একটু আশ্বস্ত হতে পারলেন গোরাংবাবু। এবং আরো কয়েকটা দিন পরে বাবা-মেয়ে দু'জনে ফাদার সাইমনের লাঞ্ছনার ঘটনাটা ইনিয়ে-বিনিয়ে কল্পনা করে খুব হাসাহাসি করতে লাগলেন। ব্যাটা পাদরি আচ্ছা জব্দ হয়েছে। কিন্তু তবু মনের ধুকুপুকু যায় না। সাইমন সায়েব সব চেপে চুপচাপ থাকবেন আর কদ্দিন? এদিনে উঠোনের উনুনের তলায় যখের ধনের মতো চোরাই গয়নাগুলো বর্ষার রসে যেন উজ্জ্বলতর হতে থাকল দিনে দিনে।

পাঁচ

ইয়াকুব তান্ত্রিক ও বশীকরণ

ইয়াকুব আলি ঢ্যাঙা সিড়িঙ্গে কালকুট্টে মানুষ। মাথায় প্রচণ্ড জটা। কুচকুচে কালো গোঁফ-দাড়ি। ইয়াকুবের কপালে লাল ত্রিপুণ্ডক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। ঠোঁট লালরঙা থানের লুঙি হাঁটু-অবধি পরা। কদাচিৎ সে লালরঙের হাফহাতা মেরজাই চড়ায় গায়ে। বেশিরভাগ সময় খালি গায়ে থাকে। কবজিতে আর বাহুতে অষ্টধাতুর বালা আছে গুটিকতক। তার নাকটা তথাকথিত আর্যসুলভ। দুটি ছোট্ট চোখের পর্দা নিরন্তর লালচে। প্রারম্ভে ইয়াকুবের চোখদুটি নাকি আরও বড়ো ছিল। দিনেদিনে কী অনুসন্ধানের চাপে নাকি ক্রমশ ভিতরমুখি হয়ে যাচ্ছে। ইয়াকুবের কতিপয় বার্তা আছে। তার প্রধান বার্তা এক অন্ধকার বিশ্ব সম্পর্কে। পুরুষরূপী জড় দুনিয়ার বুকের ওপর নারীরূপিনী চৈতন্য হাঁটছেন আর হাঁটছেন। রক্তধারায় তাঁর শক্তির প্রকাশ।...ইয়াকুব নিজে পাঁঠা কাটে না। কিন্তু কোদলার কালীবাড়ি গিয়ে পাঁঠাবলি দেখে প্রচণ্ড উল্লাসে হাততালি দিয়ে হাসে—নিঃসরিত তরল লালরঙা শক্তি দু'হাতে কুড়িয়ে ঢকঢক করে খায়। কোদলার রায়বাবুরা মদে চোর হয়ে থাকলে বিগলিত দৃষ্টে তাকে নিরীক্ষণ করেন। হুঁসে থাকলে ক্ষেপে ওঠেন, এই ব্যাটা মোছলমান! খর্বদার।...এবং ইয়াকুব কাঁচুমাচু মুখে রক্ত মুছতে মুছতে পালায়।

লোকে বলে, প্রথম-প্রথম পাঁঠার রক্ত খেয়ে ইয়াকুবের হজম হত না। একবার তো হেগে মরার দাখিল। গোরাংবাবুর হোমিওপ্যাথি আর গালমন্দে সে-যাত্রা বেঁচে যায়। তবু যেন রক্তের কী স্বাদ আছে! ইয়াকুব রক্ত ভুলল না।

ইয়াকুব 'তান্ত্রিক' হবার আগেই তার বউ সান্নিপাতিক জ্বরে মরেছিল। তার ছেলের বয়স তখন ছ' সাত বছর। ছেলের নাম ইসমাইল। এবার কিছু পৌরাণিক রহস্যের অবতারণা করা যাক, কিছুকিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক ফোড়নসহ।

মুসলিম ধর্মের এক 'পয়গম্বর' বা ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ হজরত এব্রাহিমের (ইহুদিরা যাকে বলেন, আব্রাহাম এবং ইহুদি-খৃষ্টান-মুসলিম তিনটি ধর্ম মূলত একই মিথকেন্দ্রিক।) একটি ছেলের নাম ইসমাইল। ঈশ্বরের আদেশে এব্রাহিম তাকে বলি দিয়েছিলেন। অবশ্য চকিতে রক্তাক্ত নিহত ছেলেটির লাশ একটি দুমবা নামক প্রাণীতে রূপান্তরিত হয় এবং তার পাশে জীবিত সহাস প্রফুল্ল ইস্‌মাইলকে দেখতে পান এব্রাহিম। এই ঘটনা থেকেই মুসলিমদের 'কোরবানি' পরবের অনুষ্ঠান।

তান্ত্রিক ইয়াকুবের ছেলের নামও ইসমাইল। পরে সে নাকি রাতারাতি মারা যায়। ইয়াকুব স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে প্রেতসাধক হয়ে উঠেছিল। ছেলের মৃত্যু বিষয়ে তার কৈফিয়ৎ একটু চমকপ্রদ হলেও সেকালের গ্রামে অবিশ্বাস্য নয়। ছেলেটিকে নাকি এক অশরীরী 'চ্যাড়া' অর্থাৎ প্রেত ইয়াকুবের অনুপস্থিতির সুযোগে মেরে ফেলে।

সে রাতটা ছিল অমাবস্যার। ডাবকই গ্রামে একটি ভূতগ্রস্তা মেয়ের ভূত ছাড়াচ্ছিল ইয়াকুব। মেয়েটির মুখ দিয়ে ভূতটা কথা বলছিল। বলতে বলতে ভূতটা এক ভয়ঙ্কর

শর্তের অবতারণা করে। সে বলে, এই সুন্দরী বউটিকে ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছে ছিল না—কিন্তু ইয়াকুব যখন বলছে, তখন না হয় রাখছে কথাটা কিন্তু তার বদলে সে ইয়াকুবের প্রিয়তম জিনিস চায়।

ইয়াকুব বলল, বেশ—তাই নিস। কিন্তু বউমাকে ছেড়ে দে বাবা।

নিচ্ছি তাঁহলে; ভূত হি হি করে হেসে বলল। (আহা, সেই ঢলঢল চাঁদবরনী মেয়ের এলোচুল আর রাঙা ঠোঁটের হাসি ইয়াকুব আজও ভোলেনি—ভোলেনি, কারণ, সে ছিল সর্বনাশী।)

ইয়াকুব মহানন্দে বলল, 'নে নে। কোন 'আপিত্য' (আপত্তি) নাই। যা খুসি নে তুই।'

রূপসী বউ পিঁড়ির আসন থেকে 'মূর্ছা' গেল। ভূত ছাড়ল। ইয়াকুব ওঝা রাতদুপুরে এককাঁদি পাকা কলা একসের মেঠাই-সন্দেশ, আব পাঁচ আনা পয়সা নতুন গামছায় বেঁধে নিয়ে ঠুক ঠুক করে বাড়ি পৌঁছিল। তারপর, হা সর্বনাশ! ছেলেকে ডাকে সে। কলা খাবে, সন্দেশ খাবে বাছা ইসমাইল। বরাবর ঘুম ভেঙে উঠে হাঁ হাঁ করে এইসব খায় সে। তা, ছেলে লাশ। হ্যাঁ—লাশ, সুমসাম কাঠ। অশরীরী তাকে মেরে রেখে গেছে।

সেই রাতে তাকে কবর দিল ইয়াকুব—ঘরের মেঝেতেই। সেই কবরে বসে সে দিনরাত 'সাধনা' করত। নিশিরাতে পড়শিরা তার কাতর ডাক শুনেছে, ইসমাইল! বাপ ইসমাইল! ওঠ, জাগো! ওঠ, জাগো!

অজ পাড়াগাঁ, তখনও রেললাইন হয়নি, সভ্য পৃথিবীর সঙ্গে সব যোগাযোগ তেরশো বছর আগেই হারিয়ে ফেলেছিল রাঙামাটি-কানাসোনা। বৌদ্ধ শ্রমণদের, গম্ভীর স্তোত্র টিলার নিচে তলিয়ে গেছে। অসীম শক্তি রাখে প্রকৃতি। নগরবন্দরকে ঢেকে ফেলেছে তার রোমশ আরণ্য হাতের প্রকাণ্ড ধূসর তালু। রাজা শশাঙ্কের সেই সব দুর্ধর্ষ সেনা আর নগররক্ষী—যারা নাকি কয়েক হাজার বৌদ্ধের লাশ পুঁতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পতাকা উড়িয়েছিল মহাবিহারের মাথায়, তারাও হায়, কে কোথায় নিরুপদ্রব অনন্ত ঘুমে লীন।

পাঠান-মোগল বাদশাহ উজির-নাজির কর্ণসুবর্ণের ঠিকানা জানত না। জানত না সুবে বাংলার হর্তাকর্তা মোরশেদ কুলে খাঁ, মহামতি আলিওয়ার্দি, দুরন্ত বালক সেরাজ-উ-দ্দৌলা, ধুরন্ধর গোরা কেরানি ক্লাইভ সায়েব। মুরশিদাবাদ—যা ছিল 'লণ্ডন অপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী', মাত্র ন'মাইল দূরে কর্ণসুবর্ণের সমাধি থেকে। তবু কোন ঘোড়সওয়ার এদিকে ঘোড়া হাঁকায়নি আর। কবর খুঁড়ে কে আর বেদনা জাগাতে ভালবাসে!

শুধু এক বাঙালি পণ্ডিত রাখালদাস বাঁড়ুয্যে হঠাৎ যেন স্বপ্ন দেখে একদা চিৎকার করে উঠলেন—ওখানে, ওখানে! সবাই চমকে তাকাল রাঙামাটির সবুজ টিলার দিকে।...

যাই হোক, ইয়াকুব সে কারণে একটুও উপদ্রুত হল না। আজ লোকে বলে, সে ছেলে ইসমাইলকে আসলে হজরত এব্রাহিমের মতনই বলি দিয়েছিল—তার ঈশ্বর (ঈশ্বরী বলাই ভালো) সন্তুষ্ট হবেন বলে।

এ ঘটনার কে তদন্ত করবে? রাঙামাটি কানাসোনায় ইতিহাসের সমাধি—শ্মশান। এখানে স্বভাবত ভূতপ্রেত অশরীরী আত্মাদের আনাগোনা আছে। 'মোহেন-জো-দোড়ো' কথাটার মানে যেমন মৃতদের ভূমি! এও তো এক মোহেন-জো-দোড়ো।

তবে এ সবই ইয়াকুবের সেই রক্তদোষঘটিত। রক্তে শক্তির নিঃশব্দ মহানাদ—তার মাকালীর ওই ভাষা। ইয়াকুব বলে, 'আমার দোষ নাই। মা যা করান তাই করি।'

কোদলার ঘটকঠাকুর একদিন সন্দেহবশে বলেছিল, 'ইয়াকুব কিছু পেলি?'

ইয়াকুব জবাব দিয়েছিল, 'পেয়েছি ঠাকুরমশাই—পেচণ্ড দিয়েছেন মা।'

ঘটকের যা স্বভাব—চোখ পিটপিট করে ফিসফিসিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিগ্যেস করেছিল, 'কী কী পেলি?'

ইয়াকুব বলেছিল, 'আন্ধার!'

'আঁধার!

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আন্ধার।'

'সে কী রে বাবা?'

'ঠাকুরমশাই, দুনিয়ার ওই এক আন্ধার। থমথমে চান্দিক। আসমানে রক্তসন্ধের রাঙাপানা মেঘ উঠেছে। আর তিনি আসছেন। ঠাকুরমশাই, প্রথম-প্রথম ডর পেতাম! তরাস বাজত। সে কী রক্তের দরিয়া উথালপাথাল! সে কী রূপ চোখের সামনেতে! দিগম্বরী, 'বেভাঙ্করী' (এই শব্দটা ইয়াকুবরচিত—একটা ভয়ঙ্কর কিছুর দ্যোতক) হাঁ হাঁ, খাঁ খাঁ রূপ...উঃ, বাসরে!....'

পাড়ার লোকে পচা লাশের গন্ধে একদা উত্যক্ত হল। দল বেঁধে মার-মার করে হাজির। ওরা সবাই মুসলমান। কেমন মুসলমান? জুহা মৌলবীর মতে—'নামে মুসলমান, চলনে হেঁদু।' হ্যাঁ, রাঙামাটির মুসলমানরা হজরত আলি এবং মা কালী উভয়েই বিশ্বাস রাখত। একবার ইজ্রশেখর বউ—সেই নির্লজ্জা পাড়াবেড়ানি ধুঁদুল গড়ন চাপ্টামুখি ফুলনবিবি—যার প্রকাণ্ড 'কদ্দু' অর্থাৎ লাউয়ের সদৃশ স্তনের দরুন সবাই আড়ালে 'কদুওয়ালি' বলে ডাকত, তার সঙ্গে চরণ চৌকিদারের মেয়ে বিন্নির বেজায় তর্কাতর্কি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সেটা উল্লেখযোগ্য। ফুলনের মতে মা-কালীর পায়েরতলায় ধবধবে সাদা যে মরদটা চিৎপাত ন্যাংটো পড়ে থাকে, সে হচ্ছে মাকালীর ভাসুর। ভাসুরের বুকে পা দিয়ে লজ্জা পেয়েছিল বলেই না মেয়েটা লাজশরমে একহাত জিব কেটে ফেলেছে!

বিন্নি বলে, 'যাঃ! ভাসুর কেন হবে? ও তো শিব—মাকালীর বর।'

ফুলন বিন্নির চেয়ে তেজী। সে বলে, 'তোর মাথা লো ছুঁড়ি! ভাসুরকে ভাতার করা তোর অব্যেস নাকিন রে?'

কথা শুরু হয়েছিল মজা ভাগীরথীর ঝিলে। এক কোমর জলে দুজনে 'মাখনা ফল' তুলছে। শুকোলে পেষাই করে আটা হবে। রুটি বানাবে।

এক সময় লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। বিন্নি বলে, 'ও টে (লো'-এর বিকল্প) ভাসুরভাতারি '—খাকি', (বিন্নি মুসলমানি ফুলনকে বোঝাতে চাইছিল যে তার স্বামী ইজু শেখের Circumcision অর্থাৎ 'খত্না' ঘটিত মাংসের টুকরো ভক্ষণ করেছে—কিংবা আরো অশ্লীল কিছু) ও টে মোছলমানী! ও টে গরুখাকি!'

ফুলনও পাল্টা চালিয়ে যায়। অবশ্য তাতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা কস্মিনকালেও ঘটে না পাড়াগাঁয়ে।...

সে কথা থাক্। পড়শীদের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল ইয়াকুবের ঘরে। কবর কোথায়? মাটির বেদিতে তেলহলুদ আর কী মসলামাখানো একটা লাস দেখল তারা। তার বুকের ওপর ইয়াকুব বসে রয়েছে। হ্যাঁ, লাসটা তার ছেলে ইসমাইলের।

ক্ষিপ্ত জনতা ইয়াকুবের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। মারও দিল প্রচণ্ড। তবে এসব মোটেও ধর্মের কারণে নয়। ছেলেকে খুন করে ইয়াকুব মড়াসাধনা করছে—এক। মড়ার পচা গন্ধে টেকা যাচ্ছে না—দুই। এবং আগাগোড়া সমস্তটাই বিদঘুটে—তিন। এই তিনটি কারণে তারা ক্ষেপে গিয়েছিল।

তারপর থেকে ইয়াকুব বসতি থেকে দূরে বহতা ভাগীরথীর পাড়ে নির্জনে তার ঘর বেঁধেছিল। ওই দেড়কাঠা পরিমাণ জায়গা তাকে দিয়েছিলেন বহরমপুর সৈদাবাসের এক জমিদার চক্রবর্তীবাবু। ইয়াকুব তান্ত্রিকের ওপর কী কারণে তাঁর আস্থা জেগেছিল।

জায়গাটা চমৎকার। ওখানে ভাগীরথী মৃদু বাঁক নিয়ে উত্তর-পূর্ব থেকে এসে দক্ষিণবাহিনীর হয়েছে। নদীমুখো দাঁড়ালে বাঁয়ে দূরে কর্ণসুবর্ণ টিলা নজরে পড়ে। ডাইনে ডাবকই, কোদলা ইত্যাদি এবং পিছনে রাঙামাটি। খাঁ-খাঁ মাঠ চারপাশে। সামান্য দূরে ডাইনে শম্ভু ঘেটেলের ঘর এবং খেয়াঘাট। বাঁয়ে কয়েক পা এগোলেই শ্মশান। বাবলা গাছ আছে। গুটিকয় ঝাউ গাছ—আর আছে এক মহা বটবৃক্ষ। মা-জাহ্নবীর গায়ে শ্মশান আর এহেন মহাবট সুন্দর গয়নার প্রতীক।

ইয়াকুব তান্ত্রিকের যিনি গুরু, তিনি এক হিন্দু সন্ন্যাসী—ওই বটতলায় একদা 'উদাসী' ইয়াকুব আলি তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিল। প্রচুর গাঁজা খাওয়া হয়েছিল গুরু শিষ্যে। যাবার সময় কিছু 'তত্ত্ব' দিয়ে গিয়েছিলেন—ইয়াকুবের মাথায় তাতেই জটা গজিয়ে যায়।...

ইয়াকুব বেশ কয়েকবছর একনাগাড়ে কাটানোর পর ভূত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে, লোক-সমাজে তার প্রতিষ্ঠা হল। তারপর সে সবার সঙ্গে মেশে। সব জায়গায় ঘোরে। আর তার লাঞ্ছনার ভয় নেই।..

সে-রাতে জোর বর্ষা নেমেছে। চাঁদঢাকা ঘন বৃষ্টিমেঘ আকাশজোড়া কালো ছায়ার মধ্যে গলে পড়ছে। গঙ্গায় সবে নতুন ঢলটি আসতে লেগেছে ক'দিন থেকে। কাজলা জল ঘোলা করে দূরের পাহাড়ের ময়লা বয়ে আসছে। মহাবটের লম্বা শেকড় ধরে ঘোলা জল উঠছে কিনারার দিকে। তিনটে মড়ার মাথার খুলিতে নারকেল মালাই চাপিয়ে বিযোড়সংখ্যক চাল ফুটোচ্ছিল ইয়াকুব। মাথার ওপর বিশাল বটের ডালপালা। গুঁড়িতে বাজপড়ার ফলে একটা খোঁদল সৃষ্টি হয়েছে। সেখানেই ইয়াকুব তন্ত্র চালনা করছিল। কিন্তু

বৃষ্টি বাধ সাধছিল দফায়-দফায়। চাল ফুটবে কী—জল গরম হতেই চায় না। এই তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার নাম 'ছিটেবান'। যে ভাতগুলো ফুটতে ফুটতে ছিটকে পড়বে, শূন্যে লুফে নিতে হবে। ওই সিদ্ধ সর্বনেশে ভাতটা যাকে খাওয়ানো যাবে, সে একেবারে বশ-বিবশ। সরা বাউরি লখা-মরার ছোট ভাই। যোয়ান ছেলে। দেড় কাঠা চাল আর সওয়া পাঁচ আনা পয়সা দিয়েছে তান্ত্রিককে। চরণের মেয়েকে বশ করে দিতে হবে। এসব প্রক্রিয়া করেনি ইয়াকুব। গতবছরের খরায় তল্লাটে মানুষের পেটের ধান্দা অস্থিরভাবে বেড়েছে। ইয়াকুবেরও বেড়েছে। এ দুঃসময়ে বাউরি ছোঁড়াটার যৌবন উথলে উঠেছে! তবে মর শালা! একবার নাকি আফতাব দারোগা মধুপুরের সরেস লম্পট গয়েশকে হাজতে রেখেছিল বিনিভাতে তিনদিন। তারপর বলেছিল, 'কী রে শালা? এখন ভাত 'কুরকুরায়', না যৌবন 'কুরকুরায়।' গয়েশ কেঁদেকেটে চিঁচিঁ করে বলে, ভাঁত! এই বাউরি ব্যাটার যৌবন 'কুরকুরিয়েছে'। তবে মর।

ইয়াকুব একবেলায় একসের চালের ভাত খায়। এখন বৃষ্টি এসে বাঁচিয়ে দিল তাকে। সরা পিছনে কুকুরের মতো লেজ গুটিয়ে ভিজছে চুপচাপ। তার গা শিউরে উঠছে। বিন্নিরে, বিন্নি! তোকে না ছুঁতে পেলে এ ভরা যৌবন 'ব্রেথা' যাবে! সেই যে গানে বলে—

এ ভরা যৌবন জোয়ারে
মানে না মন বঁধূয়ারে।।....

কত চাঁদনি রাত, কত ঝিমন্ত দুপুর, ধুলো উড়িয়ে মাঠে কি ঝিলের জলে ওই গান বিন্নির দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে সরা! বিন্নি হেসেছে—কিন্তু ওইটুকুই। স্বামীর ভাত এই মহাদুর্দিনেও খেতে যাবার নাম নেই বিন্নির, তা বোঝা যাচ্ছিল। তাই সরার আশা বাড়ছিল। কিন্তু বিন্নি পাত্তা দিচ্ছে না। সরা গায়,

পীরিতে ও সুন্দরী
রঙ্গ (অঙ্গ) কি তোর ক্ষয়ে যাবে?
(একদিন) চিত হয়ে ভাসবি জলে
ডালকয়োতে (দাঁড়কাক) ঠুকরে খাবে।।

এমনতরো শাসানি বিন্নি কানে নেয় না। অতএব সরা শেষঅবধি তান্ত্রিকের পায়ে সাধাসাধি করেছে। দেড় সের চাল, সওয়া পাঁচ আনা পয়সা দক্ষিণা। তাতেই রাজী সরা।

বৃষ্টি সব ভণ্ডুল করে দিল। তখন ইয়াকুব বলল, 'আজ আর হবে না বাপ্। তোর বরাত মন্দ। আসলে হয়েছে কী, যখন তখন এ কর্ম করলেই তো হয় না। তিথি নক্ষত্তর আছে। বললাম, কদিন সবুর কর। অমাবস্যা ছাড়া এসব হয় না। সামনে অমাবস্যায় নির্ঘাৎ ফলবে। আজ, বাড়ি যা।'

অগত্যা সরা প্রায় কান্না চেপে বাড়ি গেল ভিজতে ভিজতে। ইয়াকুব মুণ্ডুগুলো গাছের ওপর দিকের খোঁদলে রেখে নিজের ঘরে ফিরল।

এসেই চমকাল সে। তার ঘরে তালাচাবি দেবার দরকার হয় না। শেকল তুলে রাখে মাত্র। এখন ঘরটা খোলা। ভিতরে একটা বেদীমতো আছে। তার ওপর একটা মড়ার মাথা,

মাকালীর পট, জড়িবুটির দঙ্গল, সিঁদুর তেলের পিদিম কত কী সব রয়েছে। তার একপাশে মেঝেয় চিত হয়ে পা তুলে শুয়েছে হেরু ডাকাত! পিদ্দিম জেলে রেখেই গিয়েছিল ইয়াকুব। এখনও জ্বলছে। ইয়াকুবের বুকের ভিতর শুকিয়ে গেল। কিন্তু সে চকিতে তার তান্ত্রিক ভাবভঙ্গীতে ভয়ানক এক হাঁক মেরে বসল। অব্যক্ত একটা গর্জন সেটা। ভূত-প্রেত ছাড়াতে গিয়ে এই হাঁক মারে সে। বুক কাঁপিয়ে দায় লোকের। চেহারাও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সে হাঁকে—'হাঁ-উ-ম। পরক্ষণে—কালী-কালী-কালী-কালী...হাঁ-উ-ম্.. ! (ওঁ-এর অপভ্রংশ)।'

হেরু নির্বিকার। মিটিমিটি হাসছে।

তখন ইয়াকুব তার বেদিতে লাফ দিয়ে উঠল। একটা মড়ার মাথা তুলে তার দিকে নাড়তে নাড়তে অদ্ভুত কী সব বলে গর্জাতে লাগল—'ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ...'

হেরু হাসতে লাগল।

তখন ইয়াকুব আচমকা বেদির পাশ থেকে একটা ঝলসানো খাঁড়া বের করল। সেটা নাচতে লাগল। মুখে সেই বুলি। ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ...

কোন কাজ হল না তাতে। হেরু বলল, 'আরে যা যা!'

তখন ইয়াকুব খাঁড়ার কোপ বসাতে গেল। একেবারে সত্যি সত্যি কোপ। হেরু তার আগেই হাত বাড়িয়ে খাঁড়াটা ধরে ফেলল। তারপর ইয়াকুবের একটা হাত ধরে একটানে বসিয়ে দিল মেঝেয়। ইয়াকুব জানল, এ হেরু সে হেরু নয়—যাকে গত মাসে ঝিলে দেখেছিল, যে বলেছিল—একদিন যাবো চাচা তোমার কাছে।

এ হেরু ডাকাত। ইয়াকুব ঝিম মেরে বসে রইল।

হেরু বলল, 'চাচা ক্ষ্যাপামি করো না—শোন। আমি তোমার ঘরে রাত্তিরে শোব।'

ইয়াকুব লাল চোখে তাকায় ও মুখের দিকে।

'হ্যাঁ, শোব। তার বদলে তোমাকে মালকড়িও দোব। বিনি পয়সায় শোবে না হেরু।'

ইয়াকুব ঘড়ঘড় করে বলল, 'এ ঘরে তুই শুতে পারবি না বাপ। চ্যাড়ার উপদ্রব হবে।'

'সে আমি দেখব হে!'

'পারলে শুস।'

'রোজ এসে শোব।'

'হুঁ।'

'তোমাকে অনেক সোনা-রুপোর গহনা দোব, চাচা। বুঝলে?

'হুঁ।'

'হুঁ, নয়। সত্যি সত্যি দোব।'

'গয়নায় আমার কী কাজ?'

'বেচে পয়সা পাবে। নিকে করে মাগ আনবে ঘরে।' হেরু হাসতে থাকে। 'বলে, সোনা রুপোর কী কাজ? ন্যাকা!'

খানিক পরেই অবশ্য দুজনে বেশ মিল মিশ হয়ে গেল। ইয়াকুব খেজুর-তালাই পেতে দিল। তারপর হেরু বলল, 'চাচা খুব ক্ষিদে পেয়েছে! কিছু আছে ঘরে?'

ইয়াকুব জবাব দিল, 'দেড় সের চাল রেঁধেছি ওবেলায়। সকালের পান্তা হবে—'

'এখনও যা আছে, খাবি তো তাই খা। শালুন-টালুন কিন্তু নাই বাপ্।'

'খাব। পেঁয়াজ আছে তো?'

'পেঁয়াজ? উঁহু।'

'হেরু অগত্যা নুন দিয়ে মাটির প্রকাণ্ড গামলায় ভাত খেতে বসে। তখন হঠাৎ ইয়াকুব বলে, 'আরে শালা চোট্টা! ওখেনে তো তোর মাগ আছে শম্ভু ঘেটেলের ঘরে। সেখেনে গেলে তো মাগের পাশে শুতিস। রাঙী আজ 'পেচণ্ড' জালমাছ (চিংড়ি) ধরে এনেছে। শালুন পেতিস।'

হেরু চুপচাপ গোগ্রাসে গিলে চলে।

ইয়াকুব লাফিয়ে ওঠে। 'বাপ হেরু! একদণ্ড থাম্‌বি? আমি যাব আর আসব। তোর মাগের কাছে থেকে শালুন এনে দিই।'

হেরু গর্জায়। '...ন্না!...'এবং তার মুখের ভাত ছিটকে পড়ে। সে দম নিয়ে বলে, 'ও মাগীর হাতে আমি এ জন্মেতে আর খাব না চাচা। মাগীর জাত নাই।'

ইয়াকুব মিটি মিটি হাসে। তার তো কিছু অজানা নেই।

কিন্তু শিউরে উঠেছিল ইয়াকুবসাধু। তার ঘরে রাতের আশ্রয় চাইছে, এর পিছনে কী কুটিল ইচ্ছে যেন রয়ে গেছে হেরু ডাকাতের। একবার ভাবল, সাবধান করে দেবে রাঙীকে—আবার ভাবল দুচ্ছাই! আমি কি গেরস্থ মানুষ? ওসব পরের ঝামেলা বওয়া আমার কর্ম নয়। ইয়াকুব পাগলাটে মানুষ হলেও মাঝে মাঝে বেশ হুঁশিয়ার হয়ে চলতে পারে। সে হুসিয়ার হল। মনকে লক্ষ্য করে বলল, চোপরাও ব্যাটা! কত লোকের কত গোপন কথা চেপে রেখেছ—এটাও ঝুলিতে ভরে রাখো। হুঁশিয়ার!

হু, এক জ্যোসনারাতে ব্রহ্মডাঙার নির্জন টিলার রাঙী বাউরানের সঙ্গে দানেশ ব্যাপারীর মস্তানি এখন মনে আছে ইয়াকুবের। রাতচরা তান্ত্রিক সাধুফকির মানুষেরা কত কী দেখবার সুযোগ পায়। সেই শ্বাসপ্রশ্বাস, সেই চাপা কামনাদ, উথালপাতাল জড়াজড়ি! ছিঃ ছিঃ!

তবু অবাক লাগে, ওই রাঙীই না কেঁদে মাথা ভেঙেছিল—এখানে টিশিন দিলে ক্যানে, টিশিন? টিশিন না দিলে লোকটা মোট বইতে যেত না—আর ডাকাতও হত না! বাহারে সতীলক্ষ্মী, বাহা বাহারে!... হেরু যখন নাক ডাকাচ্ছে, ইয়াকুব তুড়ি দিয়ে এইরকম বিড়বিড় করে বাহাধ্বনি দিচ্ছে।

আর দানেশের ওপর ইয়াকুবের রাগ আছে প্রচণ্ড। দানেশ ব্যাপারী পাটের কারবার করে এলাকায়। এখান থেকে কিনে বেচে আসে গঙ্গা পেরিয়ে বেলডাঙার বাজারে।

একখানে ভুত ছাড়ানোর দক্ষিণাবাবদ ইয়াকুব সের দশেক পাট পেয়েছিল গতবছর কার্তিক মাসে। ব্যাপারী পাটটুকুর দাম দিতে যা ভুগিয়েছিল কহতব্য নয়। তবে শুধু সেজন্যও নয়; ব্যাপারী তাকে বিদ্রূপ করে বলেছিল, তুমি তো হেঁদুতে জাত দিয়েছ চাচা—তোমরা আবার ভাবনা? মাকালী কোলে লিয়ে দুধ খাওয়াবে। পয়সা তুমি কী করবে?.... ব্যাপারীর লোকজন আছে। পয়সাকড়ি আছে। ইয়াকুব তা জেনেও ক্ষেপে ওর দুগাছা দাড়ি উপড়ে নিয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল নিজের 'থানে!' ব্যাপারীর লোকেরা ওকে তাড়া করে এলে চকচকে এই খাঁড়াটা নিয়ে ইয়াকুব খুব লম্ফঝম্ফ করে ভাগিয়ে দেয়। অবশ্য তারপর ঝামেলাটা আর এগোয়নি। এলাকার মেয়েগুলোকে এবেলা-ওবেলা পটাপট ভূতে ধরে। ইয়াকুব ছাড়া উপায় নেই। তাই ওদের রাগ পড়ে গেলেও ইয়াকুবের রাগটা সমানে জ্বলেছে। ইচ্ছে আছে, বাগে পেলে দানেশ ব্যাপারীকে মায়ের উদ্দেশে বলি দেবে।

সুতরাং হেরু যা করতে চায়, করুক। ইয়াকুব লেলিয়ে দিতে ত্রুটি করবে না। এবং এইসব ভেবে কয়েকটা দিন তার মাথাটা গরম হয়ে রইল।

ক'রাত পরে হেরু ইয়াকুবের সামনে তার প্রতিশ্রুত সোনাদানা এনে হাজির করল। ইয়াকুব হতভম্ব হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গনগনে চোখে তাকিয়ে রইল। মেঝেয় ঝকঝক করছিল লম্ফের আলোয় সেই সাতগেরস্থর ধন। রুদ্ধশ্বাস সাধু চেঁচিয়ে উঠল—'এ কার সর্বনাশ করে এলি হেরু—ঠিক গোরাংবাবুর মতনই।'

হেরু মিটিমিটি হেসে বলল, 'অত খবরে তুমার কাজ কী হে? দিলাম, লুকিয়ে রাখো। সময় মতন ঝেড়ে আসবে—হয় কাটোয়া, লয় তো বর্ধমান। সাবোধান চাচা, বহরমপুরবাগে বেচতে যেও না।'

কাতর ইয়াকুব বলল, 'এ আমাকে সইবে না বাপ, সইবে না! আমার চোখ জ্বলে গেল রে! তুই লিয়ে যা, তোর পায়ে পড়ি হেরু।'

হেরু গোঁ ধরে বলে, 'ন্যাকা! সোনা দিয়ে কী হয় জানো না! তাই লোকের বাড়ি সওয়া পাঁচ আনা দরে ভূতের চিকিচ্ছে করে বেড়াও।'

ইয়াকুব এবার বুক ফেটে কেঁদে ওঠে।...'আমাকে ক্ষ্যামা দে বাপ! আমার সব্বাঙ্গ হু হু করে জ্বলে গেল! হেরু, এগুলো তোর বউকে দেগে বরং—মাগী বড় কষ্টে আছে রে!'

অমনি হেরু তার জটা ধরে ফেলে। মাটিতে নামিয়ে আনে প্রকাণ্ড মাথাটা। হাঁসফাস করে বলে, 'শালার বুজরুকি এবারে না ভাঙলে চলছে না। যেচে পড়ে দিতে চাইছি, আর আমাকে ধম্মোজ্ঞান শোনাচ্ছে! বল্ শালা, লিবি কি না লিবি?'

ইয়াকুবের ভর উঠে পড়েছে অমনি। প্রথমে তার দেহের নিচের দিকটা মাটিতে ঝটপট করতে থাকে। তারপর কী এক অমানুষিক শক্তিতে সে মাথা তোলে। হেরু ছিটকে পড়ে একপাশে। এমন হতভম্ভ হয়ে পড়ে যে মুখে রাবাকিা সরে না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ইয়াকুব সাধুর কাণ্ড দ্যাখে। ইয়াকুবের মাথাটা প্রচণ্ড দুলছে চক্রাকারে। জটাগুলো সট্ সট্ করে আওয়াজ তুলছে। মুখে ফেনা জমেছে। সে গোঁ গোঁ করে বলছে—কালীকালীকালী... আর সেই সময় বাইরে শনশন করে হাওয়া এল ভরা গঙ্গার দিক থেকে। গাছপালাগুলো

যেন গেঙিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ঝরঝর করে বৃষ্টি শুরু হল। ঘরের খড়ের চাল কাঁপতে লাগল। হেরুর মনে হল, চারপাশ থেকে কারা যেন ঘরটার ওপর ভীষণ চাপ দিচ্ছে। হেরুর বুক অমনি কেঁপে উঠল। সে কোণের দিকে সরে এসে বসল। ইয়াকুব অনর্গল কী সব বলে যাচ্ছে, বোঝা যায় না। হেরু কানখাড়া করে শোনা ও বোঝবার চেষ্টা করল। ক্রমশ তার মনে হতে থাকল যে আজ রাতে যেখানে হানা দিয়ে এইসব সোনার গয়না সে এনেছে, সেখানে ঠিক যা যা ঘটেছে—খুঁটিনাটি বলে যাচ্ছে ইয়াকুব। এই ধারণা মাথায় ঢোকা মাত্র হেরুর শরীর অবশ হয়ে গেল। সে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে সাধুর দিকে।...

কতক্ষণ পরে ইয়াকুব শান্ত হয়। উবুড় হয়ে বেদিতে মাথা রেখে চুপচাপ পড়ে থাকে। তখন হেরু ডাকে, 'চাচা, চাহা হে! ওহে সন্নেসীচাচা!'

ইয়াকুবের সাড়া নেই। হেরু আরও দু-চারবার ডেকে আড়ষ্ট হাতে ভয়ে ভয়ে গয়নাগুলো গামছায় বেঁধে নেয়। তারপর বেরিয়ে যায়।

তার অনেক পরে ইয়াকুব ওঠে। লম্ফটা নিভে আসছে। বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। দরজা খোলা। সে গম্ভীরমুখে তাকায় দরজার দিকে। কী ঘটেছিল, স্মরণ করতে থাকে।

আর পরদিন সকালে রাঙীর লাশটা দেখা যায় গঙ্গার বাঁকের একটা খোঁদলে। তার ছেলেটা ট্যা ট্যাঁ করে কাঁদে শম্ভু ঘেটেলের ঘরে। রাজ্যের লোক এসে ভিড় করে। আর সেই ভিড় সরিয়ে হঠাৎ এগিয়ে আসে ইয়াকুব তান্ত্রিক। শম্ভুর দিকে লাল চোখে তাকিয়ে বলে, 'আমাকে ছেলেটা দিবি ঘেটেলদাদা?'

শম্ভু চোখ কটমট করে বলে, 'ক্যানে? বলি দিবি?'

'না।'...লোভী চোখে ইয়াকুব তাকায় রাঙীর ছেলের দিকে।...'না হে ঘেটেলদাদা, পুষব। তুই নৌকো নিয়ে বাইতে যাবি—তখন ইটাকে শ্যালে লিয়ে পালাবে। তুই ছেলেটা আমায় দে।'

ভিড়ের হিন্দু-মুসলমান একস্বরে বলে, 'দিয়ে যাও—ভাল হবে।'

ছয়

রাঙীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

মনুষ্যপ্রেমিক গোরাং ডাক্তার রাঙীহত্যার খবর শুনে পড়ি-কি-মরি করে টাট্টু চেপে কোদলার ঘাটে চলে যান। তখন ইয়াকুব রাঙীর ছেলেকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে আস্তানায় তুলেছে। শম্ভু ঘেটেল সব খতিয়ে দেখে দুধেল ছাগলটাও তাকে দিয়েছে—যার নাম মুংলি, আসলে রাঙীরই ছাগল। রাঙামাটি গাঁয়ে থাকবার সময় অর্থাৎ হেরু আন্ডারগ্রাউন্ডে যাবার আগে যখন ইতিহাসের সেই কবরখানায় টিলায়-টিলায় কাঠঘুঁটে কুড়িয়ে বেড়াত, তখন মুংলিকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। ব্যাপারটা কতকটা বর্তমান নৃশংসতা ও করুণার সঙ্গে বেশ মিলে যায়। মুংলির মাকে শেয়ালে ধরেছিল। রাঙী তখন মাটিতে ঝুঁকে একটুকরো শুকনো গোবর তুলছে। পিছনে ছাগলটার চ্যাঁচানি শুনে সে ওই গোবরটুকু ছুঁড়ে মেরেছিল—তাতে অবশ্য শেয়ালটার কিছুই হয়নি। তবে লাভের মধ্যে শেষঅবধি কিছু মাংস পাওয়া যেতে পারে, রাঙী ভেবেছিল। সেইসময় বৈঁচির ঝোপের দিক থেকে চারঠ্যাঙে লাফাতে লাফাতে এসে গেল একটা মোটাসোটা ধাড়ী বাচ্চা। রাঙীর হাঁটুর কাপড়ে চুমু খেয়ে সম্ভবত মাতৃসম্বোধন করল আর রাঙী করল কী, তাকে ঝুড়িতে চাপিয়ে আঁচল ঢাকা দিয়ে বাড়ি নিয়ে এল। বাচ্চাটা বরাবর ঘরে লুকিয়ে পুষত সে। পাছে কেউ টের পায়, রাঙী মুংলির মায়ের মাংসের ভাগ দাবি করতেও যায় নি। এবং কী অদ্ভুত যোগাযোগ, ওই ছাগলদুটোর মালিক ছিল দানেশ ব্যাপারী। কিংবা দানেশ ব্যাপারীর বউ! কে জানে, দানেশের সঙ্গে তার নিষিদ্ধ সাঁকো স্থাপনের ব্যাপারে এই মুংলির কোন ভূমিকা আছে কি না। এবং কেই বা জানে, হেরুর নিজের স্ত্রীচরিত্রের প্রতি সন্দিগ্ধতা ও এই চরম পরিণতির পিছনেও মুংলির কী অবদান।

সবাই দেখেছে, ইয়াকুব সাধুর বুকের কাছে দু'হাতে সাবধানে রাখা রাঙীর কচি বাচ্চা, কনুইয়ের কাছে বাঁধা মুংলির দড়িতে টান পড়ায় মুংলি চারঠ্যাঙে মৃদু আপত্তিসহ বঙ্কিম গতিতে চলেছে, এবং মুংলির পুষ্ট ধাড়ী ছানাটা তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে কখনও মায়ের আগে—কখনও পিছনে চমৎকার দৌড়চ্ছে। আকাশ থেকে তখন বৃষ্টি ধোওয়া পবিত্র রোদ্দুর গলে গলে পড়ছিল। ভরা গঙ্গায় একটা করুণাঘন স্বস্তি চকচক করছিল। আর বাঁকের কাছে লাঠিহাতে রাঙীর লাসটা পাহারা দিচ্ছিল—আবার কে—এলাকার সেই নীলমণি নীলকুর্তা নীলপাগড়ি চরণ চৌকিদার। 'ডিউটিতে' থাকলে তাকে রাশভারি ও সম্ভ্রান্ত দেখায়।...

গোরাং ডাক্তার টাট্টুটা চরতে দিয়ে সব ঘুরে-ফিরে দেখে বেড়ান। কাকেও কিছু বলেন না। কোন প্রশ্নও করেন না। রাঙীর লাসটা দেখেই তিনি মুখ ঘুরিয়ে নেন। চরণ নিঃশব্দে ও গাম্ভীর্যে তাঁকে সেলামবাজী করে প্রথা অনুযায়ী। গোরাং ডাক্তার কয়েক মিনিট গঙ্গার ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে চলে যান ইয়াকুবের আস্তানার দিকে। একলা চিলটা ট্যা ট্যা করে মাথার ওপর উড়ে যায়, আর সেই ডাকটা কতক্ষণ

মাথার ভিতর ঘুরে বেড়ায় গোরাংবাবুর। মনে হয়, এক্ষুনি তাঁর চোখ ফেটে বেরিয়ে পড়ার জন্যে চিৎকারটা ভীষণ ছটফট করছে। চোখে রুমাল ঢাকেন একবার। তারপর সামলে নেবার জন্যে দূরে রাঙামাটির টিলাগুলোর দিকে তাকালে ঘোড়ায় চেপে আসা আফতাব দারোগার মূর্তিটি নজরে পড়ে।

ইয়াকুব তার ডেরার সামনে আতাগাছের গুঁড়িতে মুংলিকে বেঁধে তখন দুধ দুইতে ব্যস্ত। বাচ্চাটা তার পাঁজরে ঢুঁ দিচ্ছে। আর সুড়সুড়ি লাগায় সাধু মুখ ঘুরিয়ে হ্যাং হ্যাং শব্দ করছে। কয়েক মুহূর্ত দেখার পর গোরাংবাবু বলে ওঠেন, 'এ্যাই হতচ্ছাড়া! ছাগলটা মরে যাবে যে। বাপের জন্মে নেইকো গাই—তো চালুনি নিয়ে দুইতে যায়। এ শালার হয়েছে এই কাণ্ড!'

এইসব মানুষের সঙ্গে গোরাংবাবুর বাক্যালাপের ভঙ্গীটি এরকমই। ইয়াকুব ত্বরিতে ঘুরে ডাক্তারকে দেখে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসে।

গোরাংবাবু বলেন, 'হেরুর ব্যাটা কই?'

'কেঁদে কেঁদে ঘুমোচ্ছে।'...ইয়াকুব ঘরের দিকে চোখ ঠারে।

'এ্যাই শালা সাধু।' গোরাংবাবু সন্দিগ্ধভরে বলেন। '...তোর মতলব কী বল্ তো?'

ইয়াকুব ছাগলের বাঁট টানতে টানতে জবাব দেয়—'কিসের?'

'বলিদান দিবি না তো?'

'হ্যাং! হ্যাং! পুযব। আমার সখ।'

'হ্যা রে, তুই ব্যাটা তো ক্ষ্যাপা—নিজের ছেলেটাকে নাকি বলি দিয়েছিলি!...' বলতে বলতে কী কৌতুকবোধে হাসেন গোরাং ডাক্তার।...'শোন, এ্যাকুব, স্পষ্ট বলছি—হেরুর ছেলে নিতে হলে তোকে কাগজে টিপছাপ দিতে হবে। আফতাব দারোগা আসছে। হুই দ্যাখ্! দারোগা আর আমি সাক্ষী থাকব।'

ইয়াকুব দূরে দারোগা দেখে তাচ্ছিল্য করে বলে, 'হ্যাৎ, হ্যাৎ!'

'দাঁড়া শালা, দাঁড়া! আফতাব দারোগা তোর পিণ্ডি চটকাবে, আসতে দে।' গোরাংবাবু সকৌতুকে শাসান। 'মোছলমান হয়ে সাধুগিরি ঘোচাচ্ছে! আফতাব দারোগা কড়া মোছলমান। দেখেছিস, তার কপালে নমাজ পড়ে কেমন ঘেঁটো ধরে গেছে?'

ইয়াকুব ভয় পায় একটু। আধ গেলাস দুধ নিয়ে উঠে আসে। চাপা গলায় বলে, 'ডাক্তারবাবু, হেরুকে আমি ধরিয়ে দেব। দারোগাকে বলবেন, শালা ডাকু রেতের বেলা এসে আমাকে বড্ড জ্বালায়। যা ভাত থাকে, খেয়ে ফেলে। তার ওপর ওই একখানা মাত্র তালাই—আমাকে খালি মেঝেয় শুতে হয়।'

গোরাংবাবু হতভম্ব হয়ে যান। কিন্তু কথাটা ভাববার মতো।

আর না, হেরুকে ধরিয়ে দেওয়া দরকার। একটার পর একটা তাজা মানুষগুলোকে মেরে ফেলছে দিনের পর দিন। সোনাদানা পয়সাকড়িগুলো অন্য ডাকাতের মতন কোন কাজে লাগালেও বোঝা যেত তার ডাকাতির উদ্দেশ্য। ব্যাটা নির্বোধ জন্তু যেন নিতান্ত উদ্দেশ্যহীনভাবে মানুষ মারছে। কে জানে কত সোনাদানা মালকড়ি ওই গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে সে! স্বর্ণের ধারণা এটা। শুনে মনে হয়েছে, অসম্ভব নয়—সেই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

• ডাক্তার ফিসফিস করে বলেন, 'সত্যি বলছিস? হেরু রাতে তোর ঘরে থাকে?'

ইয়াকুব জবাব দ্যায়, 'হ্যাঁ। আর গতরাতে কাণ্ডটা শুনুন।' ইয়াকুব সব বলতে থাকে। উঠোনে গনগনে রোদের মধ্যেই কথা শুরু হয়েছিল, শেষ হয় মেঘের ছায়ায়। এবং ওদিকে আফতাব দারোগা ততক্ষণে ঘোড়া ছুটিয়ে নদীর বাঁকে চলে গেছে। সেখানে শ'খানেক মানুষের কালো কালো মাথা যেন গঙ্গার ধারে কী ফুল ফুটিয়েছে। ঘটকঠাকুর বাড়ি থেকে এতদূরে নিজের হাতে টুল আর চেয়ার বয়ে এনেছে। আফতাব দারোগা খচখচ করে কী লিখছে। সীতু ডোম আর তার বউ পিংলি রাঙীর মড়াটা ডাঙায় তুলেছে।

ইয়াকুব দুধটুকু গরম করতে থাকল—অবশ্য মড়ার মুণ্ডু দিয়ে বানানো উনুনে নয়, মাটির। গোরাংবাবু ভিড়ের কাছে এসে দেখলেন মড়াটা। মুখ ঘুরিয়ে নেবেন ভাবলেন, পারলেন না। রাঙীর মড়ার গায়ে যে শাড়িটা জড়ানো ছিল, আফতাব দারোগা ছড়ির গুঁতোয় সেটা সরিয়ে মৃত্যুর কারণ খুঁজছিল। সে আমলের পাড়াগাঁয়ে ওই যথেষ্ট। ডাক্তার, মর্গ ইত্যাদি বড়লোকের ব্যাপার। রাঙীর তলপেট থেকে জননাঙ্গ অবধি আট ন ইঞ্চি লম্বালম্বি চেরা—ফাঁক হয়ে আছে। রক্ত ধুয়ে সাদা মাংস আর কিছু নাড়িভুঁড়ি দেখা যাচ্ছে। আলতোভাবে ফিতে ধরে সেটা মাপার পর আফতাব দারোগা বলেন, 'ঠিক হ্যায়। আবে সীতুয়া, জলদি ফেক্ বে গাঙমে!'....তারপর রুমালে মুখ মুছে বারকতক 'তৌবা' 'তৌবা' বলেন।

রাঙী তার চেরা নাভি আর জননাঙ্গ নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। ভিড়ের অন্তত একজন—সে দুঃখিত প্রেমিক সরা বাউরি, তার মাথায় এককলি গান চিনের ডাকের মতন উড়ে বেড়ায়...

(একদিন) চিত হয়ে ভাসবি জলে
ভালকয়োতে ঠুকরে খাবে।।

আফতাব দারোগার তদন্ত শেষ। বিড়বিড় করে 'দোওয়া' (মন্ত্র) আওড়ে তারপর গোরাংবাবুকে দেখতে পান। 'ডাকটারবাবু, খরিয়াৎ? (কুশল তো?)'

ডাক্তার মৃদু হেসে মাথা দোলান।

ফেরার সময় কাঁচামাটির রাস্তায়—জায়গায়-জায়গায় কাদা আছে, পাশাপাশি চললেন গোরাংডাক্তার আর আফতাব দারোগা। দুটো ঘোড়া দুই বিপরীত মানুষকে ঐতিহাসিক টিলার কাছাকাছি এসে দু'মুখো করল। দারোগা পূর্বে, ডাক্তার পশ্চিমে।

মজা ভাগীরথীর খাতে এখন জল এসেছে প্রচুর। নৌকো চলছে। নৌকোয় ঘোড়া আর দারোগা ফিরে যাবে সদর কোতোয়ালে।

গোরাংবাবুর বমিভাব। সঙ্গে ছোট্ট বাকশো খুলে কয়েকটা বড়ি খেয়ে নিলেন। নৃশংস হেরু সম্ভবত আজ রাতেই ধরা পড়বে। বাঁচা গেল। ইয়াকুবের ওপর দারোগার ধর্মঘটিত পুরনো রাগ আত্মপ্রকাশের সুযোগই পায়নি, এমন কি হেরুর ছেলের ব্যাপারেও দারোগা উৎসাহ দ্যাখায়নি—গোরাংবাবুর ধারণা, এসবের একমাত্র কারণ ইয়াকুব হেরুকে ধরিয়ে দিচ্ছে এবং তার গূঢ় অর্থ আফতাব খান একশো টাকা বখশিস আর প্রমোশন পাচ্ছে।

সাত

শেষরাতের আগন্তুক

কিন্তু সে-রাতে হেরু ইয়াকুবের ডেরায় যায়নি। আফতাব দারোগা ভোর অবধি সদলবলে ওঁৎ পেতে থাকার পর ভীষণ খাপ্পা হয়ে স্টেশনে চলে আসেন। স্টেশন নতুন মাস্টার এক অস্ট্রেলিয়ান সায়েব। তার নাম জর্জ হ্যারিসন। গোরাসায়েব দেখলেই দারোগার সেলাম দেওয়া অভ্যাস আছে। সে সায়েবের সঙ্গে নিজস্ব ইংরাজিতে বাৎচিৎ চালিয়ে যেতে লাগল। সেপাইরা পিছনের অশত্থতলায় চরণের দেওয়া গাঁজা টানতে জমে গেল। রাতের ক্লান্তির সঙ্গে গাঁজার ঢুলু ঢুলু আমেজ মিলে একসময় সবাই অশত্থতলায় গড়িয়ে পড়ল। আফতাব দারোগা বেটনে খোঁচাখুচি করে তাদের কোনমতে ওঠাল। তখন কোন অজ্ঞাত কারণে তারা কথামতো গোরাংবাবুর কাছে না গিয়ে মাঠের পথ ধরল। দারোগা ঘোড়া ছুটিয়ে আলপথে ডাবকই গ্রামের দিকে হাঁটছে। এমন জাতের লোকজন সঙ্গে নিয়ে হেরুকে ধরতে আসার কারণ আফতাব খানের ছিল একটাই : বখশিসের মোটা ভাগ আত্মসাৎ করা। টাকার প্রতি অস্বাভাবিক টানের জন্যে এই বিহারী ভদ্রলোকটি সম্পর্কে পুলিশ ও জনমহলে প্রচারিত ছিল যে ওরা নাকি সাতপুরুষ ধরে কসাই। তবে একথা সত্যি, আফতাবের এক ভাই কলকাতার জেলে ফাঁসুড়ের পদে চাকরি করে।

সেদিন দুপুরে যখন সেরাজুল হাজির বাড়ি খালি কেটে খানাপিনার চূড়ান্ত আয়োজন চলছে, তখন গোরাংবাবুর ঘোড়াটা গেছে হারিয়ে। সকালে যথারীতি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল পাশের পুকুরে, তারপর আর পাত্তা নেই। গোরাংবাবু খুঁজে ক্লান্ত হয়ে গেছেন। স্নান করেননি, খেতেও বসছেন না।

অবশ্য খেতে না বসার কারণ স্বর্ণের সঙ্গে অভাবিতভাবে ঝগড়া আর বাক্যালাপ বন্ধ। গোরাংবাবুর ভিতরটা দুঃখে লোভে হু হু করে জ্বলছিল গত রাত থেকে। কী বীভৎস দৃশ্য গতরাতে তাঁর ঘরেও তিনি দেখেছেন—যা রাঙীর মড়ার চেয়েও সাংঘাতিক।

এ রাতে তেমন বৃষ্টি পড়েনি। বরং বেশ গুমোট গরম করছিল। ডাক্তারখানার মধ্যে যে তক্তাপোষে তিনি শোন, সেটা খুব মচমচ করেছে আজ। ঘনঘন পেচ্ছাব পাচ্ছিল ডাক্তারের। মাঝের বার উঠোনে এগিয়ে স্বর্ণর ঘরে আলো দেখতে পান। দরজা বন্ধ, উঠোনের দিকে জানলাটা খোলা ছিল। ডাক্তার দেখলেন, তাঁর বিধবা মেয়ে স্বর্ণলতা সেই সোনার গয়নাগুলো সারা গায়ে পরে তক্তাপোষের বিছানায় বসে রয়েছে!

আর তার পায়ের কাছে এক ঝাঁকড়া চুল আর গোঁফদাড়িওয়ালা প্রকাণ্ড জানোয়ার হেরু বাউরি।

মুহূর্তে মগজে আগুন ধরে যায় গোরাংবাবুর। দমাদ্দম কপাটে লাথি মারতে থাকেন। তখন হেরু দরজা খুলে দেয়। গোরাংবাবু পায়ের খড়ম খুলে ওকে মেরে চলেন। হেরু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসতে হাসতে বারান্দা ডিঙিয়ে উঠোনে পড়ে এবং অন্ধকারে বড়োবড়ো পায়ের ছাপ রেখে পালিয়ে যায়।

স্বর্ণর দিকে তাকিয়ে গোরাংবাবু শুধু বলেন, 'ছি! ধিক্, শত ধিক্!'

স্বর্ণ অপ্রস্তুত হেসে বলে, 'ও বলল—তাই পরলুম। আমি কি গয়না পরি নাকি?'

এই অদ্ভুত দুর্ঘটনার পর ঘোড়া হারিয়ে যাওয়ায় গোরাংবাবু একেবারে ভেঙে পড়েছেন। দুপুরে ঘেমেতেতে ক্লান্ত হয়ে যখন বিছানায় চিৎ হয়েছেন, স্বর্ণ এসে পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। তবু গোরাংবাবুর মন শান্ত হল না।

তখন স্বর্ণ তার পুরনো শাসানি প্রচার করল। ...'বেশ, তাহলে আমি যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাচ্ছি।'

সত্যিসত্যি সে বেরিয়ে পড়ল। তাতেও কাজ হল না। গোরাংবাবু চোখ বুজে পড়ে রইলেন। একটু পরে চাঁদঘড়ি এসে বলে গেল, 'ডাক্তারবাবু আপনার ঘোড়াটা আঁরোয়ার জঙ্গলে দেখে এলুম।'

তার খানিক পরে নতুন সহকারি স্টেশনমাস্টার সুধাময়বাবু হন্তদন্ত এসে বলল, 'ডাক্তারবাবু! আপনার মেয়ে ডিসট্যান্ড সিগনালের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল—হান্টার সায়েব ট্রলিতে আসতে আসতে...'

গোরাংবাবু লাফিয়ে উঠলেন।...'স্বর্ণ, স্বর্ণ সুইসাইড করেছে?...' হাঁউমাউ করে কেঁদে দৌড়তে শুরু করলেন—আটকানো গেল না।

কাছেই হান্টারসায়েবের ট্রলি সাইডিং-এ দাঁড় করানো আছে। প্রকাণ্ড ছাতার নিচে স্বর্ণ পা ঝুলিয়ে মুখ নিচে করে বসে রয়েছে। আর পাশে মাটিতে দাঁড়িয়ে হান্টারসায়েব ওকে হাত মুখ নেড়ে অনর্গল কিছু বোঝাচ্ছেন।

গোরাংবাবু স্বর্ণর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'মা আমার মা, মা গো!'

হান্টার বলেছিলেন যে আজ কাটোয়া ফিরছেন না—এইখানেই জর্জের কাছে রাত কাটাবেন এবং সন্ধ্যাবেলা এসে স্বর্ণলতাকে শেকসপীয়ারের গল্প শোনাবেন।

উপসংহার চোখের জলে চমৎকার স্নিগ্ধ হল। বাবা-মেয়ে মুখোমুখি বসে খেল। খেতে বসে স্বর্ণ মিষ্টি হেসে বলছে, 'বাবা তুমি কী ভেবেছিলে?'

গোরাংবাবুও মিষ্টি হেসে বলেছেন, 'কিসের?'

'আমার গয়না পরা!'

'ছেড়ে দে মা!'

'বাবা ওগুলো কাঁদুনেদীঘিতে ফেলে দিয়ে আসব ও বেলা।'

'তাই দিস।'

'আর ঘোড়াটাও খুঁজে আনা হবে!'

'ঠিক বলেছিস।' গোরাংবাবু জল খেয়েছেন। ফের বলেছেন, 'জঙ্গলে বেশিদূর যাস নে। পেলি ভালো—না পেলি চলে আসবি। আজকাল হিজলবিল ডুবে রাজ্যের জন্তুজানোয়ার এসে জুটেছে ওখানটায়। আরে স্বর্ণ! চাঁদঘড়ি বলছিল, ঘোড়াটা জঙ্গলে দেখেছে। ভুলেই গিয়েছিলুম। একবার চাঁদঘড়িকে জিগোস করে যাস্।'

বিকেল নেমেছে ততক্ষণে। স্বর্ণলতা উঠোনের উনুন থেকে গয়নাগুলো সাবধানে বের করে আঁচলে রাখল। তারপর বেরোল। চাঁদঘড়ির কাছে যাওয়া দরকার মনে করল না। ওর রোগা বউটার পাল্লায় পড়লে রাজ্যের দুঃখের ঘটনা না শুনে রেহাই পাওয়া যাবে না।

হান্টারসায়েব তখন ডাক্তারখানায় এসে গোরাংবাবুর সঙ্গে গল্প করছেন। ইয়াকুবের প্রসঙ্গে ছেলেধরা সাধুদের কথা এসে গেছে। হান্টার একবার একটা ছেলেধরা সাধু দেখেছিলেন—কানপুরের ওদিকে। লোকেরা মেরেছিল ওকে। ভারতবর্ষ সাধুর দেশ। সাধুদের প্রতি লোকের দারুণ ভক্তি এখানে। অথচ হুট করতেই সাধুদের সবাই সন্দেহবশে খুব মারধোর করে। হান্টারের এই অভিযোগ শুনে হাসতে লাগলেন গোরাং ডাক্তার। তখন হান্টার একটা খবর দিলেন ইয়াকুব সম্পর্কে। আফতাব দারোগা আজ ভোরবেলা নাকি তাকে বেদম ঠেঙিয়ে এসেছে। হেরুকে ধরতে পারেনি—সেই রাগ দারোগার খুব সহজে যাবে মনে হয় না।

গোরাংবাবুর কষ্ট হল শুনে। শুধু বললেন, 'আফতাব দারোগার বাপ নির্ঘাৎ কসাই ছিল।'

ওদিকে স্বর্ণ গ্রাম ছাড়িয়ে কয়েকটা ধানের জমি পেরিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে। প্রথমে সে কাঁদুনেদীঘির ধারে যায়। বিশাল জংলা দীঘিতে ঘন দাম আর শ্বেতপদ্মের ঝাঁক। পানকৌড়ি আর গাঙচিল উড়ছে। চারপাড়ে ঘন গাছপালা। আঁচল থেকে একটার পর একটা সোনার গয়না সে যথাশক্তি ছুঁড়ে মারে। সবগুলো পদ্মপাতার ফাঁকে ডুবে যায়। শুধু একটা অনন্ত পদ্মপাতায় আটকে পড়ে। তখন সে কাদার তাল ছোঁড়ে এবং সেটাকে ডুবিয়ে দ্যায়।

তারপর সে কতকটা উদ্দেশ্যহীনভাবে জঙ্গলে উঠে আসে। গাছপালা ঝোপঝাড়ের ভিতর হেঁটে যায়। ঘোড়াটা এভাবে খুঁজে পাওয়া মুশকিল, জেনেও পুবে রেললাইন লক্ষ্য করে পা চালায়। এবার তার দম আটকে আসছিল। ভিজে স্যাঁতসেতে মাটি, থকথকে পচাপাতা, কোথাও কোথাও সতেজ ঘাস, আর বিকেলের জঙ্গলে পাখিরা প্রচণ্ড ডাকতে লেগেছে, আলো কমে যাচ্ছে দ্রুত—কোনভাবে ফাঁকা একটা ছোট্ট মাঠের পরে রেললাইন পড়বে। এখনও পৌঁছনো যাচ্ছে না কেন?

গত বোশেখের ঝড়ে উপড়ে যাওয়া একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ এড়িয়ে ওল্টানো শেকড়ের পাশ দিয়ে যেতেই তার বুক ধড়াস করে ওঠে। কে দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। আর ছায়ার মধ্যে প্রথম চিনতে পারেনি, তারপর চিনে আশ্বস্ত হয় স্বর্ণ। খুশিতে ফেটে পড়ে সে—হেরু!

হেরু হাসে। 'তুমি ইখানে ক্যানে গো স্বন্নদি?'

'আর বোলো না!' স্বর্ণ হেরুর সাহায্য নেবার তাগিদে বলে। 'ঘোড়াটা হারিয়ে গেছে সকাল থেকে। তাই খুঁজতে বেরিয়েছি। চলো না হেরু, তুমিও খুঁজে দেবে।'

হেরু বলে, 'ঘোড়া খুঁজতে? কিন্তু দীঘির জলে ওইগুলো কী ফেলে দিলে স্বন্নদি?'

স্বর্ণ চমকে ওঠে। 'তুমি দেখেছ?'

'হাঁ, দেখেছি। ই জঙ্গলে আমি থাকি—আমার চোখ সবঠাঁই থাকে স্বন্নদি।'

'ফেলে না দিয়ে কী করব বলো?' স্বর্ণ তাকে বোঝায়। 'বাবা কী কাণ্ড করল, সে তো দেখেছ। তার ওপর কখন পুলিশ-টুলিশ এসে হাঙ্গামা করে। বাবার তো শত্রুর অভাব নেই।'

'হাঁ—হাঁ। তা ঠিক বটে। তবে—' হঠাৎ থেমে হেরু কেমন দৃষ্টিতে স্বর্ণর দিকে তাকায়।

স্বর্ণ প্রথম অবাক, পরে অস্বস্তিতে পড়ে যায়। কতদিন থেকে হেরুকে সে দেখেছে—কিন্তু এই সন্ধ্যাবেলার জঙ্গলে এই লোকটা হয়তো সে নয়। তার রক্ত অস্থির হতে থাকে। পরক্ষণে কতদিনের ছোটখাটো ঘটনা মনে পড়ে যায়। হেরুর এই চাহনিটা কি একেবারে নতুন? আর, হেরু বাউরি প্রথমে মেরেছিল আঁরোয়ার পালিতবাবুকে, কারণ সে এক দুপুরে স্বর্ণকে ধর্ষণ করতে যাচ্ছিল। আর, কাল রাতে সে বোকার মতো কী খেয়ালে হেরুর কথায় গয়নাগুলো যখন পরেছিল, তখন পায়ের কাছে বসে থাকা হেরুর চাহনিও কি নতুন ছিল? কী যেন ছিল তাতে—অস্বাভাবিক কিছু মারাত্মক—স্বর্ণ যেন অবচেতনে তার গন্ধ টের পাচ্ছিল এবং অবচেতনেই উপভোগ করছিল। অতি দ্রুত একটা রেলগাড়ির মতো নিঃশব্দ মস্তিষ্ক কাঁপিয়ে এইসব ব্যাপার এসে পড়ে স্বর্ণর মধ্যে।

হেরু কয়েক পা এগিয়ে স্বর্ণর দিকে নিষ্পলক তাকায়। তারপর আচমকা তার দুটো বাহু চেপে ধরে একেবারে শূন্যে তুলে ফেলে। স্বর্ণ চেঁচিয়ে ওঠে 'হেরু, হেরু! এই বাঁদর!' তার বুকে লাথি মারতে চেষ্টা করে সে।

কিন্তু হেরু আস্তে আস্তে নামিয়ে দেয় স্বর্ণকে। হাত ছাড়ে। অমনি স্বর্ণ দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায়। ঝোপজঙ্গল ভেঙে বিভ্রান্তভাবে ছুটতে থাকে সে। কোনদিকে তাকানোর সাহস হয় না। কাঁটা ফুটে ক্ষতবিক্ষত হয় সারা শরীর। শাড়ি ছিঁড়ে যায়। কতদূর যাবার পর পথ চিনতে পারে সে।

হান্টার সাহেব গোরাংবাবুর সঙ্গে তখনও গল্প করছেন। স্বর্ণকে দেখে গোরাংবাবু উদ্বিগ্নমুখে বলেন, 'পেলিনে? মরুক গে। তা এত দেরি করে?' পরক্ষণে ওর চেহারা দেখে ঘাবড়ে যান। 'তোর মুখে-হাতে রক্ত! স্বর্ণ, কী হয়েছে? সর্বনাশ, সর্বনাশ!'

স্বর্ণ বলে, 'কিছু না। কাঁটায় ছড়ে গেছে।'

স্বর্ণ খিড়কি দিয়ে পুকুরের জলে নামে। একগলা অন্ধকার জলে বসে নিঃশব্দে হু-হু করে কাঁদে। সে রাতে হান্টার সায়েবের আর শেক্সপীয়রের গল্প শোনানো সম্ভব হল না।

গোরাংবাবুর মনে দুঃখ, যা হবার সব হোল—ঘোড়াটা হারিয়ে রইল! আজ কোন কল আসেনি। কল এলে খুব অসুবিধেয় পড়া যাবে। স্বর্ণর তেমন কোন ভাবান্তর তিনি লক্ষ্য করলেন না। দিনের তরকারি গরম করল, রাঁধল। মুখোমুখি বসে খেলও। তবে এবেলা একটু কমই খেল। বলল, 'মাথা ধরে আছে। বমি বমি লাগছে?'

'ওষুধ খাস'খন।' বলে গোরাংবাবু কেবল ঘোড়াটার কথাই ভাবতে থাকেন। তাঁর মাথার ভিতর বাদামি রঙের টাট্টুটা ঘাস খেতে-খেতে মাঠে-মাঠে দৌড়চ্ছে, তাকে ধরতে পারছেন না। শোবার পরও এই উপদ্রব সমানে চলেছে। কখনও দেখলেন ঘোড়াটা সর্বাঙ্গে ভীষণ জ্যান্ত, উজ্জ্বল সবুজ রঙ, বড়ো বড়ো টানা চোখের পাপড়ি লাল। কখনও

দেখলেন ঘোড়াটা কর্ণসুবর্ণর টিলায় একটা যাত্রাদলের রাজাকে পিঠে চাপিয়ে কদম ফেলছে। অকৃতজ্ঞ জীবটা তার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। দুঃখে স্বপ্নের ভিতর ফুঁপিয়ে উঠলেন গোরাংবাবু।

শেষরাতে আফতাব দারোগার হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর।

দরজা খুলে দ্যাখেন লণ্ঠন জ্বেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে আফতাব দারোগা আর কয়েকজন মোড়লগোছের লোক। বারান্দার নিচে ও বটতলায় আরও কিছু লোক গুজগুজ করছে। আফতাব দারোগা কাকে ডেকে বলল, 'এ গিড়ধড়িয়া! ইয়ে শালা লোককো বাঁধো।'

গোরাংবাবু বুঝতেই পারেন না—কাকে এই কসাইপুত্র শালা বলে বাঁধবার হুকুম দিচ্ছে।

আফতাব দারোগা সদলবলে ঘরে ঢুকে পড়ে। গোরাংবাবুর কাঁধে হাত রেখে কে ধাক্কা মেরে বারান্দা থেকে ফেলে দেয়। এবং কোমরে শক্ত রাশির ফাঁসটা গোরাংবাবুকে আরও ভ্যাবাচাকা খাইয়ে দ্যায়। আর কিছু করার না পেয়ে তিনি শুধু চ্যাঁচাতে থাকেন, 'হান্টার সায়েব! হান্টার সায়েব!'

বাড়ির ভিতর আফতাব দারোগার আওয়াজ শোনা যায়। 'এই মৌগি! দরবাজা খুল্ জলদি। এই খানকি কুত্তিন কাঁহেকা!'

শেষরাতের আগন্তুকরা এক সুপ্রাচীন ভদ্রতা করুণা ও মানবতাবোধের ওপর এইভাবে মুহুর্মুহু পেচ্ছাব করতে থাকে। কারণ, হেরু ডাকাত পাঁচিল ডিঙিয়ে এবাড়ি ঢুকবার সময় ওৎপেতে-থাকা দারোগার হাতে ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে।

আট

একটি কলঙ্ক, একটি প্রেমের প্রয়াস

আফতাব দারোগা মনে মনে খচে যায় হান্টার সায়েবের ওপর। আচ্ছা দেখা যায়েগা পিছে। তাকে জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে লড়িয়ে দিয়ে সারাপথ ঘোড়ার পিঠে গুম হয়ে থাকে—অবশ্য সেটা মনে মনে। হান্টার লড়বেন হ্যারিসনের সঙ্গে, এটা কি সোনার পাথরবাটি বোঝবার মতন মুর্খ নয় সে। তাই রাঙামাটির ঘাট অবধি পথ সে মনঃশ্চক্ষে অবলোকন করে দুটি তেজি মারকুটে মোরগের জোর লড়াই। তোফা, তোফা! গোঁফ পাকিয়ে দাড়ি চুমরে দারোগা ফিক্ ফিক্ করে হাসে। আর সেইসময় বুঝি ঘোড়াটারও সাধ যায় জিগোস করে, দারোগা সায়েব হাসলেন কেন?

কিন্তু ঘোড়াটা নিতান্ত নাদান বেঅকুফ। দারোগা ভাবল, তার চাচাতো ভাইয়ের ফুফুতো দাদার বাবা নিশ্চয় গোরাংবাবুর ঘোড়ার চাচাতো ভাইয়ের ফুফুতো দাদার কেউ না কেউ হবে--তা না হলে আচমকা সামনের টিলার কাছে গিয়ে যেই দেখেছে গোরাংবাবুর হারিয়ে যাওয়া টাট্টুটা চরছে, অমনি আচমকা লাফিয়ে উঠে চিঁ-হি-হি-হি বলে ওঠে?

দারোগাসায়েব পড়ে যায় আর কী, চরণ চৌকিদার দৌড়ে গলার চামটি টেনে ধরল। তারপর আড়চোখে পেটের তলা দিয়ে দেখে নিল দারোগাবাবুর ইনি স্ত্রীজাতীয় প্রাণী। সুতরাং সে হাসল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অকুতোভয়ে বলে উঠল—'দারোগাসায়েব, হাসলেন ক্যানে?' চরণ ভেবেছিল, সে নিজে যে যৌনতাঘটিত কারণে হেসেছে—দারোগাও তাই।

এই বাক্যটা পরে কীভাবে চালু হয়ে যায় এলাকায়। 'দারোগাসায়েব হাসলেন ক্যানে' শেষ অবধি 'দারোগাবাবু হাসলেন ক্যানে' থেকে 'ও দারোগা হাসলে ক্যানে'তে পৌঁছায়। রহস্যময় প্রসঙ্গের সূত্রেই মাঠের রাখাল চাষাভুষো থেকে বাবু ভদ্রলোক মিয়াপণ্ডিত অর্থাৎ ইতরভদ্র সবাই ওটি ব্যবহার করতে থাকে। তারপর তো এমন হল, লোকে রহস্য টের পেলেই বলে 'ওহে, এর মধ্যে দারোগার হাসি আছে।' কচি ছেলেমেয়েরা সুর ধরে গায়--স্ত্রীলোকেরাই সম্ভবত তাদের ছড়া বানিয়ে দিয়েছে, হয়তো কোন সন্তানসুখী মা আদর করতে করতে দোল দিতে দিতে বলেছে, এবং পরে তাই রীতিমতো ছড়া হয়ে কর্ণসুবর্ণ তল্লাট ছড়িয়ে চলে যায় চতুর্দিকে—

ও দারোগা, হাসলে ক্যানে
ও দারোগা হাসলে ক্যানে
দারোগাবাবু হাসে
মিচিক মিচিক হাসে
বাঁজা মেয়ের ছেল্যা হবে
গেল-ফাগুন মাসে।।

'গেল-ফাগুন' মানে গত ফাগুন। ওমর শেখ চাঁদপাড়া জামাইবাড়ি এসে সেই ছড়া শিখে নেয়। পরে হান্টারসায়েবকে বলেছিল, 'ভেরি গুড সং স্যার, ভেরি পপুলার সং। দারোগাবাবু মিচিক মিচিক লাফিং।'

আফতাব খাঁ হান্টারসায়েবের ওপর খচেছিল, কারণ এক 'মৌগি ছেনাল কুত্তিন'কে শাস্তি দেওয়া যায়নি—হান্টারসায়েব এসে পড়েছিলেন তক্ষুনি। গোরাং ডাক্তারকেও কিছু গুঁতো দেবার শখ ছিল, হয়নি। তবে এখন সামনে অঢেল সময়। আজ শালাকে নৌকোয় ফেলে—আচ্ছা, দেখা যায়েগা পিছে। এখন হাতেম ব্যাপারী বামুনভোগ চালের ভাত আর মুরগির মাংস নিয়ে ঝিলের ঘাটে অপেক্ষা করছে। মনে প্রচুর সুখ দারোগার। সুখে গুম হয়ে মোরগলড়াই দেখতে গিয়েই ঘোড়াটা নড়েছে আচমকা।

কুতকুতে চোখে ডাক্তারের ঘোড়াটা দেখে দারোগা হুকুম দেয়, 'পাকড়ো শালাকো!' গোরাংবাবু আর হেরু পাশাপাশি যাচ্ছে। শক্ত দড়িদড়া দিয়ে দুজনের কোমর বাঁধা, হাতে হাতকড়া। টিলায়-টিলায় ভিড় জমেছে। কারো কাছে আসার সাহস নেই। কেউ ভয় পেয়ে দেখছে, কেউ খুশি হয়ে দেখছে। তবে সবার মনেই একটা আশা-আশঙ্কা গুর গুর করে বেড়াচ্ছে। হেরু ডাকাত এখন ইচ্ছে করলেই তো ঝড় যেমন পটাপট দড়ি-দড়া ছিঁড়ে নৌকো টালমাটাল নিয়ে পালায় অথৈ উত্তাল জলে, মেঘ যেমন ডুকরে উঠে ঝিলিক ছেড়ে দ্যায় গাছপালার ওপর, যেমন কিনা রেলগাড়ির কালো এনজিনটা ঝাঁ ঝাঁ গাঁ গাঁ করে ছুটে যায় একদিক থেকে অন্যদিকে—হেরু নিমেষে ছুটে যেতে পারে সব অস্বীকার করে। বন্দুকের গুলির মতন ফুটে বেরোতে পারে। দারোগা আর সেপাই আর চৌকিদার দফাদার বন্দুক সব কিছু শুকনো পাটকাঠির মতন মটামট ভেঙে উধাও হয়ে যেতে পারে আঁরোয়া জঙ্গল ছাড়িয়ে অবাধ কাশকুশময়, হিজলবিলের দুর্গমতায়। কেন তা করছে না হেরু? ওরে শালা বাউরি, হল কী তোর? তুই বানের মতন ভাঙ্, পাড়ের মতন ধ্বসে পড়্। শালার ব্যাটা শালা, বাঘের মতন ডাক্, ষাঁড়ের মতন গুঁতো!...

হ্যাঁ, এইসব মার-মার তেড়ে আসা অথচ গভীর নিঃশব্দ চিৎকার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনতায় তখন সঞ্চারিত—এবং দারোগা গর্জায়, 'পাকড়ো শালাকো!' সব ভিড় পলকে ছত্রভঙ্গ হয়। দুদ্দাড় পালাতে থাকে। মেয়েরা কেউ কেউ শুকনো কাঠকুটো কুড়োবার ভান করে। সবাই ভাবে, পুলিশেরা কি মনের লেখনও পড়ে নিতে পারে মুখ দেখেই? পারে বই কি—পুলিশ তো ছাই দিয়ে দড়ি বানাতে জানে, একথা গ্রাম্য ডাকপুরুষের বচন। সুতরাং সবাই খড়িখড়ি কাকতাড়ুয়ার মতন নড়বড় করে পালাতে থাকে।

কিন্তু দেখা যায়, গোরাংবাবু যখন মুখ তুলে নিজের প্রিয় ঘোড়াটা দেখছেন এবং দু'চোখে আলো জ্বলছে, যখন প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলেন আর কী, তখন দুজন সেপাই, তিনজন চৌকিদার আর একজন মাত্র দফাদার দৌড়ে যাচ্ছে ঘোড়াটার দিকে। ওখানে ভিড় তখন থমকে দাঁড়ায়।

ঘোড়াটা অমনি চারঠ্যাং তুলে হ্রেষাধ্বনি করে লাফিয়ে ওঠে। আক্রমণকারীরা দাঁড়িয়ে যায়। বিবেচনা করে হয়তো, দারোগাসায়েব ঘোড়াটাকেও সত্যিসত্যি গ্রেপ্তার করতে বললেন নাকি?

মারমূর্তি দারোগা লক্ষ্য করে নিজের মাদীটার শরীরে অব্যক্ত চঞ্চলতা—নাকি নিজেই মনুষ্যমতির ভ্রম। সে আরও রেগে গর্জায়—'ফায়ার! ঘোলি করো, ঘোলি করো!'

দেখতে না দেখতে একজন সেপাই বন্দুক ছোঁড়ে—গুডুম! প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে যায় টিলা থেকে টিলায়। এক ঝাঁক ঝিলগামী কাক কলরব করে গতি বদলায়। বাজপড়া ন্যাড়া তালগাছ থেকে চিলটা পড়ি-কি-মরি করে পালিয়ে যায় দূর স্টেশনের দিকে। জনতাও পালায় ফের। ক্রমাগত কুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পুলিশের বন্দুক ফুটতে তারা কেউ শোনেনি এযাবৎ কাল।

আর শ্রীমান 'চৈতক' কি না অমনি হরিণদৌড়ে টিলায় উঠে ওপাশে ঢালুতে অদৃশ্য হয়। সব কিছু ভুলে গোরাং ডাক্তার হো হো করে হেসে ওঠেন।...'বাহাদুর ব্যাটা। বলিহারি, বলিহারি!'

আফতাব দারোগা টেরচা তাকিয়ে বলে, 'চো-ও-প!'

গোরাং ডাক্তার শিশুর মতন ছড়া কাটেন—

এক দুই তিন

চলল ঘোড়া ফতেসিং।

গোরাংবাবু বলেন, 'বুঝলেন খাঁসায়েব? আমার ঘোড়া এখন ফতেসিং চলল। ফতেসিং পরগনার নাম শুনেছেন? আঁরোয়া পেরোলেই পরগনা ফতেসিঙের মাটি, পাটন বিল ছাড়িয়ে বর্ধমানের সীমানা, পাটন বিলের জলে চাঁদ সদাগরের নৌকোর দাগ আছে খাঁসায়েব—পড়েছেন মনসামঙ্গল? বলে, জলে দাগ থাকে না—থাকে গো থাকে! দারোগাসায়েব! পশ্চিমে বীরভূম জেলা, উত্তরে মহালন্দী পরগনা—এই হল ফতেসিং সুবা। রাজা ছিল তার ফতেসিং—জেতে হাড়ির ছেলে। বুকের পাটা করে বলে, কে রে, দিল্লির বাদশা আকবর শাহ, কে চেনে তাকে? বাদশা পাঠালে সেনাপতি মানসিংহকে—আভি শির মাংতা উও হাড়িকা বাচ্চার! মানসিং এল। ফতেসিঙের রক্তে আজকের কান্দী মহকুমা লাল হয়ে গেল। বুঝলে খাঁ সায়েব? সেই ফতেসিং পরগনার মানুষ আমি।' যেন এসব বলে ভয় পাইয়ে দিতে চান বিহারী ডনকুইকজোটটিকে।

দারোগা বলে, 'এই রঘুয়া, আবে ক্যা দেখতা? মুহ্‌মে ডান্ডা মার্—মার্ ডান্ডা শালাকো মুহমে!'

রঘুয়া লাঠি তুললে চরণ চৌকিদার জোড়হাতে সামনে দাঁড়ায়।...'হুজুর হুজুর মা-বাপ! আমার খাতির—মানী মানুষ।'

দারোগা হাসে। ধূর্ত মানুষ আফতাব খাঁ। হান্টারের কানে তুললে বলা যায় না, কোনদিকে গড়ায়—কারণ আগেভাগে সাবধান করে দিয়েছে গোরা রেলবাবুটা। ওদিকে সদরে কোন কোন অফিসার ওর দোস্তইয়ার বা কুটুম্ব, দারোগ জানে না। একটা ব্যাপার শুধু জানে সে—গোরা সায়েবরা পরস্পর পেটে-পেটে এক, মুখেমুখেও এক রা। তাই সে বলে, 'ঠিক হ্যায়!'

সেপাই-চৌকিদার-দফাদার একসঙ্গে বলে, 'সব ঠিক হ্যায়!' বিচিত্র মিছিলটা আবার সরু পথ ধরে এগোয়। হেরুর চোখ ভিজে। পিটপিট করে অনবরত। রাঙা রসাল মাটিতে

তার হাঁটু অবধি রাঙিয়ে দ্যায়। গোরাংবাবুর পায়ে জুতো আছে। জুতোও লাল। তবে বর্ষার সময় বলে ধুলো প্রায় নেই-ই। তিনি হাসিমুখেই হাঁটেন। কিন্তু মাঝে মাঝে দূরবর্তী ওই ভিড়ের ইচ্ছের মতন তাঁরও ইচ্ছে করে—হেরু বাউরি আচমকা ক্ষেপে উঠুক! তারপর আড়চোখে তার ভাবগতিক লক্ষ্য করে মনে মনে তাকে গাল দেন, মাগীর হদ্দ গুয়োটা। এই তোর মুরোদ রে মামদোব্যাটা?

ঘাটের ওপর বিত্তবান সম্ভ্রান্ত মানুষদের একটা ভিড় অপেক্ষা করছিল। হেরুকে ধরতে পারার দরুণ তারা প্রায় ফুলটুল মালা নিয়ে অপেক্ষা করার মতন দাঁড়িয়ে ছিল। আগে দারোগার ঘোড়া পৌঁছয়। ওরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'সেলাম হুজুর, সেলাম দারোগা সায়েব!' পঞ্চমুখে প্রশংসা কাটে। দারোগা বেল্ট খুলে কোমর ঢিলে করে হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে। কিছুই বলে না। হাতেম ব্যাপারী করজোড়ে সামনে আসে। চেয়ার আসে। দারোগা বসলে সেরাজুল হাজি পাখা পাখা বলে চেঁচায়। এবং পাখা এলে নিজেই দোলাতে থাকে দারোগার মুখের ওপর। তার কাঁচাপাকা চুল দাড়ি গোঁফ বর্ষার স্নিগ্ধ বাতাস আচমকা—অনিচ্ছাসত্ত্বে আঙুল বোলাতে বাধ্য হয়। দারোগা হাঁটুদুটো ধীরে দোলায়।

তারপর আসামীদ্বয় পৌঁছলে সেই অন্য জাতের ভিড় হেরুর বাপান্ত করতে থাকে মুখোমুখি। হাতেম গোরাংবাবুকে শুধু বলে, 'ধিক, ডাক্তারবাবু, ধিক্ আপনাকে!'

ঘটকঠাকুর বলে, 'আপনার কিসের অভাব ছিল ডাক্তারবাবু, যে ওই কুকম্মের জুটি হলেন? এত অভাব যদি, বললেই পারতেন—আমরা চাঁদা করে পয়সা দিতুম!'

আরেকজন বলে, 'ওই মতলবেই তো পিতাপুরুষের ভিটে ছেড়ে ইস্টিশনে এসে আড্ডা গেড়েছিল ডাক্তার! তখনই আমার সন্দ হয়েছিল, বুঝলে কিনা?'

এবং একসঙ্গে অজস্র নিন্দার পচাটে গন্ধে ভরে তোলে জায়গাটা। আঝোর ধারায় বর্ষিত হতে থাকে অপমানের নোংরা বৃষ্টি। যেন দেহ বেয়ে পড়ে, ভিজে যায়—কিন্তু গোরাং ডাক্তারের মন ছোঁয় না। মিটিমিটি হাসেন। কখনও বলেন, 'যা বলছ, বলে নাও, বলে নাও। এমন দিন আর পাবে না!'

সেই সময় আফতাব দারোগা কী বলবে, ত্বরিতে কারা গর্জায়—'চোওপ চোওপ! দারোগাসায়েব কথা বলবেন—হুজুর কথা বলবেন।' প্রতিধ্বনি ও ধ্বনি, ফের প্রতিধ্বনি বিলিতি অরকেস্ট্রার মতন দারুণ দ্বিগুণ, বেজে ওঠে—'দারোগাসায়েব কথা বলবেন—হুজুর কথা বলবেন।'

ভিড় চুপ হলে সে বলে, 'আরে তুমলোক সবকুছ সমঝিয়েছে—তো এক ছোটা চিজ নেহি সমঝিয়েছে?'

অনেকগুলো মাথা দোলে। দুবার দোলে। তিনবার এবং চারবারও।

'তো ইয়ে বাত হ্যায় কী—উও শালা ডাগদার ঘরমে এক শের পালা হ্যায়। কিস লিয়ে? না—উও শের শিকার লিয়ে আসবে। হাঁ—তো উও শেরকো মর্জি ঠিক রাখতে হোবে—নেহি তো কুছ সুবিস্তা হোবে না—কৈ বাত শুনবে না। ঠিক বোলা হাম?'

'ঠিক বোলা হুজুর, বিলকুল ঠিক।' ঠিক ঠিক শব্দটা বৃষ্টির মতন পড়ে যায়।

'তো উও শেরকো কুছ-কুছ গোস্ত খিলাতে হোবে?' (সহাস্যে)

'আলবাৎ খিলাতে হবে।' এবং প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে যায় রাজশশাঙ্কের রাজধানী জুড়ে।

'তো শালা ডাগদারবাবুকা বাহারসে গোস্ত খরিদ কর না পড়ে।'

'হ্যাঁ হুজুর।' এবং একসঙ্গে নাকাড়া বাজতে থাকে হ্যাঁ হুজুর, হ্যাঁ হুজুর, হ্যাঁ হুজুর!

'তো বাহারমে কেঁও যায়ে গা? ঘরমে যব বহৎ খপসুরত, গোস্তদেনেওয়ালি হ্যায়!'

দারোগা দুর্ধর্ষ হাসতে থাকেন। ভিড়ও হাসে। তুমুল কলরব ওঠে। আরে কী অবাক, এত জলের মতন সহজ ব্যাপারটা কারো মাথায় আসেনি। গোরাং ডাক্তার নিজের বিধবা যুবতী মেয়ের মাংস হেরুকে খেতে দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিচ্ছিল। হুঁ, এটাই তো স্বাভাবিক। তা না হলে হেরুর মতন দানো পোষ মেনে থাকে? তাই-ই তো!

আর সেই কথা শুনতে শুনতে অসহায় গোরাংবাবু হেরুর দিকে তাকাচ্ছিলেন, একটা কিছু আশা করছিলেন ওর কাছে—এটার মতন চরমমুহূর্ত আর আসতে পারে না! অথচ হেরু উবু হয়ে বসে ভিজে চোখে মাটি খুঁটছে। হাঁটুর ওপর দিকে গাছের ডালের মতন মস্তো দুটো হাত নেমেছে—যে হাত দিয়ে সে অনেককিছু করতে পারে। ইচ্ছে করলেই লোহার হাতকড়িটা দু টুকরো করতে পারে। তারপর দারোগার মুণ্ডুতে এক ফুট গর্ত খুঁড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু শালা বাউরি কিচ্ছু করল না। নিঃশব্দ চিৎকার উঠল গোরাংবাবুর মধ্য থেকে—ওরে হেরু, বল্ এসব মিথ্যে! হেরু, তোর দোহাই বাবা, একবার বল্, 'না—না—না'।

হেরু বলে না। বলবে না—সে তো জানাই। ও একটা নিষ্ঠুর অন্ধ নির্বোধ শক্তি। ইয়াকুবের প্রেত 'চ্যাড়া'র মতন। গোরাংবাবু কাঁপেন। কাঁপন মুখে ও মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। এবং প্রচণ্ড মাথা নেড়ে কেঁদে ওঠেন—'না—না—না!'

দারোগা উঠে এসে বুটশুদ্ধ পা তুলে বলে, 'খবর্দার! চো-ও-প!'

এই ব্যাপারটা যখন চলছে, তখন হান্টার সায়েব স্বর্ণকে কী কী করতে হবে বোঝাচ্ছিলেন। নতুন এ এস এম সুধাময়ও ছিল সেখানে। হান্টারের চিঠি নিয়ে স্বর্ণ যাবে সদরে। ঘুরপথে যাবে। ট্রেনে চেপে পরের স্টেশনে নামবে—তারপর পাকা রাস্তা ধরে মাইলটাক গিয়ে গঙ্গা পেরোলে বহরমপুর। গোরাবাজারের কমলাক্ষ মোক্তার, পুলিশ ইন্সপেক্টর হেরম্ব ব্যানার্জি, এই দুজনের সঙ্গে দেখা করলেই কাজ হবে। পরে আরো ব্যবস্থা হবে। গোরাংবাবুর ছাড়া পেতে দেরি হবে না।

স্বর্ণ আগাগোড়া আগুন হয়ে ধোঁয়াচ্ছিল, তখন কিন্তু শান্ত এবং ভিজে। এই গোরাসায়েব তাকে শেকসপীয়ারের গল্প শোনায় ভাঙাবাংলায়। এ তাকে গতকাল নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছে। স্বর্ণ মনে মনে বলে, 'তুমিও আমার বাবা—আরেক জন্মের বাবা, সায়েব!' এবং যখন মনে পড়ে, গতকাল ঝোঁকের বশে মারা পড়লে বাবার এই দশা কিছু হয়তো জানা যেত না, তখন সে মৃত্যু সম্পর্কে প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়ে। সে মনে মনে ফের বলে, 'আর কখনো মরার নাম করব না—যত কষ্টই আসুক—যত দুঃখ আসুক।

আমাকে বেঁচে থাকতেই হবে। এ অপমানের শোধ আমি নেব—তবে আমি বাবার মেয়ে স্বর্ণলতা।'

সুধাময় মৃদুভাষী যুবক। সে বিনীতভাবে বলে, 'কিন্তু আপনি কি একা যেতে পারবেন? গেছেন কখনও বহরমপুরে?'

স্বর্ণ নতমুখে বলে, 'গেছি—কম বয়সে। আর একবার...'

সুধাময় বলে, 'তাহলে অবশ্য অসুবিধে হবে না।'

স্বর্ণ জের টেনে বলে, 'আর একবার গিয়েছিলুম বিয়ের পর—হাসপাতালে।'

'হাসপাতালে?'

'হ্যাঁ। আমার স্বামী ছিল—পেটে ঘা। ওখানেই তো মারা যায়।'

'তাই বুঝি?'

'তখন আমার বয়স কম। কিছু বুঝতে পারিনি।'

হান্টার কী ভাবছিলেন। এবার উঠে দাঁড়ান। 'আমি যাই, মা। কোনও ভয় করবে না। আমি থাকল, সুধাবাবু থাকল। চাঁদঘড়িকে বলে যাব, রাতে তোমায় বাড়ি থাকবে। আচ্ছা, আমি যাই?...বলে বারান্দায় গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ান।...টাকা দরকার আছে তো বলো মা! দেব?'

স্বর্ণ বলে 'না। আছে।'

'আমি কাল এগেন মরনিঙে আসব।'

'আচ্ছা।'

'ভেরিওয়েল! গুডবাই সুধাবাবু!'...টুপি নাড়িয়ে হান্টার চলে যান।

সুধাময় বলে, 'আচ্ছা—আপনার শ্বশুরবাড়িতে একটা খবর পাঠাব?'

স্বর্ণ একটু হাসে। 'উঁহু। কেউ আসবে না।'

'আপনাদের অন্য কোনও আত্মীয়-স্বজন কোথায় আছেন?'

'গোকর্ণে বাবার খুড়তুতো দাদারা আছেন। সব জ্ঞাতিশত্রু। ওঁদের জন্যেই তো বাবা এখানে চলে এসেছিলেন।'

'আর কোথাও আপনার মায়ের পক্ষের কেউ নেই?'

'আমি জানি না। বাবা কিছু বলেননি কখনও।'

'আশ্চর্য তো!'

'আমার মাকেই আমি দেখেছি বলে মনে পড়ে না মাস্টারবাবু।'

'আপনি আমাকে মাস্টারবাবু বলছেন কেন?' সুধাময় হাসে।

'বলছি।'...বলে স্বর্ণ আনমনে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে।

সুধাময় একটু ইতস্তত করে করে বলে, 'তাহলে আমি কি আপনার সঙ্গে যাব?'

স্বর্ণ সোজাসুজি ওর দিকে তাকায়।'...আপনি যাবেন?'

'হ্যাঁ—যেতুম। যাওয়া তো উচিত। আপনি মেয়ে হয়ে অসুবিধেয় পড়তে পারেন—পৃথিবীটা খুব ভাল জায়গা তো নয়।'

স্বর্ণ চুপ করে থাকে—কিন্তু দৃষ্টিতে প্রার্থনা টলটল করে।

সুধাময় ব্যস্তভাবে ওঠে।... 'আপের সময় হয়ে এল—শিগগির তৈরি হয়ে আসুন। আমি ততক্ষণে এস এম-কে ম্যানেজ করে নিই। ব্যাটা নতুন এসেছে এদেশে—সবসময় ভয়ে চমকায়। তাতে আমার অবশ্য ভালোই হয়েছে। যা বলি, না করে না। বলে কী জানেন? আমি তোমার খুব ভালো বন্ধু!'.... হাসতে হাসতে সুধাময় চলে যায়।

খানিক পরে ট্রেনে যখন ওরা চেপেছে, তীব্র হুইসল দিয়ে ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে—স্বর্ণর বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে। অনেকদিন বাদে এই দ্বিতীয়বার ট্রেনে চাপা হল, গতির পুলক তার রক্তে মৃদু চাপ দিচ্ছিল—কিন্তু এই প্রথম একজন অচেনা পুরুষের সঙ্গে তার ভ্রমণ। আর, এই পুরুষটি যুবক। পুরুষ সম্পর্কে পার্থক্যবোধ অবচেতনায় ছিল, সেটা থাকেই জৈবিক নিয়মে—কিন্তু এখন বারবার স্বর্ণর মনে নির্দেশকারী একটি আঙুল ভেসে এল। ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষের মতন সেই আঙুলের গুরুতর খেলায় স্বর্ণ জড়োজড়ো হল। সে বাইরের প্রবহমান মাঠ গাছপালা ঝোপঝাড় দেখতে থাকল। কঠিন বস্তুরাজি কীভাবে তরল হয়ে পড়ছে, এঁকেবেঁকে এলোমেলো ছত্রখান হচ্ছে, দীর্ঘআলগুলো ধূসর মাটির টুকরো বুকে নিয়ে লাটিমের মতন ঘুরতে ঘুরতে নেপথ্যে সরে যাচ্ছে—কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল সে। টেলিগ্রাফের তারগুলো বারবার উঁচু আর নিচু হচ্ছে কেন, খুঁজতে ব্যস্ত হল সে। কিন্তু কিছুতেই মন থেকে সেই মারাত্মক আঙুলটা তাড়াতে পারল না। তখন সে চাকার শব্দের দিকে কান পাতল। টিকিটবাবুর কত টাকা, টিকিটবাবুর কত টাকা নাকি একধামা চাল তিনটে পটল, একধামা চাল তিনটে পটল, কী বোল বলছে রেলগাড়ি? হঠাৎ মনে পড়ল জুহা মৌলবীর বয়ান।...নরক থেকে নরকে.. দোজখ্ থেকে দোজখে নরকে নরকে নরকে নরকে...। অমনি স্যাৎ করে ঘুর বসল সে। ঠোঁটে চুইয়ে পড়ল অজ্ঞাতসারে সন্দিগ্ধ হাসি। ...'মাস্টারবাবু রেলের বুলি শুনছেন না?'

সুধাময় ফুটবল সিগারেটের প্যাকেট বের করছিল। স্বর্ণর মুখে পল্লীবালিকার আদল তখন স্পষ্ট দেখে সিগারেট জ্বালতে সে আনমনা হয়। খুব কম পরিচয় মেয়েটির সঙ্গে—তবে বেশ খানিকটা অন্যরকম মেয়ে, নিঃসঙ্কোচ, এবং অনায়াসে এর সঙ্গে অনেক আবোল তাবোল কথা বলা যায়। হ্যাঁ, এটাই এর পক্ষে স্বাভাবিক যে বাবা যখন দজ্জাল দারোগার হাতে বন্দী, চারদিকে ঢিঢি পড়ে গেছে, কেলেঙ্কারি ছুটেছে, তখন রেলগাড়ির চাকার শব্দ নিয়ে ভাবতে পারে। সুধাময় হাসে।...'শুনছি তো।' বলে সিগারেট ধরায়।

'সিগারেটের গন্ধ কেমন যেন। সায়েবরা খায়—বেশ লাগে।' স্বর্ণ বলে।

সুধাময় বার দুই টান দিয়ে বলে, 'অমন করে জানলায় ঝুঁকবেন না। চোখে কয়লা পড়বে।'

বলতে বলতেই কী আকস্মিক যোগাযোগ, স্বর্ণ ত্বরিতে চোখ কচলাতে ব্যস্ত হয়। ঠোঁট ভেঙে শব্দহীন হাসি, ঝকঝকে সাদা দাঁত কয়েকটা, অস্ফুট স্বরে বলে সে—'পড়ত না। আপনার কথায় পড়ল!'

সুধাময় উদ্বিগ্নমুখে তাকিয়ে থাকে। কামরাটা ছোট। আর কোনও যাত্রী নেই। মেঝের জলের ছোপ এখনও শুকোয়নি। বেঞ্চের এককোণে, দূরত্ব রেখে, সাবধানে বসেছিল সে।

এবার একটু সরে যায়। ঝুঁকে পড়ে।...'বেরোল? বেরোয়নি? ভাবছিলুম, সাবধান করে দেব—তা...'

স্বর্ণ আঁচলের খুঁটি কাঠির মতন পাকিয়ে বড়ো-বড়ো চোখ করতে যায়, পারে না—বুজে আসে। সে উদভ্রান্ত হাসে। ফের চেষ্টা করে।

সুধাময় আরও ঝুঁকে থাকে, আরও ব্যস্ত হয়।...'আমি—আমি দেখব?'

'দেখুন না।' স্বর্ণ আঁচলের কাঠিটা সাবধানে ওকে দ্যায়। তারপর দুহাতের দুটো আঙুলে বাঁ চোখটা ফাঁক করে একটু।

কী লাল ভয়ঙ্কর চোখ এখন স্বর্ণর। সুধাময় সাবধানে অদ্ভুত সলতের মতন কাঠিটা বাগিয়ে দেখার চেষ্টা করে, কোথায় সেই কালকুট্টে দুষ্টুটা। 'দেখতে পাচ্ছি না তো!'

'নেই?'

'কই?'

'তবে থাক।'

'থাকবে? অবশ্য জলের মধ্যে তাকালে খসে পড়ে। গঙ্গা পেরোবার সময় দেখা যাবে?'

'কিন্তু জ্বলছে যে! ফেট্। আপনাদের রেলগাড়িগুলো কী যেন!'

'আরেকবার দেখি।'

'ও আপনার কর্ম না।' স্বর্ণ ভুরু কুঁচকে বলে। তারপর একটা পা সামনের বেঞ্চে তুলে দিলে হাঁটুর নিচে কিছু নীল লোম আর একটা কাটা দাগ বেরিয়ে পড়ে। আলগোছে ঢেকে সে ফের বলে, 'কাপড়টা ছাড়বেন তো?'

সুধাময় দেখে যে সে আঁচলের কাঠিটা ধরে আছে তখনও। দ্রুত ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে সরে আসে। কিন্তু মনে মনে একটু আহতও হয়। তাই হাসি মিলিয়ে যেতে দেরি হয় না।

স্বর্ণ লাল চোখটা একহাতে চেপে ধরে মাঝেমাঝে। বাইরেটা দেখে নেয়। সুধাময় চুপচাপ সিগ্রেট খায়। এবং এটা ঠিকই যে এসময় অসংলগ্ন চিন্তাভাবনা খড়কুটোর মতন উড়ছিল দুজনের মধ্যে, একটু উত্তেজনাও থরথর করছিল—অন্তত সুধাময় টের পাচ্ছিল, সে যথেষ্ট ক্লান্ত, উরুদ্বয় ভাঙা গম্বুজের মতন দেহের নিচে পড়ে আছে।

স্বর্ণ হঠাৎ বলে, 'মাস্টারবাবু, রাগ করলেন নাকি?'

'আরে না না! কেন? যান্ কী যে বলেন!'

একটু চুপ করে থেকে স্বর্ণ বলে, 'আপনি তো বিয়ে করেননি—বিধবাদের ছুঁতে নেই আপনার।'

'ছুঁতে নেই? যাঃ! কে বলল?' সুধাময় গলগল করে হাসে।

'কেউ বলেনি। আমার মনে হয়।'

রেলগাড়ি তখন একটা পাকা রাস্তার ফটক পেরোচ্ছে। স্টেশন দেখা যাচ্ছে। সুধাময় উঠে গিয়ে দরজা খোলে। ডাইনে কিছুদূর সমান্তরাল পাকা সড়কে অনেকগুলো গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় গাছের মাথায় রোদের পালিশ ঝকমক করছে। আকাশ

অনেকটা ফাঁকা, অনেকটা সাদা পুরু মেঘ। বৃষ্টি হতেও পারে—নাও পারে। হলে মন্দ লাগবে না—অন্তত ফেরার সময় ট্রেনে ওঠার পর। মালকোঁচা করে পরা, প্রায় কাবুলি সালোয়ারের মতন ধুতি, গায়ে সাদা হাফশার্ট—হাতগুটানো, রেলকোট সুধাময় নেয়নি—স্যান্ডেল ঠুকে অকারণ ধুলোময়লা ঝাড়ে। আর স্বর্ণর মনে হয়, একটা বোকা-বোকা চেহারার মদ্দা সাদা ঘোড়া পা ঠুকছে আস্তাবলের দরজায়।

হাঁটে না সুধাময়—ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে। শার্টের ঘড়িপকেট থেকে ঘড়ি বের করে বেলা দেখে। তখন সামনাসামনি বসে থাকা স্বর্ণ ঝুঁকে বলে, 'ঘড়িটা দেখি! বাবারটা এর চেয়ে পুরনো। কোথায় কিনেছেন? কাটোয়ায় তো?'

সুধাময় বলে, 'না—বর্ধমানে।'

ঘড়িটা স্বর্ণ নিলে কালো কারে টান পড়ায় সুধাময়কে ঝুঁকতে হয়। স্বর্ণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, না অন্য কিছু এবং দেখতে দেখতে হঠাৎ হেসে ওঠে।...'মাস্টারবাবু আমার চোখে কুটো সরে গেছে!'

সুধাময় বলে, 'সেই তো দেখছি।'

ঘোড়ার নালে ছিটকেপড়া রাস্তার পাথরকুচির শব্দ, ক্লপ ক্লপ ক্লপ ক্লপ, মাঝে মাঝে ঘণ্টার ধ্বনি টং লং...টং লং, দুধারে বিশাল গাছের খসখসে গুঁড়ি শাঁ শাঁ করে করে সরে যায়। স্বর্ণ কী খোঁজে ঘড়ির অমলধবল মুখে—সময়ের প্রতিবিম্ব, কিংবা কারিগরি কুশলতা, সহকারী স্টেশন মাস্টার এবার খুব খুঁটিয়ে স্বর্ণকে দেখতে থাকে। অমূলক এবং উদ্দেশ্যহীন ক্রোধে তার মাথায় ক্রমশ খুন চড়ে যায়। সে ভাবে, শিগগির একটা কিছু করা দরকার।...

নয়

দারোগার হাসি

দেখতে দেখতে গ্রামে হাটে বাজারে এবং ক্ষেতে খামারে মাঠেঘাটে আফতাব দারোগার হাসি কলেরার বীজের মতন ঝাঁকে ঝাঁকে ছড়িয়ে পড়ে। সবাই চমকে ওঠে, আরে তাই তো, তাই-ই তো! গোরাং ডাক্তার বাঘ পুষছিল, ঘরে আছে অঢেল মাংসের যোগান।

সোনাদানার এত লোভ ওই বুড়ো ডাক্তারটার যে নিজের বিধবা মেয়েকে হেরু ডাকাতের পাতে ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। এর মধ্যে অঢেল সঙ্গতি এবং যুক্তি আছে।

ক্রমে চরণ চৌকিদার একদা বলে, 'বিন্নির চিকিচ্ছের সময় ওনার বাড়ি দেখেছিলুম বটে। হু, সিদিন চোখ দুটাকে বিশ্বেস করিনি।'

চাঁদঘড়ি খালাসিও বলে, 'আমারওভি সন্দ হয়েছেল!'

প্রত্যক্ষদর্শীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ে। সেরাজুল হাজি, ঘটকঠাকুর, বটতলার ময়রাবুড়ি, কে না দেখেছে হেরুর সঙ্গে স্বর্ণলতার হাসাহাসি ঢলাঢলি। কেউ কেউ শোওয়া-টোওয়াও দেখেছে। নির্বোধ হেরু ফাঁদে পড়েছিল ডাক্তারের—এমন সরল হাবাগোবা লোকটা রক্তপাগল ডাকাত হয়ে উঠেছিল! কী সর্বনাশা ডাক্তার, কী জঘন্য ছেনাল তার মেয়ে, নাকি মেয়েটার দোষ নেই—বাপের চাপে বাধ্য হয়ে পাপের বিছানায় শুতে যায়। তবে, পরে সেও সোনাদানার লোভে পড়েছিল বই কি! তা না হলে—ময়রাবুড়ি বলেছে, বিধবা আবার সোনার গয়না পরে দিনদুপুরে ঘরে বসে থাকে! অত সোনা পাবেই বা কোথায়? গোকর্ণের সবাই জানে, গোরাং ডাক্তার কেমন বাউন্ডুলে হাভেতে লোক। ওখানে গিয়ে খুঁড়লে আরও ইতিহাস বেরোতে পারে।

গোরাং ডাক্তারের ডিসপেনসারির ছোট্ট বারান্দায় এখন ফাটল, আর ধুলো—নিকোন হয় না। দু-চারটে ছাগল বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে। নেড়ি কুকুরগুলো এসে ঘুমিয়ে যায়। দুপুরবেলা ন্যাংটো কিছু বাচ্চা এসে ধুলোর ভিতর থেকে ঘু ঘু পোকা বের করে—

ঘু ঘু রে ঘু ঘু রে
তোর মা ডেকেছে এক কাঠ চাল দোব
ওঠো রে।।

একটা কাঠি দিয়ে ধুলোর ভিতর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ক্ষুদে ধুসর রঙের পোকা বের করে হাতের তালুতে রাখে। এই পোকাগুলোর স্বভাব অদ্ভুত। অনবরত লাটিমের মতন ঘোরে। ওরা আরো সুর ধরে চ্যাঁচায়—

ঘু ঘু রে, ওঠ রে!
মা ডেকেছে বাবা ডেকেছে
ভাত খাবে তো ওঠ রে।।

পরক্ষণে কেউ সতর্কভাবে চোখ টেপে। সবাই থামে কিছুক্ষণ। না, কোন সাড়া নেই বাড়িটার। ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা বাঁজাডাঙার মতন স্থির। তখন ফের তারা চ্যাঁচায়—ঘু ঘু রে!

ময়রাবুড়ি চোখ টিপে বলে, 'প্যাঁচার মতন লুকিয়ে থাকে। রাত্তিরে ঠিক বেরোয়। না বেরিয়ে পারে? ঠাহর করে দেখো, পিঠে দুটি ডানা গজিয়েছে তখন। উড়ে যাচ্ছে রেললাইন ডিঙিয়ে। টিশিনের ছোটবাবুর সঙ্গে এখন গলাগলি ভাব। ছ্যা ছ্যা ছ্যা! বেশ্যার মরণ হয় না গো! আমি হলে এতক্ষণ লাইনে মাথা দিতুম!'

হান্টার সায়েবের চিঠিতে কোনও কাজ হয়ে থাকলে কমলাক্ষ মোক্তার প্রায় বিনি খরচায় কেসটা নিয়েছে। হেরম্ব ব্যানার্জি পুলিশের ইন্সপেক্টর—কিন্তু সুপার হচ্ছেন ডগলাস—পাদ্রী সাইমনের ভক্ত। গোরাংবাবুর বাড়ি সোনাদানা পায়নি দারোগা, কিন্তু সাক্ষী আছে অনেক। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যও প্রচুর। তাতে পাদ্রীর রাগ পড়েনি—এখন সে রাগ উসুল হবার সুসময় ছাড়তে রাজি নয়। তার কথা হল—পাপীকে শাস্তি দিতেই হবে।

এ সবের ফলে তো বটেই, উপরন্তু হেরু ডাকাত জেলার বিভীষিকা—তার মাথার মূল্য একশো টাকা ঘোষণা করেছিলেন কালেক্টার বাহাদুর। ইংরেজরা ভারতবর্ষে সুশাসনের জন্য প্রশংসিত। অতএব ডাকাতি ও খুনের অপরাধে হেরুর ফাঁসিও হতে পারে। সেইসঙ্গে গোরাং ডাক্তার তার মন্ত্রণাদাতা কিংবা 'থানী' (আশ্রয়দাতা) হওয়ায় তিনিও বেশ মোটা দণ্ড পাবার যোগ্য। দুজনের জামিনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সে সময় ফৌজদারি মামলার বিচার খুব দ্রুত চুকে যেত। শীতের মাঝামাঝি হেরুর যাবজ্জীবন আর গোরাংবাবুর ছ'বছর সশ্রম জেল হল। হান্টার খুব তদ্বির করেছিলেন, ফল হল না। এবার আপীল করতে চাইলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁর ট্রলির ওপর, কাটোয়া জংশনের কাছে, এসে পড়ল অতর্কিতে একটা সাটিং এনজিন। হান্টার মারা গেলেন।

এতসব ঘটছে, আর স্বর্ণলতা দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে বেঁচে থেকেছে। একেকটা ঋজু দীর্ঘ গাছ থাকে অরণ্যে, তার সুশোভনতায় আকৃষ্ট পাখিরা ডালপাতায় হেগে বিচিত্তির করে ফেলে, সাপও কোটরবাসী হয়—স্বর্ণলতা তাই।

মোটা ঠাণ্ডাঠাণ্ডা গরাদের ওপার থেকে বাবা তাকে বলেছেন 'হাসিমুখে থাকিস, মা। মাথা উঁচু করে চলিস। ঈশ্বর তো আছেনই, তবে নিজের ওপর যার ভরসা নেই—ঈশ্বর তার কী করবেন? ঘোড়াটার যত্নপাতি করবি। শাকসবজি ফলাবি উঠোনে। খিড়কির পুকুরে পোনা ছেড়েছিলুম বর্ষায়। দেখবি, এ্যাদ্দিন ডাগর হয়েছে। অভাব হলে মাঝেমাঝে বেচিস। আর আমার জন্যে মন খারাপ হলে বই পড়িস। আর স্বর্ণ, হোমিওপ্যাথিটাও শিখে নিস। বাংলা বই আছে দেখেছিস তো—মন দিয়ে পড়বি...হুঁ, স্বর্ণমা, মৌলুবী আসে না আর?'

'একবার এসেছিলেন।'

'শালা আমাকে দেখতে এল না!'

'আসব—বলছিলেন।'

'নেড়েটার এখন মরশুম—চাষীদের ফসল উঠছে। ...হু স্বর্ণ, কেউ আমার প্রশংসা করে না? কেউ বলে না—আমি নির্দোষ?'

'বলে।'

'বলে? এ্যাঁ? কে বলে রে? কারা তারা?'

'ছোট মাস্টারবাবু...'

'ওকে দাদা বলিস। খুব ভালো ছেলে—মহৎপ্রাণ যুবক।'

'বড় মাস্টারবাবুও বলে।'

'জর্জ? জর্জও তাহলে বলে?' গোরাংবাবু পাগলাঘোড়ার মতন লাফান

'বলে। বাবা, ওঁকে আমি বাংলা শেখাব—কথা হয়েছে। মাইনে পাব।'

'বাঃ বাঃ! আমার কত সুখ হচ্ছে স্বর্ণ আঃ—আমার...'

'বাবা, হেরুর সঙ্গে দেখা করব। বকবে?'

'স্বর্ণ, থাক'।

'কেন—থাক্ কেন?'

'স্বর্ণ—ও শালা পাথর, ও বাউরির পো একটা জন্তু। শালাকে ভেবেছিলুম একখানা আস্ত ভলক্যানো—ভিসুভিয়াস। তো হেরু একটা খেঁকশিয়াল। খেঁকশিয়ালের বাচ্চা! একটা—একটা ভেড়া! ছাগল শালা! থুঃ থুঃ!'

ফিরে এসে স্বর্ণ এতদিনে বদলায়।

বদ্ধ ডিসপেনসারির দরজা খুলেছে। ঝাঁট আর নিকোন চলেছে যথারীতি। নকসীপাড় সাদা শাড়ি আনিয়েছে সুধাময়কে দিয়ে কাটোয়া থেকে। পায়ে চটি পরেছে। বাকসো থেকে দুগাছা রুলি বের করে হাতে পরেছে। খুব গম্ভীর মুখে সকালে শীতের রোদে বাবার মতন সে বসে থাকে চেয়ারে। বড় মাস্টার জর্জ এসে পড়া মুখস্থ করে—'আই সে, আমি বলি—ইউ সে, তুমি বলো,—হি সেজ, সে বলে।' শিশুর ভঙ্গীতে মধ্যবয়সী অস্ট্রেলিয়ান ইংরাজটা পা দুলিয়ে উচ্চারণ করে—'ট্রি গাস, ট্রি ইজ গাস, গাস গাস গাস'...

'নো মাস্টার, নো। নট গাস—ঘাস ইজ গ্র্যাস। ট্রি মিনস গাছ।'

'ঘাচ্।'

'গা—ছ—অ।'

'গা—'

'ছ—ছ।'

'স—স।'

'ফেট্। আপনার দ্বারা কিস্যু হবে না"

'হোবে—হোবে। বোলো—ট্রি ইজ ঘ্যাচ...'

'ঘ্যাচাংঘ্যাচ কাকে বলে ডু ইউ নো? থ্রোট কাটিং...'

'হাঃ হাঃ হাঃ! নোবডি ক্যান ডু দ্যাট!'...

ছ'বছর—তার মানে একুশ শো নব্বই দিন। তাকে চব্বিশ দিয়ে গুণ করলে ....উঃ! আমার বয়স ছ'বছর বাড়বে তখন। বাবা কি আরও ছ'বছর বাঁচবেন?

'ও সায়েব, ইউ গো নাও। কাম আফটার নুন।'

'হোয়াট ম্যাটার?'

'মাই মাইন্ড ইজ নট গুড।'

জর্জ আবার হাসে।...'দ্যাটস্ রাইট—বাট ইওর ইংলিশ ইজ নট গুড।'

বটতলায় এই সাতসকালে অনেক যাত্রী আর সওয়ারি গরুর গাড়ি জড়ো হয়েছে। গাড়োয়ানরা শুকনো পাতা কুড়িয়ে আগুন জ্বেলেছে। জড়োসড়ো স্ত্রীলোকগুলো—যারা গাড়িতে এসেছে—ওদিকে খালপুকুরে গিয়েছিল জৈবিক ব্যাপারে—তারা এখন কাঁপতে কাঁপতে রোদের দিকে আসছে। সবাই গোরা সায়েব দেখেই থমকায়। স্বর্ণর দিকেও তাকায়। ফিসফিস করে বলে কেউ, 'ওঃ হো! ও মাসিমা, দ্যাখো দ্যাখো—এই সেই মেয়েটা।'

'কোন মেয়েটা রে?'

'কেন? গোরাং ডাক্তারের বিধবা মেয়ে—বাউরি ডাকাতের সঙ্গে যার নটাঘটা ছিল!'

'মরণ! সক্কালে আবার ওই মুখ দেখে হাসছিস। তাকাসনে!'

'গোরাদের সঙ্গেও কেমন ভাব দেখছ মাসিমা?'

'হবে না! ওর মা—গোরাং ডাক্তারের মাগটাও যে তাই ছিল। আমরা সব জানি, বাবা। সেজন্যেই তো নিশিরেতে বিছানায় গলা টিপে মেরেছিল বউকে। কিন্তু মেয়ের বেলায় কী হল?'

দশ

একটি সান্ধ্য অভিযান

দেখতে দেখতে বড়ো গাছগুলোর সব পাতা ঝরে যায়। ধুলোউড়ির মাঠে শূন্য ক্ষেত থেকে ধুলো ওড়া শুরু হয়। এবং কর্ণসুবর্ণ টিলার ওপর মাঝেমাঝে দেখা যায় স্বাধীনচেতা একটি ঘোড়াকে। ছেলেপুলেরা তাকে তাড়া করে ধরতে পারে না। সে অকুতোভয়ে আকাশের নিচে ঘুরে বেড়ায় এবং রাত্রিযাপন করে। তার দেহ ততদিনে রীতিমতো মেদপুষ্ট ও সতেজ।

সহকারী স্টেশন মাস্টার সুধাময় একদিন সবিস্ময়ে দেখে, বিদ্যুতশিখার মতো ঝিলিক দিয়ে স্বর্ণলতা ধুলো উড়িয়ে মাঠ চিরে ছোটাছুটি করছে—তার লক্ষ্য সেই পৈতৃক জঙ্গম সম্পত্তি।

সুধাময়ের হাসি পায়। ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে দাঁড়িয়ে সে স্বর্ণর উড়ন্ত চুল দেখে ভাবে, এ নারীর মধ্যে প্রচণ্ড আদিমতা আছে এবং মনেমনে একটু উদ্বিগ্ন হয়। এ কাকে সে ভালবেসেছে মনে মনে গোপনে! প্রণয়ের বিপুল চাপা আবেগ নিয়ে তার দিন কাটে তো রাত কাটে না। তা কি বোঝে স্বর্ণ? যেন বোঝে, যেন বা বোঝে না। চটুল হাল্কা কথায় উচ্ছ্বসিতা স্বর্ণ কখনও হয়ে ওঠে যেন আত্মসমর্পণে তৈরি, কখনও তীব্র হুইসল দিয়ে মেল ট্রেনের মতন স্টেশন ছেড়ে চলে যায়। সুধাময়ের মনে হয়, এই উপমাটাই ঠিক। এ সুন্দর সবুজ বন্য ট্রেন তার মতন ছোট্ট ভদ্র স্টেশনের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

'চৈতক' হ্রেষাধ্বনি করে দূরের দিকে পালিয়ে যায়। তার দোদুল্যমান পুচ্ছদেশে শেষ মাঘের দিনাবসান প্রতিবিম্বিত হতে থাকে কিছু বর্ণচাঞ্চল্যে। উঁচু একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে তাকে নিরীক্ষণ করে স্বর্ণলতা।

তখন সুধাময় লাইন ছেড়ে এগিয়ে যায় তার দিকে। পিছন থেকে খুব আস্তে সে বলে, 'ধরতে পারলেন না?'

স্বর্ণ মুখ ঘুরিয়ে একবার দেখে নেয় সহকারী স্টেশন মাস্টারকে। কিন্তু কিছু বলে না। চৈতক বাঁজা ডাঙা পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সোজা কোদলা ঘাটের দিকে—যেখানে ইয়াকুব সাধুর তথাকথিত 'আশ্রম'টা চোখে পড়ছে। কয়েকটা গাছের ফাঁকে একটা কুঁড়ে ঘর। সেখানে কোথাও হামাগুড়ি দিচ্ছে হয়তো একটা বাউরিশিশু।

সুধাময় পাশে এসে চমকায়। 'কী ব্যাপার! আপনি...' অবশ্য হাসতে হাসতে সে বলে।...'আপনি তো ভারি ছেলেমানুষ! একটা ঘোড়ার জন্যে কান্নাকাটি করে নাকি কেউ?'

স্বর্ণ ধরা গলায় বলে, 'খুব দরকার ওকে—অথচ নেমকহারামটা কিছুতেই আর হাতের নাগালে আসতে চায় না। রাখালগুলোকে প্রতিদিন এককাঠা করে চাল দিয়ে যাচ্ছি, কেউ ধরতে পারছে না। ক'জনকে লাথি মেরেছিল—খুব চোট লেগেছে।'

সুধাময় ওকে সান্ত্বনা দিতে চায়।...'হাঁ মায়ামমতা তো স্বাভাবিক। কদ্দিন থেকে আছে! তবে কি—জন্তু জানোয়ারের ব্যাপার। ওরা ওই রকমই।'

স্বর্ণ ঠোঁটে কামড়ায়। তারপর বলে, 'খুব দরকার ঘোড়াটা। না—বাবার কথা ভেবে নয়, নিজের জন্য।'

সুধাময় প্রশ্ন করে, 'নিজের জন্যে?' সে কি! আপনি কি ঘোড়ায় চেপে বেড়াবেন?'

'হুঁ। দু'একটা কল পাব মনে হচ্ছে।' ...স্বর্ণ গম্ভীর মুখে বলে—চোখ দুটো ভিজে থেকে গেছে এবং এ মেয়ের কাছে যেন ওই অশ্রুসিক্ততাটা বিশেষ ধরনের বিলাস। ওই চোখ নিয়েই সে মৃদু হাসে!...'এতসব কেলেঙ্কারি করে লোকে। অথচ কেউ কেউ তো ওষুধ নিতেও আসছে।'

'আপনি পারবেন। আমার পায়ের মচকানি ব্যথাটা এক ডোজেই কিন্তু সেরে গিয়েছিল!'...এই বলে সুধাময় জোরে হাসে।

স্বর্ণ একটু ইতস্তত করে বলে, 'মাস্টারবাবু, আমার সঙ্গে একটু আসবেন?'

'নিশ্চয়। কিন্তু কোথায়?'

'আরেকবার দেখব ভাবছি। হাজার হলেও পোষা জানোয়ার তো! আসুন না!'

সুধাময় দ্রুত পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখে নেয়। তারপর বলে, 'লোকাল আসবার সময় হয়ে এল। জর্জ ব্যাটাকে কিছু বলে আসিনি—খচে যাবে নাকি!'...

স্বর্ণ নিঃসঙ্কোচে ওর একটা হাত টানে।...'জর্জকে আমি ঠাণ্ডা করে দেব। ভাববেন না।'

'কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে যে!'

'আসুক।'...

সুধাময় মনে মনে ওকে মায়াবিনী সম্বোধন করে পা বাড়ায়। আর বস্তুত তখন কী উদ্দাম চাঞ্চল্য তার রক্তে, শিরায়-শিরায় কামনাবাসনারা খুব ভদ্র বেশে সান্ধ্য ভ্রমণ শুরু করেছে! আর এই শীতশেষের ঈষদুষ্ণ সন্ধ্যায় নির্জন মাঠে তাকে বাগে পেয়ে যায় দুর্দান্ত প্রেমভালোবাসা। স্বর্ণ তার হাত ছাড়ে না। নরম কালচে মাটি শস্যশূন্য ক্ষেতের। কেটে নেওয়া ধানগাছের গুচ্ছ পিছনে ফেলে রেখে গেছে স্মৃতিপুঞ্জের মতন অজস্র 'মুড়ো'—তার নলে আগের রাতের শিশির সারাদিনের রৌদ্রপাতেও পুরো শুকিয়ে যায়নি, পায়ের আঘাতে ছিটকে পড়েছে প্রেমজ বেদনা থেকে অশ্রুপাতের পতন ফোঁটায় ফোঁটায়! ইতস্তত শামুকের খোল, মৃত কাঁকড়া, কিছু কোমলতম ফার্ণজাতীয় উদ্ভিদগুচ্ছ বুক পেতে এই প্রেমিক-প্রেমিকার অস্তিত্ব অনুভব করছে। অসমতল মাঠের উঁচু মোটা আলের ওপর কিছু ঝোপঝাড়, কদাচিৎ দু-একটা গাছ, পাখির ঝাঁক ফরফর করে উড়ে যাচ্ছে, বেজি ডিঙিয়ে যাচ্ছে সাপের সুপ্রাচীন কোন খোলস, শেয়াল কিংবা খেঁকশিয়াল গ্রামীণ কিংবদন্তীর মতন সবরকম সত্যাসত্যের বাইরে থেকে প্রতিভাত হচ্ছে কখনও; এবং দেখতে দেখতে তারা কর্ণসুবর্ণের একটি টিলার ওপর দিয়ে হেঁটে হাত ধরাধরি পেরিয়ে যায়, এবং যেতে হঠাৎ শোনে বাজখাঁই হাঁক চরণ চৌকিদারেরর—'হেই! কারা যায়।' তখন চকিতে হাত ছেড়ে আলাদা হয়।

চরণ লাঠি হাতে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। দেখে বা সব জেনেও একবার নিজেকে

জাহির করার ইচ্ছে হয়েছিল তার। স্বর্ণ কিছু বলার আগে সুধাময় সাড়া দেয়—'চৌকিদার নাকি?'

চরণ নমস্কার করতে করতে উঁচুডাঙা থেকে নেমে ওদের কাছে পৌঁছয়। চরণের বাঁকা হাসিটি এই ধূসরতায় অস্পষ্ট। সে বলে, 'আজ্ঞে, বেড়াতে বেরিয়েছেন নাকি?'

সুধাময় বলে, 'না। এনাদের ঘোড়াটা...'

স্বর্ণ ওকে থামিয়ে দেয়। ....'চলুন দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

চরণ বলে, 'হুঁ—ঘোড়াটা ওই বাগে যাচ্ছে দেখলাম। তা আপনারা কি ধরতে যাচ্ছেন ডাক্তোরদিদিরা? সে একটা কঠিন কাজ। সেবারে এতগুলো পুলিশদারোগা দৌড়াদৌড়ি করেও হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ....'

স্বর্ণ ধমকে বলে, 'হেসো না।'

থতমত খেয়ে চরণ বলে, 'আজ্ঞে হাসি নি।'

ওকে রেখে দুজনে সোজা নাকবরাবর ইয়াকুব সাধুর আখড়ার দিকে হেঁটে চলে। চরণ তখন একলা হয়ে দারোগার হাসি হেসে নেয় এবং আচমকা বিকট চেঁচিয়ে গান গাইতে থাকে। তার চ্যাপ্টা পায়ের ধাক্কায় ধুলো ওড়ে মেঠো রাস্তায়। সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকার বেয়ে নির্বোধ সাপের মতন সেই আঁকাবাঁকা ধুলো কতদূর ওঠার চেষ্টা করে।

একটু পরে আবার স্বর্ণ সুধাময়ের একটা হাত ধরে। ডাকে—'মাস্টারবাবু!'

'উঁ? বলুন।'

'আপনার খুব ভয় হল না তো?'

'ভয়! কেন?'

'চরণ দেখল।'

সুধাময় জেনেও অকারণ বলে।...'আপনাদের ঘোড়াটা খুঁজতে বেরিয়েছি—তাতে কী?

'না মশাই। আমি এমনি করে আপনার হাত ধরেছিলুম—চরণ দেখল।'

'বেশ—দেখল, দেখল।'

'আপনার বদনাম রটলে চাকরিতে ক্ষতি হবে না?'

'হবে তো হবে।'...বলে মরীয়া সুধাময় পরক্ষণে মাথা দোলায়।...'নাঃ কিছু হবে না।'

স্বর্ণ ওর হাতটা এবার ছেড়ে দেয়।...'না বাবা! আমার এখন রুগীপত্তর দরকার। কালিটালি থেকে দূরে থাকা ভালো। কী বলেন মাস্টারবাবু?'

কেন যেন অভিমানে আহত হয় সুধাময়। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সে বলে, 'লোকেদের ওটা স্বভাব। আপনি যতই দূরে থাকুন, কালির অভাব হবে না। বলুন, আপনি কি বাঁচতে পেরেছেন এত করেও? অমন নির্দোষ মানুষটার অকারণ সাজা হয়ে গেল পর্যন্ত! বিচার, না বিচারের প্রহসন! এই শালা ইংরাজ রাজত্বের আবার বড়াই করে সবাই! ছ্যাঃ ছ্যাঃ!'

'আচ্ছা মাস্টারবাবু, হেরুর সঙ্গে আমার কেলেঙ্কারির কথা রটল এত।'...স্বর্ণ খুব স্বাভাবিকভাবে বলে।...'আপনি কী ভাবেন?'

সুধাময়ের চোখ জ্বলে ওঠে।...'কী ভাববো?'

'আপনি কি ভাবেন, বাবা সত্যিসত্যি নির্দোষ?'

'নিশ্চয় তিনি নির্দোষ।'

'কিন্তু আমি যেন সত্যি ভালোবাসতুম হেরু বাউরিকে।...' বলে স্বর্ণ খিল খিল করে হেসে ওঠে।

'যাঃ!'

'হুঁ-উ। মাস্টারবাবু, আমার অপমানের শোধ নিয়েছিল যে, তাকে ভালবাসব না? কী যে বলেন!'

'ভালবাসাটা কী স্বর্ণ দেবী?'... সকৌতুকে সুধাময় বলে।

'অত বুঝিনে। কিন্তু ওই ছোটলোকটাকে দেখলে মনে খুব উৎসাহ পেতুম। ও কাছে থাকলে মনে হত—আমার ভীষণ জোর বেড়ে গেছে।'

'জানেন? আগে সব সম্রাজ্ঞী বা রানীটানীরা নাকি বাঘ পুষতেন। সখ করে পুষতেন।'

'হুঁ। ও ছিল আমার পোষা বাঘ। আজ আফশোস হয়, বাঘটা কাছে থাকলে কত কী সব করে ফেলতুম!'

'পৃথিবীর ওপর আপনার ভীষণ রাগ, তা জানি। সেটা অন্যায় নয়।'

'উঁহু—মানুষের ওপর।'

'একই কথা। কিন্তু কী আর করবেন? আপনি আমি প্রত্যেকে এত অসহায়—যেন একটা অন্ধ শক্তির সামনে কিছু করার থাকে না।'

স্বর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর চারিদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলে—'কোথায় এসে পড়লুম? হুঁ—বাঁদিকে। ওই যে ইয়াকুবের ঘর।'

'কিন্তু ঘোড়াটা কোথায়? অন্ধকার হয়ে এল—আর দেখাই যাবে না।'

'আসুন তো!'

তখন ইয়াকুব সবে 'লানটিন' জ্বেলেছে। দাওয়ায় উবুড় হয়ে পা ছুঁড়ছে হেরুর বাচ্চাটা—ফরসা ধবধবে রঙ। অবিকল রাঙীর মতন। ইয়াকুব আলোটা দোলাচ্ছে তার সামনে। মুখে অদ্ভুত আওযাজ করছে। হেরুর ছেলেও সমানে সাড়া দিচ্ছে। উঠোনে দুই মূর্তি দেখে ইয়াকুব দ্রুত ঘুরে গর্জে ওঠে—'কে র‍্যা?'

স্বর্ণ সাড়া দেয়—'আমি সন্ন্যাসীচাচা। তোমাকে দেখতে এলুম।'

অমনি লণ্ঠন রেখে ইয়াকুব শূন্যে ঝাঁপ দেয় এবং সামনে পৌঁছে দুহাত তুলে চেঁচায়—'ওরে আমার মা এসেছে রে! আমার মহামায়া মা এসেছে রে, আমার আঁধার ঘর আলো হয়েছে রে!'

তারপর ক্ষ্যাপা ইয়াকুব সাধু ঢাকের বাজনা জুড়ে দেয়। নাক ড্যাঙা ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং। উর্‌র্‌র্ ঢ্যাডাং ঢ্যাডাং ড্যাং!

সুধাময় আমোদ পায়। স্বর্ণ বলে, 'আদিখ্যেতা রাখো তো বাবু! কথা শোন।'

ইয়াকুব আরও বারকতক বাজিয়ে তারপর ঠিক ঢাকির মতনই সমের বোলটি ঝেড়ে করজোড়ে নত হয়।

'আমাদের ঘোড়াটা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। এইমাত্র এদিকে এসেছে, বুঝলে! তুমি একবার কষ্ট করে দ্যাখো না সন্নেসী চাচা!'

ইয়াকুব বলে, 'তাই বলুন। আমি ভাবলাম....যাক্ গে। যাবে কোথায় শালা? এইসা টানের বাণ মারব যে বাপ বাপ বলে দৌড়ে আসবে। ভাববেন না, বসুন মা জগদম্বা।'

বলে সে ব্যস্তভাবে লাফ দিয়ে ঘরে ঢোকে। স্বর্ণ বলে, 'ও তোমার মন্ত্রতন্ত্রের কাজ নয়। আমরা বসছি—তুমি একবার খুঁজে দেখ।-কাছাকাছি কোথাও আছে নিশ্চয়। গঙ্গা পেরিয়ে যেতে তো পারবে না।'

ইয়াকুব সাধু তার জাঁক দেখাতে ছাড়বে না। ঘরের ভিতর অন্ধকারে তার বিকট অংবং আওয়াজ শোনা যায়। স্বর্ণরা এগিয়ে গিয়ে হেরুর ছেলেকে দেখতে থাকে। ছেলেটা এদের দিকে তাকায় না। উপুড় হয়ে আলোটা দেখে, আর হাত পা ছোঁড়ে। রাঙা প্যান্ট জামা কিনে দিয়েছে ইয়াকুব। গলায় বাহুতে ঝুলিয়ে দিয়েছে সব নানা আকারের কবচ আর সুতোয় বাঁধা শেকড় বাকড়। নাকে সিকনি ঝরছে। লালা পড়ছে প্রচুর। ছেলেটা আলোর উদ্দেশে বলছে—'গ্যাঃ গ্যাঃ গ্যাঃ!'

স্বর্ণ নগ্ন দাওয়ার মাটিতে বসে পড়ে। তারপর আঙুল বাজায়, ঠোঁটে অদ্ভুত শব্দ করে। তখন সে স্বর্ণকে দেখতে পায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ওঠে। স্বর্ণ হাসতে হাসতে বলে, 'কী হল রে বাবা! পছন্দ হল না বুঝি! তোর মায়ের মতন সুন্দরী নই কি না—তাই!'

সুধাময় মনেমনে এবার বিরক্ত। গোরাংবাবুর মত স্বর্ণও বড্ড খামখেয়ালী। নিচুজাতের লোকজন নিয়েই এদের কারবার। তার ওপর এই সন্ধ্যাবেলায় ঘোড়াটোড়ার ব্যাপার—যাকে বলে একেবারে ঘোড়ারোগ!

ইয়াকুব সম্ভবত ঘোড়াটার উদ্দেশে আকর্ষণী মন্ত্র উচ্চারণ করছে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ স্বর্ণ চটুল হেসে চাপা গলায় বলে ওঠে, 'বুঝলেন মাস্টারবাবু! এটি আমার প্রেমিকের পুত্র!'

সুধাময় বোকার মতন হাসে।

'হু গো, ছোটলোকটার আমার ওপর কী যেন টান ছিল। পায়ের নিচে বসে মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। তারপর একবার আঁরোয়া জঙ্গলের মধ্যে....' স্বর্ণ সতর্কভাবে থেমে যায়।

সুধাময় অস্ফুট কণ্ঠে বলে, 'কী?'

স্বর্ণ হাসিতে ভাঙে।...'সে এক কেলেঙ্কারি। যাক্ গে। ছেলেটা কিন্তু ভারি সুন্দর—তাই না মাস্টারবাবু?

সুধাময় অগত্যা বলে, 'পছন্দ হলে নিয়ে চলুন। মানুষ করবেন।'

'পাগল!'...বলে স্বর্ণ ইয়াকুবের উদ্দেশে মুখ ঘোরায়।...'ও সন্ন্যাসীচাচা, হল তোমার?

ইয়াকুব বেরিয়ে আসে।...'চুপচাপ বসে থাকুন মা ত্রিনয়নী। শালা এক্ষুনি এসে পড়বে দেখবেন। যাবে কোথায়? এমন জোর ঝেড়েছি শালাকে....'

স্বর্ণ উঠে দাঁড়ায়।...'তোমার ওসব বুজরুকি শুনতে আমি আসিনি। উঠুন মাস্টারবাবু, আমারই বোকামি!'

সেও অবশ্য ঠিক। ঝাউবনের ওপাশে চাঁদ উঠছে। গঙ্গার জলে এবং বালিয়াড়িতে তেলরঙা আলোর ছোপ পড়েছে। এদিকটা অনেকদূর ফাঁকা। ঘোড়াটা দেখতে পাওয়া সম্ভব হবে। স্বর্ণ চাঁদ দেখতে থাকে। কুঁড়ে ঘরটার পিছনে সামান্য দূরে জঙ্গুলে একটা বটগাছ—শ্মশান। আরও কিছু গাছের জটলা নিয়ে সেদিকটা ঘন কালো হয়ে রয়েছে। প্যাঁচা এবং শেয়াল ডাকছে মাঝে মাঝে। পারাপারের ঘাটের দিক থেকে শম্ভু ঘেটেলের কাসির আওয়াজ আসছে। সেই সঙ্গে অস্পষ্ট কিছু কথাবার্তার আভাষও। হাটুরে ব্যবসায়ীরা ফিরে আসছে বেলডাঙা বাজার থেকে।

'ঘোড়া আসছে।' ইয়াকুব ফের আশ্বস্ত করে। ....'একটা কথা মা। শুনলাম, ডাক্তারি করতে লেগেছেন বাবার মতন।'

অন্যমনস্ক স্বর্ণ বলে 'হুঁ।'

'আমার পুকড়োটার সর্দিকাশি জ্বরাজ্বরি যে ছাড়ছে না রে ত্রিনয়নী।' করুণস্বরে ইয়াকুব বলে। 'ওষুধ কতরকম আমি তো দিলাম—কাজ হল না। নিয়ে যাব—দেখবি মা?'

ইয়াকুব তুই সম্বোধন করছে জেনেও স্বর্ণর রাগ হয় না। ছেলেটাকে একবার দেখে নিয়ে সে বলে, 'যেও। কিন্তু ঠাণ্ডায় ফেলে রেখেছ কেন? অসুখ তো হবেই।'

ইয়াকুব জানায়, 'হ্যাঁ—সে ঠিক কথা, মা জননী। কিন্তু সারাক্ষণ ছেলে নিয়ে থাকলে যে না খেয়ে মরব!'

ইয়াকুবের তন্ত্রচালনা ভূত ছাড়ানো এবং কবরেজি অংশ বাদ দিলেও নিজের সাধনভজনের ব্যাপার আছে। তারপর সবচেয়ে মুশকিল হয় আচমকা ভর উঠলে। তখন ছেলেটা জ্বলন্ত উনুনে গিয়ে পড়লেই বিপদ। তবে ইয়াকুবের অধীনে ভূতপ্রেত আছে কিন্তু—তারা সব সময় রক্ষা করে। সত্যি বলতে কী, এইসব সদাসতর্ক অদৃশ্য প্রহরীদের জন্যেই ছেলেটার কোনও ক্ষতি হয়নি আজ অবধি। যেমন ধরা যাক, সেদিনের কাণ্ডটা। কখন 'শালাব্যাটা' হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেছে একেবারে গঙ্গার পাড়ে। প্রায় পড়ে যায়-যায় অবস্থা। হঠাৎ কী আজব কাণ্ড দেখুন। সেই সময় বুড়ি ছাগলটা কী কারণে খুটো উপড়ে দৌড়ে আসছে পাড়ে—দড়িটা এসে একেবারে জড়িয়ে গেল ছেলের গায়ে। সেই টানে অনেকখানি দূরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ছেলেটাকে। বেঁচে গেল প্রাণে। কেটে ছড়ে গেল অনেক জায়গায়। এখনও ঘা শুকোয়নি।

মানতে হয়, এটা সত্যি বিস্ময়কর ঘটনা।

আরেকটি ঘটনা। বর্ষার শেষদিকে অনেক রাতে ইয়াকুব বেরিয়েছে গঙ্গার দিকে। উদ্দেশ্য, একটা মড়া আবিষ্কার—তার মুণ্ডুটা ভারি দরকার। ঘরে ছেলে একা ঘুমোচ্ছে। দরজা বাইরে থেকে আটকানো আছে। কিন্তু কীভাবে মড়াখেকো শেয়াল এসে আঁচড়ে কামড়ে ছিটে বাতার দরজা ফাঁক করে ঢুকেছে। তারপর ছেলের পায়ের কাছে যেই না শুঁকতে যাওয়া, অমনি প্রহরী বিশ্বস্ত 'চ্যাড়া' (প্রেত) চালের বাতা থেকে তিনটে মড়ার মুণ্ডু দিয়েছে ফেলে। পড়বি তো পড় শালার পিঠের ওপর। তখন তো শালা দরজা গলিয়ে পালাতে যাচ্ছে—কিন্তু অত কি সহজ? আটকে গেছে খাঁজে। আধখানা ভিতরে, আধখানা

বাইরে—ত্রাহিত্রাহি চ্যাঁচায় হারামজাদা। আর সেই আর্তনাদ শুনে দূরে নিশাচর সাধুর কান চখে ওঠে। সে দৌড়ে আখড়ায় ফিরে দেখে এই কাণ্ড....

সুধাময় সম্ভ্রমে বলে, 'শেয়ালটা মারলেন?'

'নাঃ। মায়ের জীব সব। রক্ষে পেল।'...ইয়াকুব জবাব দেয়। 'ছেলে আমার নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।'

স্বর্ণ বলে, 'খুব হয়েছে। আমার দেরি হয়ে গেল এদিকে।'

হঠাৎ ইয়াকুব রহস্যময় হাসে।...'মা কাত্যায়নী, ওই দেখুন আপনার ঘোড়া। হ্যাঁ, ঠাউর করে দেখুন। আমি বুড়োমানুষ—আমারও জোসনাতে দিব্যি নজর চলছে। যোয়ান চোখে আপনারা দেখুন মিথ্যে না সত্যি।'

হ্যাঁ, নিষ্প্রভ চন্দ্রালোকে স্থির ঘোড়াটাকে আবছা দেখা যাচ্ছে। চতুষ্পদ প্রাণীটি সম্ভবত কিছুক্ষণ থেকে বিশ্রাম নিচ্ছে অকুতোভয়। একটি ধ্রুপদী সঙ্গীতের মুদ্রিত স্বরলিপির মতন শ্রেণীবদ্ধ, ঋজু এবং প্রতীকচিহ্ন খচিত তার ওই অবস্থিতি। আর সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে মোহিতভাবে তাকে দেখতে থাকল। মনে হল এখন তার পশ্চাদ্ধাবন পাপ—পবিত্রতাবিনাশী, এবং ঈশ্বরও ক্ষমা করবে না কোনও মৃদুতম হস্তক্ষেপ।

আর সেই স্তব্ধতার মধ্যে থেকে প্রথমে মুখ খোলে সহকারী স্টেশনমাস্টার। ...'কী বদমাইসি! একে কয়েদ করতে চেয়েছিল শুওরের বাচ্চা আফতাব দারোগা!'

শান্তভাষী ভদ্র সজ্জন প্রেমিকের কণ্ঠ থেকে এহেন বুলি শুনেও কারও মনে হল না যে এই বাক্যটি এখন অশ্লীল। কারণ, কী যেন ছিল সেই সান্ধ্য পরিবেশ ও আবহাওয়ায়, সুপ্রচুর শান্তি এবং তদগত ভাবসমূহ। বস্তুত স্থানটি বহুজন-লাঞ্ছিত কোন শহর নয়, বিশাল আকাশ এবং ব্যাপক মাটিতে প্রকৃতির স্বাধীনতা অব্যাহত ছিল। প্রকৃতি সেখানে মনুষ্যহৃদয় ও মস্তিষ্ককে দিয়েছেন অবাধ স্বাধীনতা। আর গঙ্গা নামে ঐতিহাসিক শুধু নয়, পৌরাণিক প্রবাহিনী তার খুব কাছেই রয়েছে। সকলপ্রকার পাপ ও অশ্লীলতা তার জলে খুবই সহজে ব্রহ্মাণ্ডে উত্তীর্ণ হয়।

সহকারী স্টেশনমাস্টারের ঘৃণা এবং অশ্লীল বাক্যটিও তাই খুব স্বাভাবিক শোনাল। এবং তান্ত্রিক সাধু মুগ্ধচোখে ঘোড়াটা দেখতে দেখতে বলে ওঠে, 'চালসেপড়া চোখ আমার রেতের বেলা মায়ের কিপায় জ্বলে—ফুলকি বেরোয় রিং রিং! তো আহা হা! দেখ, দেখ সবাই—যেন বোররাখ্! (সুন্দরী নারীর মুখমণ্ডলবিশিষ্ট পক্ষীরাজ অশ্ব—যা হজরত মোহাম্মদকে স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল) হ্যাঁ, তাই লাগে। যেন, অবিকল রূপসী স্ত্রীলোকের মুখখানি দেখতে পাই। যেন...'

স্বর্ণ প্রশান্তি ভেঙে হাসে হঠাৎ।...'ফেট্! ঘোড়াটা মদ্দা।'

'কে মদ্দা, কে মাদী!' সাধুর ধ্যান ভাঙে না।....'আহা হা! দেখ গো, দেখ।'

'তুমি দেখ।' বলে স্বর্ণ পা বাড়ায়।

সুধাময় বলে, 'একটা দড়িদড়া হলে ভালো হত। নিয়ে যাবেন কীভাবে?'

'আসুন তো।'

ইয়াকুব অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মতন দাঁড়িয়ে থাকে। দাওয়ায় চটের ওপর হেরুর ছেলে

লণ্ঠন দেখে যথারীতি হাত পা দোলাতে ব্যস্ত হয়েছে ততক্ষণে। এইসব ফেলে রেখে ওরা দুজনে এগিয়ে যায়।

সুধাময়ের মনে হয়, অনর্থক একটা অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে তারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে, এবং এর শেষরক্ষা কতদূর হবে জানা নেই।

অথচ স্বর্ণ সুষমছন্দে পোড়ো ঘাসের জমির ওপর হেঁটে ঘোড়াটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ঘোড়াটা আশ্চর্য, একটুও নড়ে না। স্বর্ণ তার পিঠে হাত রাখে। গলা জড়িয়ে ধরে। ঘোড়াটা তবু স্থির। স্বর্ণ বলে, 'মাস্টারবাবু একটা ছিপটি হলে ভালো হত। দেখুন না, ওই ঝোপ থেকে একটা ডাল ভাঙতে পারেন নাকি।'

সুধাময় বিরক্তভাবে ঝোপ খোঁজে। একটু দূরে নিশিন্দাঝোপে অনেক চেষ্টা করে একটা ডাল ভাঙে সে। স্বর্ণ সেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'মাস্টারবাবু, আমি কিন্তু চাপব।'

'চাপবেন? কোথায়?' সুধাময় হাঁ হাঁ করে ওঠে।

'আপনার পিঠে নয় স্যার, এই শ্রীমানের।'

'আর আমি?'

'সেপাই সেজে সঙ্গে আসুন।'

সুধাময়ের হাসি পায়।...'কিন্তু ব্যাটা নির্ঘাৎ আপনাকে ফেলে দেবে।'

'তখন আপনার পিঠে চাপব।'...স্বর্ণ খিলখিল করে হাসে।...'কেন? পারবেন না?'

সুধাময় মনেমনে বলে, 'সে আমার প্রচণ্ড সুসময়।' প্রকাশ্যে বলে, 'আমি সব পারি।'

স্বর্ণ অভ্যস্ত ভঙ্গিতে 'চৈতকের পিঠে চেপে বসলেও সে নড়ে না। স্বর্ণ মৃদু ছিপটি সঞ্চালন করে গ্রাম্য স্ত্রীলোকসুলভ ঢঙে বলে, 'আ মর! ভিরমি খেলি নাকি? হেট্ হেট্!'

সুধাময় বিস্ফারিত চোখে দেখে, ঘোড়াটা ধীর ছন্দে হাঁটতে লাগল! আশ্চর্য, আশ্চর্য এবং আশ্চর্য! ম্রিয়মাণ জ্যোৎস্নার এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে তার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। কচি গমের ক্ষেত ভেঙে ঘোড়া যত হাঁটে, তার মন লোভে চঞ্চল হয়। এবং দৌড়ে কাছে গিয়ে বলে ওঠে, 'এই! আমাকেও একবার চাপতে দেবেন কিন্তু।'

'ঘোড়ায় চাপা অভ্যেস আছে তো?'

'উঁহু।'

'কোমর ব্যথা করবে। জিন ছাড়া তিষ্ঠোতেও পারবেন না।'

'আপনি তো পারছেন!'

'বারে', ছেলেবেলা থেকে চাপছি না?'

'শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন যখন. তখনও কি চাপতেন! ওনাদের ঘোড়া ছিল বুঝি?'

'যাঃ!' বলে স্বর্ণ মৃদু ছিপটি হাঁকায়। ঘোড়া আরেকটু দ্রুতগামী হয় এবং কাঁচা সড়কে গিয়ে ওঠে।

সুধাময় ক্লান্ত হয়ে ধুকুরধুকুর দৌড়ায়। মাঝে মাঝে বলে, 'আস্তে আস্তে!'

তখন চাঁদ অনেকটা উঁচুতে চলে এসেছে। জ্যোৎস্না বেশ স্পষ্ট। বৃক্ষবিরল মাঠ একপাশে, অন্যপাশে ঐতিহাসিক টিলা। হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে স্বর্ণ সকৌতুকে বলে, 'হ্যালো মাস্টারবাবু, কাম অন!'

সে ঘোড়া থেকে নামে। তার গলায় হাত রেখে নিজের পাছা ঝাড়ে একবার। তাবপর বলে, 'আসুন।'

সুধাময় হঠকারী আবেগে একলাফে ঘোড়ার পিঠে ওঠামাত্র ঘোড়াটা সামনের দু-ঠ্যাং তুলে হ্রেষাধ্বনি করে এবং সুধাময় অমনি স্বর্ণের ওপর পড়ে যায়। পড়ার সময় সে স্বাভাবিক ভাবে স্বর্ণকে ধরে ফেলেছিল। তার ফলে স্বর্ণশুদ্ধ জড়াজড়ি সে ধুলোয় আছাড় খায়।

ঠাণ্ডা ধুলোয় দুজনে ক'মুহূর্ত ঘন জড়াজড়ি থেকে ভেবেছিল, সব চেষ্টা এবার ব্যর্থ করে চৈতক ফের পালাবে। কিন্তু পুরুষ মানুষটির মধ্যে চকিতে সুপ্ত কামনা জেগে ওঠায় সে স্ত্রীলোকটিকে স্বাভাবিকভাবে নিষ্কৃতি দিতে চায় না এখন। আকুল দুইহাতে জড়িয়ে ধরে, পিঠের নিচে ঠাণ্ডা ধুলো নিয়ে, সে ভিখিরি চোখে তাকায় স্বর্ণর মুখের দিকে। স্বর্ণ হতচকিত ও বিভ্রান্ত ছিল এবং ঘোড়ার দিকে তার মন। সেই মুহূর্তে সহকারী স্টেশন মাস্টার তার গালে ঠোঁট ঘষে অস্ফুট স্বরে বলে, 'স্বর্ণ, আমার সোনা।'

ভাঁড়ের মতন মুখভঙ্গি করে ঘোড়া মুখ ঘুরিয়ে এই দৃশ্য দেখল। হ্রেষায় সে একবার হাসলও। আর সেই মুহূর্তে দুঃখিতা স্বর্ণ বলে 'ছিঃ! এ কী মাস্টারবাবু!'

দুজনে একই সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সুধাময় নির্বাক। স্বর্ণ কাপড় ঝাড়ে সশব্যস্তে। সেও কিছু বলে না আর। তারপর ঘোড়াব কাছে যায়। তখন টিলার ওপর দৌড়ে আসার শব্দ শোনে ওরা।

আর কে! চরণ চৌকিদার। দাঁত ঝলকায় তার জ্যোৎস্নায়।...'পড়ে গেলেন নাকি?'

'আর বোলো না হে!' সুধাময় বলে। 'ব্যাটা বড্ড পাঁজি! অনেক খুঁজে পাওয়া গেল যদি—তো....আরে, আরে!'

স্বর্ণ ঘোড়ার পিঠে চেপে আচমকা পিছলে চলে গেল দূরের দিকে। কিছু ধুলো দৃশ্যমান হল জ্যোৎস্নায়। কিছু শব্দ শোনা যেতে থাকল খট্‌খট্ খটাখট্ খটাখট্....

স্তম্ভিত সুধাময়। এবং লজ্জিত, দুঃখিত। এবং অভিমানীও।

চরণ বলে, 'ডাক্তোরবাবুব মেয়েটা ক্ষ্যাপা। এখন কী আর করবেন? চলে যান। বড়সায়ে' খুঁজছেন আপনাকে। আমি বলেছি, ঘোড়া খুঁজতে গেছেন স্বন্নদির সঙ্গে। বলুন তো সঙ্গে যাই। যাব?'

সুধাময় অনুচ্চস্বরে বলে, 'না। থাক।'

চরণ হেঁড়ে গলায় গান গাইতে গাইতে গাঁয়ে ফিরে গেল। সুধাময় খুব আস্তে হাঁটে। একটা গভীর অনুশোচনা এবং দুঃখ তাকে দুপাশ থেকে চেপে ধরে। সে মনে মনে বলে, হা ঈশ্বর! আমি ভুলে যাই যে স্বর্ণ বিধবা। আমার মনেই থাকে না যে যা হয় না, হতে পারে না, কিংবা আদৌ হবে না—তার পিছনে ছোটাছুটি করা নিস্ফল।

আর সেই রাতে ঘুমিয়ে পড়াও পাপ মনে হওয়ায় সুধাময় ছটফট করে তার কোয়াটারে। তারপর চুপিচুপি বেরিয়ে আসে। চাঁদ তখন পশ্চিম দিগন্তে আঁরোয়া জঙ্গলের শীর্ষে ঢলেছে। স্টেশনে জর্জ লম্বা টেবিলে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ভোরের আগে আর গাড়ি নেই। সুধাময় লম্বা পা ফেলে লাইন ডিঙিয়ে হাঁটে।

স্বর্ণর জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দুরু দুরু বুকে, ভারী শরীরে, ভাঙা গলায় সে ডাকে, 'স্বর্ণ, স্বর্ণ, স্বর্ণ!'

স্বর্ণ ধুড়মুড় করে উঠে বলে, 'কে, কে?'

'আমি—আমি সুধাময়।

'কী?'

'ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

স্বর্ণ লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে দেয়। তারপর উঠে গিয়ে দরজা খোলে। বলে, 'কী চাইতে এসেছেন?'

'ক্ষমা।'

স্বর্ণ কেমন হাসে।....'ফেট্! আমি ভাবলুম বুঝি...'

সদ্য ঘুমভাঙা ঢলঢল মুখ স্বর্ণর। সুধাময় ভাবে ক্ষমা চাওয়াটা ঠিক হল না। সে ভিতরে ঢুকে বলে, 'আপনার রাগ মানাতে এলুম।'

স্বর্ণ শান্তভাবে বলে, 'আমি রাগিনি। খুব লজ্জা পেয়েছিলুম। আসুন, চা খাব।'

এগারো

পালা বদলের দিনগুলি

সেই শেষরাতে চাঁদ যখন আরোয়ার জঙ্গলের মাথায়, তখন সুধাময় চা খেতে খেতে হঠাৎ মিষ্টি হেসে একটা অদ্ভুত কথা বলে বসে স্বর্ণকে।...'জর্জ আমাকে প্রায়ই বলে, কেন তুমি বিয়ে করছ না ডাক্তারের মেয়েকে? অস্ট্রেলিয়ানটাকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনে আমাদের হিন্দুদের আচার-বিচার কী রকম। ও আনকোরা সায়েব কিনা। ব্যাটার মাথায় ঢোকে না কিছু।....হুঁ, জর্জ ভীষণ অবাক হয়। এ কী নিয়ম? স্বামী মারা গেছে বলে সারাজীবন ওইরকম কষ্ট সহ্য করে শুকিয়ে তিলেতিলে মরতে হবে? হর্‌বিব্‌ল! শালা ইংরেজ আমাকে দু'বেলা উসকানি দ্যায়। তোমরা ভারতের লোকেরা বড্ড কাপুরুষ। শালা জর্জ আমাকে গাল দ্যায় হিজড়ে বলে। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।'

পিছনে জঙ্গলে বসন্তের পাখিরা তখন সবে ডাকাডাকি শুরু করল। অনেক কোকিল আর কাক। তারপর খুব কাছেই 'বউ কথা কও' ডাকতে লাগল। ভোরবেলাকার জঙ্গলে শেষ বসন্তে এই ডাক শুনে মন অন্যরকম হয়ে যায়। কোত্থেকে মিষ্টি গন্ধও ভেসে আসে। সুধাময় যেন সে-সবের মধ্যে বসে গ্রাম্য লোকদের মতো অবলীলাক্রমে পেচ্ছাপ করে দিল। সুধাময় হাসতে লাগল।

স্বর্ণ কি তার সামনে বসে আছে—হাতে চায়ের কাপ, ফুলহাতা ব্লাউজ আর সাদা নকসিপাড় ছত্রখান শাড়ি, নিষ্পলক চোখ? সুধাময় নিজের বক্তব্যের প্রচণ্ড ভিড়ে ডুবে গেছে। সে ফের কাটাকাটা ভাবে বলে, 'অবশ্য—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর...হুঁ, সে জোর এই অজ পাড়াগাঁয়ে কোথায়? বরং পাদ্রী সাইমনটা এলে খেরেস্টানই হয়ে যেতে রাজি ছিলুম। ওরা বেশ আছে মানে, খেরেস্টান আর মুসলমানরা! তবে স্বর্ণ, তুমি যদি ভাই ওদের কারো জাত হতে—আমি সে জাতে জাত দিতুম, তাতে কোন ভুল নেই।'

আবেগে স্বর্ণকে সে 'তুমি' বলে ফেলে। চায়ে চুমুক মেরে আরেকদফা নিজের মনে খিকখিক করে হাসে।...'হ্যাঁ, একটা সমস্যা। এখন সমাজ আমাদের—দেখ কাণ্ড, রক্ষিতা এ্যালাউ করবে প্রকাশ্যে—অথচ....ধ্যাৎ।' বলে সে বিরক্তিতে চুপ করে যায়।

স্বর্ণ আগের মতোই স্থির। দুর্ধর্ষ জলস্রোতের মধ্যে একটা বিশাল পাথর আটকে থাকার মতন নদীগর্ভে। ভিজে পাথর।

সুধাময় শেষ চুমুক দিয়ে বলে, 'বাতি নেভাও। ভোর হয়ে গেছে।...' তারপর নিজেই লণ্ঠনের দম কমিয়ে দিতে দিতে রেল বাতিটি হত্যা করে নিষ্ঠুর মুখে। জানলা খুলে দ্যায়। উঠে দাঁড়ায়।...'তার চেয়ে একটা সহজ সমাধান আমি খুঁজে পেয়েছি। আমরা বরং ভাইবোন হয়ে যাই। স্বর্ণ!'

সে ধৃষ্টতায় স্বর্ণর চিবুকের তলায় তার ডান তর্জনী ছুঁইয়ে ফেলে। স্বর্ণ আস্তে আঙুলটা সরিয়ে দিয়ে চায়ের কাপটা মেঝেয় রাখে। নিচে অল্প অন্ধকার থাকায় দেখা যায় না কতটুকু চা খেতে বাকি রইল।

নির্বোধ সহকারী স্টেশনমাস্টার তবু কথা বলতে দমে না। ...'স্বর্ণ আমার এই চরম প্রস্তাব। দয়া করে প্রত্যাখান করো না ভাই। এছাড়া কোন উপায় দেখতে পাচ্ছিনে। তুমি বোন, আমি দাদা—এর বিকল্প নেই। আমরা পরস্পরকে যথেষ্ট স্নেহ করব। আমাদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক থাকবে। এই ব্রাহ্মমুহূর্তে—আমি ব্রাহ্মণসন্তান—আমি এই পৈতে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি—আমি বিয়ে করব না।—কক্ষনো না—কোনওদিনও না। স্বর্গের অপ্সরা আর মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে বেছে নিতে বলা হলে আমি মৃত্যুদণ্ডই নেব স্বর্ণ।'

আচমকা সেই প্রগলভ স্রোতের মধ্যবর্তী স্থির পাথর লাফিয়ে পড়ল সুধাময়ের ওপর। সুধাময় প্রস্তুত ছিল না। হিংস্রহাতে তার জামার কলার ধরে স্বর্ণ জোরে এক চড় মারে এবং ঠেলে বের করে দ্যায়। উঁচু বারান্দা থেকে নিচে পড়ে যায় সহকারী স্টেশনমাস্টার। স্বর্ণ সশব্দে দরজা বন্ধ করে।

শুকনো ধুলোট মাটি থেকে হাঁচড়পাঁচড় করে ওঠে স্তম্ভিত লোকটি। এদিক ওদিক তাকায়। বটতলায় ময়রাবুড়ি ঝাঁটা হাতে এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পায়। আরও দ্যাখে, সেই নিঃঝুম ভোরে কোন বাবু সওয়ারি মোষের গাড়ির টাপর থেকে উঁকি মেরে স্টেশন দেখতে-দেখতে এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে হতভম্ব হয়েছে।

শিশির ভেজা সাপের মতো প্রেমিকের খোলসটি ছেড়ে নির্জীব সুধাময় আস্তে আস্তে এগিয়ে কাঁটাতারের ফটক পেরিয়ে, তারপর লাইন ডিঙিয়ে স্টেশনেব দিকে যায়।...

তারপর থেকে সবাই দেখল শান্ত সজ্জন ভদ্র সহকারী স্টেশনমাস্টারের চুল ইঞ্চি-ইঞ্চি বেড়ে কাঁধ ছুঁতে লাগল। গোঁফ দাড়িও সেই অনুপাতে পরিব্যাপ্ত হল। সন্ন্যাসীর চেহারা নিয়ে মানুষটি মিষ্টি হেসে যাত্রীদের টিকিট বিক্রি করে। দরকার ছাড়া কথা বলে না। মালগাড়ি পাস করানোর সময় সবুজ পতাকাটা এমনভাবে দোলায় স্টেশনে উঁচু খোলা চত্বরে, যেন মনে হয় ওই তার বাক্য : চলে যাও বাছা, তোমাকে বাধা দেবার কেউ নেই। এবং ট্রেনটা চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ সে তার গতিপথের দিকে তাকিয়ে পতাকা দুলিয়ে চলে। মাঝে মাঝে কোনও সময় সে বিনা কারণে সিগনালযন্ত্রের পাশে ওই চত্বরটায় দাঁড়িয়ে থাকে, আকাশের দিকে দৃষ্টি। কেউ কোনও প্রশ্ন করলে বিনীতভাবে প্রশ্ন করে : 'কিছু বললেন আমাকে?' পায়ে চটি পরে বৃদ্ধদের মতন সে প্রখ্যাত জলের ইদারার পাশ দিয়ে আস্তে কোয়াটারে চলে যায়। সময় থাকলে জানলার পাশে বসে চাপা গলায় সুর ধরে গীতাপাঠ করে। বড় মাস্টার জর্জ তাকে শুধিয়েছিল, 'কী ঘটেছে তোমার সুধাবাবু? তুমি বদলে যাচ্ছ বড্ড তাড়াতাড়ি। তুমি কি চাকরি ছেড়ে দেবে? তুমি কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবে? কেন তুমি আগের মতন হাসিখুশি চঞ্চল মানুষ নও সুধাবাবু?'

সুধাময় বলেছিল, 'মিঃ হ্যারিসন, আমি ঠিকই আছি। আশা করি, আমার কাজে কোনও গাফিলতি দেখতে পাচ্ছ না। বরং আগের চেয়েও কর্তব্যপরায়ণ হইনি কি? না মিঃ হ্যারিসন, আমি সন্ন্যাসী হব না। তবে আমার চুলদাড়ি কাটতে আর ভাল লাগে না। ঈশ্বর যা-যা সব আমাকে দিয়েছেন সবই উদ্দেশ্যমূলক কিনা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। আর আমি ঐশ্বরিক বাণীগুলো পাঠ করি। কারণ এইসব বাক্যে জীবনের গভীর উদ্দেশ্য কী—তা লুকিয়ে রয়েছে! অবশ্য সব কিছু তলিয়ে বোঝবার বয়স এখনও আমার হয়নি

হয়তো। এখনও সব ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগে। কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না। আসলে আমি অমৃত খুজছি মিঃ হ্যারিসন। ওই দ্যাখো, আমার ঘর ভর্তি হয়ে যাচ্ছে শাস্ত্রীয় বইপত্তরে। আমাদের জ্ঞানী বলেছেন, অমৃতের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। এই আমার গুহা। এ্যাদ্দিন ভাবতুম, বাইরের জগতেই এসেন্স অফ লাইফ খুঁজে পাওয়া যায়। এখন জানি, জীবনের গূঢ় তত্ত্ব আছে আমারই আত্মার মধ্যে।'...

এক চড়ে চৈতন্যোদয় বলা যায়। জর্জ ভীষণ হাসে। এই জড়বুদ্ধি বাংগালি বাবুটি ডাক্তারের মেয়ের হাতে ঘা খেয়ে চুপসে গেছে। লেজ গুটিয়ে ঈশ্বর ইত্যাদির দিকে পালাচ্ছে। বুদ্ধিমান ইংরেজটি খালি অবাক হয়। হাউ ফানি! হোয়াট এ ফুলিশনেশ! একটি মেয়ের জন্য এই নেটিভগুলো দিব্যি সাধুসন্নেসী হয়ে যেতে পারে। একটি মাত্র চড় এদের প্রচণ্ড দার্শনিক করে তুলেত পারে।

পরে একদিন কাটোয়া জংশনের এক অফিসার বলেছিল—'প্রিয় জর্জ, গ্রীক সক্রেটিস দার্শনিক হওয়ার কারণ ছিল তাঁর দজ্জাল স্ত্রী জ্যানথিপি। তবে দজ্জাল প্রেমিকাও যে অনেক সময় দার্শনিক প্রোডিউস করে, তা এই প্রথম তোমার কাছে শোনা গেল।' এই লোকটিও অবশ্য গোরা।

হ্যাঁ, ঘটনাটি রটে গিয়েছিল ক্রমশ চারিদিকে। হয়তো চাপা পড়ে যেত, কিন্তু সুধাময়ের দাড়িগোঁফ আর নতুন আচরণ এই মারীর জীবাণু ছেড়েছিল ঝাঁকেঝাঁকে। আর স্টেশন বা রেলপথের কী প্রচুর সংক্রামকশক্তি, তাও সেই প্রথম সচেতন লোকেরা টের পেয়েছিল। আপজংশন থেকে ডাউন জংশন অবধি চিরোটির তরুণ সহকারী স্টেশন মাস্টার রেলকর্মচারীদের কাছে রীতিমত একটি ক্যারেকটার কিংবা ক্যারিকেচার হয়ে দাঁড়াল। সুধাময়ের জনান্তিক নাম হল 'প্রেমানন্দ মহারাজ।' চিরোটি হয়ে যে রেলবাবুটি আসে, পরবর্তী স্টেশনে তার উদ্দেশে আর সব রেলবাবুর প্রথম প্রশ্নটি হল : 'প্রেমানন্দ মহারাজের খবর কী?' খালাসিরাও উৎসুক হয়ে থাকে। কান খাড়া রেখে অপেক্ষা করে আনাচেকানাচে। শেষ অবধি সুধাময় পরিণত হল স্রেফ 'মহারাজে'। ফলে সামনাসামনি তাকে মহারাজ বলে ডাকাও সম্ভব হল পরিচিতদের পক্ষে।

সেই দারোগার হাসি! মহারাজ শব্দ হয়ে আরেক মহিমা দেখিয়ে দিল। যারা স্টেশনে আসে, তারা একবার দ্যাখে 'মহারাজ', আরেকবার দ্যাখে 'লেডি ডাক্তার!' স্বর্ণলতা দিনেদিনে জনমুখে লেডিডাক্তার হয়ে ওঠে। তেজী টাট্টুর পিঠে সত্যিকার চামড়াজিন—(গোরাংবাবুর আমলে সেই কাঁথাজিন নয়—বড় মাস্টার জর্জ আনিয়ে দিয়েছে কলকাতা থেকে) এবং তাতে চেপে স্বর্ণলতা গাঁওয়ালে যায়। জর্জ অস্ট্রেলিয়ায় আসলে কোন লাইনে ছিল, জানা গেছে। ও ছিল একজন হর্সব্রোকার। ঘোড়াশালের গুরুমশাই। এক জনবিরল অঞ্চলে বিশাল হ্রদের ধারে ছিল এক কোম্পানির ফার্ম। ঘোড়ার কারবারটাই ছিল তাদের মুখ্য। তার সঙ্গে ছিল খরগোস ক্যাঙারু ইত্যাদি জন্তুর চামড়া চালানের ব্যবসা। সে সব দারুণ উত্তেজনার দিন গেছে জর্জের। তবে জর্জ ঘোড়া চেনে। ঘোড়ার ভাষা বোঝে। ঘোড়াকে পুরোপুরি 'হ্যান্ডমেসিনে' পরিণত করতে পারে।

এ হল এক রকম অপূর্ব যোগাযোগের ব্যাপার। স্বর্ণ ওকে বাংলা শেখায়, ও স্বর্ণকে শেখায় ঘোড়াবিদ্যা। বটতলা থেকে সামান্য দূরে একটা মস্তো বড়ো ঘাসের মাঠে বিকেলবেলা একটা ঘোড়া ও দুজন মানুষ যে দৃশ্যের অবতারণা করে, তার সঙ্গে সকালে ডাক্তারখানার বারান্দায় বসে পাঠ তৈরিতে ব্যস্ত দুটি মানুষের দৃশ্যের কোনও তুলনা সম্ভবত হয় না। গ্রাম্য লোকেরা দূরে ভিড় করে বিকেলে। আর আরও দূরে স্টেশনের উঁচু খোলা চত্বর থেকে দাঁড়িয়ে এক সন্ন্যাসীর শীর্ণ চেহারাও সেদিকে তাকিয়ে থাকে। সেই চেহারা শুধু চেহারাই দেখে—অন্য কিছু নয়।

সেই সময় একদিন সুযোগ বুঝে পাদরি সাইমনের পুনরাবির্ভাব ঘটে।

তার কথা এলাকার লোকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। বহরমপুর ক্রিমেটোরিয়ামের মধ্যে সুপ্রাচীন চার্চটার কাছে অনেকে তাকে অবশ্য দেখেও এসেছে অনেকবার—অন্তত যারা জজকোর্টে সেখানে মামলা করতে গেছে। কেউ ভাবেওনি যে অমন চূড়ান্ত কাণ্ডের পর এখানকার মাটিতে ফের সে পা দেবে।

কিন্তু সাইমনসায়েব নির্ভীক মুখেই এল। জর্জের কোয়ার্টারে তার আড্ডা নিল। জর্জকে সে খুব ধার্মিক খ্রিস্টান বলে জানে বরাবর। জর্জকে সে তাই ছেলের মতন স্নেহ করে। অন্তত এই দাবি তার আছে আগাগোড়া।

তবে জর্জ এবার একটু অস্বস্তিতে পড়ে যায়। গোরাংবাবু এবং হেরু ডাকাতের জেলের ব্যাপারে পাদরি সাইমনের গোপন চাপ ছিল অনেকটা। ইংরেজ জজসায়েব অন্তত বুড়ো ডাক্তারটির শাস্তি বিবেচনা করতে তৈরি ছিলেন—কিন্তু, জর্জ ভালো জানে—ফাদার এখানেও কীভাবে নাক গলিয়েছিল। ফাদারের স্বার্থ ছিল স্পষ্ট। এলাকায় ধর্মপ্রচারের মুখ্য বাধা ছিল এলাকার ওই একমাত্র আত্মসচেতন সভ্য ও সুশিক্ষিত হোমিওপ্যাথ ডাক্তারটি। এবং এর হাতে ছিল হেরু নামক বিপজ্জনক অস্ত্র। ফাদার এখন বুক ফুলিয়ে কর্ণসুবর্ণ জয় করার অভিযানে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে।

স্বর্ণের কথা ভেবেই জর্জ অস্বস্তিতে ভোগে। স্বর্ণ ফাদারকে কোনদিন যে দুচক্ষে দেখতে পারেনি, জর্জকে বলেছে অনেক সময়। এবং এখনও তার বাবার এই দুর্ভাগ্যের পিছনে ফাদারের অবদানের কথা কীভাবে জানে বলে সে আরও ক্ষিপ্ত।

জর্জ সে বেলা খুব ভাবনায় পড়ে যায়।

দিনগুলো এই অখদ্যে নির্জন স্টেশনে নির্বাসনে কী যন্ত্রণায় কাটাতে হত। সে মাত্র একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইংরেজ বললেই চলে—অর্ধশিক্ষিত, গোঁয়ার, চাষাড়ে। ভারতে আসবার পর নানাভাবে কিছু জানাশোনা ও চর্চার ফলে মোটামুটি নিজেকে চালিয়ে নেবার ক্ষমতা তার এসেছে। এবং জর্জ জানে, তাকে এই চিরোটির মতো জায়গায় পাঠানোর কারণ রেলকোম্পানির কী যেন লজ্জাসংকোচের মনোভাব। অর্ধশিক্ষিত রাফিয়ান একটা লোককে এখানে ঠেলে কোম্পানি যেন নিজের মান বাঁচাতে চেয়েছে। জর্জের মনে এইসব অভিমান এবং ক্রোধ তো আছেই।

স্বর্ণের মতো একটি ফ্যান নেটিভ গার্লের সহবাসে তার নির্বাসন ক্রমশ অর্থপূর্ণ আর চমৎকার হয়ে উঠেছিল। যেন তার নিজের মতনই একটা দুরন্ত আদিম বন্যতার ছাপ মেয়েটির মধ্যে লক্ষ্য করছিল। এমন নিঃসঙ্কোচ সাহসী মেয়ে ভারতে থাকতে পারে তার জানা ছিল না। তবে একথাও সত্যি, এমন কিছু ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে তার ইতিমধ্যে পরিচয়ও ছিল না। যে তার নিরিখে সে স্বর্ণকে বিচার করে বসবে।

প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণকে—স্বর্ণর আচরণে প্রথমে তাকে খুবই স্বাভাবিক লেগেছিল। অস্ট্রেলিয়ার সেই ফার্মে তাদের কিচেনে খাবার পরিবেশন করত যে মেয়েটি—লিডা হেস্কওয়ার্থ, তার সঙ্গে স্বর্ণর আমূল ফারাক একটুও খুঁজে পায়নি জর্জ।

অবশ্য কেউ কেউ জর্জকে বলেছে—'তোমার ধারণা ভুল জর্জ। ভারতে সব মেয়ে স্বর্ণ নয়। যদিও একশোটা ইংরেজ অস্ট্রেলিয়ানের মধ্যে পঁচানব্বইটার বেশি লিডা খুঁজে পাবে। স্বর্ণ একটা ব্যতিক্রম।'

জর্জ তার স্বল্প অভিজ্ঞতা বাজি রেখে তর্ক করেছে। শেষ অবধি রেগে বলেছে—'সো হোয়াট?'

'নাথিং। বাট এগেন ইউ আর রং।'...

পরে জর্জ অবশ্য খুব সহজে টের পেয়েছিল—লিডা হেস্কওয়ার্থের সঙ্গে স্বর্ণর একটা অদ্ভুত ফারাক আছে। লিডাকে দেখামাত্র ভালবাসার প্রস্তাব করা এবং চুমু খাওয়া গিয়েছিল, স্বর্ণের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। জর্জ আগে জানত, ভালবাসা বা লাভমেকিং মানেই বিছানার ব্যাপার দ্রুত এসে পড়ে—পরে জেনেছে, ভারতে একটা প্রচণ্ড আলস্যের স্রোত বইছে—যার দরুণ বিছানা পাততে অনেকখানি দেরি হয়ে যায়। এবং নাকি বিছানা অনেকসময় পাতাও যায় না—অথচ লাভ থাকে। কী অদ্ভুত, কী উদ্ভট!

এখন জর্জের অদ্ভুত বা উদ্ভট লাগে না। তাই বলে স্বর্ণকে সে 'আই লাভ ইউ' বলেও ফেলে না কোনও অসতর্ক মুহূর্তেও।

হয়তো বলত। বলে বসত কোন এক সময়। কারণ, তার মধ্যে এক চাষাড়ে আদিম গোঁয়ার মানুষ আছে। আজীবন ঘোড়ার সঙ্গদোষে সে ঘোড়ার মতনই দ্রুতগামী, চঞ্চল, উঁচুমুখো। সে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে জানে। কিন্তু সুধাময়ের পতন ও প্রস্থানের নাটকীয় দৃশ্যের সে সাক্ষী।

আর ক্রমশ স্বর্ণর ঋজুতর হয়ে ওঠা পরিচ্ছন্ন পরিপাটি গম্ভীরতা ও ব্যক্তিত্ব জর্জকে ভীত করে।

আর স্বর্ণর শান্ত বাক্যগুলোর স্নেহ (যথা—'জর্জ তুমি কি ক্লান্ত?' 'জর্জ, তুমি কি কিছু খাবে?' ইত্যাদি) জর্জকে অভিভূত করে।

ওই তিনটি ভাব অস্ট্রেলিয়ান রাফিয়ানটির জীবনে নতুন। ভয়, শ্রদ্ধা, অভিভূত হওয়া।

এই প্রথম কোন স্ত্রীলোককে সে ঘোড়া ভেবে সপাং সপাং চাবুক চালিয়ে পিঠে চেপে ছোটার ধারণা পরিত্যাগ করেছে।

অনাথ আশ্রমে মানুষ জর্জ হ্যারিসন, যার বিধবা মা এথেল হ্যারিসন অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে আবহাওয়া সহ্য করতে না পেরে মারা পড়ে, এই প্রথম একটি মেয়েকে

ভালবাসতে চেয়েও ভালবাসতে না পেরে একটা নতুন ধরনের যন্ত্রণা পেয়েছে।...

এবং সেই সময় এসে গেল ফাদার সাইমন রীতিমত জিনিসপত্র নিয়ে একেবারে অভিযানের জন্যে পুরোপুরি তৈরি হয়ে। আপাতত জর্জের কোয়াটারে কিছুদিন থাকার পর কোথায় কী করবে, সে কর্মসূচী ঘোষণা করে।

কর্ণসুবর্ণের ওই সবচেয়ে উঁচু চমৎকার টিলার ওপর ফাদার একটা চার্চ দেখতে পাচ্ছে। ফাদার সাইমন আঙুল দিয়ে দেখায়, 'দেয়ার! মাই বয়, জাস্ট লুক—লুক!'

হুঁ, জর্জও দেখতে পায় বইকি। নির্জন ধু-ধু ধূসর বিশাল টিলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা চার্চ—সুচলো চুড়োর শীর্ষে ঝকমক করছে ক্রুশ। ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং ঢং।

ফাদারের দ্বিতীয় প্ল্যান—ওখানে গিয়ে তাঁবু ফেলে বাস করবে। মিশনারস্ ক্যাম্প। একটা মেলার আয়োজন করবে। পরবর্তী পর্যায়ে মেলাটা স্থায়ী হাট বা গঞ্জে রূপ নেবে। গঙ্গার কাছাকাছি এ অঞ্চলে কোন হাটবাজার তো নেই। লোকের যথেষ্ট সমর্থন পেতে দেরি হবে না।

জর্জ শুধু হাসে। তার মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া ঘটে না। তার অস্বস্তি স্বর্ণের কথা ভেবে। ফাদার এসেছে, সবার সঙ্গে হেসে হেসে অনর্গল কথা বলছে স্টেশনে—স্বর্ণ বেলায় বেলায় দেখছে। তবু নিজ থেকে জর্জ ফাদারের প্রসঙ্গ তোলেই না স্বর্ণর কাছে। আর স্বর্ণও কেন কে জানে তোলে না। তার যেন এমন ভাব—কে এল জর্জের ঘরে বা স্টেশনে গাছ না পাথর, আমার তাতে চোখ নেই। স্টেশন জায়গা। কতরকম লোকজন যাবে আসবে।

কিন্তু ফাদার এসেই স্বর্ণর সব খবরাখবর জর্জের কাছে জেনে নিয়েছিল। সুধাময়ের ব্যাপারটা অবশ্য চেপে গেছে জর্জ। তবু ফাদার ধূর্ত মানুষ। সুধাময়ের সন্ন্যাসীমার্কা চেহারা ও চালচলন দেখে সে অবাক হয়েছে খুবই। এই নেটিভ বাবুটি রেলের লোক। এ আবার গোরাং ডাক্তারের আর হেরুর জন্যে তদ্বির করতে খুব হাঁটাহাঁটি করেছিল স্বর্ণর সঙ্গে। আর এখন সে ভুলেও লাইন পেরোয় না—ফাদার লক্ষ্য করে ফেলেছে। কিন্তু সুধাময়কে সে মনে মনে বরাবর দোষী করে রেখেছে বলে বেশি একটা কথাবার্তা বলেনি। তার রাগও হয়েছে, খুব কাছেই পাশের কোয়াটারে সহকারী স্টেশনমাস্টার প্রচণ্ড স্পর্ধায় উচ্চকণ্ঠে হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করে দেখে। পুওর জর্জ এসব সহ্য করছে কীভাবে?

মাথায় সেই বিরাট প্ল্যানের দরুন ফাদার এসব ছোটখাটো ব্যাপারে মনোনিবেশ করে না। স্থানীয় লোকেদের অসুখের খোঁজখবর নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইঁদারার কাছের অশত্থ গাছের তলায় টেবিলচেয়ার পেতে ওষুধের বাকসো নিয়ে বসে প্রতি সকালে। আর রোগীও জুটতে থাকে। রোগীরও সংখ্যা কদিনের মধ্যে হু হু করে বেড়ে যায়। অশত্থ তলায় সে এক মেলার ভিড়। চরণচৌকিদার নীল উর্দি পরে লাঠিহাতে তম্বি করে প্রথামত।

এদিকে বটতলার ডাক্তারখানায় রোগীর সংখ্যা বেশ হ্রাস পাচ্ছে লক্ষ্য করে লেডিডাক্তারটি। মানুষ এত নেমকহারাম হয়? একসময় গোরাংবাবুর সঙ্গে ঠিক এইরকম একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল ফাদার সাইমনের। হেরু শেষ অবধি জিতিয়ে দিয়েছিল

গোরাংবাবুকে। গোরাপাদরি কতকটা প্রাণভয়ে এলাকা ছেড়েছিল। এখন হেরু নেই। গোরাংবাবুও নেই। পাদরি এবার স্বর্ণলতার মুখের গ্রাস কাড়বার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বলা যায়। স্বর্ণ ভাবনায় পড়ে। ঠোঁটের নিচে বাঁকা রেখা ফোটে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে শূন্যদৃষ্টে। সবচেয়ে ভাবনার কথা পাদরি এবার এলোপ্যাথি ওষুধও এনেছে সঙ্গে।

জর্জও এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু কী করবে বেচারা? ফাদারকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে চলে যেতে বলা অসম্ভব তার পক্ষে! স্বর্ণকে দু'একবার সে বলেছে, 'ডিডি টোমার পেসেন্ট কমে গেল।' ব্যস, আর কিছু বলেনি জর্জ। স্বর্ণ শুধু একটু হেসেছে।

হঠাৎ এক রাতে স্টেশন কোয়ার্টারে হইচই কাণ্ড।

জর্জ যথারীতি স্টেশনঘরের টেবিলে ঘুমোচ্ছিল। সুধাময় তার কোয়ার্টারে ছিল। ভীষণ চেঁচামেচি শোনা গেল মধ্যরাতে। খালাসিরা চেঁচাতে লাগল। কেউ বুদ্ধি করে ক্যানাস্তারা পেটাতে শুরু করল। বাঘ ছাড়া কিচ্ছু নয়—নির্ঘাৎ আঁরোয়ার জঙ্গল থেকে এসে বাঘ হানা দিয়েছে। জর্জ জানালা দিয়ে কয়েকবার বন্দুক ছুঁড়ল ভ্যাবাচাকা খেয়ে।

সেই সময় স্পষ্ট শোনা গেল, সুধাময় চেঁচাচ্ছে—'আগুন, আগুন!' তার সঙ্গে পাদরি সাইমনের ভাঙা গলায় দুর্বোধ্য আর্তনাদও শোনা গেল।

সবাই তখন সাহস করে লণ্ঠন লাঠিসোটা নিয়ে স্টেশন কোয়ার্টারে হাজির হল। তারপর দেখল ভিতরের বারান্দায় চিত হয়ে শুয়ে আছে ফাদার সাইমন—তার কাছে জলের বালতি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সহকারী স্টেশনমাস্টার। ফাদারের জোব্বা ভিজে চবচব করছে। পোড়া গন্ধ নাকে লাগছে। ঘরের ভিতর থেকে ধোঁওয়া ভেসে আসছে তখনও।

ব্যাপারটা তক্ষুণি বোঝা গেল।

জানালা খোলা রেখে ঘুমোচ্ছিল ফাদার সাইমন। ম্যালেরিয়ার ভয়ে মশারি খাটানো ছিল। কে বাইরে থেকে মশারিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তারপর এই অবস্থা।

সুধাময় জানাল, কীভাবে পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে জল খোঁজাখুঁজি করে প্রজ্বলন্ত ফাদারের ওপর ঢালতে হয়েছে তাকে। সারা গায়ে আগুন নিয়ে পাগলের মতন লাফালাফি করছিল ফাদার সাইমন।

পরদিন সকালে দুঃখিত ফাদার সাইমন তল্পি গুটিয়ে স্টেশন থেকে চলে গেল। চলে গেল, আগের বারের মতো প্রস্থান অর্থে নয়—অন্যখানে। ভোর হতে না হতে ডাবকই কোদলা রাঙামাটি মধুপুর থেকে-মোড়লরা এসে হাজির হয়েছিল। তারা সবাই দারুণ রাজভক্ত বরাবর—অর্থাৎ ইংরাজ ভক্ত। কর্ণসুবর্ণর বড় একটা টিলার গায়ে সমতল কয়েক একর বাঁজা চটান রয়েছে। সৈদাবাদের জমিদার তার মালিক। দানেশ ব্যাপারীর সঙ্গে সেই জমিদারের গোমস্তা যদুপুরের গোবর্ধন ঘোষ ওরফে দোর্দণ্ড প্রতাপ গোবরা কায়েতের খুব খাতির আছে। দানেশই ডেকে নিয়ে গেল ফাদারকে। ওইখানে নতুন ডাক্তারখানা খোলা হবে। ঘরবাড়ি বানিয়ে দেবে মোড়লরা—নিজেরই গরজে। কারণ, এলাকায় ভালো ডাক্তার নেই, হাসপাতাল নেই—লোকেরা অসুখবিসুখে খুব কষ্ট পায়। ছুটতে হয় সেই কাটোয় জংশন, নয়তো সদর শহর বহরমপুরে

মনে মনে সবাই অবশ্য গোরাংবাবুর মেয়েকেই এই অগ্নিকাণ্ডের দরুন দোষী সাব্যস্ত করল। কিন্তু সে স্ত্রীলোক—কোনও পুরুষ নেই তার বাড়িতে, যার ওপর দিয়ে অভিযোগ-অনুযোগ-শাস্তি চালানো যাবে। সচরাচর কোন স্ত্রীলোকের অপরাধের জবাবদিহি করার রেওয়াজ হচ্ছে বাড়ির পুরুষদেরই। তাই ওদিকে আর এগোনো সম্ভব হল না। অবশ্য কেউ কেউ বলল, 'আর কোনও রোগী যাতে বটতলার দিকে না যায়, তার ব্যবস্থা করা দরকার।' কিন্তু অনেকে বলল, 'ছেড়ে দাও। মেয়েমানুষ!'

স্বর্ণর কানে এসব পৌঁছয়নি। দেখা গেছে, প্রত্যেকটি মানুষ রাতারাতি এবার কী যাদুমন্ত্রবলে পাদরিবাবার অনুরাগী হয়ে উঠেছে। সবাই বলেছে, 'ও কি মেয়ে? ও পুরুষের বাড়া। ওর বাবা ছিল ডাকাতের সর্দার। ডাকাত হেরু ছিল ওর পোষা বাঘ। ও দিব্যি ঘোড়ায় চাপতে পারে। দরকার হলে পুরুষমানুষকেও ঠ্যাঙাতে পারে। বিধবা! বিধবার কী আছে ওর? মাছমাংস কড়মড়িয়ে খায়। রাঙা শাড়ি পরে। পায়ে জুতো পরে। গটমট করে ইংরিজি বলে। জাতবেজাত জ্ঞান করে না। মুসলমান খেরেস্তান হাড়িবাউরি মুদ্দোফরাস সব—সব সমান ওর কাছে.'....ইত্যাদি।

স্বর্ণকে একঘরে করার উপায়ও নেই। সে স্ত্রীলোক। তার নাপিত বন্ধ করার কথা ওঠে না। জল বন্ধ করার উপায় নেই। স্টেশনে রেলকোম্পানির ইঁদারা আছে। আগুন বন্ধ করাও অসম্ভব। রেলপথে দেশলাই আমদানির অসুবিধা নেই। স্বর্ণর ছেলেমেয়ে নেই যে অন্নপ্রাশন বিয়ে ইত্যাদির সময় কোন সুযোগ পাওয়া যাবে। তার বাবা এখন কলকাতার জেলে। সে মলেও ইংরেজবাহাদুরের লোকেরা ওখানে পাশের গঙ্গা পাইয়ে দেবে। স্বর্ণ শ্রাদ্ধ করবে? ভাবা যায় না, ভাবা যায় না! রতনপুরের ওমর শেখের মতন ও আসলে একজন নাস্তিক। স্ত্রীলোক নাস্তিক হলে দিনকে রাত করতে পারে।

একটা শাস্তি শুধু দেওয়া যায় ওকে। তা হল, রোগী বন্ধ করা। মোড়লরা এই ব্যবস্থা দ্রুত করে ফেলতে বদ্ধপরিকর হয়েছে।

স্বর্ণর কানে দুর্ভাগ্যক্রমে কেউ এসব কথা তক্ষুনি তোলেনি। জর্জও না। সে ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। ফাদারকে সে ভক্তিশ্রদ্ধা করে; আবার এলাকার সব লোকই এখন স্বর্ণর বিরোধী। সে হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছিল কী করা যাবে এক্ষেত্রে। অবশ্য স্বর্ণর কাছে বাংলা শিখতে যেতে তার কোনও অসুবিধে নেই। কারণ সে রাজার জাত। তার সাতখুন মাফ। সে মেশে আগের মতনই। কিন্তু মনে মনে অস্বস্তি থেকেই যায়। আগের মতন কৌতুকে সারাক্ষণ ফেটে পড়ে না কথায় কথায়।

কিন্তু স্বর্ণ বাইরে-বাইরে যেন তাই আছে—একটুও বদলায়নি। জর্জ দ্যাখে, স্বর্ণ যেন আরও নির্বিকার হয়েছে বরং। পৃথিবীকে তাচ্ছিল্য করার মতন একটা কুঞ্চন তার ঠোঁট ও ভুরুতে স্পষ্টতর হয়েছে। জর্জ ভাবে, এমাসে স্বর্ণর গুরুগিরির প্রাপ্যটা সে ডবল করে দেবে। শুধু সংশয়টা থেকে যায়—স্বর্ণ নেবে তো তা?

নেবে না কেন? চমৎকার বাংলা শিখে গেছে জর্জ। লিখতে-পড়তে পারছে। শুধু বলতে আড়ষ্টতা আছে—উচ্চারণ করতে পারে না। সবচেয়ে অসুবিধে ক্রিয়াপদ নিয়ে। সাধুভাষার সঙ্গে চলিত ভাষা গুলিয়ে ফেলে।

তারপর জর্জ হঠাৎ কোন এক সময় মনেমনে নিজেকে প্রশ্ন করে—কেন তুমি বাংলা শেখার জন্যে জীবনবাজি রেখে লড়ছ বাছা? এর ইউটিলিটির সীমাই বা কতদূর এবং নেট লাভটা কী হবে? হিতৈষীরা বলেছিল, 'প্রিয় জর্জ, নেটিভ ভাষাটা শিখে নিলে এখানকার জীবন বরদাস্ত হতে পারে। সব ইংরাজই তাই বরাবর যে দেশে গেছে, তারা সেখানকার ভাষাটা শিখতে সবার আগে চেষ্টা করেছে—অন্তত যাদের নেটিভদের মধ্যে বাস করতে হয়।'...জর্জ ভাবে, অনেকদূর তো শেখা হল—এবার ছেড়ে দেওয়া যেত। ইংরেজিতে তার জ্ঞানগম্যি মোটামুটি যা, বাংলাতেও তার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে মনে হচ্ছে। বেশি জ্ঞান কষ্ট দ্যায়—'নলেজ ইজ এ ভেরি ডেঞ্জারাস এনিমি' অস্ট্রেলিয়ার সেই ফার্মে তার এক বন্ধু বলত।

অথচ এই অদ্ভুত মেয়েটির সংসর্গ ছাড়া দিন কাটে না, রাত কাটে না। মন সবসময় পড়ে থাকে ওখানে। হঠাৎ কবে প্রথামতো তার ডাক আসতে পারে বড়ো কোনও স্টেশনে, প্রমোশন হতে পারে। তখন জর্জ কী করবে? জর্জ, তখন তুমি কী করবে? লালচে চুল আঁকড়ে ধরে সে সিগনাল পোস্টের দিকে তাকিয়ে থাকে।...

দেখতে দেখতে গ্রীষ্মের শেষাশেষি কর্ণসুবর্ণ টিলার পাশে মাটির ঘর খড়ের চাল নিয়ে ফাদার সাইমনের 'হাসপাতাল' গড়ে ওঠে। শোনা যায় ফাদার কলকাতা থেকে একজন পাশ করা বড়ো ডাক্তার আনবে। সরকার বাহাদুর মোটা টাকার সাহায্য মঞ্জুর করেছেন। শুধু তাই নয়, ফাদার একটা স্কুলও করতে চায়।

সেই সময় একদিন স্বর্ণ আসছে ঘোড়ায় চেপে পাশের একটা গ্রাম থেকে—বাগদীদের ছোট্ট গ্রাম হিজল বিলের মধ্যে। উঁচু ভিটের ওপর সব ঘর—বর্ষায় চারদিক জলে থই থই করে। তৃণভূমির ওপর খড় কাটাদের খড়ের গাড়ির চাকার চলায় সারা খরা দুফালি দীর্ঘ ধুলোর রেখা পথ হয়ে পড়ে থাকে। সেই পথে সন্ধ্যার মুখোমুখি ফিরে আসছে লেডি ডাক্তার। আজকাল অনেকটা দূর থেকে তার ডাক আসে। কাছের কেউ ডাকে না—আসে না। কিন্তু দূর তাকে আপন করতে চায়।

ধুলো উড়িয়ে চৈতক ছুটে আসছে তৃণভূমি পেরিয়ে। বাঁকি নদীর কাছে এসে আঁরোয়াগামী রাস্তায় পৌঁছতেই স্বর্ণর কানে গেল সামনের বাঁকে কে জোরালো গলায় গান গাইছে।

ধুলো উড়িয়ে চৈতক ছুটে আসছে তৃণভূমি পেরিয়ে। বাঁকি নদীর কাছে এসে আঁরোয়াগামী রাস্তায় পৌঁছতেই স্বর্ণর কানে গেল সামনের বাঁকে কে জোরালো গলায় গান গাইছে।

ধুলো উড়িয়ে চৈতক ছুটে আসছে তৃণভূমি পেরিয়ে। বাঁকি নদীর কাছে এসে আঁরোয়াগামী রাস্তায় পৌঁছতেই স্বর্ণর কানে গেল সামনের বাঁকে কে জোরালো গলায় গান গাইছে।

বাঁকিনদী শুকনো খটখটে। নদী পেরিয়ে ওপারে গেলে স্বর্ণ দেখল তিনটে গরুর গাড়ি চলেছে আঁরোয়ার দিকে। আগের গাড়িটা ছই দেওয়া—পিছনের দুটো খোলা। এ দুটোতে গাদার গাদা আসবাব তৈজসপত্র বোঝাই।

আগের ছই দেওয়া গাড়ি থেকে যে জোরালো সুর শোনা যাচ্ছে, তা গান নয়, গানের মতো। পাশ কাটিয়ে আসতেই স্বর্ণ দেখল জুহা মৌলবী গাড়োয়ানের পিছনে বসে রয়েছেন। দুর্বোধ্য ভাষায় সুর ধরে তিনি কিছু পাঠ করেছেন। নিশ্চয় আরবী তন্ত্রমন্ত্র। জুহা মৌলবী তন্ময় হয়ে থাকার দরুন হয়তো লক্ষ্য করতেন না পাশ দিয়ে কে ধুলোর ঝড় তুলে অস্পষ্ট চলে গেল ঘোড়ার সওয়ার। কিন্তু স্বর্ণ থামল।...'মৌলুবী চাচা! কেমন আছেন? কোথায় চললেন এতসব জিনিসপত্র নিয়ে?'

ধূসর আলোয় মৌলবী স্বর্ণর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক কয়েক মুহূর্ত। পরক্ষণে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'স্বর্ণ! স্বর্ণময়ী! স্বর্ণলতা! ও মা, তুমি? খোয়াব দেখছি না তো মা? বাবাকে টেক্কা দিয়েছ—এ্যাঁ!' হো হো করে হেসে ওঠেন মৌলবী।

স্বর্ণ বলে, 'কোথায় চললেন এমনভাবে?'

'ডাবকই!' জুহা মৌলবী জবাব দিলেন। 'শিষ্যরা ছাড়ল না আর। ঘরবাড়ির ব্যবস্থা সব করে দিয়েছে। আমিও দেখলুম স্টেশন জায়গা—ভালই হবে দেশবিদেশ যাওয়া আসা করতে। তুমি কেমন আছো বাছা? বাবার চিঠিপত্র পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি। ভালো আছেন।'

'তোমার খবর কিছুকিছু পাই, স্বর্ণ। দেশচর লোক—কানে আসে। তা বাবার মতন পসার করতে পেরেছ তো মা?'

স্বর্ণ সকৌতুকে হাসে।....'না চাচা, পারলুম কই? সবাই যে একঘরে করতে চায়। রোগী আসতে দ্যায় না। পাদরিবাবার ওখানে হাসপাতাল হচ্ছে শোনেননি?'

জুহা মৌলবী ভুরু কুঁচকে ঝুঁকে আসেন।...'কী হচ্ছে? হাসপাতাল?'

'হ্যাঁ'।

'কোন পাদ্রী এসে জুটেছে আবার? সেই সাইমন সায়েব নাকি?'

'হুঁ।'

'ব্যাটার শিক্ষা তাহলে হয়নি?'...জুহা মৌলবীর মুখ লাল হয়ে ওঠে হঠাৎ।

স্বর্ণ হাসে।...'এবার কে ওঁর মশারিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। ব্যাঙ পোড়া হতে গিয়ে খুব বেঁচেছে।'

জুহা মৌলবীর ক্রোধ হাসিতে ফেটে যায়। প্রচণ্ড হাসেন।

'লোকের ধারণা, আমিই আগুন দিয়েছি—বুঝলেন চাচা?'

'তুমি? যাঃ!'

'তাই তো লোকের এত রাগ আমার ওপর!'

'মুসলমানরা কী বলে?'

'ডাবকই তো যাচ্ছেন—থাকবেনও। সেখানেই সব শুনবেন আপনার শিষ্যদের কাছে।'

জুহা মৌলবী গম্ভীর মুখে বলেন, 'ডাবকই গ্রামের কেউ তো আমাকে এসব জানায়নি! তৌবা, তৌবা! খ্রিস্টানের ওষুধ খাবে মুসলমানেরা আমি তবে বেঁচে আছি, না কবরে গেছি?'

'হিন্দুর ওষুধ খেলে যদি আপনার শিষ্যদের জাত না যায়, তাহলে খ্রিস্টানের ওষুধে যাবে কেন?'

জুহা সাহেব গর্জে ওঠেন—'ইংরেজ মুসলমানের দুশমন। হ্যাঁ—আমি গিয়েই ফতোয়া দেবো—যে মুসলমান ইংরেজ পাদরির হাতের ওষুধ খাবে, তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে যাবে।'

'ওরা কানই করবে না দেখবেন।' স্বর্ণ চপল স্বরে বলে।

মৌলবী মুঠো শূন্যে তুলে ঘোষণা করেন—'এ আমার জেহাদ। ইন্‌শা আল্লাহ্! এ জেহাদ শেষ না করে আমি আর সফরে যাব না।'

এইবার স্বর্ণ মৌলবীর দু'পাশে অবাক হয়ে চেয়ে থাকা তিন-চারটি ছেলেমেয়েকে দেখতে পায়। সে বলে, 'ওরা বুঝি আমার ভাইবোনেরা? ও চাচা, চাচীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন? নাকি পর্দা ভাঙলে পাপ হবে? ভয় নেই—আমি তো মেয়ে।'

জুহা মৌলবী সশব্যস্তে ঘুরে বলেন, 'কই গো, একবার মুখ বের করো। এই দ্যাখো, আমার বন্ধু গৌরাঙ্গ ডাক্তারের সেই মেয়ে—স্বর্ণমা। আমার বেটি জোয়ান অফ আর্ককে একবার দ্যাখো!'

স্বর্ণ দ্যাখে, ছায়ার নিচেকার ঘাসের মতন ফ্যাকাসে রুগ্ন একটি মুখ বেরিয়ে এল শাড়ির পর্দার ফাঁকে। লাল টুকটুকে ঠোঁট। হাসল। শীর্ণ সাদা লম্বাটে আঙুল, নীল শিরা প্রতিভাত হল। সেই হাত আদাব দেবার ভঙ্গীতে একটু উঠল। মৃদু চুড়ি বাজল। কিন্তু কোন কথা নয়।

জুহা মৌলবী খুশিতে বলেন, 'এক দুর্ভাবনা ছিল চিকিৎসাব। ছেলেপুলেগুলো ভীষণ ভোগে। পেটে ইয়াবড়ো সব পিলে। ভালই হল—ঘরের ডাক্তার পেলুম। মা স্বর্ণ, লাইনের ধারেই পশ্চিমপাড়ায় তৈরি বাড়ি পেয়েছি। যাবে মা—কাল সকালেই একবার গিয়ে দেখে আসবে।'

হাউলিতে সামান্য পাঁক আছে। গাড়োয়ানরা গরুর লেজ মুচড়ে চেঁচামেচি করতে থাকে। স্বর্ণ একটু তফাতে সরু বাঁধের ওপর দিয়ে ঘোড়া নিয়ে পেরোয়। ওপারে পৌঁছে সে বলে, 'চলি মৌলুবীচাচা! কাল নিশ্চয় যাবো।'

চৈতকের গতি বেড়ে যায়। শুকনো রাঙামাটির পথ। ধুলো উড়িয়ে জঙ্গল পেরিয়ে যায়। শাড়ি পরে ঘোড়ায় চড়ার খুব অসুবিধা আছে। হাঁটুর নিচে সারা পা খোলা। ধুলোয় রাঙা হয়ে গেছে। জর্জ বলেছিল একটা রাইডিং ড্রেসের কথা। প্রথম প্রথম লজ্জা করতে পারে পরতে। কিন্তু উপায় নেই। জর্জকে বলতে হবে—যা দাম লাগে, আনিয়ে দিক কলকাতা থেকে।...

বটতলায় পৌঁছে এসে দ্যাখে নিচু প্ল্যাটফর্মের নিচে সুধাময় বসে আছে চুপচাপ। গা জ্বলে ওঠে স্বর্ণর।

ঘোড়া থেকে নেমে সে সদর দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢোকে। ঘোড়াটা উঠোনে নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু স্বর্ণ জর্জের শিক্ষানুসারে তার গলার চামটি ধরে উঠোনে পায়চারি করায় কিছুক্ষণ।

একসময় অন্ধকার হয়ে এলে আলো জ্বেলে বসে এবং চা খেতে খেতে স্বর্ণর হঠাৎ মনে হয়, পাদরি সাইমনের মশারিতে আগুন কে দিতে পারে আর—সুধাময় ছাড়া? অবশ্যই সুধাময়।

এবং তার গা ছমছম করে, ওই ভিতু বোকা প্রেমিকটি সাইমনের হাসপাতালের খড়ের ঘরে এবার আগুন লাগিয়ে দেবে না তো?

স্বর্ণলতার এমন হিতসাধনের প্রবৃত্তি কার হতে পারে? কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে গেছে আপাতত। যদি সত্যি সুধাময় ও কাজ করে থাকে, তবে হাসপাতালেও আগুন লাগাতে পারে।

স্বর্ণ ভাবে এক্ষুনি লোকটাকে হুঁশিয়ার করে দিলে ভালো হয়। কারণ এরপর হাসপাতাল পুড়লে কিংবা পাদরির গায়ে সামান্য আঁচড় লাগলে স্বর্ণর ঘরেও আগুন লাগতে দেরি হবে না। এ এলাকায় পাল্টাপাল্টি আগুন লাগানোর রেওয়াজ আছে। সারা গ্রীষ্মকাল লোকেরা খুব ভয়ে ভয়ে কাটায়।

তাছাড়া শুধু পাল্টা ঘর পোড়ানো নয়—স্বর্ণর ওপর অন্যরকম অত্যাচারও শুরু হওয়া বিচিত্র নয়। এখন স্বর্ণকে বাঁচানোর কেউ নেই—নিজেই নিজের সতর্ক রক্ষী।

স্বর্ণ অমনি ওঠে। দরজার বাইরে থেকে শুধু শেকল আটকে অন্ধকারে হন হন করে হেঁটে যায়। নির্জন স্তব্ধ স্টেশন আর প্ল্যাটফর্ম। পিপুলতলায় কেউ নেই। ল্যাম্পপোস্টগুলো থেকে মৃদু আলো ছড়াচ্ছে। লোকাল ট্রেন চলে গেছে একটু আগে। কোনও যাত্রী নেই। খালাসিরা রাতের খাবার তৈরি করতে গেছে তাঁবুতে। স্টেশনের ভিতরে জর্জ একা বসে কী লিখছে প্রকাণ্ড খাতায়।

অন্ধকারে স্বর্ণ হাঁটে। কোয়ার্টারের কাছে গিয়ে থামে। গুনগুন করে সুর ধরে সুধাময় কী সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করেছে শোনা যায়। জানালা খোলা। আলো আছে ঘরে। বিছানায় শুয়ে আছে সুধাময় চিত হয়ে। দুটো হাত বুকের ওপর, আঙুল জড়ানো। চোখ বোজা আছে। তার ঠোঁট নড়ছে শুধু।

স্বর্ণ অস্ফুট স্বরে জানলার ধার থেকে—'মাস্টারবাবু!'

চমকে লাফিয়ে ওঠে সহকারী স্টেশনমাস্টার। 'কে? কে?' বলে একচোখা রেলবাতিটা নিয়ে জানলায় চলে আসে।

স্বর্ণ কঠোর মুখে বলে, 'শুনুন মাস্টারবাবু, একটা কথা বলতে এলুম। আপনি আমাকে ভীষণ বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। খবর্দার, পাদরি সায়েবের আর কোনও ক্ষতি করার চেষ্টা করবেন না। তাহলে এবার আপনিই বিপদে পড়বেন বলে দিচ্ছি।'

জানলার রডের ওদিকে দাড়ি গোঁফওয়ালা মুখটা আবছা হয়ে আছে—শুধু জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখা যাচ্ছে।

স্বর্ণ সাঁৎ করে চলে যায়। তারপরও কতক্ষণ সেই মুখ একই ফ্রেমে আটকে থাকে ছবির মতন—আলোও কাঁপে না।

স্টেশনের বারান্দায় জর্জ বেরিয়েছে। স্বর্ণকে দেখে সে বলে, 'কী হল ডিডি?'

স্বর্ণ তখন হাসে। ....'একা ভাল্লাগছিল না। তাই চলে এলুম। চলো তোমার টেলিগ্রাফ করা দেখব।'

ঘরে ঢুকে টেবিলে পা ঝুলিয়ে সে বসে। জর্জ এসে তার পাশেই নিজের চেয়ারে বসে পড়ে। তার মুখটা কেমন গম্ভীর।

স্বর্ণ বলে, 'তোমার আবার কী হল জর্জ? কথা বলছ না কেন?'

'ডিডি!'...জর্জ একটু হাসে।

'হুঁ, বলো।'

'টুমি—ইউ ওয়েন্ট দেয়ার—আমি ডেকসিলো।'

'হুঁ—-দেখেছিল নয়, দেখেছিলাম—দেখেছিলুম।'

'ডিডি, সুঢাবাবু কী বলল—হোয়াই—কেন গিয়াসিল?'

'ভ্যাট কে-ন গি-য়ে-ছি-লে? হোয়াই ইউ ওয়েন্ট দেয়ার?'

জর্জ গতিক বুঝে প্রসঙ্গ বদলায়।...

বারো

কালকেতু উপাখ্যান

এদিকে দিনে দিনে বেড়েছে কালকেতু। সবার লোচনসুখের হেতু তো বটেই। ওই ঢলঢল অঙ্গলাবণ্য বড় জ্যোৎস্নাময়। মুসলমান সাধু ভরা গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ দেখে সারাবেলা। মনে মনে ভাবে, এই আকাশ-রাঙানো সোনা কোথায় থুই? মাথায় থুলে উকুনে কাটে, মাটিতে থুলে পিঁপড়ে কুটুস করে কামড়ায়। ক্ষ্যাপা তান্ত্রিক দু'হাত শূন্যে তুলে ধেই ধেই করে নাচে। একটু চোখের আড়াল হলেই বজ্রগর্ভ চিৎকার করে, 'ইসমাইল। হেই-ই-ই-ই!'

ধুলো উড়িয়ে ধু ধু মাঠ একদিকে, অন্যদিকে কর্ণসুবর্ণ টিলা, আর দিকে জহ্নুকন্যার খোলা বুকের ওপর নখের আঁচড় কেটে ঘোরে সেই স্নেহভারাক্রান্ত বাজপাখি চিৎকার। ভাগলপুর-রাজমহল ধুলিয়ান-আজিমগঞ্জ থেকে কলকাতা যেতে যেতে বাণিজ্যযাত্রী নৌকার মাঝিমাল্লারা শোনে সেই তীব্র আবেগময় কণ্ঠস্বর। শোনে নিঃসঙ্গ উদ্ভিদের মতো মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা চাষা। বুড়ো সাধু ঝাঁকড়া জটা নাড়া দিয়ে ডাক ছাড়ে, 'হে—ই—ই—ই ইসমাইল।'

হেরুর ছেলে খাকি ঢোলঢাল হাফ পেনটুল পরে শ্মশানবটের কোটরে তখন অবিকল সাধুর মতন মড়ার মাথা নিয়ে খেলতে বসেছে, কানে নেয় না কোনও ডাক। কেউ বললে ঠোঁট কুঁচকে আধো-আধো বুলিতে বলে, 'ডাকুক শালা! গাঁজা আনতে আমি পারব না।'...

কাছাকাছি আবগারি দোকান নেই এলাকায়। রাঙামাটির চরণ চৌকিদার আর কোদলার মতি তিওর গাঁজা সরবরাহ করে গাঁজাড়েদের। চরণের বাড়িতে আবার গাছও লালিতপালিত হয়। তার ফুল ফুটলে পাড়া মউমউ করে আইনবিরোধী গন্ধে। কিন্তু সে তো পুলিশের লোক। গঙ্গার পূর্ব পাড়ের লোকেরা পশ্চিমপাড়কে বলে 'রাঢ়।' পূর্বপেড়েরা (পূর্বপাড়বাসীরা) ছড়া কেটে বলে,

মদ গাঁজা রাঁড়
এই তিনে রাঢ়।

(মজার কথা, বিধবাকে রাঢ় অঞ্চলে 'রাঁড়' বলে। যেমন গোরাং ডাক্তারেব মেয়ে বিধবা হয়ে এলে, লোকে বলেছিল 'ডাক্তারবাবু মেয়ের কপাল! সকালবেলায় রাঁড় হয়ে গেল!' এখানে 'রাঁড়' একটি বেদনায় ভিজে, স্নিগ্ধ ও শুচিতাপূর্ণ শব্দ। অথচ এই বাক্য : 'লেডিডাক্তার স্বর্ণলতা? থুথু ফেলো! ও আজকাল গোরাসায়েবের রাঁড় হয়েছে তা শোননি?... ময়রাবুড়ির ইদানীং প্রচারিত এই কলঙ্কগর্ভ বাক্যটিকে সেই একই শব্দ তথাকথিত সমাজবিবেকের পক্ষে হৃদয় বিদারক এবং নাসিকাকুঞ্চনকারী। অনেক অনেক বছর পরে কর্ণসুবর্ণের ঐতিহাসিক খননকার্যের সময় যে তরুণ অধ্যাপকটি এসেছিলেন, তাঁর ধারণা হয়েছিল—এতদঞ্চলে তরুণী বিধাবারা সেকালে সম্ভবত রক্ষিতার জীবন গ্রহণে ব্রতী ছিলেন। কারণ, প্রধানত রক্ষিতাকেই 'রাঁড়' বলে উল্লেখ করা হত।)

চার বছরের ছেলে ভাঙাভাঙা উচ্চারণে যখন পালকপিতা সাধুকে শালা বলে, চমৎকার লাগে। তো ইয়াকুবের ইচ্ছে, ছেলে লিখবে পড়বে—রেলগাড়ির 'আপসার' হবে। সাধু বলে, 'আমার ছেলে লিশান তুলবে গাড়ি ছুটবে, লিশান নাবাবে গাড়ি দাঁড়াবে। আমার ছেলে ফুড়ুৎ করে বাঁশি বাজাবে, গাড়ি ছাড়বে।'

কোদলার নিসিং পণ্ডিতের পাঠশালায় দেবে ওকে। সে নিয়ে কত জল্পনা, কত যাওয়া আসা। পণ্ডিত বলেছে, 'আরেকটু বয়স হোক, বুদ্ধিসুদ্ধি হোক। তখন এনো।' সেই দিন গুনছে ইয়াকুব। পাছে ছোটলোকদের ছেলেপুলের সঙ্গে মিশে বখে যায়, সব সময় সতর্ক থাকে। চোখে-চোখে রাখে। কিন্তু একটু ফাঁক পেলেই ও অদৃশ্য। আশেপাশে ইয়াকুব চেঁচিয়ে ডেকে বেড়ায়। সে-ডাকে খোঁজার চেয়ে পিতৃসুলভ গর্বই বেশি অবশ্য। কিন্তু ক্ষুদে দুষ্টুটি লুকিয়ে থাকে সাবধানে। সাড়া দেয় না।

সেরাজুল হাজি বলেছে, 'ইয়াকুব ছেলের খৎনা দিচ্ছে না কেন? কলমা পড়াচ্ছে না কেন। জুহা মৌলবীর কাছে নিয়ে এসো একদিন।'

ইয়াকুব বিনীত হেসে সায় দিয়েছে। ....'আনব বইকি। বা রে বা! আমি যাই করি হাজিসায়েব—আরে বাবা, আসলে তো আমি শালা মোছলমানের ওরসে জন্মো। হেই বাবা হাজিসায়েব, মলে তো গোরে যেয়ে শোব—না কী? হেঁদুরা কি আমাকে পোড়াবে, না গঙ্গায় ফেলে দেবে? কেউ ছোঁবে না এ শালোর লাস।'...ইয়াকুব সকৌতুকে চোখ নাচিয়ে আরও বলেছে, 'ছোঁবে কেন? মা কালী ভজি আর আলিই ভজি আমার যে মূলেই বাদ!' অর্থাৎ সে Circumscision -এর কথাই উল্লেখ করে।

ওদিকে ঘটকঠাকুর বলেছে, 'এ্যাই ইয়াকুব! খবর্দার বাবা, হেরুর ছেলের জাত মারিস না। হেরুর যাবজ্জীবন মানে তো কুড়িটা বছরের মেয়াদ। একদিন ফিরে আসবেই। তখন কী জবাব দিবি?'

ইয়াকুব বলেছে, 'অ্যাদ্দিন বাঁচবই না ঠাকুরমশাই!'

'আরে! তুই বাঁচবি না—ছেলে তো বাঁচবে।'

'বাঁচুক, বাঁচুক। আশীর্বাদ করো ঠাকুর। আমার ইসমাইল যেন ওই শশ্মানবটের পরমায়ু পায়।'

'তোর বাবার ইসমাইল, বাঞ্চোৎ!' ঘটকঠাকুর গালমন্দ করেছেন।

ইয়াকুবের মতলব কী বোঝা যায় না। সে নিজেও কি বোঝে? আসলে ওসব কিছু ভাবে না সে। তাব স্বপ্ন ছেলে হঁবে রেলের অফিসার। হুকুমদারি করবে রেলগাড়িকে।

কিন্তু ছেলের আচরণ দেখে তার দুঃখ হয়। মনে মনে বলে, হাজার হলেও বাউরির রক্ত! ও শালা গুগলি, শামুক, কাঁকড়া কুড়িয়ে জলেজঙ্গলে ধুলোকাদা মাখতেই সুখ পায়। অত যত্ন করে সাজিয়ে রাখি, পলকে নোংরা হয়ে যায়। বাঞ্চোৎ ধুলোবালিতে ঢিবি না গড়িয়ে পেচ্ছাপ করে না—আবার তাই দুহাতে ঘাঁটে। ছ্যাঁ ছ্যা। আমি ওর ভালো করতে পারি? ওর রক্তের দোষ আছে, জন্মের দোষ আছে।....

ক্ষিপ্ত ইয়াকুব সাধু ঢ্যালা তুলে তাড়া করে, 'বেরো শালা বেজন্মা আমার বাড়ি থেকে। তি-সীমানায় দেখলে তোর ঠ্যাঙ খোঁড়া করে দোব। তুই মলে গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে

আসব। হাড়ে বাতাস লাগবে আমার। হাসছে দেখ না দাঁত কেলিয়ে। তোমরা দেখ—শালা দুষমনের হাসিখানা দেখে যাও।'

লোকে দেখার আগে নিজেই দেখে মজে যায় সাধু। মনে মনে আবার তারিফ করে, 'জগন্ময়ী মা আমাকে কী অভ্রিতি দিলেন গো! কোথায় থুতে কোথায় থুই, কী বলতে কী বলে ফেলি! এ গাঁজাখেকোর মুখের তো কোন রাখঢাক নেই!'

এইরকম বকবক করে আর দাওয়ায় বসে কাঁথা সেলাই করে সে। উঠোনের রোদে ধান শুকোয়। লম্বা কঞ্চিটা মাঝে মাঝে নাড়া দেয় পাখি তাড়াতে। পায়রা আসে, শালিক আসে, চড়ুই আসে ঝাঁকেঝাঁকে। লাফিয়ে লাফিয়ে ধান খায়। ইয়াকুব কঞ্চি দোলালে একটু সরে যায়, কিন্তু ওড়ে না। চোখের নজর কমে যাওয়ায় আবার হেঁট হয়ে কাঁথায় ফোঁড় দিলে পাখিরা আবার দৌড়ে আসে ধানের ওপর। মুখ তুলে হাসে ইয়াকুব। '.তারাও বুঝে গেছিস বাবাসকল, 'সাধুর পায়ে গোদ।' কই, কইরে সেই ব্যাধের ব্যাটা একলব্যি? এবার দেখা তোর অস্তরের মহিমে! ছিটকিনি (গুলতি) কই রে বাপ? কোথা তোর তীরধনুক?'

হেরুর ছেলে ছড়ালো দুটো অমল ধবল হাত দিয়ে গুলিতে তাক করতেই সাধু লাফ দিয়ে সামনে আসে—'খবর্দার বাপ! উঁ হু হু হু, পাখপাখালি মারে না। পাপ হয়।'

'পাপ' কথাটার অতিপ্রচারের দরুন কিংবা দুর্জ্ঞেয় কোন কারণে বালকব্যাধ থমকায়। এবং সরলমুখে প্রশ্ন করে, 'ক্যানে?'

তার রাঙা লালচে-কটা চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে সাধু বলে, 'এই সুন্দর কেশগুলা উড়ে যায় বেবাক'।

'চোপরাও শালা। আবার ক্যানে? বলছি, ইটা বেদের বচন—তবু বলে ক্যানে!' ইয়াকুব লাল চোখে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

পাখি দেখতে দেখতে উজ্জ্বল রোদে ছেলেটির ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। বড় প্রসন্ন তার চোখ—সেখানে আগুনের কেন্দ্রবর্তী নীলাভ শিখার মতন কী ছটা জ্বলজ্বল করে। কী ভাবে সে, কেউ জানে না। সে আস্তে ডাকে, 'সাধু!'

সাধু! এখনও অবধি অত শিখিয়েও বাবা বলানো গেল না ওকে। বড়জোর বলে সাধুবাবা। দুঃখিত ইয়াকুব অবশ্য তখন ঠোঁটের সেই ঘামের ফোঁটা এবং দৃষ্টির নীল বিচ্ছুরণের কারণে ফেটে পড়তে পারে না। শুধু বলে, 'কী রে সোনা?'

'আমাকে একটা খাঁচা করে দেবে সাধু?'

'দোব, মাণিক, দোব!'

কাঁথা ফেলে রেখে ইয়াকুব বাঁশ এনে খাঁচা বানায়। কোত্থেকে শালিখের বাচ্চা এনে দেয়। খাঁচার মধ্যে পাখিও দিনদিনে বাড়ে! খেজুর গাছের শাখা থেকে তৈরি 'ঝাগুল' মাঠের ঘাসে বুলিয়ে ঘাসফড়িং তাড়ায়, মারে, বাঁশের চোঙায় ভরে নিয়ে আসে পাখির জন্যে। দুটি মানুষ মুখোমুখি খাঁচা নিয়ে বসে পরম যত্নে পাখিকে খাওয়ায়।

হাটের দিন ইয়াকুব ছেলেকে কাঁধে নিয়ে গোকর্ণের হাটে যায়। ছেলের হাতে পাখির খাঁচা দুলতে দুলতে চলে। ময়রার দোকানে ছেলেকে পেট পুরে মিষ্টি খাওয়ায় সে।

এবাড়ি-ওবাড়ি চেনা লোকের সঙ্গে দেখা করে আসে। ছেলের পরিচয় দিয়ে কিছু চায়। পায়ও। দাসজিমশাই হেরুর ছেলেকে নতুন পেন্টুল আর গেঞ্জি দিয়েছেন। চৌধুরীবাবুরা বলেছেন, 'ও ইয়াকুব, এবার কালীপুজোয় তোমার ছেলেরও নেমন্তন্ন রইল।'

যাবে ইয়াকুব। প্রতিমার সামনে বলিদানের সময় রক্ততিলক পরে নাচবে—

ও মা দিগম্বরী নাচো গো।
যেমন নাচো বাবার ঘরে
তেমনি নাচো আমার ঘরে
মা—আ গো।।

কবিয়াল বাঁড়ুয্যেমশাই তাকে গান দিয়েছেন—নতুন গান। ইয়াকুব বলে, 'বড়ো খটোমটো পদ। কিন্তু স্বগ্গো-মত্ত-পাতাল মহাপ্রেলয় করে দেয়।'

নাচে, পাগলা ভোলা গলায় মালা
হাতে লাগে শূল।
প্রমথ প্রমত্ত নাচে
কানে, ধুতুরারই ফুল।।....

শেষ শরতে ড্যাডাং ড্যাং ঢাক বেজে ওঠে কোদলা, মধুপুর, যদুপুর, চাঁদপাড়া চতুর্দিকে। গঘা বায়েন দুই ভাই, তাদের দুই ছেলে জগা আর লগা, জোড়া ঢাক, কাঁসি, সানাই নিয়ে গোকর্ণে চৌধুরীবাবুদের পুজোয় যায়। তার সঙ্গে চলে ইয়াকুব সাধু, 'ইসমাইল' আর তার পাখি 'মনাই।'

সারারাত নেচে ক্লান্ত মুসলমান সাধু তার ছেলেকে খোঁজে। আঙিনায় একধারে সিমেন্টের চত্বরে এক দঙ্গল ন্যাংটো নিম্নবর্ণের ছেলেমেয়ের মধ্যে ঘুমন্ত ছেলেকে দেখে তার কারণ কিংবা মহাকারণের ঝোঁক কেটে যায়। হু-হু করে ওঠে বুক গভীরতর মায়াবী বাৎসল্যের চাপে। কী কারণে তার চোখে জল উপচে আসে। কিন্তু গামছার খুঁটে মুছে সে হাসি মুখে বলে, 'আহা হা! তুই কি এখানে ঘুমোবার ধন, বাছা? আমার কপাল। ওঠ্, ওঠ্, ঘরে যাই।'

এবং ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে নিতেই সে প্রথমে চোখ পিটপিট করে বলে, 'আমার মনাই কই?'

ইয়াকুব হাসে। তখন চারপাশে ভাঙা আসর এবং স্তব্ধতা। সে বলে, 'নাও, উঠেই ওই কথা। সেদিকে চাঁদ আমার ঠিক আছে। হ্যাঁ-রে বাছা, তোর মনাইয়ের খবর আমি কী করে জানব? কোথায় রেখে শুয়েছিলি?'

কান্নাভরা মুখে ছেলেটা আঙুল তোলে, 'উইখানে।'

'উখেনে। তা গেল কোথা? উড়ে তো পালায়নি।'...দুরুদুরু বুকে ব্যস্ত হয়ে খোঁজে ইয়াকুব। ঘুমন্ত মানুষগুলোর উদ্দেশে হাঁকডাক করে বেড়ায় সারা আঙিনায়।...'কে লিয়েছে, এখনও বলো। কে লিলে আমার ছেলের পক্ষী?'

পরক্ষণে চকিতে মনে পড়ে যায় তার।...'আমার মরণ! তুই যখন ঘুম পেয়েছে বললি, আমি তো টঙে ছিলাম। তবু ঠিক খ্যাল ছিল বাপ, আমার মন ছিল তোর কাছে। হ্যাঁ, পাখির খাঁচা তুলে এনে রেখে দিয়েছি—হুই, হুই দ্যাখ কোথা?'

আঙুল তুলে সে দালানের বারান্দায় কোণার দিকে একটা ঝাড়লণ্ঠন দ্যাখায়। খাঁচা ঝুলছে নিরাপদে। তার নিচে শুয়ে আছে জনাকয় লোক—চেহারায় বাবুবাড়িরই বটে। নেশার ঘোরে বেদম ঘুমোচ্ছে। পাখির বিষ্ঠায় সকলেরই শরীর ইতিমধ্যে বিচিত্রিত। নিঃশব্দে হেসে ইয়াকুব ছেলেকে কাঁধে তুলে খাঁচা নামাতে ইসারা করে। তারপর সাবধানে সরে আসে।...

ইতিমধ্যে একদিন হঠাৎ সক্কালবেলা ইয়াকুবের বাড়ির দরজায় পরাক্রান্ত জুহা মৌলবীর আবির্ভাব ঘটল।

ইয়াকুব সবে পান্তা খেয়ে রোদের উঠোনে বসেছে। ছেলেটা একগোছা বঁড়শিকাঠি গুছিয়ে কেঁচো তুলতে ব্যস্ত কোণার সারগাদায়—গঙ্গার পাড়ে পুঁতে অপেক্ষা করবে মাছ গাঁথার। অল্পঅল্প শীত পড়েছে সদ্য। হেমন্তের কুয়াশা দূরের বস্তুগুলোকে অস্পষ্ট করে ফেলছে আজকাল। চবচবে শিশির জমে থাকছে, অনেকটা বেলা অবধি। সেই সময় জুহা মৌলবী এলেন আচমকা। হাতে ছড়ি, খালি পা, জোব্বা ও লুঙি হাঁটু অবধি গোটানো—ভিজে পায়ে ঘাসকুটো, ঘাসের ফুল এঁটে রয়েছে। এসে 'হায়দরা' (হতরত আলি হায়দর অর্থাৎ হজরত মহম্মদের জামাই যুদ্ধক্ষেত্রে যে রণহুঙ্কার দিতেন) হাঁক দিলেন, 'ইয়াকুব!'

ইয়াকুব হকচকিয়ে যায়। হাঁ করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। তারপর লাফিয়ে ওঠে, 'আসুন, আসুন হুজুর! কী সৌভাগ্যি, কী কপাল।' দৌড়ে সে তার জীর্ণ কুঁড়েঘরের সবচেয়ে সম্মানিত আসন একটা চৌপায়া বের করে আনে। ছেলেটা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখেই নিজের কাজে মন দেয়।

জুহা মৌলবী চড়া স্বরে বলেন, 'বসব না ইয়াকুব। অনেকদিন থেকে জমাতে (সামাজিক মজলিসে) তোমার কথা ওঠে। একটা বিহিত করব, ভাবি। হয় না। কাল রাত্রে শোবার সময় তোমার কথা মনে পড়ল। ঠিক করলাম, ইনশাল্লা, কালই ফজরের নমাজ পড়ে তোমার বাড়ি নিজে যাব।'

ইয়াকুব উদ্বিগ্নমুখে হাসবার চেষ্টা করে।

'ইয়াকুব! তোমার জন্যে আমি আসিনি। বুঝেছ? তুমি মহা জাহেল (মূর্খ গোঁয়ার), শয়তান তোমার রুহে (আত্মায়) ঢুকে গেছে—তাকে বের করার সাধ্য আমার নেই। তুমি যা খুশি করো, কিন্তু ওই দুধের বাচ্চার আখের নষ্ট করছ কেন?'

ইয়াকুব চুপ। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

ছেলেটার তারিফ করেন জুহা মৌলবী।...'আহা হা! কী রূপ, কী ছুরত (শ্রী)! আল্লাতালা শয়তানের হাতে ওকে সঁপে দেবেন, কোন মূর্খ বলে একথা রে? ওকে নিতে এলাম ইয়াকুব। ওর খৎনা দেব। ওকে কলমা পড়াব। ওকে আরবীফারসিউর্দু পড়িয়ে

দেওবন্দ, শরিফ পাঠাবো। আল্লার দুনিয়ায় একজন ইমানদার বাড়বে। চাই কী, ওর নেকীতে (পুণ্যে) তোর গুনাহ (পাপ) আল্লা মাফ করে দেবেন।'

ইয়াকুব একবার ছেলের দিকে তাকায়।

জুহা মৌলবী বলেন, 'আরে মূর্খ নাদান! ও ছেলে কি তোর? ও ছেলে এখন দুনিয়ার। ওর মা নেই, বাবা নেই—'

ইয়াকুব অতিকষ্টে বলে, 'আছে হুজুর। বাবা আছে।

মৌলবী হাসেন। 'হ্যাঁ—তা আছে। তবে—আর পনের ষোল—কী বড় জোর সতের বছর পরে তার যাবজ্জীবন মেয়াদ খেটে ফিরে আসবে। এসে যখন দাবি করবে, তখন তুই কী দিয়ে আটকাবি ইয়াকুব? বল্, পারবি?'

ইয়াকুব জোরে মাথা দোলায়।

'তবে? তাই বলছি—তার আগে ওকে ইসলামে দীক্ষা দিই। ওকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দে। ভালো খাবে-পরবে। তোর ঘরে পড়ে ছেলেটার কী হাল হয়েছে দেখ্‌দিকি! অমন সুন্দর সুপুরুষ ছেলে!'....বলে জুহা মৌলবী কয়েক পা এগিয়ে ছেলেটির কাছে যান। সস্নেহে একটু হেসে বলেন, 'ও বাবা ছেলে! শোন দিকি, এসো, আমার দিকে তাকাও।'

অমনি ইয়াকুব ছেলের কাছে এসে দাঁড়ায়। তার মধ্যে আর সেই ভীরুতা কিংবা ভদ্রতার একটুও চিহ্ন নেই। তার লাল চোখ জ্বলছে, শরীর কাঁপছে। শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। সে বলে, না ইসমাইল, তাকাসনে। যাদু করবে।'

প্রথমে বিস্মিত হন জুহা মৌলবী, পরক্ষণে জোরে হাসেন।...'বাঃ! ইসমাইল নাম রেখেছে ইয়াকুব? তবে তো হয়েই আছে!'

ইয়াকুব কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'আমার নিজের মরা ছেলেটার নামে নাম রেখেছি। ও নাম কারো বাপোত্তি সম্পত্তি লয়।'

জুহা মৌলবি তাকে আর ঘাঁটান না। খপ করে ছেলেটার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে থাকেন। বিব্রত ছেলেটা একটানে বেশ খানিকটা গিয়ে কেঁদে ওঠে।

ইয়াকুব এবার ছেলের একটা হাত ধরে চেঁচিয়ে বলে, 'খবর্দার।'

পাল্টা জুহা মৌলবী গর্জে ওঠেন, 'চোপরাও।'

ছেলেটা আরও জোরে কেঁদে ওঠে।

তারপর পরস্পর প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে যায় অনিবার্যভাবে। জায়গাটা গ্রাম থেকে একটু দূরে—বাইরে। আশেপাশে কোথাও কোন লোক নেই। পিছনে গঙ্গায় বহমান নৌকো আছে, স্রোতে দ্রুতগামী। শ্মশানবটের কাছে শেষরাত্রে মড়া পুড়িয়ে যারা রোদের অপেক্ষায় আগুন পোহাচ্ছিল তারা চলে গেছে। সীতু ডোম আর তার বউ পিংলিও পাওনাকড়ি চুকিয়ে নিয়ে কেটে পড়েছে। এদিকে ইয়াকুব সাধুর উঠোনে এই প্রাণপণ যুদ্ধ চলতে থাকে।

জোব্বার মধ্যে ছেলেটাকে একহাতে ঠেসে ধরে জুহা মৌলবী এবার আবলুস কাঠের লাঠিটি আস্ফালন করেন। ইয়াকুব চেরা গলায় অকথ্য গালিগালাজ করে এবং বারবার

ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলের ওপর। ছেলেটা ভাষাবিহীন আঁ আঁ চেঁচায় ক্রমাগত। মৌলবীর জামার হাতা ফালাফালা হয়ে যায় ইয়াকুবের ধারাল নখে। তখন আচমকা মৌলবী তার মাথায় আবলুস কাঠের কারুকার্যময় ছড়ি কিংবা লাঠিটা দিয়ে আঘাত করেন। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে কপাল চোখ গাল ভেসে যায় সাধুর।

এবং আশ্চর্য, যে রক্তপায়ী তান্ত্রিক, রক্ত যার শক্তির প্রতীক এবং আত্মনিবেদনের এবং রক্তের হেতুই লাল রঙ যার পরম প্রিয়, সেই ইয়াকুব হাতে রক্ত দেখেই ক্রমে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে—'এ্যাই বাপ!'

ছেলেটাও দেখে সেই বীভৎস মুখচ্ছবি সাধুর। ত্রাসে সেও অবশ হয়। জুহা মৌলবী অমনি তাকে শিকারের মতন যেন কামড়ে নিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকেন। ছেলেটার একটা হাত তাঁর হাতে—ছেলেটা ধুকুর-ধুকুর দৌড়ায় তাঁর সঙ্গে। শেয়ালছানার মতন মৃদু আর্তনাদ ক্রমশ নিশিন্দা-পলাশ-তাল ঘেরা গৌরীমাটির পথে মিলিয়ে যেতে থাকে।

কতক্ষণ পরে সম্বিৎ ফেরে ইয়াকুবের। লাল চোখে আচ্ছন্নদৃষ্টে তাকিয়ে হাঁচড় পাঁচড় করে ওঠে। এতক্ষণে মনে পড়ে যায় তার 'থামের' (সাধনপীঠ) কথা, মড়ার মাথাগুলোর কথা, জড়িবুটি পেঁচার ঠোঁট বাদুড়ের নখ তন্ত্রমন্ত্র শক্তিমান প্রেতদের কথা—এবং সবশেষে তার বীর্যবান খাঁড়াটির কথা। সবিক্রমে হুংকার ছাড়ে সে—'কালী-কালী-কালী-কালী! আ—উ—ম! (ওঁং) আ—উ—ম!'

কিন্তু লাফ দিতে গিয়ে তক্ষুনি টের পায়, সে জড়দেহে পর্যবসিত। আকাশপাতাল বনবন করে ঘোরে। ক্ষতস্থানে দু'হাত চেপে তবু সে গর্জায় বারবার—'আ—উ—ম!'

ওখানে ঘাটে খেয়ানৌকোর শম্ভু ঘেটেল তামাক খেতে খেতে একবার কান করে শোনে। তারপর আপনমনে বলে, 'ক্ষ্যাপা আজ আবার ক্ষেপল ক্যানে?'

ঘরের ভিতর 'থানে' পৌঁছে ইয়াকুব খাঁড়াটার দিকে তাকায় কতক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ে। রক্তাক্ত জটাজুটগুলো মাথাটা বেদিতে ঠেকিয়ে শিশুর মতন কাঁদে সে।....

সে-বেলা আর ইয়াকুবকে বাইরে কেউ দেখতে পায় না।

থানের পাশে চিত হয়ে শুয়ে সে আরেক ইসমাইলের কথা ভাবছিল। তার নিজের ইসমাইল। মুখটা মনে পড়ে কিংবা মনে পড়ে না। আবছা চেহারা এসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার ঘরকন্না তন্ত্রমন্ত্রময় দুর্বোধ্য সংসারে—অনেকদিন পরে তার এই প্রত্যাবর্তন। একটি আধল্যাংটো ছেলে, গলায় বাহুতে অগুনতি কবচ।

ইয়াকুব তাকে বলে, 'কোথায় ছিলি বাপ, এতদিন?'

'মায়ের কাছে।'

তিনবার এই প্রশ্ন করে, তিনবার একই জবাব পায়। তখন ইয়াকুব সাধু তার স্ত্রীর চেহারা খোঁজে। মনে পড়ে, কিংবা মনে পড়ে না।

'তুমি কি ইসমাইলের মা?'

প্রতিমূর্তি জবাব দেয় না। ঘরের কোণায় কিছু হাতড়ায়। খুটখুট শব্দ ওঠে।

ইয়াকুব জ্বলে যায়। 'এ্যাই শালী হারামজাদী! খবরদার!'

আর, তখন একটা অন্ধকার আসে। বিশাল ভয়ঙ্কর নিঃশব্দ অন্ধকার। কার্তিক মাস, অমাবস্যা তিথি। ডাবকই গ্রামে ভূতগ্রস্তা মেয়েটির ভূত ছাড়িয়ে ফিরে আসছে সে। একটু পরেই কালীপুজোর প্রথম বলির ঢাক বেজে উঠবে চারিদিকে গ্রামগ্রামান্তরে। তার মধ্যে সেই ভূতটার কণ্ঠস্বর ক্রমশ জোরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—'দেঁ সাঁধু, তোঁর সেঁরা জিনিসটি দেঁ।' ইয়াকুবের কাঁধে গামছায় বাঁধা রয়েছে কলা সন্দেশ। পিছনে আওয়াজ উঠে, 'দেঁ দেঁ দেঁ!' ইয়াকুব হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়য়। আবার আওয়াজ আসে—দেঁ দেঁ দেঁ! চারিদিক থেকে স্তব্ধ কালো চরাচর ফাটিয়ে অঙ্কুরিত সেই আওয়াজ তাকে গিলে খেতে থাকে। ইয়াকুব গামছা থেকে খাবারগুলো খুলে ছড়িয়ে দেয়, চেঁচিয়ে ওঠে—'লে, লে! ক্ষান্ত হ।' তবু আওয়াজ থামে না।....

তারপর কী একটা ঘটল। দরজা খুলে ক্ষীণ পিদিমের আলোয় ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। ঘরের চারপাশ থেকে বিশ্বপ্রকৃতি অন্ধকারে অবিশ্রান্ত একটা কী চাইছে তাকে। বেদির পাশের গর্ত থেকে মাটির হাঁড়িটা বের করল সে। মড়ার মাথায় ঢেলে মদ খেতে থাকল। তারপর আবার দেখল ছেলের মুখ। অন্ধকারে অদৃশ্য অলৌকিক সত্তা তার জন্যে অপেক্ষা করছে দরজায়। তিথি অমাবস্যা। মহালগ্ন উপস্থিত। খাঁড়াটা টেনে নিল সে। ছেলের বুকে বসল। ছেলে ঘুম ভেঙে গেঙিয়ে উঠল। তারপর ধারাল খাঁড়াটা দু'হাতে ধরে গলায় ঠেকিয়ে চাপ দিল। অমনি চারদিকে হাজার হাজার ঢাক বাজাতে লাগল!...

ইয়াকুব লাফ দিয়ে ওঠে। পালানোর মতো দৌড়ে বেরিয়ে উঠোনে পৌঁছয়। হাঁফাতে থাকে, জিভ বেরিয়ে যায়। জমাট কালো রক্তে বিকৃত মুখটা জন্তুর মতন দেখায়। আস্তে আস্তে শ্মশানবটের দিকে এগিয়ে যায় সে।..

বিকেলে স্বর্ণলতা অবাক হয়েছে ইয়াকুব সাধুর মূর্তি দেখে।

'কী হল সন্ন্যাসীচাচা? কে মারল তোমাকে?' স্বর্ণ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

'জুহা মৌলুবী।'

'মৌলুবী? কেন, কেন?'... স্বর্ণ ব্যস্ত হয়ে বলে। ...'মৌলুবীচাচা এসে কী যে সব করে বেড়াচ্ছেন বুঝিনে। তোমাকে মারলেন কেন? গালটাল দিয়েছিলে নিশ্চয়। তোমার ক্ষ্যাপামি যে গেল না! বোসো, ওখানটায় বোসো। একটা ব্যান্ডেজ করে দিই।'

ইয়াকুব শান্তভাবে বসে থাকে। স্বর্ণলতা যত্ন করে তার রক্ত সাফ করে দেয়। ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়। কপালে দু'ইঞ্চিটাক ক্ষত হয়েছে। ওষুধ খাইয়ে দেয় এক ডোজ। ইয়াকুব মিঠে গুলিগুলো চিবোয়, চোষে। তারপর বলে, 'একটা চিঠি লেখাতে এলাম মা ব্রহ্মময়ী।'

'চিঠি লেখাবে? কাকে?'

'হেরুকে, মা।'

'কেন?'

'ওর ছেলেটার জন্যে।'...তারপর ইয়াকুব সবিস্তারে সব জানায়। ঘটকঠাকুরের পরামর্শ নিয়ে সে এইমাত্র আসছে। ঘটকঠাকুর বলেছেন, ছেলে তো আসলে হেরুর। কাজেই থানা পুলিশে যেতে হলে সেটা তার কাজ। সে যদি গরমেন্টোকে দরখাস্ত করে, তাহলে মৌলবীর কাছ থেকে ছেলে উদ্ধার করা যাবে। হেরুর নাবালক ছেলের দায়দায়িত্ব গরমেন্টো অবশ্য নিতে পারে। কিন্তু তাহলে ইয়াকুবের যে কোল খালি হয়ে যায়। তাই হেরু দরখাস্ত করুক—তবে বলুক, যে ছেলে সাধুর কাছেই জিম্মা থাকবে।

স্বর্ণ চিঠি লেখে। পড়ে শোনায়। ইয়াকুব মাথা দোলায়, 'ঠিক নেকেছ মা জগদম্‌বা।'

সেই চিঠি জর্জের মারফৎ সন্ধ্যার গাড়িতে গার্ডের হাতে যায়। গার্ডসায়েব কাটোয়ায় পৌঁছে মেলব্যাগে চালান করে দেন।

দুটো দিন কেটে গেল। ইয়াকুব সাহস পায় না ডাবকই যেতে। লোকের কাছে খোঁজখবর নেয়। না, এখনও খৎনা দেয়নি মৌলবী। তবে ছেলেটা নাকি বেশ মেনে গেছে। ভাল খাচ্ছে দাচ্ছে। মাথায় টুপি, পরনে লুঙি, গায়ে কুর্তা—মসজিদে আরবি পড়ছে ছেলেদের সঙ্গে। ইয়াকুব আফশোস চুপিচুপি কাঁদে—'বাঃ রে শালা নেমকহারাম!'

শোকাচ্ছন্ন সাধু তবু মনাই পাখির পরিচর্যা ভোলে না।

তৃতীয় দিন বাইরে থেকে ঘুরে সে সবিস্ময়ে এবং আনন্দে দেখে, ছেলেটা পালিয়ে এসে ঘরের কোণায় চুপচাপ বসে রয়েছে—বুকে মনাইয়ের খাঁচা। লাফিয়ে পড়ে সাধু। বুকে তুলে চুমো খায়। জোরে চেঁচিয়ে আনন্দপ্রকাশ করতে ভয় হয়। বলে 'আমি জানতাম, আমি জানতাম!'

ছেলেটার পরনে ক্ষুদে লুঙি, গায়ে কুর্তা, পকেটে টুপি। সব খুলে ওকে ন্যাংটো করে ইয়াকুব। তারপর উনুনে ভরে আগুন জ্বেলে দেয়। ছেলেটা পাখি নিয়েই মত্ত।

কিন্তু ওকে লুকিয়ে রাখবার অস্বস্তিতে সে আক্রান্ত হয়। প্রতিমুহূর্তে ভয়, এই বুঝি মৌলবী কিংবা তার লোকজন এসে পড়ল!

রাতের অন্ধকারে সে ছেলেটাকে নিয়ে স্বর্ণলতার কাছে যায় চুপি চুপি। স্বর্ণলতা জর্জের সঙ্গে পরামর্শ করে আসে। জর্জ বলে, 'হেরুর খবর না আসা পর্যন্ত ওকে ফাদারের কাছে রাখা যেতে পারে। সেটা খুবই নিরাপদ হবে।'

অগত্যা ইয়াকুব তাতেই রাজি হয়। শুধু বলে, 'পাদরিবাবা ওকে আবার কেরেস্তান করবে না তো?

জর্জ হাসতে-হাসতে বলে, 'কুছু বয় নাই। আমি আছে।'

সেই রাতে ছেলে চলে যায় পাদরি সাইমনের আখড়ায়। ফাদার দুটো হাত তুলে সোল্লাসে বলেন, 'ঔ জেসসি!'...

এক হপ্তা পরে একদিন ফাদার ডেকে পাঠালেন ইয়াকুবকে। কর্ণসুবর্ণর একটা টিলার গায়ে ফাদারের ছোট্ট হাসপাতাল, চার্চ, থাকবার ঘর। মাটির দেয়াল, খড়ের চাল আপাতত। তবে শিগগির পাকা বাড়ি হবে শোনা যাচ্ছে।

বারান্দায় মনাই পাখির খাঁচা ঝুলছে। হেরুর ছেলে হাফপেন্টুল-শার্ট পরেছে, পায়ে জুতোও রয়েছে, একেবারে গোরার বাচ্চা। পাদরি ইজি চেয়ারে বসে রয়েছেন—তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি—অতি সজ্জন এবং অনুগত। ইয়াকুবের বুক আবেগে তোলপাড় করে। দুঃখে অভিমানে গলার ভিতর গোটা ওঠে। সামলে নিয়ে সে সেলাম দেয় পাদরিকে। একটু তফাতে বসে ছেলেটার দিকে আড়চোখে তাকায়। নেমকহারামটা যেন চিনতেই পারে না সাধুকে।

ফাদার বলেন, 'বহট্ দুখের কতা আছে সাটু। হেরু মারা গেছে।'

ইয়াকুব ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

'হাঁ বহট্ বোকা লোক ছিল। তোমার পট্টু পাইয়া একরাট্রে জেলের ডেয়ালে উঠেছিল—মটলব ছিল, পালাবে। টো কী হল, সেন্ট্রি ঘোলি মার ডিলো। মরে গেল।'

আর কোনও আশাই রইল না, ইয়াকুব বুঝতে পারে। তাই করুণ চোখে ছেলেটার দিকে তাকায়। তারপর হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে বলে, 'আপনি মিছে কথা বলছেন সায়েব। আপনি ছেলেটাকে খেরেস্তান করবেন—আপনার মতলব খারাপ।'

ফাদার হাসেন। 'মিছা কটা? টো যাও, স্টেশনমাস্টারকে পুছো!'

ইয়াকুব রুদ্ধ আক্রোশে তক্ষুনি উঠে পড়ে। হন্তদন্ত স্টেশনে যায়। জর্জ বলে, 'এসো সাটু। ফাদার টোমাকে ডেকেসিলেন! যাও, ডেকা করো।'

ইয়াকুব আবার মুষড়ে পড়ে। করুণভাবে বলে, 'যেয়েছিলাম সাহেব।'

'হেরু মারা গেসে, বলে নাই?'

'বলেছে, সাহেব।'

'তবে? কী করটে চাও এখন?'

ইয়াকুব মাথা দোলায়। তারপর আস্তে আস্তে ফেরে। স্বর্ণর কাছে যায় না। ধুলাউড়ির মাঠ পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে চলতে থাকে।

এ ইয়াকুব অন্য মানুষ। শক্তিমান ভয়ঙ্কর অলৌকিক তাকে এবার পরিত্যাগ করেছে, সে টের পাচ্ছে।

আরো কয়েকটা দিন গেল। সবাই ভেবেছিল হেরুর ছেলেকে নিয়ে মৌলবী বনাম পাদরি একটা লড়াই না হয়ে যায় না। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। চার্চের কাছে পুলিশচৌকি বসিয়েছেন ফাদার সাইমন। ইতিমধ্যে কয়েকটি বাউরি পরিবার খৃষ্টান হয়ে গেছে। ফাদারের বড় সুসময়।

শীত জাঁকিয়ে এসেছে। এক সকালে ইয়াকুব সাধু অদ্ভুত কাণ্ড করতে শুরু করল।

বেদিটা কোদাল চালিয়ে খুঁড়ে তছনছ করে ফেলেছিল সে। মড়ার মাথাগুলো ফেলে দিয়ে এল শ্মশানবটের কাছে। জড়িবুটি শেকড়-বাকড় সবকিছু ফেলে দিল। খাঁড়াটাও গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে এল। তারপর একটা পুঁটুলিমাত্র কাঁধে ঝুলিয়ে বেরোল!

আর এলাকায় কেউ জটাজুটধারী তান্ত্রিককে দেখতে পায় না। তার ঘর হাট করে খোলা। শেয়ালের আড্ডা। জীবজন্তুদের আস্তানা। নিশিরাতে ভূতপ্রেত এসে নাচে-গায়। ভয়ে কেউ দিন দুপুরে এদিকে ঘেঁষে না।

কিন্তু এক বসন্তের বিকেলে দেখা গেল চুপিচুপি চলে এসেছে একটি ছেলে—নধর চেহারা, ফরসা রঙ, প্যান্ট শার্ট জুতো তার পরনে, এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে বিধ্বস্ত কুঁড়ে ঘরটার সামনে। পাশে শ্মশানবটের ডালপালায় পাখি ডাকছে, গঙ্গার পাড়ে শিমুল গাছটা লাল ফুলে ভরে উঠেছে। গৌরী মাটির পথের দু'ধারে মাদার পলাশও ফুল ফুটিয়েছে থরেবিথরে। সে দুঃখিত চোখে তাকিয়ে থাকে ঘরটার দিকে। এদিক-ওদিক কিছু খোঁজেও। তারপর আস্তে আস্তে ডাকে, 'সাধু!'

কোন সাড়া পায় না।

ফের সে ডাকে, 'সাধু! সাধুবাবা!'

কোনও সাড়া নেই।

তখন সে বিষণ্ণ মনে পা বাড়ায়। দূর চার্চের দিকে হাঁটতে থাকে—অতি ধীরে, অন্যমনস্ক।

পথে একজন তাকে দেখে প্রশ্ন করে, 'তুমি হেরুর সেই ছেলেটা না?'

ছেলেটি মুখ তুলে মাথা দোলায়। কী জবাব দেয়, প্রশ্নকারী বুঝতে পারে না।

'ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?'

কোনও জবাব না দিয়ে সে হাঁটতে থাকে। লোকটা কতক্ষণ তার চলে যাওয়া দেখে।

চার্চে গিয়ে ফাদার সাইমনের উগ্রমূর্তি দেখে সে থমকে দাঁড়ায়। ফাদার তেড়ে আসেন, 'কোঠায় গিয়েছিলে টুমি? নটি বয়! হামি বলেছে না, না বলে কোঠাও যাবে না! বোলো, কোঠায় গিয়েছিলে?'

ছেলেটা ফ্যালফ্যাল করে তাকায় শুধু।

'বডমাস! কাম হেয়া, কাম! আমি বারণ করেছি না? বলেছি না—আই প্রমিজড—পানিশমেন্ট করব।'

জবাব না দেওয়ার জন্যেই ফাদার আগুন হয়ে যান। কান ধরে সজোরে চাঁটি মারেন। পড়ে গিয়ে সশব্দে কেঁদে ওঠে সে। এবং এতদিন পরে এই প্রথম, আকাঙ্ক্ষিত সেই পবিত্র শব্দটি ছিটকে বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে, 'বাবা গো।'

'ডোন্ট, ডোন্ট ক্রাই, ডেভিড। আবার মারব। গো, ব্রিং ইওর বুকস!'

হেরুর ছেলে ডেভিড ঝাপসা দৃষ্টির সামনে—অনেক দূরে একটা বিশাল স্নেহময় মুখ দেখতে পায়। জটাজুট গোঁফদাড়িতে ভরা, একটা ছায়া আর রহস্য মুখে—সেই মুখটা ইয়াকুব সাধুর।....

তেরো

কালকেতু উপাখ্যান (২)

কোদলাঘাটের বাঁদিকে যেখানে শ্মশান, তার ওপারে সামনাসামনি কিছু খোলামেলা সাদা ক্ষেত, তারপর একটা ছোট্ট বসতি—চাঁইপাড়া। ওরা চাঁইসম্প্রদায়ের মানুষ। গঙ্গায় ধারে-ধারে সারা জেলায় ওদের বসতি। দেহাতি হিন্দি অর্থাৎ খোট্টাই বুলি আর বাংলা দুটোই ওদের ভাষা। শাক-সবজি ফলমূলের চাষবাস ওদের পেশা। কোন পুরুষে ওরা চলে এসেছিল বিহারের অনুর্বর এলাকা ছেড়ে বাংলাদেশের এই নদীটির অববাহিকায়।

লেডি ডাক্তার স্বর্ণলতা ওদের মন কেড়ে নিয়েছে। গোকর্ণের হাটে সপ্তায় দুদিন ওদের যেতেই হয় সবজি আর আনাজপত্র নিয়ে। স্টেশনধারের বটতলায় একবার জিরিয়ে নেয় যেতে-আসতে। সামনেই তো লেডি ডাক্তারের ডাক্তারখানা। গোরাংবাবুর আমলেও ওরা কেউ কেউ ফিরে যাবার পথে ওষুধ নিয়েছে। কিন্তু এখনকার মতো বিশ্বাস ছিল না। গোরাংবাবুর মেয়ে ওদের বিশ্বাস পেয়েছে।

অত চেষ্টা করেও গোরা ফাদার যা পাননি। গোরাকে ওরা যমের প্রতিমূর্তি ভাবে। স্বর্ণ প্রায়ই কল পায়। আসার সময় ঘোড়ার পিঠে একরাশ সবজি ফলমূল বয়ে আনতে হয়। অতসব কে খাবে? কিছু নিয়ে যায় চুপিচুপি চাঁদঘড়ির বউ, কিছু জর্জকে পাঠিয়ে দেয়; পাঠিয়ে দেয় ময়রা-বুড়িকেও। তখন ময়রাবুড়ি অন্য মানুষ।

বোশেখ পড়েছে। তখনও বাতাসে নিমফুলের গন্ধ ভাসে চারদিকে। চাঁইপাড়া থেকে বেরোতে বেলা পড়ে এসেছে। ঘাটের ওখানে দহ—অগাধ জল। কিন্তু শ্মশানের সামনে অনেকটা চড়া—একখানে ঘোড়াটার পেট ছোঁয়ামাত্র।

পেরিয়ে এসে ঘোড়া থেকে নামে স্বর্ণ। পাড় খানিকটা খাড়া, খানিকটা ঢালু। লাগাম ধরে ঘোড়াটা টানতে টানতে পাড়ে ওঠে। নির্জন শ্মশানবটের ওধারে ইয়াকুব সাধুর ভিটে। ঘোড়ার পিঠে চাপতে গিয়ে একটু চমকায় স্বর্ণলতা। বটতলার দিক থেকে দৌড়ে আসতে দ্যাখে হেরুর ছেলে ডেভিডকে।

ফাদার সাইমনের সঙ্গে মাঝেমাঝে ছেলেটা স্টেশনে আসে, স্বর্ণলতা দেখেছে। কখনও ট্রেনে চেপে দুজনে কোথায় যায়, ফিরে আসে। জর্জের সঙ্গে ফাদার যখন কথাবার্তা বলেন, ছেলেটা স্টেশনের চত্বরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বর্ণ লাইনের পার থেকে হাত তুলে ডাকলে সে শুধু হাসে, আসে না। স্বর্ণর খুব কৌতূহল হয়। ইচ্ছে করে, কিছুক্ষণ কথা বলে ওর সঙ্গে। কিন্তু ছেলেটি বড্ড লাজুক প্রকৃতির। ওদিকে ফাদারের শাসনও কড়া। কারো সঙ্গে মিশতে দেয় না। জর্জ বলেছে, ফাদার ডেভিডকে নিয়ে একটা লম্বাচওড়া স্বপ্ন দেখেছেন। জর্জের মুখে আরও শুনেছে স্বর্ণ, ডেভিড প্রায়ই পালিয়ে যায় আর ফাদার তাকে খুঁজে বের করেন—শাস্তিও দেন প্রচণ্ড। সেইজন্য স্বর্ণর খুব ইচ্ছে করে ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে।

আজ এখানে ছেলেটাকে হঠাৎ দৌড়ে আসতে দেখে স্বর্ণ অবাক হল। এতটুকু রাঙা টুকটুকে একটি ছেলে! এখনও ভালো করে দৌড়তেই পারে না। বার দুই আছাড় খেল। তারপর আচমকা সামনে স্বর্ণকে দেখে তার মুখ সাদা হয়ে গেল আতঙ্কে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সে!

আর, স্বর্ণ তো মা নয়, তবু কী একটা ঘটে যায় তার মনে। সে ব্রাহ্মণ কন্যা, বিধবা। ওই ছেলেটার জন্ম বাউরিমায়ের কোলে—মুসলমান ঘরে কাটিয়েছে কতবছর, তারপর এখন খ্রিস্টানের হাতে পড়েছে। এইসব ব্যাপার স্বর্ণর মনকে একবারের জন্যেও হানা দিতে চেষ্টা করে, সে টের পায়। কিন্তু এতটুকু রাঙা টুকটুকে ছেলেটার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা তাকে কী এক অপরিচিত আবেগে মূলসুদ্ধ নাড়া দিতে থাকে।

ঘোড়াটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেছে। স্বর্ণ ছেলেটার কাছে এগিয়ে যায়। তার এরকম দৌড়ে আসা আর ভয়ের কারণ খুঁজতে চারদিকে তাকায়। তখন ফাদার সাইমনের মূর্তিটি দেখতে পায়—বেশ খানিকটা দূরে। ফাদারের হাতে ছড়ি। নিশিন্দা ঝোপ পেরিয়ে সাইমন সায়েব হন্তদন্ত হয়ে আসছে।

পলকে সব টের পেয়ে যায় স্বর্ণলতা। ঠোঁট কামড়ে কয়েক মুহূর্ত সেদিক তাকিয়ে থাকে। তারপর ছেলেটাকে দ্যাখে। ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়েছে। পাথরের মতো স্থির—স্বর্ণকে সেও দেখছে, সে চোখে ত্রাস। স্বর্ণ তার দু'কাঁধে হাত রেখে একটু ঝুঁকে পড়ে। হাসিমুখে বলে, 'আবার পালিয়ে এসেছ বুঝি?'

ডেভিড ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। কিছু বলে না। কাঁদতেও ভুলে গেছে এখন। ভিজে চোখ দুটো নিষ্পলক।

দু'হাতে ওকে শূন্যে তুলে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দ্যায় স্বর্ণ। তারপর নিজে চাপে। অভ্যাসমতো শাড়িটা দুপায়ের দিকে ঠিকঠাক করে নেয় হাঁটু অবধি যথারীতি খোলাই থাকে। সে একটু হেসে আঁচল দিয়ে ডেভিডের গলা অবধি ঢাকে। তারপর ঘোড়ার পিঠে মৃদু আঘাত করে ডানপায়ের গোড়ালি দিয়ে।

ঘোড়াটা দৌড়তে শুরু করে। গঙ্গার পাড়ে অনেকদূর ঝোপজঙ্গল ভেদ করে ওরা চলতে থাকে। তারপর রাঙামাটি ঝিলের কাছাকাছি গিয়ে সোজা পশ্চিমে চলে। টিলার উত্তর দিক ঘুরে স্টেশন এড়িয়ে বাড়ি ফেরে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। স্বর্ণ কী আনল, লক্ষ্য করার মতো আশেপাশে কেউ ছিল না। ঘরের ভিতর বিছানায় ডেভিড শান্তভাবে বসে থাকে। স্বর্ণর মুখ চাপা হাসিতে ঝলমল করে। কৌতুকে চঞ্চল হয়ে থাকে সে। জর্জকে ব্যাপারটা আপাতত জানাচ্ছে না। দেখা যাক, কী গড়ায় শেষ অবধি।

কিছুক্ষণের মধ্যে স্বর্ণ দ্যাখে, ছেলেটা ভয় কাটিয়ে উঠেছে! নিঃসঙ্কোচে সে স্বর্ণর ঘরের এটা ওটা ছুঁয়ে পরখ করে। বারান্দায় স্বর্ণ কুপি জ্বালিয়ে রাঁধছিল। পিঠের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দুজনে পরস্পর তাকায়—কেউ কোনও কথা বলে না।

কতক্ষণ পরে দুজনে খেতে বসে—পাশাপাশি। ওর খাওয়া দেখে তাক লেগে যায় স্বর্ণলতার। হেরুর কথা মনে পড়ে যায়। হেরুর ছেলেও যেন বিপুল ক্ষুধা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। স্বর্ণ চাপা গলায় বলে, 'পাদরিবাবা কী খেতে দিত রে তোকে?'

ডেভিড কাঁচুমাচু বলে, 'রোটি, মিট।'

স্বর্ণ হেসে ওঠে।...'রোটি কী রে! পাদরিবাবা তাই বলে বুঝি! তুই তো বাউরির ছেলে—রুটি বলবি, বুঝলি? রুটি। আর মিট কী? মাংস বলবি। কীসের মাংস?'

ডেভিড জানে না।

'এই ছোঁড়া! তোর জাত গেছে, জানিস? থাক্ কাল তোকে গোবর খাইয়ে শুদ্ধ করব।'

ডেভিড এতক্ষণে—কী বোঝে কে জানে, একটু হাসে।

'ভাগ্যিস হেসেছিস!'...স্বর্ণ বলে, 'হ্যাঁ রে, তোর সাধুবাবার জন্যে মন খারাপ করে না?'

ডেভিড মাথা দোলায়।

'তোর বাবা কে ছিল জানিস?'

ডেভিড তাকায়।

'ধুঃ ছোঁড়া! বাবা কী তাই জানে না। শোন, তোর বাবা মানুষ মারতে পারত। তুই পারবি তো?'

একটু অপেক্ষা করার পর স্বর্ণ ফের বলে, 'তুই কিস্যু পারবি নারে হাঁদারাম! যা—হাতমুখ ধুয়ে শোগে। ওঠ্। না—না এঁটো কুড়োতে হবে না। তোর পাদরিবাবার শিক্ষা ভুলে যা।

সে-রাতে পাশাপাশি ওরা শুয়ে থাকে। স্বর্ণর ঘুম আসে না। ক্রমশ কী আবেগ তাকে নাড়া দিতে থাকে। তখন সে নিঃশব্দে কাঁদে। কেন কাঁদে, সে বুঝতে পারে না নিজেই। শুধু মনে হয়, পৃথিবীটা এত বড়, আর সে এমন অসহায়!

গোরাংবাবুর মেয়াদ শেষ হয়ে এল। যেকোনও দিন চিঠিতে সুখবর এসে যাবে। কলকাতার জেলেই আছেন। তবে শরীর খুব ভালো যাচ্ছে না। হেরু অমনভাবে মারা পড়াতে গোরাংবাবু নাকি খুশি—হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। লিখেছিলেন, 'ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। তবে কি না, ওর অমন একটা মৃত্যুই নির্ধারিত ছিল। মৃত্যু নিয়ে খেলা করতে নেই। বেদের ভাগ্য কালসাপের হাতে জিম্মা থাকে।'

মধ্যরাতে চঞ্চল হয়ে ওঠে স্বর্ণ। প্রতিজ্ঞা করেছিল, বাবার অপমানের প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু কীভাবে যে বছরগুলো কেটে গেল! কিছুই করা হল না। এদিকে কে প্রকৃত দায়ী তাও স্পষ্ট হল না। আফতাব দারোগা? নাকি ইংরেজ জজ সায়েব, কিংবা পাদরি সাইমন—নাকি এলাকার মোড়লরা? প্রতিপক্ষ অসংখ্য। স্বর্ণর অত শক্তি তো নেই। নিজের অসহায়তার দুঃখেই কি তাই মাঝে মাঝে তার মুখ শব্দহীন কান্নায় ধুয়ে যায়?...

সকালে সে স্টেশনে গেল জর্জের কাছে। পাদরি ছেলেটার জন্যে কতদূর তোলপাড় করছে, সেই খবর পেতেই। কিন্তু জর্জ নেই—সহকারী স্টেশনমাস্টার সুধাময় গম্ভীর মুখে খাতা লিখছে। চাঁদঘড়ির বউ বলছিল, ছোটবাবুর বদলির হুকুম হয়েছে অ্যাদ্দিনে। যেতে-যেতে আড়চোখে দাড়িগোঁফ আর লম্বাচুলওয়ালা যুবকটিকে একবার দেখে যায় স্বর্ণ। মনে মনে বলে, ঢঙ। মনের ভিতরটা কী দুঃখময় জ্বালায় ছটফট করতে থাকে।

কোয়াটারে জর্জ বন্দুক সাফ করছিল। স্বর্ণকে দেখে সে বলে, 'দিদি এসো। আজ আমি বাঘ মারবে।'

স্বর্ণ বলে 'বাঘ? আবার বেরিয়েছে নাকি?'

'হাঁ। বেরিয়েসে। পাবলিক খবর দিয়েসে। এ ক্যাট্‌ল লিফটার—মানুষ খায় না।' জর্জ হেসে ওঠে।

'ও জর্জ, তোমার পাদরিসায়েবের খবর কী?'

'কেন? সে ঠিক আছে—কী হয়েসে দিদি?'

'কিছু না—এমনি।'...স্বর্ণ একটু পরে ফেল বলে, 'আচ্ছা জর্জ, তোমাদের মহারাজ বদলি হয়ে যাচ্ছেন শুনলাম।'

জর্জ মুখ তোলে কাজ করতে করতে।—'হা—যাবে। জুন মাসে। দিদি, সুঢাবাবু তোমাকে....' হঠাৎ থেমে যায় সে।

স্বর্ণ ভ্রূ কুঁচকে বলে 'কী আমাকে?'

'বলব? তুমি রাগ করবে না?'

'না। বলো।'

'খুব ভালবাসে।'...বলে মুখ নামিয়ে বন্দুকের নল মুছতে থাকে জর্জ।

স্বর্ণ হাসে। বলে তুমিও তো আমাকে ভালবাসো জর্জ।

অস্ট্রেলিয়ান স্টেশনমাস্টার মুখ তোলে। ভীষণ গম্ভীর মুখ। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে। কিন্তু কিছু বলে না—আবার মুখ নামায়।

স্বর্ণ ডাকে, 'জর্জ!'

'বোলো দিদি।'

'কী হল তোমার?'

'কিসু না।'

'তুমি কি রাগ করলে, জর্জ?'

'না। স্ত্রীলোকের প্রতি আমি রাগ করি না।'

'জর্জ, কেন তুমি এদেশে জন্মাওনি? তাহলে হয়তো তোমার কথা ভেবে দেখতাম।' বলে স্বর্ণ তার কাছাকাছি মেঝেতেই বসে পড়ে।...'অথচ দ্যাখো, চারদিকে আমার নামে কত কলঙ্ক। বাবা ফিরে এলে কতজনে কতকথা শুনিয়ে দেবে ওঁকে। দ্যাখো জর্জ, তবু যেন কলঙ্কে কী সুধা আছে—তুমি কলঙ্ক মানে বোঝাতো সায়েব?'

জর্জ নিঃশব্দে মাথা দোলায়।

'স্ক্যান্ডাল।'...বলে স্বর্ণ একটু থেমে ওর মুখের ভাব লক্ষ্য করতে থাকে। স্বর্ণর ঠোঁটে চাপা হাসি।

জর্জ একটুকরো পরিষ্কার তুলো দিয়ে ট্রিগার ঘষে। বার দুই টেপেও। তারপর মুখ নিচু রেখেই বলে, 'আমি এদেশের লোক হইলে তুমি আমার কথা ভাবতে, দিদি? কী কথা ভাবতে?'

স্বর্ণ খিলখিল করে হাসে। ....'তোমার লিন্‌ডা যে কথা ভাবত।'

জর্জ বিকৃতমুখে বলে, 'আই হেট দ্যাট সিলি ক্যাট!' তারপর উঠে দাঁড়ায়। বন্দুকটা বাইরে দূরে তাক করে কী দেখে নেয়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখে। তারপর ঘরে ঢুকে কার্তুজের বেল্টটা নিয়ে আসে। পরতে থাকে।

স্বর্ণ বলে, 'এ কী! তুমি কি এখনই বাঘ মারতে বেরোচ্ছ নাকি?'

'বেরোব।'

'কখনও বাঘ মেরেছ তুমি?'

'সো হোয়াট?'

'তুমি যেয়ো না জর্জ। বরং আমার ঘরে চলো—একটা মজার জিনিস তোমাকে দেখাব। এ বিগ ফান।'

'এখন বাঘ আমার বিগ ফান আছে।'...বলে জর্জ দরজায় তালা বন্ধ করে।

দুজনে বেরিয়ে আসে। সেই সময় দেখা যায়, চরণ চৌকিদার দৌড়ে আসছে। কাছাকাছি এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'ডাক্তোরদিদি। হেরুম্ব ব্যাটা পাদরিবাবার কাছ থেকে পালিয়ে যেয়েছে গো! এ কী কাণ্ড দেখুন দিকি। সারা পৃথিবী আমি তোলপাড় করছি ইদিকে—কী সব্বোনাশ, কী সব্বোনাশ। ছোঁড়াটাকে আপনি দ্যাখেননি ডাক্তোরদিদি? আসেনি ইদিকে?'

'না।' কঠোর মুখে স্বর্ণ বলে।

'পাদরিবাবা আগুন হয়ে আছে গো। আমাকে বলেছিল চোখে-চোখে রাখতে। এটুকুন ফাঁক পেয়েই কেটেছে কাল বিকেলবেলা। কাল থেকে তল্লাটের সকল গাঁয়ে খুঁজেছি—পাইনি। রেতের বেলা টিশিনি এসেও চাঁদঘড়িদাকে শুধিয়েছি—না, সে দ্যাখেনি। হঠাৎ আজ সক্কালে খ্যাল হল—ডাক্তোরদিদি তো তল্লাটের অনেক খবর রাখেন—তাই এলাম।' চরণ বলতে বলতে পিছনে হেটে আসে।

জর্জ ভুরু কুঁচকে শুনছিল। এবার বলে, 'ট্রেনে পালিয়েসে—আমি ভাবছি। হাঁ—ফাদার বলে, সে ট্রেনে চাপতে ভালবাসে খুব।'

চরণ লাফিয়ে ওঠে।....'হ্যাঁ হ্যাঁ মাস্টার হুজুর! ঠিক বলেছেন। তাই হবে। কিন্তু ইদিকে যে আমার পেরান যায়-যায় অবস্থা। কী করি!'

স্বর্ণ বলে, 'গাঁজা খেয়ে শুয়ে পড়ো গে চৌকিদার।'

চরণ হলুদ দাঁত বের করে হাসে।....'অগত্যা তাই। পাদ্রীবাবা দেখে নিক গে। কিন্তু গতিক বড় খারাপ ডাক্তোরদিদি—বুঝলেন? পাদ্রীবাবা থানাপুলিশ করে বসবেন মনে হচ্ছে। আমার অদ্দিনের চাকরিটা ইবার যাবে গো! ডিউটি বরজায় (বজায়) রাখতে পারিনি—আমার দোষ খণ্ডায় কে? '

চরণ সম্ভবত চাঁদঘড়িকে খুঁজতে গেল। জর্জ আর স্বর্ণ স্টেশনচত্বরে এসে দাঁড়ায়। সিগনালযন্ত্রের কাছে সুধাময় দাঁড়িয়ে আছে দেখে স্বর্ণ জর্জকে ফেলে একা হন্‌হন্ করে নেমে যায় লাইনে। বড়োবড়ো পায়ে লাইন পেরিয়ে চলে যায়।

বাইরে থেকে তালা দিয়ে গিয়েছিল। এখন দ্যাখে, ছেলেটা বাইরের ঘর অর্থাৎ ডিসপেন্সারির জানালা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। স্বর্ণ অস্ফুট চেঁচিয়ে ওঠে—হাত

নাড়ে—চোখ টেপে। ছেলেটা নড়ে না। তখন সে তালা খুলে ঢুকে দরজা বন্ধ করে এবং ছেলেটার হাত ধরে টানতে টানতে ভিতরের ঘরে নিয়ে যায়। বকতে গিয়ে হেসে ফেলে।...হ্যাঁ রে তোকে যে অত করে বলে গেলাম, বাঁচতে চাস, বেরোবিনে! এক্ষুনি যদি চৌকিদারের চোখে পড়তিস, কী হত বুঝেছিস? চৌকিদার তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পেলেই পাদ্রীবাবার কাছে নিয়ে যাবে। আমি তোকে বাঁচাতে পারব না বাবা, স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

ডেভিড কী বুঝল কে জানে, একটু হাসল। তারপরই গম্ভীর হয়ে বলে ওঠে সে—'মনাই?'

'মনাই! সে কী রে? মনাই কী বলছিস?'

ডেভিড অস্ফুট বলে, 'পাখি কই, আমার পাখি?'

'তুই পাখি পুষেছিলি বুঝি? বল তো পাখির ইংরিজি কী?'

'বার্ড।' চমৎকার ইংরিজিতে জবাব দেয় ছেলেটি। বিশুদ্ধ উচ্চারণ শুনে তাক লেগে যায়।

'বাঃ! আচ্ছা বল তো—মানুষ ইংলিশ কী?

'ম্যা অ্যা ন!' টেনে উচ্চারণ করে সে।

'বাঘ!'

'টাইগা।'

'ওরে বাবা! তুই তো বিদ্যের জাহাজ হয়ে গিছিস।'...

ক্রমশ স্বর্ণলতা টের পায়, তার জীবনে কী একটা সুখ বা আনন্দ অথবা উৎসব, একটা মৃদু পরিপূর্ণতা টলটল করে উঠছে। শূন্য ঘর ভরে গেছে। নিঃসঙ্গতা এবং সময়হীনতা জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেছে—এখন ঘরময় জীবনের উত্তাপ। স্বর্ণ আবিষ্ট হতে থাকে। ছেলেটার সঙ্গে অনর্গল কথা বলে চলে—চাপা গলায়, পাছে কেউ শোনে।

জনাকয় ওষুধ নিতে এসেছিল সেই সকালে। তাদের কেউ কেউ প্রশ্ন করেছে—'কে এসেছে ডাক্তোরদিদি? কথা বলছেন, মনে হল?'

স্বর্ণ বলেছে, 'আমার এক ভাসুরপো।'

'গোবরহাটির লোকেরা তাহলে আজকাল খোঁজখবর নিচ্ছেন!'

'হ্যাঁ। তা তো নিচ্ছেন।'

এইভাবে এড়িয়ে বেঁচেছে স্বর্ণ। ভিতরে গিয়ে আবার দুহাতে ছেলেটির দুহাত দোলাতে দোলাতে বলেছে, 'হুঁ—এবার বল, সাধুবাবার কথা। বটতলায় খেলছিলি—তারপর তারপর—কী হল?'

ডেভিড অনেকটা সংকোচ কাটিয়ে উঠেছে আস্তে আস্তে। সে কেবল তার মনাই পাখি, সাধুবাবা আর বটতলার কথাই বলতে থাকে। অজস্র অস্পষ্ট শব্দ দিয়ে একটা প্রিয় পরিচিত জগৎকে প্রকাশ করে সে। সেই জগৎ ছেড়ে এসে যে সে অসুখী, তাও জানা যায়।

কিন্তু শেষ অবধি স্বর্ণ বোঝে, খেলাচ্ছলে একটু অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করে বসেছে সে। জানাজানি যে-কোনও মুহূর্তেই হতে পারে। পাদ্রী সাইমন দৌড়ে আসতে

পারে—পুলিশ নিয়েই আসতে পারে। তাছাড়া, স্বর্ণর ডাক এলে তখন একা একা রেখে যেতে ভরসা হয় না। একা থাকতে ছেলেটা ভয় পাবে না এটা ঠিক—শ্মশানমশানে নির্জন ভিটেয় সে পালিত হয়েছে। কিন্তু ছেলেপুলেদের ওই এক দোষ—বেশিক্ষণ ঘরে আটক থাকতে চাইবে না। জানালা খুলি উঁকি দেবে এবং কারো না কারো নজরে পড়ে যাবে।

তারপর স্বর্ণ আরও ভাবে এবং মনমরা হয়ে পড়ে—একে এমন করে রেখে কী লাভ তার? পাদ্রী সাইমনের হাত থেকে বাঁচিয়ে কি কোনও পুণ্য অর্জন করতে চায় সে? কিংবা নিতান্ত হেরু বাউরির ছেলে—সেই দায়িত্ববোধ?

স্বর্ণ কিছু বুঝে উঠতে পারে না। অথচ একে হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হয় না। ভুলতে পারে না বিকেলের সেই রুদ্ধশ্বাস পলাতক শিশুমূর্তি, সেই ত্রাস আর কান্না, অসহায়তা। অথচ এও তো একজন মানুষ—একটি সুন্দর ছোট্ট মানুষ! যে নির্ভয়ে তার কাছে রয়েছে, আনন্দেও আছে—নিশ্চিন্তে যে তাকে আবার ভয় এবং দুঃখের দিকে ঠেলে নিতে মন চায় না।

এই ছেলেটি পৃথিবীতে নিতান্ত একা। মা নেই, বাবা নেই। এর মতো দুঃখী আর কে আছে? এক আজব সন্ন্যাসী এর মধ্যে যেন প্রকাশ করতে চেয়েছিল একটা পরিব্যাপ্তির ধর্ম—আকাশের বিশালতা আর স্বাধীনতা। ধর্ম বা শিক্ষাদীক্ষার শেকল এর পায়ে জড়াতে চায়নি সেই ক্ষ্যাপা সাধুটি। সে হয়তো চেয়েছিল, এই বালক মুক্তমানুষ। এবং যে স্বাধীনতায় প্রকৃতির ধারা বয়ে চলেছে, এই শিশু হবে তার একটি প্রতীক।

খুব আবছাভাবে এইসব ভাবনা মাথায় আসে স্বর্ণর। মন আবেগে তোলপাড় করে। হুলুস্থুল ঝড় বয়ে যায় সারাটি দিন।

দুপুরে ধুলোউড়ির মাঠে ধুলো উড়ছে মেঘের মতো। ঝাঁঝাল বাতাস। উত্তাপ বেড়েছে। চিলের গলা ধকধক করে কাঁপছে। শুকনো তালপাতা অবিশ্রান্ত নড়ছে আর শূন্যতার আওয়াজ তুলছে। আর ঘরের মধ্যে স্বর্ণ একবুক উত্তাপ শীতল স্রোতে ভেসেছে ডুবছে।

ছেলেটি সারা দুপুর ঘুমিয়ে কাটায়। ওর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে গভীরতর মায়ায় আচ্ছন্ন হতে থাকে স্বর্ণ।

বিকেলে জর্জকে দেখা যায় টলতে টলতে ফিরে আসছে। একটা লাইনের ওপর পা ফেলে ভারসাম্য রেখে হাঁটবার চেষ্টা করে সে ছেড়ে দেয়। কাঠের তক্তায় লম্বা পা বাড়ায়। স্বর্ণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে পায় তাকে।

জর্জ স্টেশনের দিকে ঘোরে না—এদিকে আসে। তারপর স্বর্ণর বারান্দায় ওঠে সরাসরি। ম্লান হাসে—'হল না।'

স্বর্ণ দরজা ছেড়ে নড়ে না। পাছে জর্জ ভিতরে ঢুকে পড়ে। ডেভিড উঠোনে আপনমনে খেলা করছে—এ বাড়ির একান্ত বশীভূত। একটি প্রত্যঙ্গ যেন। এবং স্বর্ণ বলে, 'বাঘ মারা অত সোজা নয়, জর্জ। বাঘ কখনও দেখেছ? ছিল অস্ট্রেলিয়ায় বাঘ? অস্ট্রেলিয়ায় ক্যাঙারু থাকে।'

জর্জ রুমালে ঘাম মোছে। বন্দুকটা কাছেই ঠেস দিয়ে রাখে। তারপর বলে, 'দিদি চা খাবো। খুব ক্লান্ত হয়েছি।'

এবার স্বর্ণর উপায় নাই। একটু সরে বলে, 'এসো—কিন্তু খবরদার, ঘরের চেয়ার ছাড়া নড়বে না। তুমি বাইরে থেকে আসছ—আমরা তোমাকে কিছু ছুঁতে দেব না এখন। জাত যাবে।'

'জাত?' বন্দুকটা নিয়ে প্রশ্ন করে জর্জ।

'হ্যাঁ—এ আমাদের হিন্দুদের নিয়ম।'

'তুমি হিন্দু?' হা-হা-হা করে হাসে স্টেশনমাস্টার। তারপর আচমকা বন্দুকসুদ্ধ হাতে স্বর্ণর কাঁধ ধরে ফেলে।...'এই আমি টাচ্ করলাম তোমাকে। হাঁ—এবার মারো, দিদি। আমাকে মারো। এই বন্দুক দিচ্ছি—মারো একটা বুলেট।'

স্বর্ণ স্যাঁৎ করে সরে যায়। সারা শরীর হিম—নীল পাণ্ডুর।

না, হেরুর ছেলের জন্যে নয়। ম্লেচ্ছ সাহেব তাকে ছুঁল, সেজন্যও নয়। স্বর্ণ নিজেই জানল, এই দ্রুত শিহরনের চাবুক এসে পড়া এবং ভিতরের মাংসে গভীরতর নীল দাগগুলো একটা করে ফুটে ওঠার কারণ, প্রচণ্ড এক পুরুষ তাঁকে ছুঁল।

সহকারি স্টেশন মাস্টার তাকে একদা ছুঁয়েছিল—নিছক ছোঁওয়া নয়, চুমু খেয়েছিল—আর অনেক পরে তার মনে হয়েছিল, নিষিদ্ধ আঙুল ফলের মতন টলটলে এই অধরোষ্ঠের পাশে সে এক অসহায় মালিনী! তাই সুখ পায়নি স্বর্ণ, দুঃখ পেয়েছিল। তাই ধুলো থেকে উঠেই ঘোড়া হাঁকিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল রাস্তা থেকে ঘরের দিকে।

আর, একদা তাকে ছুঁয়েছিল এক ছোটলোক হেরু বাউরি। যে-হাতে সে ডাকাতি ও খুন করে—সেই বিশাল ভয়ঙ্কর হাতে। যেন বৃক্ষচ্যুত করতে চেয়েছিল আঁরোয়া জঙ্গলে সঞ্চরমান এক বিচিত্র পরগাছার মতন স্বর্ণলতা নামে লতাকে। সেদিনও দারুণ ত্রাসে দিশেহারা হয়ে পালিয়ে এসেছিল সে।

কিন্তু আজ বড় সাধে যেন মনে হয়, পুরুষত্বের রঙে প্রগাঢ় এই ছোঁয়ার তুলি চকিতে ও দ্রুত মাংস ও হাড়ের ভিতর কিছু কামনার দীর্ঘ দীর্ঘ রেখা এঁকে দিয়েছে। তবু এত পাণ্ডুরতা! সে নীল হতে-হতে পাণ্ডুর হল। হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রের ধারে দাঁড়িয়ে চাষা যেমন নিজেকে অজস্র আকাঙক্ষার ভিড়ে হারিয়ে ফেলে, স্বর্ণলতা নিজেকে হারাল কিছুক্ষণের জন্যে। বুঝতে পারল না—কী আকাঙক্ষা তার শোভন।

আর অস্ফুটস্বরে বলে সে. 'জর্জ! জর্জ!'

প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান হর্সব্রেকারটি হা হা করে হাসে। শুধু বলে, 'কিক মি—মারো আমাকে!'

স্বর্ণ আলগোছে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। যেন কিছু ঘটেনি নিজের মধ্যে, এভাবে সপ্রতিভ হয়ে পরমুহূর্তে কেড়ে নিয়ে বলে, 'তুমি বরং বন্দুক ছোঁড়া শেখাও জর্জ।'

জর্জ সামনের চেয়ারটাতে ধুপ করে বসে পড়ে।...'জল পান করব দিদি।'

স্বর্ণ ঘুরে বন্দুকটা রাখছিল। একবার ভাবে, ওকে 'জল খাব' কথাটা শিখিয়ে দেবে।

কিন্তু তার চোখ যায় ভিতরের দরজায়। ডেভিড এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, স্বর্ণ চোখ টেপে। তবু ছোঁড়াটা সরে যায় না। হঠাৎ সে আরও দেখতে পায়, ডেভিডের একটা আঙুল রক্তাক্ত। অমনি পাখির মাটি থেকে ওড়ার মতন ভঙ্গীতে সে পুরো সেই দরজা ঢেকে ওকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। তখন ঘাড় ঘুরিয়ে বড় স্টেশনমাস্টার সব দেখতে পায়। উঠে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে বলে, 'মাই গুডনেস! হি ইজ হেয়ার! দিদি, ডেভিড তোমার এখানে!'

স্বর্ণ জবাব দেয় না। ডেভিডকে নিয়ে সোজা ভিতরের ঘরে চলে যায়।

জর্জ কিন্তু ফের বসে পড়ে। আপন মনে হাসে। পা দুটো দোলায়। বাঘটা একবার যেন দেখেছিল—মাত্র একপলকের জন্যে। জঙ্গলের ছায়ার মধ্যে ডোরাকাটা শয়তান!...আমি তোমাক খুন করবই—দ্যাটস এ প্রমিজ—প্রতিজ্ঞা। ইউ আর এ পুওর ক্যাট্‌ললিফটার—নিতান্ত গরুখেকো বাঘ—কিন্তু, দ্যাটস এ প্রমিজ!...গোঁয়ার দুর্ধর্ষ সেই আদিম মানুষটি তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিভ্রম বা হ্যালুসিনেসান দেখতে পায়। ওই বটগাছটার তলায় দিনশেষের ঘন ছায়ার মধ্যে বিদ্যুতের মতন বারবার ঝলসে ওঠে জন্তুটা। মনে হয়, বড় ভয় পেয়ে গেছে জর্জকে। জর্জ হাসে আর মনে মনে বলে, আই মার্স্ট কিল ইউ!

অনেক পরে স্বর্ণ চায়ের কাপ নিয়ে আসে। নিঃশব্দে ওর হাতে কাপটা ধরিয়ে দিয়ে দরজার কাছে দাঁড়ায়। জর্জ বলে, 'ডেভিডকে কোথায় পেলে দিদি?'

'পালিয়ে এসেছে।'...স্বর্ণ নিরাসক্তমুখে জবাব দ্যায়।

জর্জ এত জোরে হাসে যে কাপ থেকে চা পড়ে যায়।...'ফাদার জানতে পারলে গোলমাল হবে! নিয়ে যাবে ডেভিডকে। তখন—তখন তুমি কী করবে? তুমি স্ত্রীলোক—ফাদার পুলিশ নিয়ে আসবে। তখন—তখন?'

স্বর্ণ গম্ভীর মুখে বলে, 'আসুক। দেখা যাবে।'

'তুমি পারবে না, দিদি। ফাদার একজন ইংলিশম্যান আছে। গভর্নমেন্ট তাকে সাহায্য করবে।'

স্বর্ণ আস্তে বলে, 'তুমি নিশ্চয় কানে তুলে দেবে ফাদারের। তোমার জাতভাই—তোমার ধর্মগুরু।'

জর্জ ঠোঁটে কাপ তুলতে গিয়ে নামায়। বলে, 'আমি ফাদারকে পসন্দো করছি না দিদি। ফাদারের কাজ আমার ভালো-লাগে না। দ্যাট ডেড রিভার—ঝিলটা গভর্নমেন্ট প্রপার্টি আছে। সৈদাবাদ জমিন্দারের প্রপার্টি ছিলো—নিলাম হয়েছিল! তারপর কী গোলমাল হল, গভার্নমেন্ট রাখল—দিল না। দেন—এখন ফাদার বললেন, যে লোক ঝিল থেকে কিছু নেবে—আই মিন, ফিস অর এ্যানি ড্যাম থিং, তাকে খ্রিস্টিয়ান হতে হবে।'

স্বর্ণ নখ খুঁটতে খুঁটতে বলে, 'শুনেছি।'

'তো অনেক গোলমাল আছে। আমি কিছু বলি না ফাদারকে। বলা উচিত হয় না।'...একটু হেসে জর্জ ফের বলে, 'তুমি দেখবে—বাঘটা মেরে সুচাবাবুর মতন বদলি হবো। আই কান্ট স্টে হেয়ার—থাকব না। ভালো লাগে না দিদি।'

খুব তাড়াতাড়ি চা গিলে নিয়ে মেঝেয় কাপটা রাখতে যায় সে। স্বর্ণ হাত বাড়িয়ে নেয়। এক মুহূর্তের জন্যে সংস্কার ঝিলিক দিয়েছিল—অভ্যাসে, এবং বরাবর তাই হয়—সে কড়া মনে শাসন করে নিজেকে। তারপর বলে, 'তুমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছ?'

'হাঁ! তো কী করব? ডিউটি দিতে হবে না? সুচাবাবু ভাবছে শেষবার তাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি।' বলে জর্জ উঠে দাঁড়ায়।

'থামো তো! যে আমার স্টেশন, তার রেলগাড়ি—তার ডিউটি! জর্জ তুমি কিছুক্ষণ থাকো। প্লিজ!'

'কেন দিদি?'

'তুমি আমাকে দিদি কেন বলো? আমি তোমার চেয়ে বয়সে কতো ছোট। বলেছি—দিদি বলবে না।

'দিদি বলব না? তো কী বলব?'

'মিস রায় বলবে।'

'মাই! তোমার হাজব্যান্ড—স্বামী ছিল—মারা গেছে। তুমি বিবাহ করবে না আর। তোমাকে মিস বলব কেন? বলব না।'

'না না! আমাকে তুমি মিস রায় বলবে।'

'অর্ডার?'

'হ্যাঁ! আমি তোমার টিচার না?'

'রাইট, রাইট! ঠিক আছে। মিস রায় বলব।' সকৌতুকে মাথা দোলায় জর্জ।

'তুমি কিছুক্ষণ বসো, জর্জ। কথা আছে।'

জর্জ ফের বসে পড়ে। বলে, 'কী কথা আছে, বলো?'

স্বর্ণ কাপটা জানলাব ধারে রাখে। সেখানেই একটু হেলান দিয়ে বসে। বাইরেটা দেখে নেয়। সন্ধ্যার ধুসরতা ঘনিয়েছে চারদিকে। কী একটা গাড়ি আসার মৃদু আওয়াজ শোনা যাচ্ছে দক্ষিণে ডাউন সিগনালের দিক থেকে। নির্জনতা এখন এইসব সময়ে শূন্যতার মতন লাগে। বটতলায় ময়রাবুড়ির দোকানে আলো জ্বলে উঠল। দুজন চাষাভুষো মানুষ সেখান থেকে এইমাত্র গ্রামের দিকে চলে গেল চাপা গলায় কথা বলতে বলতে। বাতাস এলোমেলো বইছে। তালগাছের পাতাগুলো অস্পষ্ট খড়ঘড় শব্দ তুলেছে। টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে কয়েকটা পাখি—ছবির পাখির মতন। দেখতে দেখতে গাড়িটা এসে পড়ে। সব নির্জনতা চুরমার হয়ে যায়। প্রচণ্ড নির্ঘোষে স্থাবর জঙ্গম আলোড়িত হতে থাকে কিছুক্ষণ। বিরক্তিকর শব্দটা যতক্ষণ না মিলিয়ে যায়, স্বর্ণ চুপ করে থাকে। তারপর কথা বলতে গিয়ে দেখে, জর্জ এতক্ষণ তার দিকেই তাকিয়ে ছিল।...'জর্জ!' স্বর্ণ ডাকে।

'কী কথা বলবে, মিস রয়?' কৌতুকের অভ্যস্ত স্বাদ জর্জের কণ্ঠস্বরে। 'মিস রয়! এ ফানি নেম! ইউরোপিয়ান!'

'জর্জ, তুমি তো খ্রিস্টান। পুনর্জন্ম কী জানো? রিবার্থ বলে আমাদের একটা কথা আছে, শুনেছ?'

'খুব—খুব চমৎকার কথা। শুনেছি। জানি। র‍্যাদার আই ফ্যান্সি—আমার মনে হয়, ওয়াল আই ওয়াজ হেয়ার—ইন দিস প্লেস! এখানে আমি আগেও এসেছিলাম! তখন আমি কিন্তু ব্রাহ্মিন ছিলাম তোমার মতন। হাঁ—পিওর ব্রাহ্মিন! বিশ্বাস করো।'...জর্জ হু হু করে বলে যায়।...তুমি কিন্তু তখন কে ছিলে, বলব? এ প্রিন্সেস অফ দ্যাট হিস্টোরিক প্লেস—কর্ণসুবর্ণ। ইওর লুক—চোখ দুইটি, তোমার কথাবার্তা—এভরিথিং প্রভ্স দা ফ্যাক্ট।'

স্বর্ণ বলে, 'জোক করো না জর্জ। আমার মন ভাল নেই।'

'কেন ভাল নেই? ফাদার এ্যান্ড দ্যাট পিওর বয় ডেভিড—ইজ ইট দা প্রব্লেম?'

'হয়তো।'...বলে স্বর্ণ কী ভাবতে থাকে।

'ডেভিড তো ফাদারের কাছে ভালো ছিল। এডুকেশন পেত...'

'কিন্তু ও তো থাকতে চায় না ওখানে। পালিয়ে আসে।'

'হাঁ, দ্যাটস ট্রু—সত্যি কথা।'

'আমি শুধু একটা কথা ভাবছি—ওকে দূরে কোথাও রাখতে পারলে ভালো হত।'

জর্জ কিছু বলে না। বন্দুক দেখতে থাকে।

স্বর্ণ একটু ঝুঁকে আসে।....'জর্জ, তোমার এ্যাসিস্ট্যান্ট ভদ্রলোক কবে যাচ্ছেন এখান থেকে?'

'ফার্স্ট জুন। কেন?'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'অনেক দূরে—পূর্ণিয়া ডিস্ট্রিক্টে। তিনপাহাড়ি স্টেশন। প্রমোশন পেয়ে এস এম হয়ে যাচ্ছে সুঢাবাবু। বাট দ্য স্টেশন ইজ—ছোট—অনেক ছোট। এ ব্রাঞ্চ লাইন।'

স্বর্ণ হিসেব করে বলে—'আর মাত্র দিন পাঁচেক পরে। জর্জ, তুমি আমার হয়ে ওকে একবার বলবে? ছেলেটাকে যদি নিয়ে গিয়ে রাখে! আমি জানি, ও ফাদারের এক নম্বর শত্রু। তাই বিশ্বাস হয় ওর অমত হবে না। একা মানুষ। ব্রহ্মচারী!'

'হোয়াট?'

'ব্রহ্মচারী—স্ত্রীলোক দেখলে ভয়ে পালায়।' স্বর্ণ একটু হাসে।

জর্জ কিন্তু গম্ভীর হয়ে মাথা দোলায়।..'ইন্ডিয়া ইজ এ ভেরি-ভেরি মিসটিরিয়াস কানট্রি। সো মেনি আনন্যাচারাল থিংস! ব্রমোসারি।'

'হ্যাঁ, ব্রহ্মচারী। সন্ন্যাসী। তা জর্জ, ও কি এই অনাথ ছেলেটার দায়িত্ব নিতে পারবে না? লেখাপড়া—ইচ্ছে হলে শেখাবে। কিন্তু আমি চাই, তোমাদের ফাদারের হাত থেকে ও বাঁচুক।'

'খ্রিস্টায়ান হওয়া কি অপরাধ বলছ মিস রায়?'

'না। তুমিও তো খ্রিস্টান জর্জ।'

'তবে কেন?'

'আমার ইচ্ছা—আর কিছু বলতে পারব না তোমাকে।'

'নো এক্সপ্লানেশান?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ কথা। বলছি এখন।'

'এই পাঁচটা দিন আমি ওকে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকেদের হাতে পায়ে ধরেও লুকিয়ে রাখতে রাজি করাব। তারপর...'

চাঁদঘড়ি খালাসি, সেই সময় রেললাইনের ধার থেকে চেঁচিয়ে ডেকেছে—'ডাক্তারদিদি, ডাক্তারদিদি! বড়সায়েব আছে নাকি ওখানে? তার এসেছে।'

জর্জ শুনতে পেয়ে বন্দুক হাতে বেরিয়ে যায়। বলে যায়, 'বলব সুধাবাবুকে। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে পরে—হ্যাঁ, আজ রাতে। দুইটি ঘণ্টা পরে। চলি গুড বাই।'...

রাত ন'টার ডাউন লোকাল চলে গেলে চাঁদ উঠেছে রাঙামাটির মাথায়। ক্ষয়ের চাঁদ। জ্যোৎস্না ঠিক আলো নয়, একটা রহস্য। প্রকৃতি এখন নিজে দরজা খুলেছে মনে হয়। কতক্ষণ জর্জের অপেক্ষা করে স্বর্ণ বেরিয়ে আসে। ছেলেটা ঘুমোয়নি হয়তো তখনও। আঙুল কেটে ফেলেছিল অনেকটা—টনটন করছে বলেছে! ঘরে পিদিম জ্বলছে। বেরিয়ে এসে ছেলেটার জন্য মায়ায় বত্রিশ নাড়ি পাক খায় স্বর্ণর—কিছুক্ষণের জন্যে। ছেলেটার সঙ্গে তার জীবনের এত মিল! উদ্দেশ্যহীনতার মিল, সুখদুঃখের মিল। ইচ্ছা অনিচ্ছার মিল।

লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে কিছু সময় চাঁদ দেখে সে। স্টেশনের ভিতরে আলো জ্বলছে—কে বসে আছে জর্জ না সুধাময়, চেনা যায় না। অস্পষ্ট একটা মূর্তি।

হ্যাঁ, প্রকৃতি আজ রাতে নিজের দরজা হাট করে খুলে দিয়েছে। তার ঘরের মধ্যে আরেক স্টেশনঘর, আলোছায়ায় আঁকা আরেক মানুষ—চেনা মানুষের প্রতিবিম্ব, যাদের কখনও জানা যায়নি। জর্জ যেতে বলেছিল, নাকি নিজেই যাচ্ছে, বুঝতে পারে না বিধবা স্ত্রীলোকটি। তার খালি মনে হয়, নিজেও এই পারিপার্শ্বিকের প্রত্যঙ্গ—প্রকৃতির মস্তিষ্ক থেকে আদেশ এলে তার মুভমেন্ট সম্ভব। নতুবা, দূরের জংশনে বিকল ট্রেনের প্রতীক্ষায় থাকা যাত্রীর মতন দাঁড়িয়ে তার পায়ের তলায় ঘাস গজাবে।

যেন প্রকৃতিই ডাকে। স্বর্ণ পা বাড়ায়: প্রথম পদক্ষেপে জড়তা এবং কী শীতল লাগে এই লৌহবর্ম। দ্বিতীয় পদক্ষেপে নিচের কঠিন বস্তুরাজি গলে যায় সহসা। যেন স্রোতকে সোজা পার হয়ে যায় স্বর্ণ। চাঁদ স্পটলাইটের মতন তার মুখের ভাব স্পষ্ট করতে থাকে। নাসারন্ধ্রে স্পন্দন দৃশ্যমান হয়। চোখদুটো চকচক করে। এবং অবশেষে পরিপূর্ণ আদিমতা ফোটে।

স্টেশনঘর জিভ বের করে হাঁফাতে থাকে তাকে দেখে। হাঁটু দুমড়ে এক প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী তার জন্যে অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। কতক্ষণ পরে বড় একটা প্রশ্বাস ফেলে স্বর্ণ। তারপর ঘরে ঢুকে চাপা গলায় ডাকে, 'ছোটবাবু!'

ছোটবাবু সুধাময় স্যাৎ করে ঘুরে যায়। দাড়িগোঁফ সন্ন্যেসীচুল নিয়ে তার তরুণ মুখমণ্ডল তারপর স্লেটে আঁকা মতন স্থির হয়। স্বর্ণ তার খুব কাছে গেলেও সেই স্থিরতা ঘোচে না।

স্বর্ণ তার পাশে টেবিলে পাছা ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। বলে, 'জর্জ তোমাকে কিছু বলেনি ছোটবাবু?'

একবার সুধাময় একটু স্পন্দিত হয়।...'স্বর্ণ, হুঁ, আমি—আমি কী বলব ঠিক ভেবে পাচ্ছিনে। সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। একটা ভুল বোঝাবুঝি—বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। তাহলেও...হ্যাঁ, জর্জ আমাকে বলেছে তোমার অদ্ভুত কীর্তির কথা। ছেলেটাকে নিতে আমার আপত্তি ছিল না, স্বর্ণ। ওকে আমি নিতুম। বস্তুত, ছেলেটা ঈশ্বরের সন্তান হয়েই দাঁড়িয়েছে।...' খিকখিক করে হাসে সে। এবং তারপর এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার ঘটতে থাকে। সে মুখে এবং মনে দুইপ্রকার বাক্য একইসঙ্গে এবং তেমনি বিস্ময়কর দক্ষতায় উচ্চারণ করে চলে।..

মনে-মনে : 'ছেনাল বেশ্যা মাগী! ম্লেচ্ছ কেরেস্তান নিয়ে অহরহ ঢলাঢলি করছিস—তাকেই বলগে না! ভাত দেবার বেলায়, আমি,...(অশ্লীল) আসুক তোর বাবা। সব খুলে লিখে পাঠাব তিলপাহাড়ি থেকে বেনামী চিঠিতে। গলায় দড়ি জোটে না খানকি কাঁহাকা! হেরু বাউরির ব্যাটার জন্যে নেউ (স্নেহ) উথলে উঠছে! কেন উঠেছে আমি কি বুঝি না ভাবছিস? এখনও ঘর খুঁজলে কাঁড়িকাঁড়ি ডাকাতির বমাল বেরোবে। আমি জানি না? ওরে আমার ইয়ে! ফি-হপ্তায় পাঁঠা জর্জটাকে নিয়ে কাটোয়া-কলকাতা করছিস কী জন্যে, সব জানি। স্বর্ণকারের দোকানে না যেয়ে থাকিস তো আমার নামে কুকুর পুষে দোব। নাকি আলিপুর জেলে বাপকে দেখতে যায়! ওরে বাবাসোয়াগী! হুঃ....এই শালা ইংরেজরাজত্ব না হলে দেখে নিতুম জর্জটাকে!'

মুখে : 'তবে কী, দেখ স্বর্ণ—আমার দিকটাও বিবেচনা করার আছে। বিয়ে করিনি—কিন্তু ফ্যামিলি আছে দেশে। বাবা-মা ভাই-বোন নিয়ে অনেকগুলো পেট। ইংরেজ রাজত্ব। পাদরিটা যদি কোনওগতিকে জানতে পারে যে আমার কাছে ওর বমাল রয়েছে, বুঝতেই পারছ, আমার পরিণতি কী হবে! চাকরি তো যাবেই...জেল খাটিয়ে ছাড়বে। ওর খ্রিস্টায়ান হোমের একটি অনাথ বালক চুরি করার চার্জে কিডন্যাপিং কেসে ফেলবে। তার শাস্তি মৃত্যু অথবা যাবজ্জীবন। না—আমি ভিতু নই, স্বর্ণ। তুমি তো জানো, কী ঝুঁকি নিয়ে পাদরির লাঞ্ছনা সয়েছি—তুমি না শাসালে ওর খেড়ো চার্চে আগুনও জ্বালিয়ে দিতুম। পাদরিটাকে আমি ঘৃণা করি। অবশ্য সবই তোমার দিকে তাকিয়ে—তা অনুভব নিশ্চয় করো তুমি! অথচ স্বর্ণ, আমি সত্যি এ-ব্যাপারে বড় অসহায়। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে তোমার অনুরোধ রাখতে পারছি না বলে। কিন্তু কী করব? এটা ইংরাজ রাজত্ব।'

ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্রের মতন কথা বলে সহকারী স্টেশনমাস্টার। স্বর্ণ বঙ্কিমচন্দ্র পড়েছে। তার বাবা সাহিত্যানুরাগী মানুষ আজীবন। এবং স্বর্ণও এসব কারণে মনে ও মুখে সুধাময়ের মতনই দু'রকম কথা বলে। কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট। মনে

বলে—'তুমি আসলে একটি কিম্ভুত নপুংসক ছোটবাবু। এই আমি যদি এখুনি তোমাকে জড়িয়ে ধরি এবং অশ্লীলতম প্রস্তাব করি, তুমি ভিরমি খাবে। তোমার সাধ প্রচুর, সাধ্য একতিল নেই। আর তা থাকলেও, স্বর্ণলতার শবীর তোমার জন্য নয়। আমি শেষবার পরীক্ষা করতে চেয়েছিলুম যে তোমাকে সত্যি ঘৃণা করি নাকি। করি ছোটবাবু। কারণ, একটা চমৎকার স্বপ্ন তৈরি হবার মুখে তুমি তা নষ্ট করে ফেলেছিলে। তুমি যে আমার যোগ্য নও, ধরা পড়েছিল স্পষ্ট হয়ে।' এবং সে মুখে সংক্ষিপ্ত বাক্য উচ্চারণ করে, 'হ্যাঁ—তোমার সমস্যা আছে। দেখি, কী করা যায়!'

তারপর সে সরে আসে। চলে আসবার জন্যে পা বাড়ায়। তখন সুধাময় তাকে ডাকে—'স্বর্ণ, শোনো।'

স্বর্ণ দাঁড়ায়।

'বলছিলুম কি, হেরুর ছেলে নিয়ে তোমার ঝামেলা করা উচিত হয় না। কী দরকার?'

স্বর্ণ কেমন হাসে শুধু।

'পাদরিটা শয়তান। তুমি স্ত্রীলোক—মাথার ওপর কেউ নেই। তাই বলছি..'

স্বর্ণ ঘোরে। পা বাড়ায়।

সুধাময় উঠে আসে। পিছনে পিছনে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। ....'আশ্চর্য! একটা স্বপ্ন—সুন্দর স্বপ্ন। তাছাড়া কী? তুমি হঠাৎ আবার আসবে—আমার সঙ্গে কথা বলবে—ভাবিনি! উঃ কী বিচিত্র মানুষের এই জীবন!'

স্বর্ণ বারান্দা ঘুরে স্টেশন কোয়াটারের দিকে এগিয়ে প্রথম পা জ্যোৎস্নায় পড়া মাত্র বলে, 'তুমি নাকি সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছ? অবশ্য গৃহী সন্ন্যাসী। তাদের স্ত্রীলোকের প্রতি টান থাকবে না—তারা ছেলেপুলের বাপ হবে না, তা আমি বলছি না।'

তার হাসির শব্দ ছিটকে এসে আঘাত করে সন্ন্যাসীমনা প্রেমিকের—কিংবা প্রেমিকমনা সন্ন্যাসীর—অথবা শুধুই এক দুর্বলচেতা তরুণ সহকারী স্টেশনমাস্টারের মুখে। সে দাঁড়িয়ে থাকে ছায়ার মধ্যে। মনে মনে বলে, 'আরে যা যা খানকি কাঁহেকা!'....

জর্জ খেতে বসেছে তখন। প্রকাণ্ড দুটো বানরুটিতে জেলি মাখাচ্ছে আর কামড়াচ্ছে। একডজন কলা রয়েছে, কাগজে জড়ানো আপেল আছে অনেকগুলো। টিনের কৌটোয় শুকনো মাংস আছে। কাটোয়া থেকে তার দু'বেলা খাবার আসে। ইউরোপিয়ান ক্যানটিনে ব্যবস্থা করা আছে। সময় মতো নামিয়ে দিয়ে যায় স্টেশনে ক্যাটারিং কোম্পানির লোকেরা। স্বর্ণকে দেখে সে ইশারায় বসতে বলে।

যতক্ষণ তার খাওয়া না হয় কোন কথা বলে না সে। একসময় স্বর্ণ জিগ্যেস করে, 'তুমি গরুর মাংস খাও না, জর্জ?'

জর্জ স্টেশনের সুপ্রসিদ্ধ ইঁদারার জল খাওয়ার পর মুখ মুছে তার জবাব দেয়। হেসে বলে, 'আমি হিন্দু নয়। ইন্ডিয়ান ব্রাহ্মিন না আছে মিস বয়।'

'ওই কৌটো থেকে কী খেলে? মাংস না? কীসের?'

'পর্ক। শুওর।'

'সুধাবাবুর কাছ থেকে এলুম। সে পারবে না বলল।'

জর্জ সিগ্রেট ধরিয়ে খাবার টেবিলেই বসে পড়ে বলে, 'হাঁ। বলেছিল আমাকে। সে কাওয়ার্ড—ভয় পাইল। তো—আমি বলছি, ছেলেটা রিটার্ন দাও।'

স্বর্ণ ঠোঁট কামড়ে বলে, 'না।'

'কোথায় রাখিবে তাকে?'

'আমার মাথায়।' ....বলে স্বর্ণ হঠাৎ উঠে পড়ে। দরজার দিকে পা বাড়ায়। তার বুকের ভিতর হু হু করে কিসের আগুন জ্বলে যেতে থাকে।

আর জর্জ চকিতে দরজা আটকায়।...'কী হল তোমার?'

আলগোছে ওর বিশাল বাহুটা সরিয়ে দিয়ে স্বর্ণ বলে, 'ছাড়ো যেতে দাও।'

বাহু সরে। কিন্তু জর্জ বলে, 'কেন? আমি কি অপরাধ করল? কেন যাবে?' আমি যদি যেতে না দিব তোমাকে? কী করবে? পারবে? আমাকে মারবে?'

'অসভ্যতা করো না জর্জ।'

চোয়াড় অস্ট্রেলিয়ান এতদিন পরে নির্ভুল স্পষ্ট উচ্চারণ করে—'স্বর্ণলতা! প্লীজ—আমার কথা আছে। যাবে না।'

'তুমি মদ খেয়েছো জর্জ। তোমার মুখে মদের গন্ধ।'

'দ্যাটস রাইট। ঠিক কথা। কিন্তু তুমি যাবে না—কথা আছে। সেইজন্য তোমাকে আমি আসতে বলেছিল। তুমি বসো।'

'তোমার ঘরে বসে কিছু শুনব না—কাল দিনেরবেলা আমার ঘরে যাবে।'

'ডু ইউ ইনভাইট মি? নিমন্ত্রণ করল?'

'হ্যাঁ। আমাকে যেতে দাও।'

জর্জ হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—'আমি এক ডেড ম্যান—মরা লোক, স্বর্ণলতা। জাস্ট এ ঘোস্ট ইজ ক্যারিং দা বডি অফ এ্যান আননোন ম্যান। আই ক্যান্ট—ক্যান্ট আইডেন্টিফাই দা ড্যাম থিং। আইম ইন দা হেল অফ এ মেস!'

'জর্জ জর্জ! তুমি কী চাও আমার কাছে?'

'জাস্ট স্ট্রাইক মি! হাঁ—আমাকে মারো মিস রয় স্ট্রাইক দা সান অফ এ বিচ। কিক দা বাস্টার্ড!'

'জর্জ! মাতলামি করো না। আমি চেঁচিয়ে লোক ডাকব বলে দিচ্ছি।'

'জাস্ট সি দা ফান! আমি একদিন সুঢাবাবুকে জিজ্ঞাসা করল—আমি হিন্দু হইতে ইচ্ছা করি! তো সে বলল—নো—নেভার স্যার! কেহ হিন্দু হইতে পারে না। এ হিন্দু ইজ বরন্!'

'কেন তুমি হিন্দু হতে চাও জর্জ? আমার জন্যে?'

'ইউ আর উইপিং! কাঁদল কেন? হোয়াট হ্যাপন্ড?'

স্বর্ণ হু-হু করে কেঁদে উঠল। দু'হাতে মুখে ঢেকে বলল, 'আমাকে যেতে দাও।' বিস্মিত অস্ট্রেলিয়ান একটু সরে বলল, 'আমি অ্যাপলজি চাইল। তুমি যাও।'

দ্রুত ছুটে যেতে-যেতে স্বর্ণ ইন্দারার কাছে একজন মানুষের সঙ্গে ধাক্কা খেল। মানুষটা সহকারী স্টেশনমাস্টার। সে দেখল এক অলীক উপদ্রব সাদা শরীর নিয়ে ছায়ায় মিশে গেল।

চৌদ্দ

গোরাং ডাক্তার ফিরে এলেন

এলাকার কিংবদন্তি কোন এক কেদার রাজার কথা আছে। আঁরোয়া জঙ্গলের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে পশ্চিম হিজল বিলের তৃণভূমি পেরিয়ে প্রকাণ্ড আলপথ চলে গেছে গোবরহাটির দিকে—স্বর্ণলতার শ্বশুরবাড়ির দালানের নিচে তার শেষ। পাঁচ মাইল লম্বা এই আঁকাবাকা আলপথটা বাঁধের মতো দেখতে। দু'পাশে কুল শেয়াকুলবৈঁচির ঝোপঝাড়। বাবলা শ্যাওড়া ভাঁট হিজল যজ্ঞডুমুর একলাদোকলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই পথটার নাম 'কেদারের আল।' কোন এক কেদার রাজা রাতারাতি নাকি তৈরি করেছিল।

কেদার রাজা বা তার আলপথের যেমন কিংবদন্তি আছে, তেমনি আছে জ্যোৎস্নার রাতে ওই পথে ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া এক সাদা পোশাকের সওয়ারের জনকথা। গ্রামবৃদ্ধ বলে, সে সওয়ার মেয়েমানুষ। সে কেদার রাজার মেয়ে। আর, যারা নাকি তাকে দেখেছিল—হাটুরে কিংবা গমক্ষেতে রাতের পাহারা দিতে আসা কোনও চাষা কিংবা হিজলের বিলে নিশিরাতে কাঁধে বিশাল প্রজাপতির ডানার মতন 'বেসাল' জাল নিয়ে যেতে যেতে কোন জেলে-জেলেনি—তার কেউ কেউ বলেছিল 'হুঁ—মেয়েমানুষ। কিন্তু তার বুকের কাছে বালক ছিল।'

শতকের এই ছয়ের দশকে কর্ণসুবর্ণে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মাটি খোঁড়ার সময় এইসব অলীক উপদ্রবের কাহিনী শুনেছিল আমাদের তরুণ অধ্যাপকটি। সে মনে মনে ভাবে সে ছিল এক জ্যোৎস্নারাত। হিজলের অবাধ তৃণভূমি পেরিয়ে যেতে সত্যি ওরা দেখেছিল এক ঘোড়সওয়ার স্ত্রীলোককে—বুকের কাছে যার 'বালক।' বালক! বাচ্চা ছেলের প্রতি কোন কারণে সম্ভ্রম দেখাতে রাঢ়বাংলার এ অঞ্চলে লোকে বলে 'বালক।' তা—স্ত্রীলোকটি এবং বালকটি, এবং ঘোড়াটিও পরবর্তী সময়ে অলৌকিকদের গল্পে জায়গা করে নিয়েছিল। তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিক ভাবে, এই ভূতের গল্পটির বয়স মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের বেশি নয়। অথচ এটি যেন হাজার বছর আগের গন্ধে ভরা। আমাদের বস্তুজ্ঞান এবং যুক্তি অনুসারে বলতে হয়, বস্তুত ঘটনাটি এক রাতে মাত্র একবারই ঘটেছিল 'কেদারের আলে।' আর সেই সময় হাঁওড়া আজিমগঞ্জ লুপ লাইনের বয়স হবে হাঁটিহাঁটি পা-পা।...

...না, এ ভূতের গল্পের জন্মদিন বেশি পুরনো নয়। এখনও তো গ্রীষ্মকাল আসে। এখানে এই চিরোটি বা বর্তমান কর্ণসুবর্ণ রেলস্টেশন এখনও চারপাশে মাটি ও প্রকৃতির আদিমতায় চিড় ধরাতে পারেনি তিন-চারটি পাঁচশালা যোজনা। তেমনি রাতের মতো চাঁদ ওঠে। ধুলোউড়ির মাঠে ধুলো ওড়ে। আঁরোয়া জঙ্গলের পিছনে সেই কেদারের আল চাঁদের আলোয় পথিককে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে আরও চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে। দু'ধারে বিলের জল আর মসৃণ গমের ক্ষেত ঝকমক করে ওঠে। কুল শেয়াকুল বৈঁচির ঝোপঝাড়ে পোকামাকড় ডাকে। দূরে বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরে হাট্টিটি পাখি ডাকতে থাকে—ট্রি ট্রি ট্রি....ট্রি ট্রি ট্রি। প্রজাপতির পাখার মতো বিশাল 'বেসাল' জাল কাঁধে নিয়ে বিলের দিকে

রাতের রহস্যময় জলজগতে নামতে চলে জেলে কিংবা জেলেনি। তৃণভূমির বয়স্ক রাখালেরা বাথানের খোলা আকাশের নিচে শুয়ে থাকে এবং চাঁদের আলোয় নক্ষত্র খোঁজে। বিহারি গোয়ালারা লম্বা লাঠি তুলে কোথাও একবার কী দু'বার মোষের উদ্দেশে বলে ওঠে—ধোঃ ধোঃ! ফসলের ক্ষেতে পাহারা দিতে দিতে অতি সতর্ক কোনও 'জাগালে'র ভিতু ঘুমজড়ানো কণ্ঠস্বর শোনা যায় হেই—ই—ই! হৌ—ঔ—ঔ—ঔ! তারপর ফের নীরবতা। ফের পূবের রেল লাইনে গয়াপ্যাসেঞ্জার চলে যাওয়ার স্বপ্নময় ধ্বনিপুঞ্জ। স্টেশনের সিগনাল বাতি ফের লাল হলে নীরবতা ফেরে। তারপর শুধু নীরবতা। বাতাসের শব্দও শোনা যায় না। তারপর কোথাও এইসব প্রশান্তি আর মৌন রহস্য ছুঁয়ে শিশিরের ফোঁটার মতন মৃদু উচ্চারণে হা-ট্রি-ট্রি পাখিটি ডেকে ওঠে—ট্রি ট্রি ট্রি...ট্রি ট্রি ট্রি!

এবং তখনই, আমাদের ভাবপ্রবণ তরুণ অধ্যাপকটি প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁবু থেকে বেরিয়ে কর্ণসুবর্ণ নগরীর কবর স্বরূপ একটি টিলায় দাঁড়িয়ে অনেক দূরের কেদারের আলপথটা খুঁজতে চেষ্টা করেন। তাঁর মনে হয়, গোরাং ডাক্তারের মেয়ে স্বর্ণলতা হেরু বাউরির ছেলেকে নিয়ে এমনি গ্রীষ্মের জ্যোৎস্নারাতে ওই পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। হতভাগ্য ছেলেটির জন্য কিছুদিনের নিরাপদ আশ্রয় চাইতে গিয়েছিল।

...সহজেই বোঝা যায়, স্বর্ণলতা কী ঝুঁকি নিয়েছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরাজ রাজত্ব তখন। কিন্তু ইংরাজ সন্ত্রস্ত, সতর্ক। দেশে সন্ত্রাসবাদীদের প্রচণ্ড আত্মপ্রকাশ শুরু হয়েছে। গান্ধীজির ডাকে ছাত্ররা লেখাপড়া ছেড়ে স্বদেশী করতে বেরিয়ে আসছে। মাত্র কয়েক মাইল পূর্বে বেলডাঙা থেকে বহরমপুর শহর স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে ভাসছে। ভাসছে কয়েক মাইল পশ্চিমে জমিদারের বড় গ্রাম গোকর্ণও। শুধু রাঙামাটি চাঁদপাড়া চিরোটি আঁরোয়া নিস্পন্দ। নিম্নবর্ণের নিরক্ষর মানুষদের অধ্যুষিত এলাকায় রাজনৈতিক স্পন্দন নেই তখন। তাহলেও সন্ত্রস্ত সতর্ক ইংরাজ প্রশাসকদের পক্ষে স্বর্ণলতার আচরণ যত অরাজনৈতিক মনে হোক, পাদরি সাইমন এই সামান্য ছাই দিয়ে দড়ি পাকাতে পারত। স্বর্ণলতাকে 'স্বদেশী' এবং সন্ত্রাসবাদী প্রতিপন্ন করতে পারত।

আর যে স্বর্ণর নামে এলাকায় নানা কেলেঙ্কারির ঢিঢি, স্বাধিকারপ্রমত্তা সেই স্বর্ণ হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের বালবিধবা—এবং সে গেছে রাতদুপুরে ঘোড়া হাঁকিয়ে শ্বশুরবাড়ি—এতদিন পরে! মুখের ওপর ঝাঁটা খেয়ে তক্ষুনি ফিরে আসবার কথা তার। সে নিশ্চয় জানত, একটা অসম্ভবের কাছে অকারণ জেদে হাত পাততে চলেছে সে। অথচ মানুষ অনেকসময় কেন কী করে বসে, সে নিজেও তা জানে না। মানুষের মন কম্পিউটার নয়। মানুষ ইচ্ছে করেই অমৃতের বদলে বিষ তুলে পান করে। মানুষের চেতনায় এই স্বাধীনতা আছে। এ স্বাধীনতা প্রকৃতি তার নিজের ভাণ্ডার থেকে তাকে দিয়েছে। এ স্বাধীনতাই মানুষের জীবনের নিয়ম এবং চূড়ান্ত সত্য। একে বাগ মানাতে গিয়েই যা ঘটে আসছে, তার নাম ইতিহাস।

তরুণ অধ্যাপকটি অবাক হয়। স্বর্ণলতাকে সে প্রকৃতির এক স্বাধীন সন্তান বলে মনে করে। এবং এভাবেই আমরা পৃথিবীতে ও ইতিহাসে মানুষের অনেকানেক ঘটনাবলীর মীমাংসায় পৌঁছতে পারি।' অধ্যাপক মনে মনে একথা বলে সিগ্রেট ধরায়।

তবে আরও বিস্ময়কর ঘটনা—স্বর্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়নি। তার এক দেওর কমলাক্ষ

যাত্রাদলের রিহার্সাল থেকে বাড়ি ফিরছিল। দরজার কাছে নিশিরাতের ওই অলীক উপদ্রব দেখে থমকে দাঁড়ায়। কমলাক্ষ শিল্পী যুবক—যাত্রাদলের রাজকুমার। মাইনর পাশ করেই যাত্রায় মেতে গেছে। পৃথিবী একদিকে তার—অবেহেলিত, অন্যদিকে যাত্রা। কোথায় কী ঘটছে, সে জানতে চায় না। বয়সে স্বর্ণর কাছাকাছি, দু-তিন বছর বড় হতে পারে। সে কানেই শুনেছিস তার বিধবা বৌদির বিচিত্র সব গল্প। কোন উৎসাহ ছিল না বৌদি সম্পর্কে। আত্মভোলা কমলাক্ষ অবশ্য হেরুর ছেলেকে নিল। কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যে। ছোঁড়াটা চমৎকার একানি বালকের পার্ট করবে। বায়েনপাড়ার মতি দলে ঢোলতবলা বাজায়। ওরা মাগমরদ বাঁজা-বাঁজী, ছেলেপুলে নেই। এ তো স্বর্গের সিঁড়ি হল ওদের। মতি বায়েনের ভাগ্নে হয়ে ডেভিড সুখে ও কতকটা গোপনে বাড়ুক। কমলাক্ষ সে রাতেই সব ব্যবস্থা সেরে বৌদিকে কেদারের আলপথে কিছুটা এগিয়ে দিয়ে গেল। অনেকদিন পরে দেখা। সুখদুঃখের কথা নিশ্চয় হল।'...বৌদি, যা মনে চায়, করে যাবে। কোন্ শালাকে পরোয়া! কে তোমাকে খেতে পরতে দ্যায়, বলো। আমি তো মাইরি ওই বুঝি! তোমার ভাসুররা শাসাচ্ছে পৃথকান্ন করে দেবে। দিক্ না শালারা! আমার অংশে সাত বিঘে মাটি, পাঁচকাঠা জলা, আর তিনটে তালগাছ পড়বে। হিসেব করে দেখেছি। হেসেখেলে চলে যাবে। ভেবো না।....' কমলাক্ষ এইসব বলেছে। ফের বলেছে, 'কাকে পরোয়া? এ শালা ব্রিটিশ গরমেন্টের রাজত্ব। চ্যারাকপোঁ (টুঁ শব্দ) করলে দেবে ঘানিকলে জুড়ে। তুমি চালিয়ে যাও।'

কমলাক্ষ ওই রকমই। একটু এঁচোড় পাকা টাইপ। স্বর্ণ ফিরে যেতে যেতে ভেবেছে, ডেভিড ছোঁড়াটা তো আশ্চর্য নেমকহারাম! দিব্যি মতি বায়েনের নোংরা মাদুরে গড়িয়ে পড়ে ঘুমোতে লাগল! সকালে ও স্বর্ণকে ভুলেই যাবে। ও একটা অদ্ভুত ছেলে। ও কারো নয়—অথচ সকলেরই। সব ঘর ও সব মানুষই ওর আপনার।....

স্বর্ণ ফিরেছিল সদর রাস্তায়। গোকর্ণ চিরোটি কাঁচা সড়ক ধরে—বাঁকি নদী আর হাউলির সোঁতা পেরিয়ে। বাড়ি পৌঁছতে তখন ভোর হয়েছে।...

এর দু'দিন পরে অপ্রত্যাশিতভাবে কমলাক্ষ এসে জানিয়ে গেল, 'মনাই' ভালো আছে।'

মনাই আবার কে? হুঁ—সেই ছেলেটা। সবসময় মনাই-মনাই করে, তাই ওই নামে সবাই ডেকেছে। মতি বায়েন তাকে শালিখের বাচ্চা এনে দিয়েছে। খাঁচা বানিয়ে দিয়েছে। মনাই বড় সুখে আছে।

স্বর্ণর কথা বলে না? পাদরিবাবার কথা? বলে না—মিট মাংস ব্রেড রুটি বার্ড পাখি বুক বই? কিচ্ছু না—কিচ্ছু না। শুধু বলে—'মনাই' আর 'সাধুবাবা!' আপন মনে খেলতে খেলতে হঠাৎ বলে ওঠে, 'সাধুবাবা, সাধুবাবা কই?' কমলাক্ষ বলে গেছে, 'ছেলেটা জড়ভরত একেবারে।'

আরও দু'দিন পরে এক সকালে ট্রেন থেকে নামলেন গোরাং ডাক্তার। নেমেই থপথপ করে দৌড়ে সোজা স্টেশন ঘরে—তারপর চাঁদঘড়িকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, 'বাবা চাঁদঘড়ি, ভালো আছিস? বউ ভালো? তোর বাচ্চাটার সর্দিকাশি সেরেছে তো? হাঁরে তোদের ঘর

দেখছি এখনও করে দিলে না রেল কোম্পানি। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার শালাদের মুখে!' তারপর সন্নেসী চেহারার সুধাময়কে চিনতে না পেরে বলেন, 'আপনি নতুন এস এম? বাঃ ভালো, ভালো। আমি—আমি এখানকার হোমিওপ্যাথ ডাক্তার শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল রায়—ওই যে আমার পর্ণকুটির। আমার মেয়ে স্বর্ণলতাকে নিশ্চয় চে—'

'ডাক্তারবাবু, আমি সুধাময়।

'সুধাময়!' গোরাংবাবু হাঁ। পা থেকে মাথা দেখে নিয়ে বলেন, 'এ কোন সুধাময়? দাড়ি রেখেছ কেন? চুল এত লম্বা কেন বাবা?'

'ও এমনি। আপনার শরীর ভালো?'

'খুব ভালো বাবা, খুব ভালো। শালারা জেলে খাসা রেখেছিল। বুড়োমানুষ তো—ভদ্রলোক—তারওপর ডাক্তার। হোমিওপ্যাথি বাকসো দিয়েছিল। সকলকে ওষুধ দিতুম। জেলার বলো, অফিসার বলো—কয়েদিরা বলো—সব্বাই সব্বাই...হুঁ বাবা সুধাময়, তোমার বড়সায়েব জর্জ হ্যারিসন আছেন তো? কোয়ার্টারে নাকি? একবার যাই, দেখা করে আসি। বড় ভালোলোক—কে বলবে শালা ইং....

সুধাময় বলে, 'আমি কাল সকালে বদলি হয়ে যাচ্ছি ডাক্তারবাবু।'

গোরাংডাক্তার ধমক দিয়ে বলেন, 'পাগল! কখনো যাবে না। কই দেখি জর্জসায়েব কোথায়?'

'জর্জসায়েব জঙ্গলে গেছেন। কদিন থেকে পাগলামিতে পেয়েছে।'

'জঙ্গলে? কেন, কেন?'

'বাঘ মারতে। একটা গরুখেকো বাঘ এসেছে নাকি।'

প্রচণ্ড হাসেন গোরাং ডাক্তার। সুধাময়ের মনে হয়,. গোরাংবাবুর স্বাস্থ্যটা ভালো হয়েছে আগের তুলনায়। রঙ ফেটে পড়ছে রোদ্দুরে। গোরাংবাবু তারপর লাইন ডিঙিয়ে প্রায় দৌড়ে চলেন। অনর্গল বকবক করেন—'উঃ কতকাল সব দেখিনি! কত মুখ, কত মানুষ। মৌলুবীটাকে খবর দিতে হবে। শালাকে এবার বেদম ঠ্যাঙানি দেব। উহু, হু, আমার এখন পাখির মতো উড়তে ইচ্ছে করছে গো! স্বর্ণ, ওরে স্বর্ণ মা! আমি এসেছি। আমি এসে গেছি রে!'

স্বর্ণ বারান্দায় গাছের মতন দাঁড়িয়ে আছে। এবং সে-গাছ চারদিকে বড়বড় ডালপালা ছড়ানো বিশাল এক বট। নিজেকে-প্রশস্ত করে ছায়াপুঞ্জ সমন্বিত গাছের মতন সে প্রতীক্ষা করছে ওই মানুষটার—যে-মানুষটাকে তার উড়ে আসা পাখির মতন লাগে। আর মানুষটাও পাখি হয়ে সেই নীরব বিস্তৃত এবং রহস্যময় গাছের দিকে উড়ে চলে। তার দুটো বাহু ডানার মতন আন্দোলিত হতে থাকে।...

এমনি করে গোরাংবাবু ফিরে এলেন। তাঁর আসার মধ্যে হইচই ছিল। মনে হচ্ছিল, অনেক মতলব মাথায় নিয়ে ফিরেছেন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারবাবু। কুচুটে ময়রাবুড়ির ভাষায় 'রাজাউজির মারতে/হাতে মাথা কাটতে' এবং চাঁদঘড়ি খালাশির বুলিতে 'হ্যান করেঙ্গা/ত্যান করেঙ্গা' নিয়ে।

যাকে সামনে পেলেন, যেচে কথা বললেন। অনেককে জড়িয়ে ধরলেন। আদ্যোপান্ত খবরাখবর নিলেন, পারিবারিক অসুখবিসুখের। ওষুধ নিয়ে যাবার সুপরামর্শ দিলেন। এমনকি যারা-যারা তাঁর গ্রেফতারের সময় ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছিল, তাদের সঙ্গেও কথা বললেন, খোলা মনে।

পরেরদিনই যথারীতি সুধাময় স্টেশন ছেড়ে চলে যায় আপের দিকে তিনপাহাড়ি। গোরাংবাবু তার বোঁচকাবুঁচকি তুলে দেন গাড়িতে। চোখের জল মোছেন হাতের চেটোয়। এবং জর্জকে বলেন, 'স্যার, মানবজীবন পান্থশালা। হিউম্যান লাইফ ইজ স্যার সরাইখানা। ডু ইউ নো স্যার হোয়াট ইজ সরাইখানা? ম্যান কামস এ্যান্ড ইটস এ্যান্ড গোজ ফ্রম দ্যাট প্লেস।'

জর্জ শুধু বলেছিল, 'না ডাকটারবাবু, আমাকে স্যার বলবেন না, অনুগ্রহ।' একটু পরে হাসতে হাসতে ফের বলেছিল, 'আমি আপনার ঘোড়ার সহিস ছিল। আপনার মেয়েকে প্রশ্ন করবেন।'

ঘোড়াটা—চৈতক! হ্যাঁ—রীতিমতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অশ্ব এখন। স্বর্ণলতা যেমন বদলেছে, ও ব্যাটাও বদলেছে। তাকে ভীষণ ভদ্রলোক লাগে। গোরাংবাবু এসে অবধি চালচলন ভাবভঙ্গী দেখে পিঠে চাপতে সাহস পান না। নয় তো এলাকা চষে বেড়াতেন, বাড়ি-বাড়ি ঘুরতেন, মাঠে যেতেন চাষা ও ক্ষেত মজুরদের খোঁজখবর নিতে, গোবিন্দপুর পোস্টাপিসে হানা দিতেন, তাহের হরকরার বাড়ি তালরস খেয়ে আসতেন ভোরবেলায়। আরও যেতেন আঁরোয়া জঙ্গলের বাথানে, রাঙামাটির ঝিলে, কোদলার ঘাট পেরিয়ে চাঁইপাড়ায়। কিন্তু হাঁটবার শক্তি জেলেই খতম হয়েছে যেন।

আসলে ভেতরটা ফোঁপরা হয়ে গেছে। নিজেকে 'পাকা কুমড়ো' বলে বর্ণনা করেন গোরাংবাবু। চৈতকের পিঠ থেকে পড়লে কুমড়ো ফেটে যাবে। এবং এইসব বলে প্রচণ্ড অট্টহাস্য করেন। স্বর্ণ গম্ভীর—হাসে কম। স্বর্ণ সে-স্বর্ণ নেই। সেই প্রগলভ গ্রাম্য বালিকার খোলস ফাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে সংহত ব্যক্তিত্ব—একটি নিঃশব্দ সৌন্দর্য। মনে মনে তারিফ করেন বুড়ো ডাক্তার, মনে মনে ক্রমে অস্থিরও হন।

কিন্তু যে ঝড় হয়ে ফিরেছেন, সেই ঝড় হয়ে বয়ে যেতে চাওয়ার ফলে এবং অনেক মতলব কামড়ানিতে গোরাংবাবু নিজের সম্পর্কে এত ব্যস্ত যে বাইরের বর্তমান পরিবর্তিত পরিবেশকে খুঁটিয়ে দেখার সময় পান না।

হঠাৎ তাই আঘাত এল। গোরাংবাবুর কানদুটো দিয়ে সেই পরম ঝড়টা ফোঁস করে বেরিয়ে গেল। বেশিদিন যায়নি—ফিরে আসার মাত্র কিছু দিন পরেই।

বটতলায় কিছু সওয়ারি গরুমোষের গাড়ি এসেছিল। চেনা-অচেনা লোকগুলোর সঙ্গে এবং গাড়োয়ানদের সঙ্গে সোৎসাহে কথা বলছিলেন গোরাংবাবু। হঠাৎ কানে এল ময়রাবুড়ির আটচালার সামনে জনাকতক লোকের বলাবলি।

'ছেড়ে দিলে তাহলে?'

'দিলে তো দেখছি।'

'আবার কার বুকে হস্তা দেবে কে জানে!'

'দেবে কী করে? আর তো হেরু বাউরি নাই।'

'হেরু নাই, হেরুর চেলা তো ঘরে আছে। উরেব্বাস! অমন মাল যার ঘরে, শালা রাজ্যের হেরু এসে বলবে—হুকুম করুন হুজুর! কে জানে—এ্যাদিন কে জুটেছে তলেতলে। সাঁওতাপাড়ায় অতবড় ডাকাতিটা হল সেদিন—'

'আর, এবার তো আরও মজা। জেলখানা থেকে পেকে এসেছে।'

'তাইতো বলছি রে বাবা! লেডিডাক্তার সেজে গেরস্থবাড়ির খোঁজখবর নিয়ে আসে। সাঁওতাপাড়ার যে বাড়িতে ডাকাতি হল—মা কালীর দিব্যি এক হপ্তা আগে মাগী ও বাড়ির ছোটবউয়ের ছেলেকে দেখতে গিয়েছিল। আমার দাদার মেয়েটার ওখানে বিয়ে হয়েছে।'

গোরাংবাবু ওদের অলক্ষ্যে একটা করে পা বাড়ান। নিজেও জানেন না যে ওদিকে তাঁর পা এগোচ্ছে। সামনে টাপর দেওয়া দুটো গাড়ি মাত্র।

'মাইরি! হিসেব মিলে যাচ্ছে একেবারে।'

সেই সময় ময়রাবুড়ি বলে, বুড়োও কি কম নাকি? তোমরা জানো না—নিজের হাতে বউকে খুন করেছিল। যাও গোকর্ণে—জেনে এসো। আবাগী মেয়েটার বয়স তখন দুই কী তিন। বাবুবাড়ির কেলেঙ্কারি—তার ওপর জ্ঞাতিরা কেউ জমিদার। পুলিশকে থামিয়ে দিলে। আমি তখনও বিধবা হইনি। সেবারই তো পেথম কান্দির রাজারা হাওয়াগাড়ি আনলে কলকাতা থেকে। আমার ভাসুরপোও দু-চাকার গাড়ি এনেছে—টিপগাড়ি নাম—নাকি সারকেল....'

'শালা সায়েবদের মাথা আছে বটে?'

'হুঁ—সে মাথাও তো হাত করেছে মেয়েটা। অষ্টপহর দেখছি বাবা, কী ঢলাঢলি, গলাগলি। গোরাটা আজ চার-পাঁচবছর এসেছে, যাবার নাম করছে দেখছ?'

'চুপ্। বুড়ো আসছে।'

'আসবে বই কি। লজ্জাঘেন্না আছে? এককান কাটা যায় গাঁয়ের বাইরে—দু'কান কাটা যায় গাঁয়ের ভেতরে। ভেবেছিলাম, লিদুষী যদি হোস, পেঁচার মতো লজ্জায় কোটরে লুকিয়ে থাকবি। মুখ দেখাবি না কাকপক্ষীকে। তা ওরে বাবারে বাবা! যেন কী অক্ষয় পুণ্যি করে এল—একশোআট তীত্থধম্মো সেরে ঘরে ফিরল। ধিক, ধিক, শত ধিক!'

'ও ময়রামাসি, চুপ চুপ!'

তাহলে লোকেরা এইরকম চেয়েছিল! ফিরে এসে চুপচাপ ঘরে বসে থাকবে। সবাইকে মুখ দেখাতে লজ্জা করবে। বাকি দিনগুলো ধর্মে প্রায়শ্চিত্তকর্মে কাটিয়ে দেবে। বাঃ বাঃ! ওরে শালা-শালীরা। তোদের অসুখবিসুখের কথা ভেবে পাঁচটি বছর গারদঘরে ঘুমোতে পারিনি। তোদের প্রত্যেকটা মুখের সঙ্গে কথা বলেছি। ওষুধ দিয়েছি মনে মনে। ভেবেছি—তোদের ঘরে ঘরে বড় অশিক্ষা, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা, মূঢ়তা। তাই ফিরে গিয়ে তোদের ছেলেপুলেদের জন্যে পাঠশালা করব এখানটায়। সবাই বলবি, গোরাং ডাক্তারের পাঠশালা।

...ওরে গুখেকোর ব্যাটারা! তেরশোবছর আগে তোদের পূর্বপুরুষ ছিল দেশের সেরা জায়গা একটা রাজধানীর মানুষ। এই মাত্র পৌনে দুশো বছর আগেও তোদের বাড়ির কাছে নদী পেরোলে সুবে বাংলা বেহার ওড়িশার রাজধানী ছিল মুরশিদাবাদ। লর্ড ক্লাইভ বলেছিল—লন্ডনের চেয়ে সমৃদ্ধিশালী শহর!

...ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো সব! এদের কথা ভাবতে আছে? শূয়োরের বাচ্চারা অন্ধকারে থাকতে থাকতে অন্ধকারের জীব হয়ে গেছে পুরো। শালাদের পায়ের নিচে ইতিহাস—শালারা শ্মশানের পোড়াকাঠের ওপর ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'চুপব ক্যানে বাছা?' ময়রাবুড়ি গলা চড়িয়েই বলে। ....'কার সাতপাঁচ ধারি যে চুপব? মগজ পাকিয়ে ফিরেছে—এবারে কোন বেলা দেখবে, আমিও মরে পড়ে রয়েছি। ঘরের পাশে যার চোরডাকাতের বাসা, তার আবার পেরানের দাম? মারুক না গুলি—বন্দুকধারী সাগরেদের তো অভাব নাই।...এই যে ডাক্তোরবাবু, আসুন, আসুন। বলছিলাম, যে দিনকাল পড়েছে—একা বুড়োমানুষ টিশিন জায়গা, কতরকম বিদিশী ভালমন্দ লোকজন নামছে উঠছে—কখন কে এসে বুকে হস্তা দ্যায় কে বলতে পারে! তা দাদাকে দেখে ভরসা হয়েছে—হ্যাঁ, সেটা পষ্টাপষ্টি বলব বইকি। আপনি এই নিরালা ফাঁকা জায়গায় এসে না বসলে এই কুড়ানির সাধ্যি ছিল বটতলায় এসে দোকান দিই? ওরে বাবা শুনেছি—এল লাইন হবার আগে এটা নাকি ছিল মানসুড়েতলা। রাঢ় থেকে ব্যবসা করে লোকে এখান দিয়েই বাড়ি ফিরত, আর পেরান খোয়াত। ওরে বাছা, বসতে দে দাদাকে।' ময়রাবুড়ি সহাস্যে ফের বলে—'বলুন না দাদা, পেথম এসে ওই বটের কোটরে কতগুলো মড়ার মাথা দেখেছিলেন?'

গোরাংবাবু থরথর করে কাঁপছেন। ফ্যাকাসে বড়োবড়ো চোখ নিষ্পলক। তারপর আচমকা চেঁচিয়ে ওঠেন —'খবর্দার!'

পরক্ষণে ফের গর্জে ওঠেন—'খবর্দার শালাশালীরা।' কণ্ঠস্বর ফেটে ছেৎরে যায়। গাড়োয়ান, সওয়ারি, পুরুষ-স্ত্রীলোক ও শিশুরা যে-যেখানে ছিল থেমে যায় এবং মুখ ঘোরায় এদিকে। ময়রাবুড়ির বেসনমাখানো হাতে ঘটিটা ধরা থাকে নিশ্চল। কালো গরম তেলের কড়াইও স্থির হয়ে যায়—বুদ্বুদবিহীন।

গোরাংবাবু প্রচণ্ড আওয়াজ করে হাঁফাতে হাঁফাতে বলেন—'আমি ডাকাত নই। আমি বদমাস নই। খবর্দার কেউ আমাকে ডাকাত বলবিনে! সব শালার মুণ্ডু কড়মড় করে চিবিয়ে খাবো। কোন শালাকে ছেড়ে দেব না। বল্, আরেকবার বল্ আমি ডাকাত। বল শালারা, আমার মেয়েটা গোরা মাস্টারের সঙ্গে নষ্ট হয়েছে। বল্, দেখি শালাদের কত মুখের জোর! আমি ডাকাত? আমার মেয়ে নষ্টা? আমি বউকে খুন করেছিলাম? খবর্দার!'

তখন আকাশ গনগনে নীল। দক্ষিণে একজায়গায় মেঘের একটা সরপড়া ভাব আছে মাত্র। দশটার ডাউন আসতে দেরি আছে। বাঁজা ডাঙায় সেকেলে কাছারি বাড়ির ভাঙা পোড়া দেয়ালের ওপর একটা ট্যাসকানো পাখি এসে বসল, কিন্তু ডাকল না। একটা নেড়ি কুত্তা যেতে যেতে থেমে লেজ নাড়তে লাগল। দূরের জঙ্গল থেকে হোসেন কাঠুরে

ট্যাঙি কাঁধে আসছিল, গামছায় কয়েকটুকরো কাঠ পিঠের দিকে ঝোলানো, কয়েতবেলতলার কাঁকুরে খোলা মাটিতে এসে দাঁড়িয়ে রইল। সেরাজুল হাজির বড় ছেলে ওসমান লুঙি-পাঞ্জাবি পরে হাতে পাম্পসুজোড়া নিয়ে আস্তে আস্তে ডাবকই-এর দিক থেকে এগিয়ে আসছিল—রেললাইন পেরিয়ে বটতলায় এল, দাঁড়াল না। জড়ভরতের মতন সবার দিকে তাকাতে তাকাতে গাঁয়ের দিকে চলল। সে নির্ঘাৎ মেয়ের বাড়ি চলেছে। মেয়েটাকে নাকি তালাক দেবে। সেই ভাবনায় সে অস্থির।

গোরাংবাবু পাগলা ঘোড়ার মতন সমানে লাফাচ্ছেন। আর যা খুশি বলে যাচ্ছেন। কখনও তেড়ে যাচ্ছেন মুড়ি তেলেভাজা খাওয়া লোকগুলোর দিকে, কখনও গাড়িগুলোর দিকে ঘুরে মুঠো তুলছেন। গাড়োয়ানদের একজন ফের মুড়ি চিবোনো শুরু করে। এই লোকগুলোও তেলেভাজায় কামড় দেয়। যেন তারা—বটতলায় সমাগত মানুষরা কেউই গোরাংবাবুর অকথ্যভাষণের লক্ষ্যস্থল নয়। যেন ওঁকে সায় দেবার ভঙ্গিতেই ওরা ভোজনরত থাকে। যেন বলতে চায়—ঠিক, ঠিক।

গোরাংবাবুর ঠোঁটের দুপাশে ফেনা জমেছে। চোখের ঘোলাটে ভাব কেটে লালচে রক্তের ছিটে ফুটেছে।

কেবল সোলেমান নামে বুড়ো গাড়োয়ানটা চাপা গলায় এতক্ষণে বলল, 'লোকটাকে কেউ ধরো—সামলাও! তৌবা, তৌবা! মানুষের ই কী ছাস্তি গো!'

কেউ ধরতে আসে না। আর গোরাংবাবু এবার মাটিতে ঢিল খোঁজেন—'মারব! মারব! সব শালাকে ফাটাব আমি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিঃক্ষত্রিয় করে ফেলব!'

স্বর্ণ ভোরে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছিল গোবরহাটি। হেরুর ছেলের খবর জানতে। ইচ্ছে মতো সাঁতার কেটে ছেলেটার সর্দিজ্বর মতো হয়েছিল। লেডি ডাক্তার চিকিৎসা করে এল মতিবায়েনের অনাথ ভাগ্নেটার। কিন্তু বেশিদিন ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়া কি যাবে?

তার ঘোড়া আঁরোয়া গ্রামের শেষ বাড়িটির পর কিছু পথ এসে বাঁক ঘুরেই থমকে দাঁড়ায়। ঘোড়া দাঁড়ায় না—স্বর্ণলতাই লাগাম টানে। চৈতক হ্রেষাধ্বনি করে। তারপর একলাফে নেমে আসে স্বর্ণ। ঘোড়াটা চলে যায় ডাক্তারখানার দিকে। সে বাইরের বারান্দার ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে।

স্বর্ণ গোরাংবাবুকে ধরে ফেলতেই উনি পড়ে যান মাটিতে। অজ্ঞান হয়ে গেছেন। স্বর্ণ অতবড়ো ভারী শরীরটা তুলতে পারে না। বিব্রতমুখে একবার স্টেশনে দিকে তাকায়। এখানে লোকগুলো দ্বিধায় পড়ে গেছে। সাহায্য করা উচিত কি না ভেবে ঠিক করতে পারে না। বাবু যাত্রীদের জনাচার ব্যক্তি কয়েক মিনিট ধুতি সামলে এগিয়ে আসেন। স্বর্ণ তাঁদের দিকে তাকিয়ে বলে—'থাক্।'

ময়রাবুড়ি মিনমিনে গলায় টাট থেকে বলে—'জল দেব? মুখে মাথায় দেবে।'

স্বর্ণ বলে—'থাক।'

কিন্তু যাত্রী ভদ্রলোকেরা শুনবেন কেন? একরকম জোর করে ধরাধরি করে ঘরে পৌঁছে দেন।

পনের

নকীবদ্বয় এবং বিঘোষণা

এক সকালে হঠাৎ লোকেরা শোনে গুড় গুড় গুড় গুড় ডিম ডিমা ডিম ডিম ঢ্যাড়ারার রব। এই রবটি খুব চেনা। রাঙামাটির ঘগা বায়েন ছাড়া আবার কে? একমাইল ধুলোউড়ির মাঠ পেরিয়ে মধুপুরের সামনে লাইন ডিঙিয়ে জোড়া বেলতলায় মুড়ি খেয়েছে। পুকুরের সুন্দর স্বচ্ছ কাজল জল পান করেছে। কানের আধপোড়া বিড়িটি হাতে নিয়ে হাপিত্যেশ করেছে চন্না বাগদির—অর্থাৎ চরণ চৌকিদারের। হুঁ, টিশিনে চাঁদঘড়ির কাছে বাঁশি চুষে (গাঁজা খেয়ে) এতক্ষণে ওই সে আসে লাইনের ধারে ধারে, নীল কুর্তি কাঁধে লাঠি, ঝিমধরা সাপের গতি! তার কুর্তির পকেটে ছোট্ট চকমকি আছে।

এসে পরস্পর দেরির জন্য দোষারোপ করে যথারীতি ভাবও হয়েছে। বিড়ি খাওয়া হয়েছে। উপায় নেই—দুই হাভেতের মাথার ওপর তো মুনিব একজনাই। তবে কী, চরণ ঘোষক—তার মর্যাদা ঢুলির চেয়ে বেশি। এবং তারই কথামতো প্রথমে ঢুকতে হয়েছে মধুপুর।

সেকালের গ্রামে এই এক চিরাচরিত উত্তেজনা। যেন 'রাসনীলে!' তুখোড় ঘগা বলে। 'যেন কী হল—না, চিকিষ্ণোর বংশীধ্বনি শুনে যে যেখানে ছিল, সম্মাই (সব্বাই) পড়ি-কী-মরি করে হাজির হল। কারো হাতে গোবর, কেউ ছেলেকে তোন (স্তন) দিচ্ছিল—সে ঢাকবারও সময় পেল না। কী? না—ওই বুঝি বাঁশি বাজে....' এই শেষ বাক্যটি গানের কলি এবং ঘগার গলাটি খাসা।

গুড় গুড় গুড় গুড় ডিম ডিমা ডিম ডিম! গাঁয়ের মুখে রব উঠল। ঘাট থেকে স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে উঠে দাঁড়াল বউঝিরা। পিছনের দেওয়ালে গোবর চাপড়ি দিতে দিতে চমকে এবং থমকে কান পাতল বিষয়িনী বাঁজা এক বুড়ি। ঠশা (কালা) মোড়ল আর্তনাদ করে উঠল দাওয়ায়—'কীসের লুটিশ? কীসের লুটিশ?' পিলপিল করে বেরিয়ে এল কাচ্চাবাচ্চারা। মুনিশ মাহিন্দার দাঁত বের করে অকারণ হাসতে লাগল। গেরস্থরা রুদ্ধশ্বাসে তাকাল। ঘগা বায়েন দ্বিগুণ জোরে বাজাল গুড় গুড় গুড় গুড় ডিম ডিমা ডিম ডিম!

তখন তৈরি হয়েছে চরণ চৌকিদার। মাথায় নীল পাগড়িটি বেঁধে কাঁধে লম্বা লাঠিটি ফেলে ঢোল থামবার অপেক্ষা করছে। অধৈর্য হয়ে সে ধমকাল—'বাস বাস!' এবং চিরাচরিত মুখস্থ ও তালিমপ্রাপ্ত ঘোষণাটি সগর্জনে (গাঁজা খেয়ে গলার নিকুচি করে ফেলেছে) আওড়াল :

'এই বাবুভদ্র ছোট বড় হেঁদুমোছলমান তাবৎ পোজা (প্রজা) সাধারণকে কহা যায় কী, আঙামাটির মা গঙ্গার মজা সোঁতার এক রংশে বাহান্ন বিঘা জলা জমা সৈদাবাদ জমিদারির ক্ষুদে (ছোট) তরফ বাবদ লীলামী সম্পত্তি মুশ্বিদাবাদ কালেকটোর বাহাদুর বরাবর স্বত্ব দখল ছিল—অদ্য হইতে ফাদার শমন (সাইমন) বাহাদুর বরাবর জিম্মাদারী মুতাবেক কেউ বিনিহুকুমে মচ্ছ (মৎস) ধরা কিংবা কোনপোকার (প্রকার) ভোগ দখল করতে পারবা না, শমন সায়েবের কাছারি থেকে হুকুম লিবা-আ-আ-আ-আ!'

তিনদিন ধরে তালিম নিয়েছে চরণ। বরাবর এ-কাজ তাকে করতে হয়। তাই সে পারে। যন্ত্রের মতন পারে।

আবার ঢোল বেজে উঠল। সব গাঁয়ের মাঝবরাবর একটি সদর রাস্তা থাকবেই—এটা প্রাকৃতিক নিয়মের মতন অনিবার্য। এবং শেষপ্রান্তে পৌঁছতে চরণকে আরও দু'বার এই দীর্ঘ জটিল ও অস্পষ্ট বাক্যটি উচ্চারণ করতে হল। কিন্তু এ তো স্বপ্নের মধ্যে উচ্চারণ তার। নিজের পোশাকের রঙের মতন একটি নীল রহস্যময় জগতে সে ভাসমান। পিছনে তার পালেপালে ন্যাংটো-আধন্যাংটো মনুবংশ—ওটাই টের পায় সে এবং বাস্তবতা অনুভব করে।

ফেরার পথে গাঁয়ের মধ্যিখানে বিশাল বটতলায় চণ্ডীমণ্ডপে একবার দাঁড়িয়ে জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করল। আশেপাশে কতিপয় বর্ণহিন্দুর বাস। সেকালে চৌকিদারের সম্মান ও প্রযত্ন অধুনা ভাবা যায় না। বিরিঞ্চিবাবু নামে একজন ঘটি থেকে তার মুখে জল ঢেলে দিলেন। কিন্তু চরণ যে বাগদি, সেটা স্মরণ করিয়ে দিতেও ভুললেন না....'এ্যাই শালা বাগদী! জল তো খেলি—জমাদারবাবুকে বলিস, বিরিঞ্চিবাবুর খবর ভালো। কেমন?' চরণ জানে ওটা গূঢ় সংকেতবাক্য। ওইসব কোড ডিসাইফর করার ক্ষমতা তার আছে। চৌকির জমাদারবাবুকে বলবে, হ্যাঁ—মধুপুরের বিরিঞ্চিবাবু 'খবর' ভালো।

মধুপুর থেকে উত্তরমুখী হাঁটল নকীবদ্বয়। উঁচু-উঁচু খসখসে শুকনো ঘাসের আল, কেয়াঝোপ কোঙাঝোড়, ফণিমনসা, মাদার, শ্যাওড়াগাছ, দু'ধারে ছোটবড়ো পুকুর, উষর ক্ষেত পেরিয়ে আচমকা সামনে স্নিগ্ধ শ্যামলতা গোবিন্দপুর। পোস্টোঅপিস। লালবরণ ঢোল ঝুলছে দেয়ালে। ক'পা এগিয়ে বাঁশবাদাড় পেরোলে ছোট্ট নদী বাঁকি—শুকনো সোনালি বালি।

চরণরা ওদিকে যাবে না। গুড় গুড় গুড় গুড় ডিমা ডিমা ডিম ডিমা চলেছে পিছনে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে। যারা শোনেনি, ঘোষণাটা, তারা বলে, 'কীসের ঢেঁড়ি হে চরণদা?' চরণ পিছনে দেখায়—শুনে নাও গে পোস্টমাস্টারবাবুর মুখে। সে হাঁটে গর্বিত ভঙ্গিতে। গোবিন্দপুর থেকে পূর্বমুখী তার যাত্রা। শ্যামলিমার দুর্গ পেরোলে হঠাৎ উজ্জ্বল সূর্যের আলো বাজখাঁই চিৎকার হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘগা ধুকুর ধুকুর প্রায় দৌড়োয়। বলে—'পা চালিয়ে, পা চালিয়ে!' চরণ বলে, 'ক্যানে?'

ঘগা জবাব দেয় না, চরণও প্রশ্ন করে না আর। ধুলোর রঙ লাল হতে থাকে রেললাইন পেরোতেই। উঁচুতে উঠে চলে পথ। কী লাল, কী লাল। হ্যাঁ, এবার খাস রাজা শশাঙ্কের রাজধানীতে পা। ধুলোর লাল রঙ গাঢ়তর হতে থাকে। বড় বড় বাঁজা ডাঙা, স্তূপ, খোলামকুচি, ফণীমনসা, একলা অশত্থ শ্রীভ্রষ্ট ও উদাসীন, কিছু জরাজীর্ণ কুঁড়েঘর, কী দারিদ্র্য চারিদিকে হু-হু ঘূর্ণি চলে যায় গায়ের ওপর দিয়ে—'বছরের গতিক ভালো লয় হে' ঘগা বলে, এবং যদুপুর ঢুকতে ঢুকতে ঢোল বাজায় ডিম ডিমা ডিম ডিমা। অন্যরব, অন্য ছাঁদ। তাক গুড় গুড় গুড়তাক, গুড়তাক চাকুম চাকুম! চরণ খেঁকায়, 'আরে হল টা কি? তোমার মায়ের বিহা নাকি হে?' ঘগার চোখে ঝিলিক। দু'পাশে বায়েন

পাড়া। বংশীবায়েনের নামডাক কাছে তল্লাটে—সেই ঈর্ষা! বংশী বহরমপুরে বায়না পায় পুজোর। তবে কী, এখন ঘগা রাজঘোষক—তার সঙ্গে নীল উর্দিপরা রাজপ্রতিনিধি। সে হাতের চরম খেল দেখায়—গুড়তাক গুড়তাক....নাক ঢাক চোখ ঢাক, ডিম ডিমা....দেখবি কি দেখবি না....অগত্যা চরণ বলে, 'বহুৎ আচ্ছা!'

উঁচু পৈঠা থেকে হুঁকো হাতে বংশীবদনও বলে—'ভাল, ভাল!' অমনি ট্যাঁড়রার সনাতন বোল ধরে ঘগা বায়েন। চরণ চেঁচায় যথারীতি—'বাস্ বাস্! এই বাবুভদ্র ছোটবড় হেঁদুমোছলমান তাবৎ পোজা সাধারণকে কহা যায় কী....'

রাঙা—লাল মাটির দেয়াল, দেয়ালে সাদা রেখার পদ্মফুল পাখি লক্ষ্মীমায়ের চরণ। গরিবগুবরো ছোটনাকের বউঝির কাঁধবরাবর নজর হয়। তারা নাকমুখ কুঁচকে বলে—'মরণ! কী বুলে, বুঝাও যায় না!

'মজা সোতার ঝিলে, বুঝলি? আর কেউ যেতে পাবে না।' চরণ সহাস্যে বলে।

'ক্যানে, ক্যানে?'

'পাদরিবাবার হুকুম। তেনার সম্পত্তি এখন।'

'পাদরি না বেলেস্টোরের (ব্যারিস্টার) হাকিম!'

'বললে কী হবে মা-ভগ্নীরা, আমরা কিনা বিটিশের পোজা বটি।'

ঠোঁটকাটাগোছের মুখরা কোনও যুবতী বলে—'তাইলে তুমার মেয়ে বিন্নিও যেতে পাবে না?'

চরণ এতক্ষণে বাস্তবতা টের পেয়ে অন্যমনস্ক বলে—'হুকুম লিলে যেতে পাবে বইকি?'

'তুমি তো চৌকিদার। তুমার হুকুম হয়েই আছে। আমাদের বেলা?'

হাত তুলে আশ্বস্ত করে চৌকিদার—'হবে, হবে।'

'হ্যাঁ—তুমার ভাইপো-ভাগ্নের মতন জাত দিলেই হবে!'

চরণ লাঠি ঠুকে রেগে কিছু বলতে গিয়ে হা হা হা হা হেসে ফেলে। তারপর বলে, 'চলো চলো হে ঘগা। বেলা বেড়ে গেল! এখনও তিনটে গাঁ বাকি!'

গুড়গুড় ডিম ডিমা গিয়ে থমকে দাঁড়ায় গাঁয়ের শেষে—আচমকা নিচে দেড়শো ফুট খাত, পাড়ে রক্তবর্ণ মাটি, মজা ভাগীরথী। অতএব ডাইনে দক্ষিণে পা এগোয়। ঝিলের ধারে-ধারে চলে রাঙামাটির দিকে। চৌকিদারের নিজের গ্রাম। ওখানে সবাই জেনে গেছে আগাম—তত পেয়োজন নাই—তাহলেও নিয়মভঙ্গ করা চলবে না। বাঁয়ে পূর্বে ঝিলের দুর্গম বিস্তার—দূর দিগন্তে বর্তমান গঙ্গার ধুধু চড়া, সবে বিহারি সবজিওয়ালারা (চাঁই সম্প্রদায়) বসত শুরু করেছে ওখানটায়। ওপারে মহুলা, গভীর দহের ধারে। বিস্তৃত বাবলাবন, ঝিলের জল, পাখিরা কী যেন মনে পড়ে যায়, অবচেতনায় গাঁথা জন্মান্তরের ঘটনাসূত্রে এবং কিছু অস্পষ্ট ভাব, তেরশোবছর আগে এখানে দাঁড়িয়ে কি চরণ চৌকিদার ও ঘগা বায়েন দেখেছিল মহাবণিক শ্রীবুদ্ধগুপ্তের বাণিজ্যপোত পাল উড়িয়ে দিয়েছে, শঙ্খধ্বনি হচ্ছে চতুর্দিকে, প্রাসাদ অলিন্দে ভিজেচোখে চেয়ে আছে বধূ ও কন্যারা?

গুড় গুড় গুড় ডিম ডিমা ডিমা...আওয়াজ বাড়ে দ্বিগুণতর। অদূরে টিলার চার্চঘরের বারান্দায় বসে পাদরি সাইমন শুনছে বুঝি! বখশিসের লোভে দুই প্রতিনিধি আবেগ অবলম্বন করে। ডিম ডিম ডিমা ডিমা ডিমা! এই বাবুভদ্র ছোট বড় হেঁদুমোছলমান তাবৎ পোজাসাধারণকে কহা যায় কী আঙামাটি মা গঙ্গার মজা সোঁতায়....

উরে ব্বাস! হাতি! হাতি এসেছে! কখন এল, কার হাতি? শমনসাহেবের কাছারির সামনে ভিড়। অশ্বারোহীরা রয়েছে। সেপাইলস্করই রয়েছে। টাট্টুর পিঠে নির্ঘাৎ আফতাব দারোগা! চরণ চোখ কচলায়। কালেকটর সাহেব আসবার কথা ছিল বটে। তো আগাম, এমন বিনিলুটিশে! গ্রাম পেরিয়ে চলে দুই নকীব। কেউ ওদের প্রশ্ন করে না। সবাই জানে চাঁদপাড়া পেরিয়ে যেতে যেতে দূর পশ্চিমে বারোটার হাওড়া ডাউন সবুজ রেখার মতো আঁরোয়া জঙ্গলের গায়ে মিলিয়ে যায়, কেবল শূন্যে ভেসে চলে থকথকে কালো ধুঁয়ো মেঘের মতন—কতক্ষণ। গুম গুম গুম গুম ডিমা ডিমা.... বায়েনের হাত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বাঁজাডাঙার ওপর তালবন। অনেক শুকনো বাগড়া পড়ে রয়েছে। আড়চোখে দেখে যায় দুজনেই। মেয়েগুলোকে পাঠাতে হবে। কিছু স্নিগ্ধ মাটি, গঙ্গার পাড়, শ্মশান, বটতলা, ইয়াকুব সাধুর ভিটে, কোদলার ঘাট, ডাবকই, চিরোটি—চারটি ক্লান্ত পা পড়ে ধুপ ধুপ। ঢোলের বোল থেকে নির্জনতা ঝরে-ঝরে পড়ে। চাষাভুষো হিন্দু মুসলমান উঁকি মারে, উত্তেজনা পূর্ববৎ—কিন্তু চরণের কণ্ঠস্বর অসহায় এখন। দুপুরবেলায় নির্জন হয়ে ওঠা গ্রাম কিছু উত্তেজনার পর ফের শান্ত ও নির্জন হয়। চিল ডাকে। নিমফুলের গন্ধ ভাসে। শোকবিলাসিনী কোনও মেয়ে সুর ধরে কাঁদে একটানা—দুপুরের ঐকতানে এক অবিচ্ছেদ্য অংশের মতন, এবং মসজিদ থেকে জুহা মৌলবী বেরিয়ে কান করে ঘোষণা শোনেন, তারপর নিঃশব্দে প্রস্থান করেন, দুই নকীব পশ্চিমমুখী হয় আবার, রেল লাইন ডিঙিয়ে উত্তরমুখী হয়ে আঁরোয়া বটতলায় স্টেশনের এপারে ময়রাবুড়ির দোকানে পৌঁছায়। ঢোল বেজে ওঠে। চৌকিদার হাঁকে—'এই বাবুভদ্র ছোট বড় হেঁদুমোছলমান পোজাসাধারণকে কহা যায় কী...'

গোরাংডাক্তারের ডাক্তারখানার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। খুলে যায়। লেডি ডাক্তারকে দেখা যায় একবার। ফের দরজা বন্ধ হয়। চরণ ঘগাকে বলে, 'মুড়ি খেয়ে জিরোও, আমি আসি।'

'কতি?' ঘগা শুধোয়।

'বঁধুর কাছ হতে আসি।' বলে চলে যায়।

ঘগা জানে, চাঁদঘড়ি ওর বন্ধু—ফের শালা গাঁজা টানতে গেল। যাক। এবার ঘগার ছুটি। শমনসায়েবের কাছারিতে যাবে। মজুরি নেবে। কিন্তু কালেকটর সায়েব এসেছে—পাদরিবাবার নাগাল পাওয়া যাবে না হয়তো। ঘগা ঘাবড়ে যায়। পরে ভাবে, চন্না শালা তো আছে!

ওখানে ঘরের ভিতর শুয়ে গোরাংডাক্তার পুরনো পত্রিকা পড়ছিলেন। স্বর্ণকে শুধোন—'কিসের ঢেঁড়ি পেটাচ্ছে?' এবং তক্ষুনি উঠে বসেন।

স্বর্ণ বলে, 'ও কিছু না। তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো তো!'

গোরাংবাবু একটু হাসেন—'তুমি না বললে কী হবে, আমি শুনে ফেলেছি। শালা পাদরি এবার মরবে। হঁউ—আর কটা দিন। দ্যাখ না কী হচ্ছে! ওরা এল বলে। আর দেরি নেই।'

গোরাংবাবুর কথাবার্তা ইদানীং কেমন অস্বাভাবিক লাগে। চুপচাপ ঘরে শুয়ে থাকেন বেশিরভাগ সময়, কদাচিৎ বেরোন। লাইনের ধারে গিয়ে বসে থাকেন। আপন মনে বিড় বিড় করে কী সব বলেন। মাঝে মাঝে কাকে শাসান—'থাম্ থাম্। এল বলে—আর দেরি নেই!' কে আসবে? স্বর্ণ বুঝতে পারে না। নার্ভ শান্ত করার ওষুধ খাইয়ে দেয়।

স্বর্ণ মেঝেয় গিয়ে শোয়। এখন তার ঘুমের সময়। গোরাংবাবু ফের পত্রিকা পড়ছেন। কতক্ষণ পরে ঘগা বায়েনের ঢোলের শব্দ হয় ফের। শব্দটা লাইন পেরিয়ে স্টেশনে চলে যায়। ফের ধুড়মুড় করে উঠে বসেন গোরাংবাবু। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন স্বর্ণের দিকে। স্বর্ণ ঘুমোচ্ছে—হয়তো চোখ বুজে রয়েছে এবং স্বর্ণের শরীরেই কি তিনি ওই ঢোলের শব্দগুলো মুদ্রিত দেখেন? তাঁর দৃষ্টি সন্দেহাকুল।

ঢোলের শব্দ মিলিয়ে যেতে রেলগাড়ির শব্দ আসে। দীর্ঘ কয়েকটা মিনিট একটা মালগাড়ি গড়িয়ে যেতে থাকে। তখন হতাশভাবে গোরাংবাবু শুয়ে পড়েন।

ওখানে স্টেশনের বারান্দায় ঘগা বায়েন চরণের প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হতে হতে শুয়ে পড়েছে। একটু তন্দ্রাও আসে তার। সে স্বপ্ন দেখে। পাদরিবাবা তাকে মজুরি দিচ্ছেন না। বলছেন—'নেহি দেগা! চলা যাও!'...ও পাদরিবাবা, তোমার এই বিচার? ঠোঁট কাঁপে বুড়ো বায়েনের—ঘুমের ঘোরে সে প্রচণ্ড দুঃখে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে ডাকে, চন্না চন্না হে! ই কী কথা!....

ষোলো

শূন্যের রাগিণী

বৃষ্টির দিন। বিকেলের দিকে আকাশ কিছু ফরসা হয়েছে। রেললাইনের ধারে নয়ানঝুলিতে জল জমেছে। চটান জায়গাটায় চৌহদ্দি নির্দেশকারী তারের বেড়া—খুঁটিগুলো ইংরিজি 'এ' হরফের গড়ন, মরচে যথেষ্ট ধরেছে, সারাদিনের বৃষ্টির জলে নিচেটা ডুবে রয়েছে সেগুলোর, এবং খুঁটিগুলোর ওপর কোথাও শালিক ফিঙে আর বক বসে রয়েছে। চাঁদঘড়ির রোগা ছেলেটা সেই জলে দৌড়াদৌড়ি করে পাখিগুলোকে বড্ড জ্বালাচ্ছে। জানলা দিয়ে গোরাংবাবু দেখছেন আর অকথ্য খিস্তিতে গাল দিচ্ছেন ছোঁড়াটাকে। তাই শুনে চাঁদঘড়ির বউ এসে শাসিয়ে গেল—'ছি ছি! ই কী বাত ভদ্দরলোকের মুখে! জেল মে এইগুলা শিখাইছে আপনাকে? ও দিদি, আপনি বলুন!'

জলে ভিজে ছপছপে ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে মিনিট তিনেক অনুযোগ করে বউটি চলে গেছে। স্বর্ণলতা আকাশ দেখতেই ব্যস্ত, চাপা গলায় বলেছে—'দেখেছি। তুমি যাও। ঘাঁটালে আরও বলবে।'

গোরাংবাবুর কান থেকে তা এড়িয়ে যায়নি। আজকাল কিছু এড়ায় না ওঁর। অমনি বলেছেন, 'বলবে না ছেড়ে দেবে? রেলকোম্পানির চাকর বলে তার ব্যাটা যা খুশি করবে! পাখিগুলো দিনমান চরতে পায়নি, খিদেয় ধকাচ্ছে। এখন খাবার ধান্দায় বেরিয়েছে তো হারামজাদা গুয়োটা ওদের পেছনে লেগেছে।'

স্বর্ণ টের পেয়ে গেছে, বুড়ো ডাক্তার হয়তো পাগল হয়ে যাচ্ছেন। প্রথম প্রথম সে ধমক দিত, এখন আর দ্যায় না। রাগ করে পালিয়ে ডাউন সিগনালের কাছে বসে থাকবেন। খুঁজে সাধাসাধি করে আনা সে এক প্রকাণ্ড হাঙ্গামা। অবশ্য তার মনে পড়ে যায়, নিজে একসময়ে বাবার উপর রাগ হলে সেও ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে বেলতলায় গিয়ে দাঁড়াত। এখন সে রাগ করে না। বাবা যখন থেকে জেলে, তখন থেকেই সে এ ধরনের রাগ হারিয়েছে। এখন বাবা ফিরেছেন। কিন্তু এ তো অন্য মানুষ।

বাবা যদি সত্যি পুরো পাগল হয়ে যান! এখন শুধু এই অস্বস্তি দিনরাত্রি। পাগলদের শেকলে বেঁধে রাখা সে দেখেছে। আর, রেললাইনের পাশে বাস—কখন হয়তো গিয়ে পড়বেন এঞ্জিনের সামনে, কী বীভৎস কাণ্ড না ঘটে যাবে!

অবশ্য জর্জ বলেছে, পাগলরা কখনও এ্যাকসিডেন্ট করে না।

জর্জ এখনও বাঘটা মারতে পারেনি। এদিকে বাঘটারও আর সাড়া শব্দ নেই কদিন থেকে। তাকে শেষবার দেখা গেছে দিন-দুপুরে ডাবকইয়ের কাছে গভীর নয়ানজুলির ধারে ব্রিজটার তলায়। বৃষ্টি এসেছিল, তাই একদল রাখাল দৌড়ে এসে শুকনো ব্রিজের তলায় আশ্রয় নেয় এবং বাঘটাকে দিব্যি বসে থাকতে দেখে। আশ্চর্য, বাঘটা তক্ষুনি জায়গা ছেড়ে চলে যায় পশ্চিমের ছোট মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে। রাখালরা অবাক হয়েছে। মোটামোটা ফোঁটা পড়ছিল। বাজ ডাকছিল! তার মধ্যে রোদ্দুরও ছিল খানিকটা।

এইরকম বৃষ্টি হলে ওরা সুর ধরে বলে—

রোদের মধ্যে পানি ঝরে
খ্যাঁকশেয়ালরা বিহা করে।

....তখন খেকশিয়ালদের বিয়ের লগ্ন। বাঘটা আস্তে আস্তে এগোল। আলগুলো বেশ উঁচু। পেরোবার সময় ওকে একটুও গতর ঘামাতে হল, মনে হয়নি তাদের। রাখালরা সায়েবকে বলেছে, 'ও সায়েব, হেঁদুদের ঠাকুর দেখেছ—বাঘের ওপর বসে থাকে? এ বাঘ সেই বাঘ।'

জুহা মৌলবীর কানে গেলে ছোঁড়াগুলোকে সাত হাত নাক ঘষটাতে হত। বন্য প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরারোপ হিন্দুত্বের লক্ষণ না? এই শয়তানগুলোর রক্তে এখনও আদিম হিন্দুর প্রেত বিরাজ করছে। তা না হলে এলাকার মুসলমানেরাও অস্পষ্টভাবে বিশ্বাস করে, এই বাঘটা আসলে একজন ঠাকুর—অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতীক! কোনও এক নির্জন দুপুরে নাকি গুটিকয় মুসলিম বউঝি জঙ্গলের মধ্যে যে জটাবাবার সুপ্রাচীন থান রয়েছে, সেখানে বাঘটার উদ্দেশে মানত দিয়ে এসেছে। কারণ তাদের ছেলেমেয়েরা গরুছাগল চরাতে যায় 'বাবার' এলাকায়। জুহা মৌলবী বলেছেন, তাঁর প্রথম জেহাদ এইসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তাবৎ জড় ও মনুষ্যেতর প্রাণীতে ঈশ্বরত্ব আরোপ একান্তভাবে হিন্দুয়ানী। অপিচ, এতদ্দেশীয় মোছলেম ভ্রাতৃবর্গ এবং তাঁদের অগোচরে কারো-কারো পুত্রকন্যাবধূমাতা ঔরৎকুল অনুরূপ বিশ্বাসে উদ্ভট কাজকর্ম করে থাকেন। তবে এসবের জন্যে মোছলেমকুল কলঙ্ক হারামজাদা ইয়াকুব সাধুরাই দায়ী। ইয়াকুব পালিয়েছে, কিন্তু তার জটিবুটি-শেকড়-বাকড়ের প্রভাব আস্ত রেখে গেছে।

অবশ্য এসব হচ্ছে তন্ত্র বিশ্বাসের ধারাবাহিক সংক্রমণ। হবে না? জুহা মৌলবীর ভাষ্য : এই কর্ণসুবর্ণ ছিল বৌদ্ধদের মস্ত ঘাঁটি। হীনযান সম্প্রদায় ছিল, তেমনি ছিল মহাযানীরা। এদেরই লোকায়ত রূপ সিদ্ধাই তান্ত্রিকতা। ডাকিনী যোগিনী প্রেত ইত্যাদি ভাবকল্পগুলোর মধ্যে এদের ছিল বাস। এলাকার গ্রামে গ্রামে এদের সংগুপ্ত ঐতিহ্য তুমি লক্ষ্য করবে। গোকর্ণের পাশের গ্রাম বিজয়নগর—অধিবাসীরা মুসলিম। অথচ ওরা সবাই গুণিন ও তান্ত্রিক। কালীপুজোর অমাবস্যার রাত্রে ওরা নিশিপালন করে, তন্ত্রসাধনার গুহ্য আচার পালন করে। দ্রাবিড় সংস্কারের সঙ্গে আর্য সংস্কার, তার সঙ্গে মঙ্গোলীয় সংস্কার, তারপরে জুটল সেমিটিক মুসলিম সংস্কার। নাও বোঝো ঠ্যালা। সংস্কারের সে এক হযবরল—এই জটিল জাল ছিঁড়ে আদমপুত্রদের মুক্তিদানই জুহা সাহেবের ঐকান্তিক ব্রত। বস্তুত ফরাজি আন্দোলনের পটভূমিকায় বাহ্যরূপ বৃটিশবিরোধিতা, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় মুসলিমদের আত্মাকে শোধন করা—হিন্দুত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত করা। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই গোরাং ডাক্তার একদা তাঁকে বলেছিলেন, 'ওহে মৌলুবী, উপনিষদের তত্ত্ব তোমার ওই ভোঁতা মাথায় ঢুকবে না—পাদরি সাইমনেরও ঢুকবে না। তোমরা সেমিতি। তোমাদের ধর্মের পূর্বপুরুষ আব্রাহাম বুঝতেন। তিনি ছিলেন আসলে প্রকৃতির উপাসক। নেচার ছিল তাঁর ঈশ্বর। তাঁর সঙ্গে আমাদের ঋষিদের চিন্তার মিল আছে আগাগোড়া। জড়ে-অজড়ে সর্বময় ব্রহ্মের অস্তিত্ব তোমাদের সুফিরাও বিশ্বাস করতেন। মৌলবীভায়া,

তোমার দৃষ্টি স্থূল—তোমার মগজে মোটা বুদ্ধি। এই কাঠের টুকরোর মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। শুধু দেখতে শিখতে হয়। আর ভাই জুহাসায়েব, তুমি নাকি তাঁর কবিতায় ইসলামি বিশ্বাস খুঁজে পাও। হ্যাঁ রবিঠাকুর ব্রাহ্ম, মূর্তিপুজোর বিরোধী ব্রাহ্মরা। তাই তোমরা মনে মনে বড্ড খুশি ওঁর প্রতি। কিন্তু আসলে তিনিও এই কাঠির মধ্যে ঈশ্বরের লীলা দেখেন। আব্রাহাম বা এব্রাহিম থেকে সোজা লাইন টেনে দাও, রবিঠাকুরে এসে পৌঁছবে। তুমি শালা একটা গাড়োল হে!'

তাই শুনে সেবার জুহা মৌলবীর এত রাগ হয়েছিল যে বেশ কিছুদিন ও মুখো হননি। কতবার এমন হয়েছে। তবে লোকটা মানুষ হিসেবে ভালো। বন্ধুতা ইত্যাদি কিছু মানসিক শ্রেষ্ঠ গুণাবলীতে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে। জেল থেকে গোরাংবাবু ফিরে এলে অন্তত একবার করে আসেন। গতিক বুঝে গেছেন—তাই তর্কের ধারকাছ ঘেঁষেন না। দশপনেরো মিনিট বসে কুশল প্রশ্ন করেই কেটে পড়েন। গোরাংবাবু কিন্তু অনর্গল কথা বলেন। অসংলগ্ন উদ্ভট সব কথা। তিনি মৌলবীকে দেখে খুবই খুশি হন সত্যি, কিন্তু চলে গেলে একনাগাড়ে অকথ্য গালাগালি দেন। এবং যাবার সময় মৌলবী আড়ালে স্বর্ণকে বলে যান, 'তিনপাহাড়ি বলে একটা জায়গা আাছে বিহারে—পূর্ণিয়া জেলায়। ওখানে উন্মাদরোগের হাসপাতাল করেছে মিশনারীরা। চেষ্টা করে দেখতে পারো মা।'

কী মারাত্মক পরামর্শ! সুধাময় তিনপাহাড়ি স্টেশনে রয়েছে। সে এখন স্টেশন মাস্টার। স্বর্ণ যাবে? সুধাময় তার সুখ, নাকি তার দুঃখ, এ মীমাংসা আজও হয়নি। এই ঠোঁটে তার ঠোঁটের ধর্ষণের স্মৃতি রয়েছে। মাঝে মাঝে আয়নায় নিজের ঠোঁটদুটো দেখে স্বর্ণ। বিচলিত হয়। কেন অমন হয়েছিল—কেন?

তিনপাহাড়ি! শব্দটা ওই আকস্মিক প্রধর্ষক চুম্বনের এত প্রধান অনুষঙ্গ যে গা জ্বলে যায় ঘৃণায়, আবার মৃদুভাবে এই বোধ আনে যে তাকে একজন পুরুষ চুম্বন করেছিল, তাই সে জীবনের কোনও গূঢ় ক্ষেত্রে বিজয়িনী হয়ে রইল।

হায়, সুধাময় যদি জর্জ হ্যারিসন হত—কিংবা জর্জ হ্যারিসন হত সুধাময়! স্বর্ণ কী বিপদেই না পড়ত।...

'মিস রয়!'

কে? বর্ষাতিতে শরীর মুড়ে জর্জ বেরিয়েছে। হাতে বন্দুক। শান্টিং লাইনের ওপর পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে ডেকেছে—'মিস রয়!'

নতুন এ এস এম এসে গেছে আরেক বাঙালিবাবু। বয়সে প্রৌঢ়—এখনও আলাপ হয়নি। তাই জর্জ ফের দু'বেলা বেরোতে পারছে বাঘের তল্লাশে। আকাশ ফরসা হয়ে গেল। আজ আর বৃষ্টি হবে না বোঝা যাচ্ছে। জর্জের কাঁধে ব্যাগ আর একগুচ্ছের রশারশি। মাচান বাঁধবার সরঞ্জাম। 'হ্যালো মিস রয়!' সকৌতুকে হাত দোলাচ্ছে সে।

স্বর্ণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছিল। গোরবহাটি যাবে মতিবায়েনের বাড়ি। রোজ একবার করে না গিয়ে থাকতে পারছে না। খুব ভোরে যায়, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসে। বাঁকি নদীতে ঘোড়াটার হাঁটু অবধি জল বইছে কদিন থেকে। আজ সারাদিন বৃষ্টি হল। উত্তরের বিশাল বিল 'তেলকার জলা' থেকে জল নামলে বাঁকির বুক ভরে যাবে

নির্ঘাৎ। তবু একবার যেতে হবে। ছেলেটার প্রতি কি সে বেশি মনযোগী হয়ে পড়েছে ক্রমশ? ছেলেটা তার নিছক জেদের বিষয়, নাকি স্নেহ মমতা? স্বর্ণ বুঝতে পারে না। শুধু সবিস্ময়ে এবং শিহরনসহ লক্ষ্য করে, সে ক্রমশ গভীরভাবে আসক্ত।

স্বর্ণ বারান্দা থেকে নেমে বলে—'বাঘ?'

'ইউ আর ড্যাম রাইট।'...জর্জ হা-হা করে হাসে।

আর সেই সময় গোরাং ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে বলেন, 'বাঘ, না কচু! শুধু বড়ফট্টাই! দেখেছ কখনও বাঘ! রয়েল বেঙ্গল টাইগার—সাবধান! ফাদার-মাদার বলতে দেবে না।'

'হ্যাল্লো ডাক্তারবাবু! কেমন আছেন?'....জর্জ এগিয়ে আসে।

'আমি যাই থাকি, তোমার কী হে সায়েব? খবরদার কখনো আমার মেয়েকে অমন অভদ্রভাবে ডাকবে না। গরু, না ছাগল যে দূর থেকে অমন করে ডাকবে?'

স্বর্ণ বলে, 'বাবা। ঘরে যাও!'

'নেভার। কভি নেহী!' গোরাংবাবু মুঠো শূন্যে তুলে বলেন।...'শী ইজ এ হিন্দু উইডো। তার সম্মান আছে মিঃ হ্যারিসন!'

জর্জ সটান তারের বেড়া টপকে কাছে এসে গম্ভীর মুখে বলে, 'আমি আপনার কন্যাকে বহুৎ সম্মান করে ডাকটারবাবু। শী ওয়াজ মাই টিচার।'

'জজ! তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও তো!' স্বর্ণ বাবার হাত ধরে টানে। ....'ঘরে চলো।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গোরাংবাবু বলেন, 'যাচ্ছি! জেলখানায় ছিলুম বলে সবাই আমার মেয়েকে যা খুশি করেছ তোমরা। এখন এসো দেখি—কাম অন! টাচ হার—গায়ে হাত দাও!'

স্বর্ণ অস্ফুট চিৎকার করে—'বাবা!'

জর্জ আরও গোমড়া হয়ে বলে, 'কেহ মিস রয়কে কিছু করে নাই। দ্যাটস এ ন্যাসটি থিং, এভরিবডি এনজয়েড—গসিপস!'

'যাও যাও! বন্দুক দেখে ভয় পায় না গৌরাঙ্গ রায়! সুধাময় আমাকে বলে গেছে, তুমি স্বর্ণর ওপর জবরদস্তি করতে গিয়েছিলে। ইয়েস! ইউ ট্রায়েড টু এ্যাটাক আপন হার চেস্টিটি!'

অমনি স্বর্ণ চকিতে বুদ্ধিশূন্যভাবে গোরাংডাক্তারের গায়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বসল। আর্তনাদময় গর্জন তার গলায়—'ঘরে যাও, ঘরে যাও বলছি!' গোরাংবাবু ভিজে ঘাসে পড়ে গেলেন। তখন স্বর্ণ তার হাত ধরে টানতে টানতে বারান্দার কাছে নিয়ে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে ঠেলে বারান্দায় তুলল। তারপর ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা টেনে শেকল তুলে দিল।

দরজায় পিঠ রেখে সে লাল চোখে জর্জের দিকে তাকাল। ভিতরে গোরাংবাবুর কোনও সাড়াশব্দ নেই।

জর্জ একটু হাসে।... 'ডোনট টেক ইট সিরিয়াসলি! এ গসিপ।' তারপর আস্তে আস্তে চলে যায়। লাইনে পৌঁছে একবার এদিকে ঘুরে বাঁ-হাতটা নাড়ে—অর্থাৎ 'কিছু মনে কোরো না—টেক ইট ইজি। সহজভাবে নাও'....

তার একটু পরেই স্বর্ণ চৈতকের পিঠে চেপে বেরিয়ে পড়ে। গোরাংবাবু যা ছিলেন, তাই—শুয়ে পত্রিকা পড়ছেন। স্বর্ণর ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে—তারপর ভারি কষ্ট হয়। বাবাকে ধাক্কা মারল? কোথায় চলে যাচ্ছে সে দিনে দিনে।

রাস্তায় কাদা। ঘোড়াটার চলতে কষ্ট হচ্ছে। কাঁচা রাস্তা—সামান্য বৃষ্টিতেই কাদা হয়। তবে এলাকার মাটির একটা গুণ আছে, খুব তাড়াতাড়ি রস শুষে নিতে পারে। বাঁকি নদীতে জল কিছু বেড়েছে। পেরোতে সময় লাগল। ঘোড়ার তলপেটে ছুঁল ঘোলা স্রোত। স্যাডল থেকে পা তুলেছিল স্বর্ণ। পরনে ঘিয়ে রঙের ব্রিচেস—মাথায় শোলার হাল্কা টুপি, গলায় স্টেথিসকোপ, লেডি ডাক্তার কলে চলেছে।

তারপর রাস্তার মাটি বেশ শক্ত খটমটে। বৃষ্টি হয়েছে বোঝা যায় না। উঁচু হয়ে উঠেছে ক্রমশ গোবরহাটির দিকে। দীঘির পাড় দেখে পাহাড় মনে হয়। চারদিকে ধ্বংসস্তূপ—খুচখাচ ঝোপঝাড় শেয়াকুল নাটা বৈচি, কোঙা কেয়া, নিমগাছ বটগাছ, নির্জন শিবমন্দির—একসময় বৌদ্ধদের জমজমাট আখড়া ছিল। গাছতলায় ছড়ানো শিলাগুলোতে সেই চিহ্ন রয়েছে। দীঘির পাড়ে ওঠা গেল না—বড় পিছল। নিচে দিয়ে কুপথে এগোল ঘোড়া। সামনেই বায়েনপাড়া। শেষ সূর্যের গাঢ় গোলাপি রোদ পড়েছে গাছপালায়। বায়েনপাড়ায় কার বাড়ি ঢোল আর সানাই বাজছে। মহড়া চলছে অভ্যাস মতো! তাড়ি খেয়ে দাওয়ায় ওরা বসেছে। রেওয়াজ চলছে সানাইতে—পূরবীর।

এই নিরক্ষর গরিব ছোটলোকেরাও পূরবী রাগিণী বাজাতে পারে! ঢোলে বিলম্বিত লয়ের সূক্ষ্ম গভীর ছন্দকে শব্দের প্রতীকে সাজাতে পারে! বেপথু গলায় ফোগলা মুখে কোনও প্রাজ্ঞ বুড়ো দুহাত প্রসারিত করে দোলাচ্ছে এবং বলছে—ধা—কট্রে—ধে—ধিন...ধা-আ—ধা-আ—ধিন্ কট্রে—তেরেকেটে-ধা—ধি-ই-ন—ধি-ই-ন....

মতি বায়েনের বউ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। দৌড়ে আসে স্বর্ণকে দেখে।—'দিদি ও ডাক্তোর দিদি। বিষম খবর—খারাপ খবর। মিনসে সেই বেরিয়েছে দুপুরবেলা বিষ্টি মাথায়! এখনও ফেরেনি! আমি ভাবছি কী করে মুখ দেখাব আপনাকে দিদি গো!'...আচমকা হু হু করে কেঁদে ওঠে সে!

স্বর্ণ রুদ্ধশ্বাসে বলে, 'কী হয়েছে বায়েনবউ?'

'ছেলেটা পালিয়েছে। দুপুরবেলা বিষ্টি পড়ছিল—আমি উনুন ধরাব বলে আগুন আনতে গেলাম নুটোদের বাড়ি, মিনসে যেয়েছিল বাবুদের আখড়ায়, ইদিকে ছেলে আমার একলা ছিল। এসে দেখি, ঘরে নাই। তা—খোঁজ খোঁজ! দীঘির উদিকে কটা ছোঁড়া গরু চরাচ্ছিল—বললে তোমাদের ভাগ্নে হুই মাঠ বাগে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছিল দেখলাম! তক্ষুনি তো চলে গেল সেবাগে। আর দুজনেরই পাত্তা নাই ডাকাতোরদিদি। এই আমি কেবল ঘরবার হচ্ছি তখন হতে—না নাওয়া, না খাওয়া!'

'কমলকে খবর দাওনি?'

'দিয়েছি। সে বললে—ছেড়ে দাও। সময় হলে ফিরবে।'

'কোন মাঠে দেখেছে বললে?'

'পুবমাঠে—হেজলের (হিজল বিলের) দিকে!'

স্বর্ণ ঘোড়া ঘোরায়। আস্তে আস্তে চলে আসে। দীঘির শেষপ্রান্তে এসে ঢালু হতে থাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে তাকায়। রোদ মুছে ধূসর ছায়া নেমেছে। কোথায় হারিয়ে গেল ছেলেটা? তার দুচোখ জলে ভরে আসে। কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারে না সে। ও আমার কে? বারবার মনে-মনে উচ্চারণ করে। আর ধীরে হেঁটে আসে গৃহাভিমুখী শান্ত চৈতক। দিন শেষে এক অপার শূন্যতায় বিলম্বিত সেই পূরবীর লয় কেন্দ্র করে ঘোড়াটার পায়ের শব্দ মৃদু বাজে, ধা—কট্রে—ধে—ধিন...ধা-আ—ধি-ই-ইন—ধা-আ....

সতেরো

একটি বিচিত্র লোকগাথা

জুহা মৌলবীর মধ্যে সেইসব মোগল কিংবা হুন সর্দারদের হই হই করে ঝাঁপিয়ে পড়ার বেগ ছিল। 'ভিনি ভিডি ভিসি—এলাম দেখলাম জয় করলাম—' মৌলবী এইরকম বলেন। করেনও অনেক। গ্রামের মুসলমানেরা তাঁর হাতে 'তৌবা।' (ক্ষমাপ্রার্থনা) 'ফরাজী' মতে দীক্ষা নিয়েছে। সঙ্গীত শুনলে চল্লিশ বছরের 'বন্দেগী' (উপাসনা) বরবাদ হয়, মেনেছে। মেয়েদের পর্দানসীন করেছে। হিন্দু জমিদারদের মাটিতে গোরু কোরবানিও অনেক জায়গায় চালু হয়েছে। ব্রিটিশ রাজা খ্রিস্টান। সদরে কালেকটার বাহাদুর, পুলিশ সায়েব প্রমুখ আমলা-ফয়লা সাদা চামড়া ও খৃষ্টান। জুহা মৌলবী মুখে ফতোয়া দিয়েছেন—ব্রিটিশরাজ জালেম (অত্যাচারী), তার বাদশাহী হারাম (নিষিদ্ধ), তার শাসনে বাস করা মুসলমানের গোনাহ্ (পাপ), কিন্তু গুরুতর সাম্প্রদায়িক গোলযোগের হাওয়া উঠলেই সোজা দরবার করেছেন কালেকটার বাহাদুরের কাছে। বলেছেন, 'স্যার—ইওর প্রফেট ইজ মাই প্রফেট। দি সেইম অরিজিন স্যার।' কলেকটার তাই শুনে হেসেছেন।—'রাইট, রাইট মৌলানা। দেয়ার ইজ এ সেইয়িং—ইসলাম ইজ এ ড্যাসটিক ফর্ম অফ দি খ্রিস্টিয়ানিটি।' এবং ক্রমশ ইংরেজ ততদিনে মুসলমানদের চুপি চুপি কোলে টানতে শুরু করেছিল। এর মোদ্দা কারণ, কংগ্রেসের ব্যাপক অভ্যুত্থান আর তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদ।' ইংরেজও যেন জুহা মৌলবীর সুরে গলা মিলিয়ে বলতে চাইছিল—উই আর অফ দি সেইম অরিজিন। তোমরা এসেছ, দেখেছ, জয় করেছ—আমরাও এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। এতে জোর কাজ হচ্ছিল। ওহাবী আন্দোলনের তীব্রতা হারাল। ইংরেজ শেখাল এবং জুহা মৌলবীরা মুসলিম নেতাদের প্রতিনিধি হয়ে গ্রামে-গঞ্জে বলতে শুরু করলেন—আমরা মুসলমান, বাদশাহের জাত। কংগ্রেস হিন্দুদের কারবার! অতএব....

নিজের মধ্যে এক বাদশাহকে নিশ্চয় দেখতে পেতেন জুহা মৌলবী। তাঁর বাদশাহী এক ইসলামী সাম্রাজ্যের। এটা বড় জোর তাঁর অবচেতন স্বপ্নের বেশি কিছু নয়। এবং এর আভাস পেলেই গোরাং ডাক্তার মুখোমুখি বলতেন—'ইস! ঢাল নেই তরোয়াল নেই—নিধিরাম সর্দার!'

গোরাং ডাক্তারকে কিন্তু শেষ অবধি বাদশাহী দাপট সইতে হল।—'খামোকা পড়ে-পড়ে লোকটা পাগল হবে, আর জুহা তাই দেখবে চুপচাপ?' মৌলবী দাপটে এসে গোরাংবাবুকে এক প্রত্যুষে টেনে তুললেন। ....'তিনপাহাড়ি নিয়ে যাবার লোক নেই, এ কি কাজের কথা মা স্বর্ণলতা? আমি তবে আছি কী করতে? যাবি তো সোজা সঙ্গে চলে আয়, নয়তো বাপের দায়দায়িত্ব আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের ডাক্তারি কর্।'

জুহা মৌলবীর চেহারায় যখন ওই রোখ বা দাপট ঠেলে ওঠে, সবাই ভড়কে যায়। স্বর্ণ চুপচাপ রইল। এদিকে গোরাংবাবু ত্রাহি ত্রাহি চেঁচাচ্ছেন। লোক জড়ো হয়েছে গাছপালার আনাচে-কানাচে। সবাই অবশ্য মজাটাই দেখছে। মৌলবী একা বীরবিক্রমে

তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলেন। গোরাংবাবু প্রচণ্ড গালাগালিও করছিলেন। জাতধর্ম তুলেও বটে। জুহাসায়েব নির্বিকার। আপ ট্রেন এসে গেল। তারপর সব অদৃশ্য। খাঁ খাঁ প্লাটফর্ম। তরুণ শিরীষ পিপুল কৃষ্ণচূড়ার ডালপালায় বাতাস খেলছে। জর্জ হ্যারিসন স্টেশনের উঁচু বারান্দায় আপের দিকে তাকিয়ে থাকার পর নিশাল হাতে ঘরে ঢুকে গেল।

ময়রাবুড়ির আখড়ায় এ নিয়ে কিছু চাপা মন্তব্যও শোনা গিয়েছিল। মৌলবীর একটা মতলব আছে মাথায়। বুড়ি বলেছিল, 'ও মোছলমান করতে নিয়ে গেল বুড়োকে। দেখো, এ যদি না হয়, আমার নামে কুকুর পুষে ছেড়ে দিও তোমরা। আর—এরপর কী হবে জানো? ওর মেয়েটা খেরেস্তানে জাত দেবে। বাপ হবে মোছলমান, মেয়ে হবে খেরেস্তান।'

তাই নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে রটেও গেল কিছুটা। জুহা মৌলবীর মোক্ষম শিকার এবার স্টেশনধারের গোরাং ডাক্তার! সবাই আশা করতে লাগল যে অদূর ভবিষ্যতে গোরাংবাবু ট্রেন থেকে নামবেন গোরাই মিয়া হয়ে, মাথায় থাকবে লাল ফেজ টুপি, পরনে পায়জামা, গালে দাড়ি, মুখে 'বিসমিল্লা!' তবে অন্য কোনও সজ্জন ভদ্র মানুষ হলে এই নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপ ও ভট্টচায্‌রা গোল পাকাতে বসতেন। কিন্তু গোরাং ডাক্তার! রাম কহো, রাম কহো!

ডাকুর সর্দার। দাগির রাজা। ছত্রিশজাতের এঁটো খাওয়া জাতনাশা বামুন। ম্লেচ্ছের হদ্দ। না মানে মনু, না মানে মানুষ। সমাজছাড়া সৃষ্টিছাড়া এক হতচ্ছাড়া জীব।

তার মেয়ে ম্লেচ্ছ খেরেস্তানের গলা ধরে রাতে শুয়ে থাকে, দিনে ঢলাঢলি করে। বাপের ধ্বন্বন্তরীবিদ্যার টুকুনটাকুন (একটু আধটু) পেয়েছিল, তাই রক্ষে। পেটে পাপের পোকা জন্মাতে দেয় না। ঘটকঠাকুর বলে বেড়িয়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে—'হোমোপাথি কঠিন জিনিস! শুনেছি এট্টুকুন দুটো গুলি বহরমপুর ঘাটে ফেলে চৌরিগাছার ঘাটে একঘটি সরবত তুলে খেও, এমন ব্রহ্মতেজ! আর সামান্য স্ত্রীলোকের জঠর!'

পুনশ্চ সেই 'দারোগার হাসি' কর্ণসুবর্ণ পরিমণ্ডলে। আসলে সে আমলের গ্রামসমাজে 'কেলেঙ্কারি' নামক ব্যাপারটা ছিল সংস্কৃতির এক অবিভাজ্য ও চমৎকার অংশবিশেষ। এ না থাকলে গ্রামের মানুষ শূন্যতা অনুভব করত। পুজোআচ্চা মেলাপার্বণ গানবাজনা পুঁথি কথকতা মালামো—গ্রামসংস্কৃতির এইসব পুরানো স্তম্ভের সঙ্গে 'কেলেঙ্কারি' ছিল অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। কেলেঙ্কারি নেই, তো এবার চৈত্রের গাজনে সঙ বাঁধবে কিসে? আড্ডায় মাঠেঘাটে বাটে কী নিয়ে কথা বলবে গ্রামীণ মানুষেরা? তাই কেলেঙ্কারি আবিষ্কারের তালে থাকতেই হত। তৈরি করে নিতে হত বাতাসের মৃদু গন্ধ থেকে।

এবং কদাচিৎ এই কেলেঙ্কারিকে দরদি মরমী পুঁথিকার গীতিকার অথবা কোনও লোককবি বা লোকসাহিত্যিক পুঁথিতে কাব্যে গীতিকায় তুলে ধরতেন—তাঁরা নমস্য। তা থেকে তাঁরা সামাজিক ঘৃণার অংশ ধুলোবালির মতো সাফ করে তুলে নিতেন যেন অবহেলিত পথের অমল-ধবল পবিত্র শিশুকে বুকের কাছে। সে এক গভীরতর সমাজদ্রোহ নিশ্চয়! কিন্তু আশ্চর্য, একদা সমাজ তো মেনেই নিত। কেলেঙ্কারি হত বিশুদ্ধ

প্রেম—নিকষিত হেম। আর একদা তাই হয়েছিলও স্বর্ণলতা ও গোরাং ডাক্তারকে নিয়ে জুহা মৌলবী, পাদ্রী সাইমন, জর্জ হ্যারিসন আর সুধাময়কে নিয়ে —হয়েছিল ইয়াকুব সাধু আর তার ছেলে ইসমাইলকে নিয়ে। এবং এই বিস্তারিত গীতিকাহিনীর কেন্দ্রে ছিল এক বাউরি ডাকাত।

পঞ্চাশ বছর পরে কর্ণসুবর্ণে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান শিবিরের তরুণ অধ্যাপক এক জ্যোৎস্নারাতে টিলায় বসে শুনছিলেন লোকগীতিকার মদন শেখের মুখে—গানের সুরে, ছড়ায়। আল্লাতালা মা সরস্বতী পীরপয়গম্বর তেত্রিশকোটি দেবতা ও দশদিক বন্দনার পর মদন শেখ শুরু করেছিল :

বাউরিকুলে জন্ম লিলে রূপেতে কন্দর্প
ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো বাপের বড় গর্ব...

সব লোককাহিনীর হালচালই এমন। মদন শেখের কল্পনা তার বাইরে যায়নি। কিন্তু যখন সে স্বর্ণলতার সঙ্গে বাউরিছেলের প্রেম লড়িয়ে দিল, তরুণ অধ্যাপক হো করে হেসে ফেলেছিলেন।

..ব্রাহ্মণের বিধবা তিনি নাম স্বর্ণলতা
মনে বড় অনুরাগ মুখে সরে না কথা
ধিকধিক আগুন জ্বলে জলে না নেভায়
চলে গো বাউরির ছেলে ভিন্নদ্যাশে যাই....

হাস্যকর! কিন্তু মদন শেখ হাসেনি। সে বুকে দম নিয়ে আকাশে মুখ তুলে তখন গানের জায়গায় টান দিয়েছে :

নিশিরাতে কানপাশা আর
পরব নাকো সই লো
(আমার) মনের মানুষ 'জেহেলখানায়' বাসরো পোহায়।।'

তারপর কিনা বাউরির ছেলের মনে সেই টান লেগেছে, সে পাগলের মতো গরাদ ভেঙে পাঁচিল টপকে পালিয়ে স্বর্ণলতার কাছে যেতে চায়, বুকে লাগল গুলি।...

তারপর দিন যায়, রাত যায়। তারপর এল :

'জাতিতে খেস্তান তিনি, হার্সন নামে গোরা
সামোনে দেখেন কন্যা রূপেরো পশরা
আমি তো বিদেশী তুমি বিদেশিনী নারী
মনের কথা বলতে যেয়ে মুখের কথা বৈরী (অর্থাৎ ভাষা)
অ আ ক খ শেখাও কন্যা তোমার পাঠশালায়
তখন বলিব কথা প্রাণে যাহা চায়।।

এবার হাসেন না অধ্যাপক। দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করে তাকান ধু ধু জ্যোৎস্নার মধ্যে দূরের স্টেশনে—সেই প্রাচীন বট কালো হয়ে মাথা তুলে আছে এখনও। তিনি বলতে চান—বন তো কালের সাক্ষী পিতামহী, জর্জ হ্যারিসন একটা বাঘ মারতে পাগল হয়ে উঠেছিল কেন? কে সেই বাঘ? কী সেই বাঘ—যা ওই অস্ট্রেলিয়ান গোঁয়ার মানুষটিকে বারবার

ধূর্ততায় পরাজিত করছিল আর ক্ষেপিয়ে দিচ্ছিল, হন্যে করে মারছিল? ওই বাঘটার জন্যে তার চোখে ঘুম ছিল না। সারাক্ষণ সে দেখত, আলোছায়ার মধ্যে বিভ্রম, ডোরাকাটা এক হিংস্র চতুর শয়তান—নীল উজ্জ্বল দুটি চোখ—মৃদু নড়াচড়াতেই সে সাঁৎ করে হারিয়ে যায়। রাত দুপুরে সে বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসত—বন্দুক হাতে নিত। বিড়বিড় করে গাল দিত। রাগে বেরিয়ে ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বসত হঠাৎ। খানখান হয়ে যেত রাত্রির গভীরতর নৈঃশব্দ্য। গ্রামের ঘরে কেউ জেগে থাকলে বলে উঠত : পাগলা সায়েব বাঘ মারতে বেরিয়েছে।

মদন শেখ গায় :

স্বর্ণলতা বলেন শোন সায়েবের ছেলে
আমাকে পাইবেন বনের রাজাকে মারিলে
বড় সাধের চৈতক আমার এমন আস্পর্ধা
কন্ধেতে বসাইল থাবা ব্যাঘ্র হারামজাদা
পায়ে ধরি সায়েব তোমার করিলাম প্রতিজ্ঞা
বাঘছাল পিন্ধাইলে তবে করব স্যাঙ্গা।।...(স্যাঙা বা দ্বিতীয় বিয়ে)

প্রতিজ্ঞা করেছিল নাকি স্বর্ণলতা? সত্যি কি তাই? রোমান্টিক অধ্যাপক তীব্রতর অনুসন্ধানে লিপ্ত হন।

....এদিকে কিনা জুহা মৌলবী দিনের পর দিন বাবামেয়ের পিছনে লেগে রয়েছে—তোমাদের জাত সমাজ বৈরী, কেন এমন একঘরে হয়ে কাটাবে? কলমা পড়ো। আমার ইসলাম সমাজ তোমাদের মাথায় করে ঘরে ঢোকাবে। যুবতীমেয়ের বিয়ে দেবে। আর তাই শুনে সুরসিকা স্বর্ণলতা মনে মনে হেসে বলেন,

শোন শোন মৌলুবী গো মোছলমানের ছেলে
আমাকে পড়াবেন কলমা বাঘেরে মারিলে...।।

তাই শুনে নির্বোধ মৌলুবী করলে কিনা এলাকার তাবৎ মুসলমানদের জড়ো করল! তাবৎপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 'আল্লাহ্ আকবর' বলে আরোয়া জঙ্গলে চড়াও হল। আর তখন বাঘটা বের হল। বাজবিজলীর ছটা আর কানফাটানো মেঘের গর্জন যেন। বাঘ যায় উত্তরে, একবার করে কালো আকাশ ঝিলিক দিয়ে যেন বাজ পড়ে। বাঘ যায় দক্ষিণে, ফের বজ্রপাত হয়। বাঘ লাফ দেয় পূর্বে, পশ্চিমে আর :

মোমিনগণ ভাগে ডরে কাতারে কাতার।
মৌলুবী ভাগেন আগে শোনেন সমাচার
কাঁটাঝোড়ে রইল লুঙ্গি জলে দিলেন ঝাঁপ
ডাঙায় বাঘ বসে ডাকে, কী হল রে বাপ
মৌলুবী চেঁচান ওরে উল্লুকের বেটা
তোকে কলমা পড়াতে এসে এত হল ল্যাঠা

বাঘ যত ডাকে, শোন ও গুণের চাচা
মৌলুবী পাড়েন গালি কাফের হারামজাদা....

হ্যাঁ—জুহা মৌলুবী সত্যি বাঘটা মারতে ফতোয়া দিয়েছিলেন বটে। তবে স্বর্ণলতা বা গোরাংবাবুকে কলমা পড়ানোর গূঢ় সংকল্প মনে ছিল না। তাছাড়া মৌলবীর এ ব্যাঘ্র অভিযানপর্ব অনেক পরের ঘটনা। তবে বাঘ মারতে গিয়ে মৌলবীর বিলক্ষণ দুর্দশা ঘটেছিল।

মদন শেখের লোকগাথার বিবরণ আলাদা। বাস্তব কাহিনীর সঙ্গে তার কোন মিল নেই। তবু তরুণ অধ্যাপক শোনেন সেই গাথা, শুনতে শুনতে মনে হয়—না, ভুল করছি! লোকগাথায় যা আছে, তা যেন গভীরতর বাস্তবতা। তাই তার মধ্যে সত্য আছেই কিছু। সেই সত্য বড় সহজে ধরা দেবার নয়। লোকগাথা যখন বলে, জর্জ হ্যারিসনের বাংলা শেখার তাগিদ স্বর্ণলতাকে মনের কথা খুলে বলার উদ্দেশ্যে, তখন হয়তো সেই গভীরতর বাস্তবতাকে ছোঁয়া যায়—যা জর্জের অবচেতনায় স্ফোটকের মতো জেগে উঠেছিল!

আর চৈতককে বাঘটা ধরেছিল, এ ঘটনাও অবশ্য সত্য।

গোরাং ডাক্তারকে তিনপাহাড়ি নিয়ে গেলেন জুহা মৌলবী। সেখানে মিশনারিদের উন্মাদ আশ্রম রয়েছে। মৌলবীরও শিষ্য আছে সে এলাকায়। তার কদিন পরে এক বিকেলে বাঘে ধরল চৈতককে।

বাঘটা কেন কে জানে যেন দিনে দিনে জঘন্য কাণ্ড শুরু করেছিল। দিন দুপুরে গরুবাছুর কুকুর বেড়াল সামনে যা পেত, থাবা হানত। লোকজনের উপস্থিতি গ্রাহ্য কবত না। হয়তো তাড়া খেয়ে খেয়ে সেও খুব ক্ষেপে গিয়েছিল।

চৈতকের দু'পা বেঁধে বরাবর যেমন দীঘিতে ছেড়ে দিয়ে আসত, তেমনি সেদিনও দিয়ে এসেছিল স্বর্ণলতা। পা বাঁধা না থাকলে চৈতক পালিয়ে আসতে পারত হয়তো। পারেনি। বেচারা পড়ে পড়ে মার খেল।

কাঠকুড়ানি মেয়েরা ইদানীং বাঘের ভয়ে জঙ্গলে ঢুকত না। তবে বিন্নি কি না চৌকিদারের মেয়ে। তার বাবা সরকারি লোক। সে বাঘকে ভয় করবে কেন? জঙ্গলের দীঘিতে গেছে পদ্ম গাছের গোড়া তুলতে—তাকে বলে 'মূলান।' ভারি মিষ্টি স্বাদ সেই মূলের। ধবধবে সাদা রঙ, রসে ভরা, কুড়মুড় করে চিবিয়ে খেতে ভালো লাগ। রান্না বা সেদ্ধ করেও লোক খায়।

বিন্নি আপন মনে 'মূলান' তুলেছে সারা দুপুর। তারপর উঠে এসেছে। এসেই ভয় পেয়েছে। সামান্য দূরে ঘোড়াটা পড়ে আছে। আর বাঘটা তার লেজের দিকটা খাচ্ছে। বিন্নিকে তাকাতে দেখেই সে গরগর করে উঠে সরে গেছে পাড়ে ঝোপের আড়ালে। আর বিন্নি পড়ি কি মরি করে মূলনাগুলো ফেলে অনেক ঘুরে ফাঁকায়-ফাঁকায় স্টেশনে এসেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে খবর দিয়েছে স্বর্ণকে।

স্বর্ণ আবেগে অনেক সময় অনেক কিছু করে বসে বটে, এবার কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল। ধীরে সুস্থে জর্জকে গিয়ে জানায় দুঃসংবাদটা। তখন জর্জ সেজেগুজে বেরিয়ে আসে।

দুজনে গিয়ে চৈতককে আবিষ্কার করে ওই অবস্থায়। তারপর কিন্তু স্বর্ণ আর পারে না। হু হু করে কেঁদে ভেঙে পড়ে ঘোড়াটার ওপর। জর্জ বলে—'আমি বালো ঘোরা দেব তোমাকে, ডোন্ট ক্রাই।'

কতক্ষণ পরে স্বর্ণ উঠে দাঁড়ায়। তার চোখে চোখ রেখে শান্তভাবে বলে—'জর্জ, আমার চৈতককে যে মেরেছে, তাকে তুমি যদি মারতে পারো...'

হঠাৎ তাকে থামতে দেখে জর্জ একটু হাসে।...'তো? বোলো?'

স্বর্ণর চোয়াল আঁটো হয়। তার নাকের ফুটো কাঁপে। ঠোঁটদুটোয় ভাঁজ পড়ে।

জর্জ ফের বলে—'বোলো? বখশিস দেবে?'

স্বর্ণ হিসহিস করে বল—'দেব। যা চাইবে, তাই দেব।'

'প্রমিজ?'

'প্রমিজ।'

হা হা করে হাসে অস্ট্রেলিয়ান স্টেশনমাস্টার। আর কাছাকাছি কোথাও গরগর করে গর্জে ওঠে বাঘটা, খাওয়ায় বাধা পড়ছে বলে ক্রুদ্ধ সে। জর্জ একটু পরে গম্ভীর হয়ে বলে—'চলো তোমাকে রেখে আসি। তারপর মাচান বাঁধতে হোবে। আই থিংক ইট ইজ দা গ্রেটেস্ট চান্স নাও! মিস করলে আমি নিজের বুকে ঘোলি মারব।'

স্বর্ণ যেতে যেতে একবার তার দিকে তাকিয়ে নেয়। কিন্তু কিছু বলে না।

স্টেশনের কাছে এসে জর্জ একটু হেসে ডাকে—'মিস রয়!'

'উঁ?'

'তুমি প্রমিজ করেছ, যা চাইব—দেবে।'

'হুঁ, করেছি তো।'

'তো বোলো, আমি কী চাইতে পারব তোমার কাছে! হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট? বোলো মিস রয়?'

'আমি কি কিছু দিতে পারিনে, ভাবছ?'

'না, নো। আই নেভার স্যে দ্যাট। বাট হোয়াট? আমি কি চাইবে তোমার নিকট বোলো। তুমি বলে দাও!'

'বা রে! সে তোমার খুশি। দ্যাটস আপ টু ইউ—ইওর চয়েস।'

'ইফ আই ওয়ান্ট ইউ?'

'পাবে।'

জর্জ ক্ষেপে যায় সঙ্গে সঙ্গে।—'ড্যাম ইট! আমি বুঝেসে। সব বুঝেসে।'

'কী বুঝেছ তুমি?'

'তুমি জানো আমি বাঘ মারতে পারব না। দা স্যাটান লেট লুজ! আমি হেরে যাব, সো ইউ থিংক! দেয়ারফোর ইউ প্রমিজ দ্যাট! ইয়েস, আই নো। চরণ চৌকিদার বলছিল, দা টাইগার ইজ এ হিন্দু গড। কেউ তাকে মারতে পারবে না। ইউ প্রমিজড অন দ্য বেস অফ দ্যাট ফেইথ।'

'না।'

'ইউ আর জাস্ট প্লেয়িং মিস রয়।'

'না।'

জর্জ কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ হন হন করে চলে যায় জঙ্গলের দিকে। তার কাঁধে একটা মস্তো দড়ির বাণ্ডিল ঝুলতে ঝুলতে যায়। সন্ধ্যার আবছায়ায় তাকে দেখে মনে হয়, সারা গায়ে লোভী ব্যগ্র মূল বাড়িয়ে একটা কী বিদেশী অচেনা পরগাছা ঘুরছে উপযুক্ত মাটির সন্ধানে।...

ঘরে ঢুকে আর বাগ মানাতে পারে না স্বর্ণ। দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কাঁদে ফের। চৈতকের শোকে তার বুক ফেটে যায়। এই নিঃসঙ্গ জীবনে তবু তো একজন সঙ্গে ছিল, যার সঙ্গে নির্জনে কথা বলেছে, সুখদুঃখের কথা। কত নির্জন মাঠ ও পথ মন ভরে গেছে ওই চতুষ্পদ প্রাণীটির সঙ্গে আলাপে। জ্যোৎস্নার রাতে হঠাৎ অস্পষ্ট শব্দে ঘুম ভেঙে বেরিয়ে দেখেছে কীভাবে আটচালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে চৈতক, উঠোনে স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনে হয়েছে, দুঃখের দিনরাতের এক পক্ষীরাজ। এখন জ্যোৎস্নায় তার পিঠে চেপে বসলেই গজিয়ে উঠবে দুটো চমৎকার ডানা। উড়িয়ে নিয়ে যাবে কোথাও—যেখানে পৃথিবীটা অন্যরকম।

ধুলোউড়ির মাঠের বুকে চৈত্রের সন্ধ্যায় ঘোড়া ছুটিয়ে আসার স্মৃতি স্বর্ণকে যত বিহ্বল করল, স্বর্ণ কচি মেয়ের মতো কাঁদল তত। সেরাতে রান্নাও চাপাল না। খেল না। অনেক রাতে বাবার ঠিকানায় চিঠি লিখতে বসল। জুহা মৌলবীর চিঠি এসেছে। ভর্তি হয়েছেন বাবা, চমৎকার বন্দোবস্ত হচ্ছে। মৌলবীর ফিরতে দেরি হবে। স্বর্ণমা যেন শিগগির এসে দেখা করে যায়। স্বর্ণ চোখের জলে লিখল; বাবা, বড় দুঃসংবাদ দিচ্ছি। আমাদের প্রাণের চৈতক আজ....

চিঠি লিখে স্বর্ণ শুল কিন্তু ঘুম এল না। এই বুঝি জর্জ মরা বাঘটা টানতে টানতে ফিরে এসে ডাকবে জানলায়। এই বুঝি তার রাইফেলের আওয়াজ শোনা যাবে। সে কান পেতে রইল। বাইরে আজ হু-হু হাওয়া দিচ্ছে। শন্‌শন্‌ করছে গাছ-পালা। তালগাছের বাগড়া দুলছে খড় খড় সর সর। শিস দিয়ে চলে গেল রেলগাড়ি। কিছুক্ষণ বিকট অস্থির শব্দপুঞ্জ। তারপর ফের হাওয়ার শন্‌শন, তালপাতার খড়খড় ধারাবাহিক।

জর্জ তাকে কী চাইতে পারে?

একথা যত ভাবল, শিউরে উঠল সে। ক্রমশ একটা অপরিচিত অস্বস্তি জেগে উঠল তার মধ্যে। শরীর ভারী লাগল। ঠোঁট কামড়ে ধরল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'না-না-না!' তারপর চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুজল। মনে মনে প্রার্থনা করল, বাঘটা যেন না মরে—সে দেবতার বাহন হয়ে যেন বেঁচে থাকে।

একটা আত্মপ্রকাশের লজ্জা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অনেককাল পরে স্বর্ণ ঈশ্বরকে ডাকতে থাকল। মাথা কুটতে লাগল মনে মনে। এ আমার মনের পাপ। আমাকে তুমি বাঁচাও, ঠাকুর!

কখন আবছা যেন গুলির শব্দই কানে এল। লাফিয়ে বিছানায় বসল সে। লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে দিল। কানের ভুল? আর কোনও শব্দ শোনা গেল না।

একটু পরে একটা মালগাড়ির আওয়াজ এল। অনেকটা সময় লাগল সেটা পেরিয়ে যেতে। স্বর্ণ ফের শুয়ে পড়ল। এবার চোখ ভরে ঘুম এসে গেল তার। কিছুতেই জেগে থাকতে পারল না।...

না, বাঘ মারা পড়েনি।

সে এত ধূর্ত, এত ক্ষিপ্রগতি, গাছের ডালে দড়ির মাচায় বসে জর্জের পা ফুলে ঢোল হয়েছে, কিন্তু তার অস্তিত্বও টের পায়নি—অথচ ঘোড়াটার অনেক মাংস খেয়ে গেছে। জর্জকে পরে স্বর্ণ বলেছিল, 'তোমার মন বাঘে ছিল না—তাই।'

তাও হতে পারে। অন্ধকারে জর্জ স্বর্ণকে দেখেই রাত কাটিয়েছে হয়তো। তার কথাই ভেবেছে। ভেবে তোলপাড় হয়েছে, কী চাইবে সে স্বর্ণকে, কী চাওয়া উচিত, এবং স্বর্ণই বা কী দিতে পারে, কী আছে স্বর্ণর....এইসব গুরুতর চিন্তা।

এদিকে লোক কবি মদনচাঁদ শেষ বলছে অন্যকথা :

স্বর্ণলতা গেছে গহন জঙ্গলে। বাঘের কাছে মিনতি করে বলেছে, হে দেবতার বাহন, আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচাও।

কন্যা বলেন, শোন বাঘা, আমার মাথার কিরে
এ দ্যাশ ছাড়িয়ে তুমি যাও দ্যাশান্তরে।
তোমার গেলে জান বাছা আমার যাবে মান
সে বড় পাপিষ্ঠ গোরা জেতে কেরেস্তান
কুক্ষণেতে ওরে বাঘা, করেছিলাম পিতিজ্ঞা
বামুনের বিধবা হয়ে ক্যামনে করি স্যাঙ্গা।।...

অধ্যাপক আবার হো হো করে হেসে ওঠেন। বুড়ো লোককবি বলে, এবার সিগারেট দিন। গলার রসকষ শুকিয়ে গেল। এরপর ধরব ইয়াকুব সাধুর পালা। হেরুর ছেলের কী হল তাও বলব। আর বলব পাদ্রিবাবার সঙ্গে জুহা মৌলবীর জব্বর লড়াই....

আঠারো

বিদ্রোহের মুহূর্তে

জুহা মৌলবী তিনপাহাড়ি থেকে ফিরে এসে অনেকগুলো খবর দিলেন। খবরের মতো খবর। সুধাময়বাবু চুলদাড়ি কেটে বিয়ে করেছেন এবং গোরাংবাবুর ব্যাপারে খুব উৎসাহী। মিশনারি হাসপাতালে দু'বেলা খোঁজখবর নিচ্ছেন। তিনপাহাড়ির মতো স্বাস্থ্যকর স্টেশনে সুধাবাবুর চেহারা খুব খোলতাই হয়েছে। প্রথমে তো জুহাসায়েব চিনতেই পারেননি যে চিরোটি স্টেশনের সেই খ্যাংরাকাঠি লোকটি ইনি। তবে মৌলুবীব মতে, সুধাবাবুটিও সেই উন্মাদাশ্রমে থাকার যোগ্য মানুষ। পাগল, পাগল, মাথাখারাপ!... বলে মৌলবী প্রচুর হাসলেন। কেন পাগল বলা হচ্ছে, তা অবশ্য বিশদ জানতে চায়নি স্বর্ণ।

এরপর ইয়াকুব সাধুর কথা।

হঠাৎ ওখানে ব্যাটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে জুহা মৌলবীর। তাজ্জব কাণ্ড! মুসলমান বাউলফকিরদের একটা আখড়া আছে তিনপাহাড়িতে। আখড়া না বলে পাড়া বলাই ভাল। পাড়ার শেষদিকে একটা বিশাল দীঘি আছে। তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় আছে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। তার তলায় ইয়াকুব সাধু এখন ইয়াকুব ফকির হয়ে বসে গিয়েছে। পয়সাকড়ি কামানোর ভাল ফন্দিফিকির এঁটেছে ব্যাটা বহুরূপী। হ্যাঁ, এখনও তার ভর ওঠে, মাথা দুলিয়ে প্রচণ্ড গর্জন করে সে। কিন্তু 'কালী-কালী' বলে না ভুলেও। তার বদলে 'আলি-আলি' বলে। সে চ্যাঁচানি শুনে দুর্বল লোকের মারা পড়ার কথা। গাঁজাখোর লোকের বুকে এত দম থাকে, ভাবা যায় না!

আর, সবচেয়ে তাজ্জব কাণ্ড—হেরুর ছেলে সেই ডেভিড কিংবা ইসমাইল এখন তার কাছে।

কীভাবে এই মিলন ঘটল, তাও শুনে এসেছেন মৌলবী। আগের বর্ষায় ইয়াকুব যখন এখানে-সেখানে ঘুরে রেড়াচ্ছিল, কাটোয়া স্টেশনে হেরুর ছেলেকে হঠাৎ দেখতে পায়। ইয়াকুব বলেছে—খুব বৃষ্টি পড়ছিল রাত্রিবেলা। স্টেশনের পিছনে রেলের মস্তো আটচালায় আরও সব ভবঘুরে ও ভিখিরিদের সঙ্গে সে রাত কাটাচ্ছিল। এমন সময় পাশেই আবিষ্কার করে ছোঁড়াটাকে। পাতলুন-জামা পরা ক্ষুদে প্রাণীটা কুঁকড়ে শুয়ে ছিল। গাঁজা খাবার জন্যে দেশলাই জ্বালতেই তার মুখে আলো পড়ল। মুহূর্তে চিনেছিল ইয়াকুব। প্রথমবার সন্দেহ হলে আবার আলো ফেলেছিল।...

তবে আসল কথাটা হচ্ছে—ইয়াকুব বলেছে মৌলবীকে—সে ওই ছেলেটার জন্যেই চুপিচুপি চিরোটির দিকে এগোচ্ছিল। শেষরাতের রেল গাড়িতে চেপে সে ওখানে যেত—প্রথমে স্বর্ণমায়ের কাছে, তারপর মৌলবীর কাছে। কারণ ছেলেটার জন্যে সে একটুও সুখ পাচ্ছিল না। 'সাধনভজনে' মনে বসছিল না। তা—এই তো হচ্ছে চরম প্রমাণ যে ইয়াকুবের ঈশ্বর ইয়াকুবকে পরিত্যাগ করেননি।

ছেলেটা স্বল্পভাষী বরাবর। যেটুকু ইয়াকুব জেনেছে তা হল : গোবরহাটির মতি বায়েনের বাড়ি থেকে সে সোজা মাঠ-বিল-জঙ্গল পেরিয়ে চলতে থাকে। তার কিছু ভাল লাগছিল না। সে পাদরিবাবার কাছেই (কী নেমকহারাম ছেলে!) ফিরতে চেয়েছিল। পথ ভুলে সোজা গিয়ে ওঠে রেললাইনে, তারপর লাইন ধরে চলতে চলতে পৌঁছায় বাজারসাহু স্টেশানে। চিরোটির ডাউনে একটা স্টেশনের পরেরটায়। তখন রাত দুপুর হয়ে গেছে। অতটুকু ছেলে বনবাদাড় ভেঙে হেঁটেছে! সাপে কাটেনি। ভয় পায়নি। তারপর সকালবেলা একটা গাড়ি আসতেই চেপে বসেছে। কথা বলতে চায় না তো! তাই কাকেও জিগ্যেস করেনি, গাড়িটা কোথায় যাবে।

গাড়িটা ভাগ্যিস ছিল কাটোয়া লোকাল। ওখানেই শেষ। তাই ছেলেটা শেষ অবধি কাটোয়ায় ঘুরেছে সারাটা দিন। সুন্দর টুকটুকে ছেলে দেখে অনেকে ভেবেছে ভদ্রলোকের ছেলে—পালিয়ে এসেছে কিংবা পথ হারিয়েছে। তাই কেউ কেউ খোঁজখবর করতে চেয়েছে। কিন্তু সে কারো কাছে ধরা দেয়নি।

শুধু এক ময়রার স্নেহকে সে প্রত্যাখ্যান করেনি। ময়রাটা তাকে পেটপুরে লুচিমিষ্টি খাইয়েছিল। ময়রাবউ বলেছিল, আমাদের ঘরে থাকো, বাবা। কিন্তু সে এক ফাঁকে ফুড়ৎ করে উড়েছে। তারপর সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি এলে তখন আটচালায় গিয়ে জুটেছে।

ইঁয়াকুব বলেছে, আমাকে চিনল সঙ্গে সঙ্গে। সাধুবাবা বলে কেঁদে উঠল। তবে কথা কী, মানুষের মধ্যে আত্মা আছে। সেই কেঁদেছিল। ও তো দুধের বাচ্চা। অত কিছু বোঝে না। ওর আত্মার কাছে সবাই তো পরিষ্কার। যেমন এই দীঘির পানি—আপনি তার তলাঅবধি দেখতে পাবেন মৌলবীসায়েব।

জুহা মৌলবী কীভাবে ইয়াকুবকে আবিষ্কার করলেন?

সেও কম চমকপ্রদ নয়। তিনপাহাড়িতে অধিকাংশ মানুষই বঙ্গভাষী—যদিও জায়গাটা বিহারপ্রদেশ। সেখানে মুসলমানরা আগের বছর জুহা মৌলবীর কাছে 'তৌবা' করে ফরাজীমতে দীক্ষা নিয়েছিল। পবিত্রভাবে জীবনযাপনের প্রতিজ্ঞা করেছিল। কিন্তু করলে কী হবে? ফকির বাউল পাড়াটা কাছাকাছি থাকায় খুব শিগগির ঝাড়ফুঁক মন্তরতন্তর কিংবা অনৈসলামিক সংস্কার চলে যাওয়া সহজ নয়। এবার গোরাংবাবুকে নিয়ে যাবার পর মৌলবী সব টের পেলেন। মোড়লরা জানাল, 'জমাত' (সমাজ) বশে আসছে না। লুকিয়ে বিবিসায়েবারা পীরের সিন্নি খায়। মানত করে। কামাল ফকিরের কাছে মাদুলি নেয়। মুশকিল আসানের চিরাগ থেকে পিদিম জ্বালে লুকিয়ে। তার ওপর ইদানীং উৎপাত কে এক প্রচণ্ড ফকির ইয়াকুব বাবাসাহেবের আবির্ভাব। আর ঠেকানো গেল না শরীয়ত। শুধু তিনপাহাড়িতে নয়, ঐ এলাকায় হিড়িক পড়ে গেছে। হিন্দু মুসলমান সবাই এসে ভিড় করছে তার আস্তানায়। একটা ঘরও করে দিয়েছে ফকিরবাবাকে।

সুতরাং, অন্যান্য ক্ষেত্রে যা করেন, এখানেও সেই কৌশল অবলম্বন করলেন জুহা মৌলবী। দলদল নিয়ে চড়াও হয়ে ভড়কে দেবার চেষ্টা করলেন। ইয়াকুবের সাগরেদও জুটেছিল দু-চারজন। বাইরের ভিড়ও ছিল। সবে ভর ওঠার আয়োজন চলেছে। তিন পাহাড়ির আণ্ডাবাচ্চা তাবৎ মুসলমান শিষ্যসহ জুহা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই চকিতে

ব্যাপারটা টের পেয়ে ভিড় পালিয়ে প্রাণ বাঁচল। তারপর সাগরেদরা দীঘির জলে প্রায় ঝাঁপ দিল বলা যায়। (মৌলবী খুব হাসতে হাসতে এই বর্ণানাটা দিলেন) তখনও ব্যাটা ইয়াকুব চোখ বুজে ভান করছে। এদিকে হেরুর ছেলেটা ঘরের দরজায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ওকে না দেখলে মৌলবী টেরই পেতেন না যে এ ব্যাটা সেই কালীসাধক ইয়াকুব!

জুহা তক্ষুনি চিনতে পারলেন ইয়াকুবকে। ব্যাটার চেহারায় জেল্লা খেলছিল। রোজগার ভালই হচ্ছিল কি না। জুহা চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'এ্যাই ইয়াকুব!'

ইয়াকুব চোখ খুলল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিল—'আসসালমু আলাইকুম মৌলানাসায়েব!'

ব্যাটা অসম্ভব ধূর্ত।

তাহলেও শরীয়তের পবিত্রতা রক্ষার জন্য জুহা কোনওরকম অজুহাত বরদাস্ত করতেন না। তিনি ভালই জানেন, এসব ক্ষেত্রে ইয়াকুবের জন্যে থানার দারোগাবাবুরা কিছুই করবে না। কারণ, মোড়লরা মৌলবীর পক্ষে।

অথচ হঠাৎ কী ঘটে গেল মৌলবীর মনে।

ঠিক কী ঘটল, তিনি এখনও স্পষ্ট বলতে পারবেন না। বড়জোর বলতে পারেন, বিকেলের লালচে রোদ পশ্চিমের খোলা মাঠ পেরিয়ে এসে দুটো মুখে পড়েছিল, আর পিছনে বটগাছের ছায়া দীঘির পাড় বেয়ে উঠে গিয়েছিল, একটা গভীর স্তব্ধতা নেমে এসেছিল হঠাৎ সেই পরিবেশে—কী জানি কেন, মৌলবীর মনে হল—এখানে সবকিছু বড় নিষ্ফল আর অকারণ যেন। নাকি দুটো মুখেই কী ছিল—কোণঠাসা আক্রান্ত প্রাণীর ভয়, কিংবা উল্টোটা—তীব্র পরিহাস জুহাসায়েব ইয়াকুবের সঙ্গে অন্যরকম কথাবার্তাই বললেন। খুব ঠাণ্ডা মেজাজে ওকে কিছু সদুপদেশ দিলেন। ছেলেটার সঙ্গেও কিঞ্চিৎ রসিকতা করলেন। এতে কার মাহাত্ম্য বাড়ল, সেটা এখন বলা কঠিন—ইয়াকুবের কিংবা মৌলবীর। তবে যে-কটা দিন ছিলেন, ইয়াকুব তাঁর কাছে গেছে—পায়ের কাছে বসে ধর্মোপদেশ শুনেছে আর ফাঁকে ফাঁকে চিরোটি এলাকার খবরাখবর জিগ্যেস করেছে। গোরাংবাবুর কথা শুনেছে, কেঁদে ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝেড়েছে। বলেছে 'আমি যখন কাছেই আছি—স্বর্ণমাকে বলবেন, কোনরকম অসুবিধে হবে না ডাক্তারবাবু।'

ছেলেটা—নেমকহারাম ছেলেটা মৌলবীকে একটি কথাও বলেনি।

এতসব বলার পর জুহা আচমকা বলে উঠলেন—'তবে আল্লার কসম, পাদ্রিকে আমি এলাকা থেকে তাড়াব। রাঙামাটির ঝিলে গরিবগুরবো লোকেরা এটাওটা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এ্যাদ্দিন খেয়ে বেঁচেছে। শুনলুম চৌকিদার দফাদার আর লেঠেল বসিয়েছে সেখানে। মাছ বেচে মিশনের খরচ তুলবে।'

তারপর স্বভাবমতো তিনি ফের অন্যপ্রসঙ্গে গেলেন। বাঘের হাতে চৈতকের মৃত্যুতে খুব দুঃখপ্রকাশ করলেন। জর্জের ব্যাপারে বললেন—লোকটা ভালো। তবে সেও এক পাগল। ওকেও না তিনপাহাড় নিয়ে যেতে হয়।'

শেষে বললেন, 'বাঘটা আমিই মারব। লোকে মাঠে নামতে পারছে না। তার ওপর আমার বন্ধুর ঘোড়াটা খেল। শয়তানের শাস্তি না দিলে নয়।'

স্বর্ণ হাসতে পারত কথাটা শুনে। কিন্তু হাসির দিন তার নেই।

এরপরই জুহা মৌলবীর বাঘমারার অভিযানটা ঘটে। সে বড় হাস্যকর ব্যাপার। স্বর্ণ স্বচক্ষে কিছু দেখেনি। বাঘটা কোণঠাসা হয়ে পড়ায় বেশ কয়েকজনকে জখম করেছিল। এমন কি মৌলবীকে পুকুরের জলে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল।

বাঘটার ব্যাপারে জুহা প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন এবার। কালেকটার বাহাদুরের কাছে এলাকার লোকের সই সংগ্রহ করে দরখাস্ত গেল। সরকার আশ্বস্ত করলেন—সবুর, বৃটিশ প্রজাবর্গের অশান্তির কারণটিকে শীঘ্রই দূর করা হবে।

বাঘ মারতে একদল শিকারি এল। দুটো হাতি এল। স্টেশনের মাঠে তাঁবু পড়ল। সে এক হইচই ব্যাপার। শোনা গেল স্বয়ং কালেকটার বাহাদুরও আসবেন বন্দুক নিয়ে।

জর্জ হ্যাবিসন ভেতরে ভেতরে রেগে লাল। ইদানীং কেন কে জানে,—হয়তো নিজের ব্যর্থতার জন্যেই স্বর্ণকে এড়িয়ে থাকে। স্বর্ণ কিন্তু মুখোমুখি হলেই খোঁচা দিতে ছাড়ে না—'কী জর্জ? তোমার খবর কী?'

'কী খোবোর?'

'বাঘ?'

জর্জের চোখ দুটো মুহূর্তে জ্বলে ওঠে। মনে হয়, জানোয়ারের মতো ঝাঁপ দিয়ে স্বর্ণকে ধরাশায়ী করতে পারলে তার পৃথিবী আর আকাশের মুক্তি ঘটে। আর স্বর্ণ ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে ধীর ছন্দে চলে যায় গাঁওয়ালে। তার গলায় স্টেথিসকোপ, একহাতে ব্যাগ। সে এখন পায়ে হেঁটেই রোগী দেখতে যায়। ফিরতে রাত হবে বলে আগের মতো বিকেলে বেরোয় না—দুপুরেই রওনা হয়।

তিনপাহাড়ি যেতে মন টানছিল তার। যতটা না বাবার জন্যে, হেরুর ছেলেটার জন্যেই। ছোঁড়াটাকে এত যে দেখতে ইচ্ছে করে। কত বড় হয়েছে, কেমন হয়েছে এখন! পৃথিবীতে চোখ খোলার পর থেকে যাকে দেখেছে সামনে, সেই তো হবে তার প্রকৃত আত্মজ। তার নাম ইয়াকুব সাধু। তাব কাছে গিয়ে তাই নিশ্চয় ছেলেটা শান্তি পেয়েছে। কিন্তু কী হবে ওর ভবিষ্যত? ওইরকম ভবঘুরে সাধুসন্নেসী হয়ে জীবন কাটাবে সে?

এটা সঙ্গত মনে হয় না। তার চেয়ে পাদরী সাইমনের কাছে থাকলে আর কিছু না হোক, সভ্যভদ্র একটা জীবনের আশা ছিল। লেখাপড়া শিখতে পারত। এখন মনে হয়, স্বর্ণ নিজেই বড্ড ভুল করেছে। কেন ছেলেটাকে লুকিয়ে রাখল সে? কেন ওকে ফিরিয়ে দিয়ে এল না পাদরির কাছে?

এখন আফশোস লাগে। বিক্ষোভটা মাঝে মাঝে এত তীব্র হয় যে মাথা খুঁড়তে ইচ্ছে করে। কী ভুল, কী ভুল! হেরুর আত্মা কি সব দেখতে পাচ্ছে? সে নিশ্চয় এর জন্যে দায়ী করেছে স্বর্ণ আর ডাক্তারবাবুকে। হেরু ছিল তাদেরই আশ্রিত মানুষ। তার ছেলের আখের এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া উচিত হয়নি।

এমনি চিরপ্রক্ষোভের মধ্যে দিনেরাতে স্বর্ণ অবচেতনায় প্রস্তুত হচ্ছিল। এ ব্যাপারে একটা কিছু করা তার দরকার। কিছুতেই নিজেকে থামিয়ে রাখতে পারছিল না সে। আগের মতো হঠকারী কোনও আবেগের ফলাফল নয়—একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছিল সে।

ইতিমধ্যে জুহা মৌলবীর সঙ্গে পাদরি সাইমনের সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠল।

মোড়ল মাতব্বর লোকেরা অবশ্য এ ঝামেলা চায় না। পাদরির সঙ্গে তাদের কিসের বিরোধ? তারা কেউ ঝিলে নামে না শামুকগুগলি তুলতে। তারা পাদরির কাছে অসুখবিসুখে বিনাপয়সায় বা নামমাত্র দক্ষিণায় ওষুধ পায়। মুসলমান মোড়লরা মৌলবীর ফতোয়া ফাঁকি দিয়ে গোপনে ওষুধ নিয়ে আসে। তারা অনেক ওজর-আপত্তি দেখাচ্ছিল।

তখন জুহা তাঁর ফতোয়ায় রণকৌশল বদলালেন। বললেন, সাদা চামড়ার খ্রিস্টানেরা মুসলমানদের বাদশাহী কেড়েছে, অতএব তারা মসলমানদের দুশমন। তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ বিশ্বাসী মুসলমানের অবশ্যপালনীয় কাজ।

মৌলবীর এ কণ্ঠস্বর অবশ্য নতুন নয়। বরাবর বলেছেন এমন কথা—কিন্তু জেহাদের ডাকটাই যা দেননি।

এখন জেহাদের ডাক দিতে গিয়ে টের পেলেন, কোনও সাড়া নেই। এই এলাকার মাটির মালিক আসলে জমিদাররা। সব প্রজাই জমিদারের অনুগত।

জমিদাররা ইংরেজ শাসনের একেকটি মজবুত স্তম্ভ।

প্রথম ধমক এল সেখান থেকে। দ্বিতীয় ধমক খোদ কালেকটারের। মৌলবীর বাড়ির দরজায় চৌকিদার টাঙিয়ে দিয়ে গেল ইস্তাহার। 'এতদ্দ্বারা মৌলবী মহম্মদ শামসুজ্জোহা পিতা মৃত মৌলবী মহম্মদ শাহাবুদ্দিন হালসাকিন ডাবকই ডাকঘর গোবিন্দপুর থানা সদর জেলা মুর্শিদাবাদ, তোমাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বাটির বাহির হইতে পারিবে না এবং সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাকিম ডাবকই বাদে কোথাও যাইতে হইলে পূর্বাহ্নে নিকটবর্তী কোনও পুলিশ ফাঁড়িতে অনুমতি করাইয়া লইতে হইবে।' ইত্যাদি।

জুহা মৌলবী হতভম্ব হয়ে পড়লেন। এ যে তাকে সপরিবারে ভাতে-মারার সামিল!

তিনি দেখলেন, খোদাতালার এই বিশাল দুনিয়ায় হঠাৎ এত একা হয়ে পড়েছেন। তাঁর আশেপাশে কেউ নেই।

শিষ্যরা অবশ্য খুব আশ্বাস দিল—'আমরা আপনার পরিবারের সম্বৎসরের খরচ চালাব, আপনি ভাববেন না।' কিন্তু এতদিনে মৌলবী টের পেয়ে গেছেন যে চাটরার পৈতৃক ভিটে থেকে এখানে আসার সময় যে উৎসাহ ছিল এদের ক্রমে তা ডুবে গেছে। ভক্তিতেও ভাঁটা পড়ছে ক্রমশ।

তবু জুহার রক্তে কিছু ছিল। আগেই যাকে বর্ণনা করা হয়েছে মোগল কিংবা হুন সর্দারদের তেজস্বী আবেগ বলে।

স্ত্রী গোবেচারা মানুষ। পৃথিবীর কোন খবরই তাঁর জানা নেই। কিন্তু তিনিও টের পেয়েছিলেন, কী ঘটতে চলেছে। স্বামীকে অনেক বোঝালেন বেচারা। কিন্তু জুহা তখন সেই আবেগে ভাসছেন।

সেই সময় এক দিন স্বর্ণ এল। মৌলবীর নজরবন্দী হওয়ার কথা চারদিকে সঙ্গে সঙ্গে রটে গিয়েছিল। রাতে বারবার রাঙামাটির নতুন পুলিশচৌকি থেকে সেপাইরা আর চরণ চৌকিদার তাঁকে ঘুম থেকে ওঠায়। চরণ সবিনয়ে বলে, 'অপরাধ নেবেন না মৌলুবীবাবা, রাজার হুকুম।' এবং বিশেষ করে চরণের মুখে বিস্তারিত জেনেই স্বর্ণ এল।

জুহা ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে ঘৃণার ছাপ। স্বর্ণ সব শুনে শুধু বলল, আচ্ছা—'আসি মৌলবীচাচা।'

মৌলবী কি কিছু আশা করেছিলেন তার কাছে? স্বর্ণ যতক্ষণ না চলে গেল, তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বিদায় দিতে আসা তার অভ্যাসে ছিল—এলেন না। বারান্দায় একটা মোড়ায় বসে দেখলেন স্বর্ণ উঁচু রেললাইনের ধারে-ধারে চলেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। স্ত্রীলোক মাত্র! কী-ই বা করতে পারে সে?

একদিন রাত বারোটায় চরণ চৌকিদার ও সেপাইরা এসে দেখল, জুহা মৌলবীর জ্বর হয়েছে। রীতিমতো কম্পজ্বর। ঠকঠক করে কাঁপছেন। ওরা গ্রামের মাঝখানে বটতলার মাচায় বসে গাঁজা খেল। তারপর টলতে টলতে চৌকির দিকে এগোল। তখন রাত দেড়টার কিউল প্যাসেঞ্জার শিস দিতে দিতে হাউলির সাঁকো পেরোচ্ছে।

জুহা মৌলবী বেরিয়ে পড়লেন চুপিচুপি।

অন্ধকার রাত। হেমন্ত ঋতু। শীত সবে পড়তে শুরু করেছে। শিশির আর কুয়াশায় সব নিঝুম স্যাঁতসেতে। শেয়াল ডাকছিল হাউলির ধারে। জুহা গ্রামের পূবে বাঁজা ডাঙায় দাঁড়িয়ে দূরে স্টেশনের দিকে তাকালেন। শিকারিদের তাঁবুতে আলো জ্বলছে। বাঘটাব কথা মনে পড়ল এতক্ষণে। একটু হাসলেন মৌলবী।

প্রথম ঢুকলেন রাঙামাটির বাউরিপাড়ায়। সরা বাউরি যোয়ান ছেলে। তাকে ক'দিন আগে ঝিলে নামার অপরাধে পাদরির লোকেরা খুব মার দিয়েছিল। সরার নাম ধরে চাপা গলায় ডাকতে থাকলেন মৌলবী।

এই শেষ চেষ্টা। গরীব-গুরবো লোকগুলোকে নিয়ে যদি কিছু করা যায়!

সরা একা উঠল না। তার দুই ভাই মরা আর লখাও বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে এল। তারপর হতভম্ব!

ততক্ষণে চকমকি ঠুকে পিদমি জ্বেলেছে সরা। জুহা বললেন, 'খবর্দার! আলো হটাও। বসো চুপচাপ। শোনো বলছি।...'

সরা হেসে বলে, 'নতুন কী বলবেন মৌলবীসায়েব—আমরা কাল বিলে নামব। আমাদের সব ঠিক হয়ে আছে। যদুপুর মধুপুর আরোয়া গোবিন্দপুর আঙামাটি তাবৎ গাঁয়ের ছোটনোক-টোটোনোক সব তৈরি।'

উত্তেজিত মৌলবী রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'সে কী! কবে-কবে এসব ঠিক হল তোমাদের?'

সরা চাপা গলায় রহস্যময় হেসে বলল, 'হয়েছে বইকি। কাল সকালে দেখবেন, কে সবার আগু-আগু যাচ্ছে।'

'বল কী! কে সে?'

সরা জবাব দেয়—'আবার কে? ডাক্তোরদিদি।'

'এ্যাঁ! স্বর্ণ! স্বর্ণলতা! গোরাংবাবুর মেয়ে?'

'হু গো। তিনিই তো কদিন থেকে মিটিং কল্লেন গাঁয়েগাঁয়ে। উদিকে রতনপুরের সেই ওমর শেখ—শেখদাদাও মেয়েকে দেখতে এসে সব শুনেছিল। ওমরদাদাকে তো জানেন—সব সময় তিরিক্ষি মেজাজ। সেও খুব ক্ষেপেছে। সৈদাবাদের জমিদারের কাছে গিয়ে খুব লম্ফঝম্প করে এসেছে। এ কাজটা উচিত হয়নি। ওনাদেরই তো সম্পত্তি ছিল ঝিলটা। তদ্বির করলে দখল পেতেন। তা না করেই তো সরকারি খাস তালুকে চলে গিয়েছিল। এখন সুযোগ পেয়ে পাদরি ডেকে নিয়েছে নিলামে। যাই হোক, ওমরদাদাও এর মধ্যে আছে'।

লখা বলে, 'অবিচারটা দেখুন। ভগবানের জলা! আমরা সেখানটায় চরে খেয়ে চিরকাল বেঁচে থাকি। আজ এসে পাদরি বলে, খাজনা দিতে হবে। সেলামি দিতে হবে মাথাপিছু এক আনা পয়সা। একটা সিকির মুখ দেখিনি—তো একটা আনা! শালা যা আছে, কপালে! নয়তো জেলেই পচে মরব। হেরুর মতন! না কী রে দাদা?'

মরা জেষ্ঠোর গাম্ভীর্যে জবাব দেয়—'তা বই কি।'

জুহা যখন মাঠে নামলেন, তখন মনে হল তিনি এক দিগ্বিজয়ী ঘোড়া। শিশিরে পাজামা ভিজে ঢোল হল। ধানের শীষ আলের ওপর উপচে এসে এসে পড়েছে। সেই শীষ দলে হাঁটতে থাকলেন।

ফার্স্ট সিগনালের কাছে লাইন পেরিয়ে বটতলা ঘুরে স্বর্ণর বাড়ি পৌঁছলেন।

ফের চাপা গলায় ডাকতে থাকলেন—'স্বর্ণ, ও ও স্বর্ণ, মা স্বর্ণলতা!'....

উনিশ

ওমর শেখের কীর্তি

আকাশে তখন 'ঝুঝকি' তারার উদয়, হিন্দু মতে ব্রাহ্মমুহূর্ত, আর মুসলিম মতে 'সোবেহ, সাদেক'—জুহা মৌলবী নমাজের জন্যে তৈরি হয়েছেন, সেই সময় বাইরে কোথাও ঢোল বেজে উঠল ডিম্ ডিম্ ডিমা ডিমা।

জুহা কান পাতলেন। ঢেঁড়রা দেওয়া হচ্ছে এই অসময়ে—কীসের? মানুষের জেগে ওঠার সময় হয়নি, সবে কিছু কাক বাঁশবনের ডগায় বসে চাপা কণ্ঠস্বরে ও সংশয়ে একটি দিনের কথা ঘোষণা করছে, হাল্কা কালো একটা রঙ খোদাতলার দুনিয়া জুড়ে রহস্যের শেষ খেলা চলেছে। আর, এসময় কি চরণ চৌকিদারের মাথা খারাপ হল হঠাৎ? জুহা মনে মনে হেসে বলেন, ব্যাটা উল্লুক নেশাখোর শয়তান! নেশার ঘোরে সময় ভুল করেছে নির্ঘাৎ।

তারপরই যথারীতি শোনা গেল চরণের গলা : 'এই হেঁদুমোছলমান ছোটবড় তাবৎ পোজা সব্বসাধারণকে কহা যায় কী...'

হঠাৎ চরণের গলা ডুবিয়ে অতিশয় হেঁড়ে বিকট ধরনের একটি কণ্ঠস্বর জাগল যে আওয়াজ শুনে সারা গাঁয়ের ঘুম মুহূর্তে ভেঙে গেল নির্ঘাৎ।

কার গলা চিনতে পারলেন না জুহা।....'আজ থেকে সমুদায় লোক যত খুশি রাঙামাটি ঝিলে নামিবা, যাহা প্রাণ চায় করিবা, শাকশামুক তুলিবা, গুগলি ও মৎস্য ধরিবা, ফাদার সাইমন সাহেবের তাহাতে আপত্তি নাই—তিনি তাবৎ প্রজা-সাধারণের জন্য ঝিল ছাড় দিয়াছেন—নন্—ন্—ন্!'

পাঁচিল থেকে মুণ্ডু বাড়িয়ে দিলেন জুহা। খুব ঢ্যাঙা একটা লোক, একটু কুঁজোও বটে, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, পরনে থানের লুঙি, চুল ছোট করে ছাঁটা, পায়ে কাঁচা চামড়ার ভারী পাম্পসু জুতো, কাঁধে ঝোলা আর হাতে একটি ছোট্ট মোটা লাঠি। সে আকাশে মুখ তুলে কথাগুলো ছড়াচ্ছে।

তার চিনতে ভুল হল না। সেই ওমর শেখ! সেই গীতা—বাইবেল-কোরাণ-পুরাণওয়ালা কিম্ভুত প্রাণীটি—যাকে আসন্ন বিদ্রোহের নায়ক ভেবে সারারাত ধরে খুশি ও বিস্ময় অনুভব করেছেন জুহা, যার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আজ সকালে ঝিলে গিয়ে যার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পুলিশের ও পাদরি লাঠিয়ালদের ঘায়ে শহিদ হবার সংকল্প করেছেন, সেই ওমর!

নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। রি রি কবে সারা শরীর জ্বলে উঠল।

ওমর শেখ মৌলবীর মুণ্ডটি দেখামাত্র ঘোষণা থামিয়ে বলে উঠল, 'আস্‌সালাম্ আলাইকুম মওলানা সাহেব!'

জুহা মুণ্ডু সরিয়ে আনলেন। উঠোন থেকে বেগমসায়েবা রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'কী? কী হয়েছে?

মৌলবী গর্জে বললেন, 'চোপরাও!' তারপর গটগট করে বেরিয়ে গেলেন মসজিদের দিকে। এখন রাত শেষ—সুতরাং বাড়ির বাইরে যেতে সরকার আটকাবে না। ঘোষকদের পিছনে ততক্ষণে ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। হনহনিয়ে ভিড়কে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন জুহা। ওমর শেখ ফের দ্বিগুণ জোরে ঘোষণাটা করতে করতে গাঁয়ের শেষদিকে এগোল।

মসজিদের ভিতর আবছা অন্ধকারে সেরাজুল হাজি বসে রয়েছে একা। বাইরে জনা তিন মুরুব্বীগোছের লোক বদনায় জল ঢেলে 'অজু' (প্রার্থনার আগে প্রক্ষালন) করছে। জুহা নিঃশব্দে 'অজু' করে ভিতরে ঢুকলে হাজি সায়েব বলল, 'পাদরি ঝিল ছেড়ে দিয়েছে। কাল রাতে আমাদের সব ডেকেছিল। ওমরও ছিল।'

বাধা দিয়ে জুহা গম্ভীর মুখে বললেন, 'খোদার ঘরে কাফেরদের সম্পর্কে কথা বলা হারাম হাজি সাহেব!' সেরাজুল হাজি নিশ্চয় মুচকি হাসল, স্পষ্ট দেখা গেল না।....

ওখানে স্বর্ণও হুড়মুড় করে উঠে বসেছিল। তখন বেশ ফরসা হয়েছে। ঢেঁড়রার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। একটা নতুন ধরনের দিন তার সামনে—তাই নিয়ে সারারাত অস্থির থেকেছে সে। শেষরাতে ঘুম এসে গিয়েছিল, তখন স্বপ্নেও নিজেকে দেখেছে রাঙামাটির ঝিলে সাঁতার কাটছে, আর কী সব ঘটনাও ঘটছিল—হঠাৎ এই আওয়াজ।

স্বর্ণ বেরিয়ে এসে সব শুনে ভীষণ অবাক হল।

ওমর শেখ তাকে দেখে এগিয়ে এসে নমস্কার করল প্রথমে। তারপর চরণ ও ঘগা বায়েনের উদ্দেশে বলল, 'বাবাসকল! এবাব আমাকে ছুটি দাও। তিনখানা গাঁ ঘুরলাম সেই ঝুঝকি ভোরবেলা থেকে—এখন ওই দ্যাখ, মামা লাল হয়ে উঠেছে। এবার মামার গুণের ভাগ্নে হয়ে বাকি তিনখানা তোমরাই সারো।' বলে সে আঙুলের গিট গুনে গ্রামগুলোর নামও বলে দিল—'এক গোবিন্দপুর, দুই মধুপুর, তিন যদুপুর। তারপরে গিয়ে ফাদার সাইমনকে বলবা কী, শেখদাদা তেনার সঙ্গে দুপুরবেলা সাক্ষাৎ করবে। কেমন?'

চরণ একগাল হেসে বলে, 'লিচ্চয়।'

ঘগা মাথা নুইয়ে বলে, 'তবে যেতে আজ্ঞে হয় শেখদাদা?'

'হু—তোমরা এগোও।'

নকীবদ্বয় হনহন করে রেল লাইন ধরে উত্তরে আপের দিকে এগিয়ে চলে। এবং শূন্য স্টেশনের সামনে কেন কে জানে ঘগা ঢোলে বার দুই আওয়াজ তুলে যায়—'চাকুম চাকুম'! আওয়াজটা দেওয়ালে জোরে প্রতিধ্বনিত হয়।

স্বর্ণ ওমরের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। ওমর বারান্দায় উঠে বলে—'সে অনেক কথা মা স্বর্ণময়ী। আপনি ধীরে সুস্থে বসে শুনুন। আমি যদি দোষ করে থাকি, আপনার পায়ের লাথি মারুন ছেলের মাথায়—আর যথার্থ কাজ করে থাকলে এক পেয়ালা চা খাওয়ান।'

স্বর্ণ শুনতে চায়। সে নিঃশব্দে ডাক্তারখানায় ঢোকে। ওমর তার পিছনে পিছনে ঢোকে। তারপর ওমর তার শাস্ত্রভরতি ভারী ঝোলাটা সসম্ভ্রমে টেবিলে রেখে একটা চেয়ারে বসে।

স্বর্ণ দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

ওমর একটু কেশে তার চীনা ছাঁদের মুখ ও মাকুন্দে চিবুকে হাত বুলিয়ে বলে, 'আপনার সঙ্গে সেই তো কাল সন্ধেবেলা কথা—তারপর এক কাণ্ড। মতি বায়েনকে তো ভালই চেনেন। মিটিং তো আপনিও ভিতরে-ভিতরে খুব করলেন কদিন, আমিও করলাম—কিন্তু মতির সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, সব ব্যানাবনে মুক্তো ছড়ানো হয়েছে।

স্বর্ণ দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

'মানে খুব সহজ। আপনাকে এলাকার ছোটবড় সবাই মুখে মান্য করে বটে, ভিতরে অন্যরকম। স্বার্থটা নিজেদের—তাই খুব আগ্রহ দেখাল, হ্যাঁ—সবাই মিলে কথামতো ঝিলে নামব, দেখি কী করতে পারে ওনারা, এদিকে ভেতরে-ভেতরে কেউ কেউ বলে ডাক্তোরবাবুর মেয়ের কথায় হুট করে ঝাঁপিয়ে পড়া কি ভালো হবে? এইরকম আকথা-কুকথা সব উঠল ওদের মধ্যে। সেসব শুনলে আপনি কষ্ট পাবেন মনে। শালারা কি মানুষ মা? যদি মানুষই হবে, তাহলে চিরকাল পড়ে পড়ে মার খায়? মতি আমাকে সব খুলে বলল। বললে যে কাল সকালবেলা কজন কথামতো যায় দেখো শেখদাদা! হুঁ—যেত, যদি অন্য কেউ এসে সামনে দাঁড়াত। ডাক্তোরবাবুর মেয়েকে আমরা বিশ্বাসই করি না।...মা স্বর্ণময়ী, রাগ করবেন না আমার ওপর। ছোটলোকের ছোট মুখ—সামনে এক বলে, পিছন বলে অন্যরকম। তাই গতিক বুঝে আমি করলাম কী, সোজা ফাদারের কাছে গেলাম। ব্যাটা আমাকে খুব খাতির করে। বাইবেল নিয়ে কথাবার্তা বলি কি না—খুব ভাব আমার সঙ্গে। তা, ফাদার সাহেবও দেখলাম ব্যাপারটা আগেই জানতে পেরেছে। একথা ও কথার পর আমাকে বললে, দেখ ব্রাদার ওমর, আমি চাই না সবাই আমাকে মন্দ ভাবুক...'

স্বর্ণ বাধা দিয়ে বলে, 'থাক। বসুন, চা খাবেন।'

ওমর হেসে উঠল। অমন প্রচণ্ড হাসি সচরাচর শোনা যায় না।

একটু পরে চা খেতে খেতে হঠাৎ সে বলল, 'স্বদেশীবাবুদের সঙ্গে আমার ইদানীং চেনাজানা হয়েছে। চারদিক দেখে শুনে আমার মনটা ক্রমে ক্রমে ওদিকেই ঢলে পড়ছে, বুঝলেন মা? আমি ভাবছি কথাটা—কিছুদিন থেকেই ভাবছি—আমি স্বদেশী করব। চরকাও কিনে রেখেছি একখানা। দেখি, কী হয়।'

স্বর্ণ কোনও মন্তব্য করল না।

'হ্যাঁ মা। ওই আমার রাস্তা। ধর্ম টুঁড়ে টুঁড়ে তো জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। কিছুই পেলাম না। এখন একটা কাজের মতো কাজ তো করতে হবে। জীবনটা আবাদ করতেই হবে। মহাত্মাজি নন-কোঅপারেশনের ডাক দিয়েছেন। বেলডাঙায় খুব গোলমাল হয়েছে শুনলাম। বেলডাঙায় আমার সহপাঠী বন্ধু আছে—সত্যবাবু। তার জেল হয়েছে।'...চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে ওমর ফের বলে, 'আপনি কিছু বলছেন না মা!'

স্বর্ণ অস্ফুট স্বরে বলে, 'কী বলব?'

ওমর তার দিকে একটুখানি তাকিয়ে থাকার পর বলে, 'আজ তাহলে যাই, স্বর্ণময়ী।'

স্বর্ণ মাথা নাড়ে।

ওমর শেখ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। বেরিয়ে যাবার মুখে ঘুরে সে একবার বলে, 'বাবার খবর ভাল তো? চিকিৎসা কেমন চলছে?'

'ভাল।'

ওমর বারান্দা থেকে নেমে স্টেশনের দিকে যায়। সূর্য উঠেছে। হেমন্তের শিশির আর কুয়াশা এখনও স্পষ্ট। সামনের মাঠে শিকারিদের তাঁবু, সেদিকে এগিয়ে যায় সে। হয়তো বাঘের খবরটা জানতে চায়।...

স্বর্ণ চুপচাপ ভাবছিল। এ কী জীবন তাকে ঈশ্বর দিয়েছেন! কোনও কাজে লাগে না, লাগানো যায় না। একটার পর একটা পতনের শব্দ। পরাজিত হয়ে পিছু হটা। এ জীবন কাম্য নয় বলেই একদিন ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছে মরতে গিয়েছিল। হয়তো সেদিন আজকের মতো স্পষ্ট করে কিছু বুঝত না—কিন্তু এটুকু অন্তত জেনেছিল যে এই বিরাট পৃথিবীতে তার অস্তিত্বটা বড় গোঁজামিল।

তাবে কি ওমর শেখের মতো স্বদেশী করতে ছুটে যাবে? ক্রমশ চারদিক থেকে যে উত্তাল ঝড়ের শব্দ তার কানে ভেসে আসছে, সেই ঝড়ের গতিতে নিজেকে ভাসিয়ে দেবে?

এলাকায় শিক্ষিত লোক নেই বললেই চলে। তাই এখনও এখানে ঝাপটা এসে লাগেনি। তাছাড়া স্বর্ণের পক্ষে ওখানে কিছু করাও কঠিন—একটা প্রমাণ তো সদ্য পেল। তার কথার কেউ সত্যিকার মূল্য দেয় না। সবাই তাকে জানে চরিত্রহীনা—একটা নচ্ছার প্রকৃতির মেয়ে। কমপয়সার ওষুধ পায় বলেই যেটুকু ভক্তি। এ কোন সৃষ্টিছাড়া জায়গায় বাবা এসে ঘর বেঁধেছিলেন!

অথচ এখান থেকে যেতেও ইচ্ছে করে না কোথাও। এত ভালো লাগে ওই স্টেশন, 'ধুলিউড়ির' মাঠ, সুন্দর নদী ভাগীরথী, রাঙামাটির পথগুলো, স্বপ্নভরা ওই সব ঐতিহাসিক টিলা! চৈতক তাকে কী একটা দিয়ে গেছে—কতক্ষণ ও মুহূর্তের ভালো লাগার স্মৃতি। কত সন্ধ্যা ও জ্যোৎস্নার রাতে ওই মাঠটাতে ঘোড়ার পিঠে ছুটে চলার সময় আবছা কী অনুভূতি তার চেতনায় ধরা দিত—যেন কী ঘটবে এখানেই, অন্য কোথাও নয়।

স্বর্ণ আনমনে বসে থাকে।

এদিকে তিনপাহাড়ি যাওয়া দরকার, পা ওঠে না। সুধাময়ের কথা ভাবতেই ঘৃণায় তার মনে জ্বালা ধরে যায়। হেরুর ছেলেটারও একটা সদ্গতি করা খুবই দরকার ছিল। ইয়াকুব ওকে নষ্ট করে ফেলছে দিনে দিনে।...

কয়েকদিন পরেই স্বর্ণ ঠিক করল, তিনপাহাড়ি যাবে।

সেই সময় একটা বড় খবর পেল—ওমর শেখকে স্বদেশী করার অপরাধে জেলে ঢোকানো হয়েছে।

জুহা মৌলবীর কাছে গিয়েই খবরটা পায় স্বর্ণ। সে গিয়েছিল, কীভাবে যেতে হবে তিনপাহাড়ি, উন্মাদাশ্রমটা কোথায়—এইসব ঠিক ঠিকানা জানতে।

সব জানিয়ে জুহা বলেছেন, ওমর ঠিক রাস্তাই ধরেছে। ওই জাহেল (মূর্খ) ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ছাড়া আমারও বাঁচার রাস্তা নেই।

কিন্তু ওমর শেখের জেহাদটা কী রকম? জুহা মৌলবী তাও বলেছেন স্বর্ণকে। মৌলবীর মনে যেন একটা হীনমন্যভাব বোধ জেগে গেছে এ ব্যাপারে—স্বর্ণের তাই মনে হয়। তুই ব্যাটা শেখের বাচ্চা, বুনো, অল্পবুদ্ধি, নাদান ওমর। তুই কিনা ইংরেজের চোখে রীতিমতো একজন 'দুশমন' বনে যেতে পারলি। তৌবা, তৌবা। এই ইংরেজ জাতটার মতো বেঅকুফ আর নেই দুনিয়ায়।

মৌলবী দুঃখের মধ্যে হেসে খুন।...আরে, ওই জংলি নি-জেতে লোকটাকেও ইংরেজ বাহাদুরের ভয়—যার কলিজা একটা বিল্লির মতো, যার ফুসফুস একটা চুহার মাফিক! ও পারেটা কী?

এইসব বলে জুহাসাহেব ওমরের স্বদেশী ও গ্রেফতার হওয়ার কিছু বিবরণও দিয়েছেন। সেদিন স্বর্ণের বাড়ি থেকে সোজা নাকবরাবর হেঁটে ওমর শিকারিদের তাঁবুতে যায়। বাঘটার খবরাখবর নেয়। তারপর তাকে দেখা গেছে ধুলোউড়ির মাঠ পেরিয়ে সিধে গঙ্গার দিকে যেতে। সেখানে শম্ভু ঘেটেল তাকে পার হতে দেখেছে। তারপর গেছে ব্যাটা বেলডাঙার বাজারে! একটা বড়সড় সভা হচ্ছিল সেখানে। এক নেতা বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে ওমরের রক্ত গেল গরম হয়ে। অমনি সে লাফিয়ে সোজা উঠে পড়ল সভাপতির সামনের টেবিলে। আচমকা ইংরেজের মা-মাসি তুলে গাল দিতে শুরু করল।

ওমর নেচে নেচে যা সব বলেছে, জুহা তাও বর্ণনা করেন। ওমরের বক্তৃতা অনুকরণ করেন তিনি : 'ওরে ভাই দেশবাসী, ওরে ভাই চাষী, তোদের আখের ভুঁয়ে ঘোগ হয়েছে সেই ঘোগ (ছেঁদা বা গর্ত) তুই পায়ে করে মার্ (বন্ধ কর্)—সেই ঘোগের নাম ইংরেজ, সেই ঘোগের নাম ব্রিটিশ, সেই ঘোগের নাম সাদা চামড়া। আর, ওরে ভারতবাসী তোরা তেত্রিশ কোটি মুখে ভাত খেয়ে একবার কুলকুচো করলে সেই এঁটো জলে তামাম ব্রিটিশ দীপপুঞ্জ ভেসে যায়!...লোকে ওমরকে জোর হাততালি দিলে। কারা মালা পরালে। তারপর এক দারোগা (আফতাব খানেরই কোন স্যাঙাত) কোত্থেকে এসে ওমরের হাত ধরে বললে—আসুন, জেয়াফৎ (নেমন্তন্ন) খাবেন শ্বশুরবাড়ি।' আর সঙ্গে সঙ্গে সভা ছত্রখান। লালটুপি গজিয়ে উঠল চারদিকে। হইচই পড়ে গেল। ওমর আর আরও কজনকে পুলিশ বাজারের পথে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এদিকে তাদের মাথার ওপর মেয়েটা খই ছিটোচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, বাড়ির ছাদে, উলু দিচ্ছে!'

হুঁ, ওমর ওই একটুতেই প্রচণ্ড নাম কিনলে! মৌলবী ঈর্ষায় ভিতরে-ভিতরে জ্বলে পুড়ে মরছেন। বারবার দাঁত ঘষে বলছেন, 'আমিও বেরিয়ে পড়ব, আমিও বেরিয়ে পড়ব। শুধু এই নাবালকগুলোর জন্যে একটুখানি পিছুটান! ওমর পারবে না কেন? ওর তো

কোনও পিছুটান নেই! ব্যাটা যথার্থ স্বাধীন প্রাণীবিশেষ। সেজন্যেই তো ওকে হিংসে করি! সত্যিসত্যি ওমর একটা কীর্তি করেছে বটে।'

জুহা সায়েব সেই কীর্তির হিংসের ছটফট করে একটা পথ খুঁজছেন। খোদাতালা তাঁকে একটা বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কোনও বিশেষ কাজে লাগাতে পারছেন না। এর জন্য আখেরাতে (পরলোকে) তাঁকে খোদাতালার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হবে—এ্যাই বান্দা শামসুজ্জোহা!' দুনিয়ায় কী শ্রেষ্ঠ কাজ করেছিস, হিসাব দে। তখন কী বলবেন জুহা? মাথা হেঁট করে থাকতে হবে তাঁকে। তাঁর কাঁধের দুই সাক্ষী ফেরেশতা (দেবদূত) নীরব থাকবে—কারণ, এই মনুষ্যটি পাপ বা পুণ্য কিছুই করেননি। ইনি এক অদ্ভুত আত্মা! ইনি ঈশ্বরকেও সমস্যায় ফেলেছেন।

এরপর আচমকা হা হা করে কেঁদে ওঠেন জুহা মৌলবী। তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরের দাওয়ায় ঝুঁকে অবাক চোখে চান। সন্তানসন্ততিও কাঠ হয়ে দাঁড়ায়। স্বর্ণ কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করে, আর সেইসময় পশ্চিমে উঁচু রেলব্রিজ পেরিয়ে যেতে থাকে একটা রেলগাড়ি, তার বিকট শব্দ ফুরোতে চায় না এবং শব্দসমূহের মধ্যে সকলেরই মনে হয় লাইনের ওপারে আরোয়ার জঙ্গলে বুড়ো রোগা সেই বাঘটা যেন একবার দুবার অথবা তিনবার ডেকে উঠল।...

কুড়ি

আনন্দসংবাদ

পরদিন সকালে স্বর্ণ তিনপাহাড়ি যাবে! আর সেই রাতের শেষ যামে তার দরজায় কে ঠুকঠুক করে ঘা দিল। স্বর্ণ ঘুমোয়নি। ঘুমোতে পারছিল না। খাটের কোথাও ঘুণপোকাটা আজ বড় জ্বালাচ্ছিল। মাথার ভিতরে যেন ধারাবাহিক তার দাঁতের শব্দ। সেইসময় কয়েকবার বাইরের ঘরের কপাটে ঠুক ঠুক ঠুক ঠুক। স্বর্ণ ভাবে, জর্জ।

কী সাহস ওর! ভুরু কুঁচকে একটু অপেক্ষা করে। বুক কেঁপে ওঠে এবার। কী চায় জর্জ—এই অসময়ে? নাকি—তাহলে বাঘটা অবশেষে মারা পড়েছে। এবং পুরস্কারের দাবি নিয়ে সে হাজির হয়েছে এখন? স্বর্ণ ভয়ে আরও কাঠ হয়। স্বপ্নের ঘোরে বলতে চায়, না না না! তার ঠোঁট কাঁপে! ফের কপাটে শব্দ ওঠে, ঠুক ঠুক ঠুক!

তখন মরীয়া হয়ে স্বর্ণ বলে, 'কে?'

চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'আমি মা, আমি ইয়াকুব।'

ইয়াকুব সাধু! লাফিয়ে উঠে পড়ে স্বর্ণ। লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে দেয়। এঘরে এসে একটু ইতস্তত করে। ভুল শুনল না তো? সে ফর বলে—'কে?'

'আমি ইয়াকুব, মা। তিনপাহাড়ি থেকে আসছি।'

দরজা খুলে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ায় সে। ইয়াকুব সাধুর সেই চেনা মূর্তিটি হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে। লাল ফতুয়া আর লাল লুঙি, বগলে ঝোলা, পিঠে বোঁচকা জড়ানো, এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে কমণ্ডলু, জটাজুট দাড়িগোঁফ, রুদ্রাক্ষ আর পাথরের মালা! ফকির না সাধু—সাধু না ফকির! আর বারান্দায় আরেকটি ক্ষুদে মূর্তি—পেন্টুল কুর্তাশোভিত, একরাশ চুল, রাঙা শান্ত মুখ, দপদপ করে হঠাৎ জ্বলে ওঠে বাতিল আলোয়। বাইরে শেষপ্রহরের শেয়ালের ডাকের সঙ্গে গলা মেশায় কয়েকটা পেঁচা। ইয়াকুব ওকে ডাকে—'চলে আয় বাপ, নির্ভয়ে চলে আয়। মা—মা জননী রে, স্বয়ং জগদম্বা। গড় কর্ ব্যাটা, ধুলো চাট্ চরণের, অক্ষয় পুণ্যি!'

তবু হেরুর ছেলে আসে না। স্বর্ণের চোখ থেকে চোখ নামায় না সে। স্বর্ণও। তারপর মৃদু হাসে ডাক্তারের বিধবা যুবতী মেয়ে।...'ভেতরে এসো!'

ছোঁড়াটা ভেতরে ঢোকে। চারিদিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। চিনতে চেষ্টা করে হয়তো। ইয়াকুব নিজে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর বলে, 'হঠাৎ চলে এলাম মা জগদম্বা! ওখানে লোকেরা জ্বালাতন শুরু করলে। শেষঅবধি পুলিশ লাগালে। বলে আমি নাকি চুরিডাকাতির দল ফাঁদছি। শালা মানুষ কি মানুষ মা?'

বলতে বলতে সে ধুপ করে মেঝেয় বসে পড়ে। স্বর্ণ ছোঁড়াটার কাঁধে হাত রেখে বলে—'কী রে, চিনতে পারছিস তো?'

'শালা নেমকহারাম মা!' ইয়াকুব অক্লেশে বলতে থাকে।...'সেই অট্টুকুন থেকে গু-মুত ঘেঁটে মানুষ করলাম। তবু পোষ মানল কই? এদানিং সব সময় বোল ধরেছিল—মায়ের কাছে যাবো, মায়ের কাছে যাবো!'

'কার কাছে?'

চাপা হাসে সাধু।...'হু, সেটা তো ঠিকই। একবার আপনার ছেনেহ (স্নেহে) পেয়ে শালাব্যাটা ধন্যি হয়ে যেয়েছে, তা আবার পাক্। সেই আশায় লিয়ে এলাম। একে গ্রহণ করুন, মা। আমি তীখে রওনা হই চিরকালের মতন। এ কেবলই আমার পথের কাঁটা হয়ে ফুটছে গো!' যেন আফশোজে সাধু মাথা দোলায়। অস্ফুট আক্ষেপ প্রকাশ করতে থাকে।

'কিন্তু ও তো থাকবে না, ফের পালিয়ে যাবে।'

ইয়াকুব লাঠি তুলে শাসায় হেরুর ছেলেকে।...'খবর্দার, খবর্দার! এবার পালালে ঠ্যাঙ ভেঙে দেব শালার!'

স্বর্ণ চিন্তিতমুখে বলে, 'কিন্তু এখানে রাখব কী করে? পাদরি হামলা করবে যে!'

'কে? পাদরি? ইয়াকুব একটু ভাবে। তারপর তার মুখটা আগুনের মতো জ্বলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলে, 'পাদরিকে ছেলের ভার তো আমিই দিয়েছিলাম—ন্যায্য কথা বলতে গেলে, ছেলের মালিক আমি। আমিই পাদরিকে বলে যাব। আপনি ভাববেন না মা।'

স্বর্ণ হেরুর ছেলেকে বলে, 'কী রে?' থাকবি তো আমার কাছে?'

সে ঘাড় নাড়ে। থাকবে।

বাকি রাতটুকু গল্পে গল্পে কাটিয়ে ও চা খেয়ে ইয়াকুব ওঠে। ভোরবেলা ফাদার সাইমনের কাছে হাজির হবে সে।

সেদিনের মতো তিনপাহাড়ি আর যাওয়া হল না স্বর্ণের। যাই-যাই করে আলস্য চাপে ক্রমাগত। আসলে এই ছেলেটার জন্যেই যেতে চেয়েছিল যেন। বাবা যা ছিলেন, তাই আছেন। গিয়েই কি পাগল ভালো করতে পারবে সে? আরও কটা দিন থাক, বরং।

ফাদার সাইমনকে ইয়াকুব বলে গিয়েছিল—তার প্রমাণ স্বর্ণ পেল। চরণ চৌকিদার এসে জানিয়ে যায়, পাদরিবাবা হেরুর ছেলের জন্যে মাথা ঘামাতে চান না। তাঁর এখন বড় দুরবস্থা, সর্বমোট দশবারোজন লোক জাত দিয়ে দীক্ষা নিয়েছে। তারা সবাই আবার গোবর খেয়ে জরিমানা দিতে জাতে উঠেছে। পাদরিবাবা টের পাচ্ছেন, এখানে মাটি বড় পুরনো আর শক্ত। খুব একটা সুবিধে হবে না। তাই তল্পি গুটোতে চান।

এখন স্বর্ণ হেরুর ছেলেকে পড়ায়। বাংলা ইংরেজি কতরকম বই এনে দিয়েছে বহরমপুর থেকে। তার নতুন নাম রেখেছে আনন্দ। সে এখন নির্ভয়ে খেলাধুলো করে সামনের মাঠে। সে গাছে চড়তেও ওস্তাদ। ক্রমশ তার নতুন স্বভাব ঠিকরে বেরোতে থাকে। দুষ্টুমি করতে পিছপা হয় না। স্টেশনে কোনওরকম ফাদার সাইমনকে দূর থেকে দেখলেও ভয় পায় না। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, এই হনুমান কলা খাবি? স্বর্ণ তার কাণ্ড দেখে হাসে।

জর্জ সেই থেকে আর আসেও না রেল ডিঙিয়ে—দেখা হলেও কথা বলে না। স্বর্ণও বলে না—বরং যেন ভয় পায়। বাঘ মারার বাতিক তার গেছে মনে হয়। বন্দুকহাতে আর তাকে রেললাইন ধরে জঙ্গলের দিকে যেতে দেখা যায় না। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকে কখনও এক গম্ভীর শান্ত মূর্তি—তার দৃষ্টি আপে কিংবা ডাউনের দিগন্তে।

স্বর্ণ যখন রোগী দেখতে গাঁওয়ালে যায়, আনন্দ দরজা বন্ধ করে ঘরে জানলার পাশে চুপচাপ বসে থাকে। তখন সে ভারি বাধ্য ছেলে। কেউ ডাকলেও বেরোয় না বা দরজা খোলে না। তার শরীরে হেরুর কোনও ছাপ খুঁজতে চায় কেউ, মেলে না। রাঙী বাউরান ছেলেকে পুরো ধরে রেখেছে শরীরে ও স্বভাবে। শুধু হাসিটা বাদে—হাসলে মনে পড়ে এক বিশালাকায় বাউরিডাকাতের মুখের হাসি অবোধ, নির্মল আর স্পষ্ট।

এর কিছুদিন পরেই এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে।

সেই ধূর্ত কিংবদন্তি ওঠা বাঘটা মারা পড়ল—স্বয়ং জুহা মৌলবীর হাতেই!!

ঘটেছিল ঠিক এরকম।

শিষ্যরা মৌলবীকে একটি দুধেল গরু দিয়েছিল। তার জন্যে একটি গোয়ালঘর বানানো হয়। এক প্রত্যূষে মৌলবী যথারীতি মসজিদে গেছেন নমাজ পড়তে। বেগম সদ্য নমাজ সেরে বারান্দায় বসে সুর ধরে কোরাণপাঠ করছেন। হঠাৎ গোয়াল থেকে হুড়মুড় করে বাছুরটা বেরিয়ে আসে এবং ভিতরে একাট অস্পষ্ট হুটোপুটি শব্দ শোনা যায়। বাছুর দুধ খেয়ে ফেলেছে ভেবে বেগম দৌড়ে গোয়ালে ঢুকে পড়েন। দেখেন গরুটা খুঁটি থেকে অসম্ভব টানটান হয়ে ফোঁসফোঁস করছে এবং কোণের দিকে একটা মোটাসোটা কুকুর বসে রয়েছে। তিনি তখন কুকুরটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করলেন। কুকুরটা গ্রাহ্যও করল না। অগত্যা কুকুর নিয়ে আর ব্যস্ত হবার কারণ ছিল না, তাই তিনি বেরিয়ে এলেন। একটু পরেই মৌলবী ফিরলে তাঁকে বললেন ব্যাপারটা।

জুহা সাহেব মুডে ছিলেন। বেয়াদপ কুকুরের জন্যে আজ দুধটা বরবাদ হল! নির্ঘাৎ বাছুর ভয় পেয়ে দড়ি ছিঁড়ে সব দুধ শেষ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নানা ব্যাপারে উত্যক্ত হয়েইছিলেন। এই মুহূর্তে সব রাগ পড়ল হতভাগ্য প্রাণীটার ওপর। উঠোনের কোণায় একটা কাঠকাটা পুরনো টাঙি পড়ে ছিল—তার বাঁটটা অর্ধেক নেই। মৌলবী সেটা তুলে নিয়ে বীরবিক্রমে গোয়ালে ঢুকলেন। তারপর 'কই সে শয়তান, কই সে হারামি' বলে গর্জন করে প্রচণ্ড জোরে টাঙিটা বসিয়ে দিলেন জন্তুটার মাথায়। অমনি একটা আকাশপাতাল 'গাঁক গাঁক' আওয়াজ উঠল। মৌলবী পলকে ডিগবাজি খেয়ে পড়লেন। বেরিয়ে এসে 'বাঘ বাঘ—কুকুর নয়, বাঘ!' বলে পাড়া মাথায় করলেন। তারপর লোকেরা জড়ো হল। হুলুস্থুলু পড়ে গেল। আর কোনও আওয়াজ নেই গোয়ালে—গরুটার ফোঁসফঁসানি ছাড়া। একজন পা টিপে টিপে এগোয় আর লাফ দিয়ে পিছিয়ে আসে। কারো সাহস হয় না ভিতরে উঁকি মেরে দেখতে। অবশেষে মৌলবী জনতার উদ্দেশে ধিক্কার জানিয়ে বলেন, 'এই তোমরা ইসলামি রক্তের বড়াই কর! আরে নাদান! তোমাদের পূর্বপুরুষ সারা দুনিয়া জয় করে বাদশাহী পেয়েছিলেন। আর তোমরা একটু কুত্তাকা মাফিক শেরের ভয়ে কাহিল হলে! ইতিহাসে আছে শেরশাহ ঘুমন্ত শের জাগিয়ে মেরেছিলেন। আজ আমিও তাই করেছি। এবার দেখছি শেরের লেজ ধরে আমাকেই টেনে আনতে হবে।'

কেউ কেউ বাধা দিল যাবেন না হুজুর, যাবেন না। ব্যাটার জান এখনও যায়নি হয়তো। ওদের একশোটা জান।'

জুহা মৌলবী গ্রাহ্য করলেন না। সেই রক্তাক্ত টাঙিটা আকাশে নাচাতে নাচাতে এবং 'আল্লাহ আকবর' হাঁক ছেড়ে গোয়ালে ঢুকে পড়লেন ফের। জনতা স্তব্ধ ও বাকশূন্য হল। কিন্তু মৌলবীর সন্তানসন্ততিরা কী ভেহে হিহি করে হাসতে থাকল! এমনকি বেগমও মুখে আঁচল চাপা দিয়ে পর্দার আড়ালে চুপি চুপি হাসছিলেন।

একটু পরেই দেখা গেল, গরুটা দড়ি ছিঁড়ে লেজ তুলে ছিটকে বেরিয়ে এল। ভিড় দুদ্দাড় ছত্রভঙ্গ হল। তারপর কিন্তু দেখা গেল, গরুটা আশ্চর্য শান্ত হয়ে উঠোনের কোণে সবজি-মাচার কাছে বাছুরটার ঘাড় চেটে দিচ্ছে।

এবং সত্যিসত্যি জুহা মৌলবী তুমুল হাসিসহ বাঘের লেজ ধরে বাইরে এলেন। হ্যাঁ, যথার্থ একটি বাঘ। তার মাথাটা প্রায় দু'ফাঁক হয়ে গেছে। জনমনে শঙ্কাশিহরন সৃষ্টিকারী ধূর্ত পশুচোর দাঁত ছরকুটে পড়ে রয়েছে। এবার সবাই এই প্রচণ্ড বাস্তবতা আঙুলে টিপে এবং মাপজোপ করে দেখতে এগিয়ে এল। কোনও সন্দেহ নেই, এটি রীতিমত বাঘই বটে। এ অঞ্চলে যে ছোটখাট বেঁটে মোটাসোটা বাঘ দেখা যায়, তাদেরই সাঙাত। এর তিনটে কষ দাঁত ভাঙা। পায়ে ও পিছনের পিঠে কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন আছে। গুলি আর বল্লমের দাগ হতে পারে। তবে সবচেয়ে লক্ষ্য করার ব্যাপার বাঘটার রক্তের রঙ। যা দেখে কেউ বলল, ভুঁষির কালি—কেউ বলল, শিমপাতার রসের মতো—আবার কেউ বলল, বাঘটা হিন্দু বিধবার মতো নিরামিষ খেতে শুরু করেছিল এদানিং, তাই এই রক্ত। হুঁ, অনেকে সায় দিল, তাই ইদানীং চুপচাপ ছিল ব্যাটা।

বাঘটা ঘিরে এইসব জল্পনা কল্পনা হচ্ছে, এমন সময় স্টেশনে তাঁবু থেকে শিকারিরা এসে হাজির হলেন। তাঁরা তো হাঁ একেবারে। শেষকালে এই হল? তাঁরা হতাশভাবে মুখ তাকাতাকি করলেন! সুগন্ধি সিগ্রেট খেতে খেতে বন্দুক কাঁধে তুলে 'ফুঃ ফুঃ' বলতে বলতে চলে গেলেন। অবিশ্বাস, নৈরাশ্য, ক্লান্তি নিয়ে তাঁরা গুটিকয় ভিজে সোনালি মোষের মতো রেল লাইনে হাঁটতে থাকলেন। সবাই বাঘের গা থেকে দৃষ্টি তুলে তাঁদের দেখতে লাগল। এ অঞ্চলে এই উচ্চাকাঙক্ষী বেচারাদের কস্মিনকালে আর কেউ দেখতে পাবে কি না ভাবনার কথা বটে!

বেলা বাড়তে বাড়তে কত মানুষ এল। তখন পর্দানসীন পরিবারের সম্মানরক্ষার্থে বাঘের লাশটা বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। সবাই একটা দিন ছুটির খাতায় লিখে দিয়েছিল। কাতারে কাতারে ভিড় আসতে থাকল। এ অঞ্চলের প্রথম উত্তেজনার বিষয় ছিল একদা হেরু বাউরি—দ্বিতীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল বাঘটা। তাই ভিড় স্বাভাবিক। দুপুর নাগাদ লেডি ডাক্তার ও তার পালিত পুত্রটিও এল। মৌলবী তাদের শতমুখে কাহিনীটি শোনালেন। শেষে ঠোটের কোণায় হেসে আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'ভাবা যায় না! আমি অবশেষে একটা বাঘ মেরেছি!'

এবং মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে সবাই জুহা মৌলবীকে স্বগতোক্তি করতে শুনত—পরবর্তীকালে, 'আমি একটা বাঘ মেরেছিলাম! ভাবা যায় না।'

তাঁর মুখে যেন দিব্যচ্ছটা ঝলমল করতে দেখেছিল স্বর্ণলতা। যেন তাঁর মধ্যে অলৌকিক অবির্ভাব ঘটেছিল এক প্রত্যুষকালে এবং সেই অলৌকিকটি প্রস্থানের পরও চিরস্থায়ী এক সূর্যাস্তরাগের মতো কিছু উজ্জ্বলতা থেকে গেলে মৌলবীর মুখে, ফুরোল না।

এবং একটি উদাসীন দীর্ঘশ্বাস ক্ষরিত হয়েছিল গোরাং ডাক্তারের মেয়ের। সে কি পরিত্রাণজনিত তৃপ্তি? নাকি অবচেতন অতৃপ্তিজনিত দুঃখ? নিরাপত্তার সুখ, নাকি বঞ্চিতার বিষাদ?

প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান হর্সব্রোকারটি এই বাঘের জন্য জান লড়িয়ে দিয়েছিল। ভাবতে গেলে গা শিরশির করে। স্বর্ণ মনে মনে গোপনে বলে, 'দুয়ো স্টেশন মাস্টার! হেরে গেলে!' ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসে। আর একপলকের একটি রক্তোচ্ছ্বাস কানের নিচে জ্বলজ্বল করে তক্ষুনি নিভে যায়। .....'হ্যালো জর্জ! ইওর গেম ইজ লস্ট! আই উইন! হিপ হিপ হুররে!'....

তো সবাই এল, এল না শুধু একজন। সে হল গোরা স্টেশন মাস্টার। সবার চোখে পড়ল ব্যাপারটা। কেউ বলল, 'খুব তড়পেছিল দেখ্ লেঙ্গা—তাই এল না।' কেউ বলল, 'সায়েবের জ্বর, শুয়ে আছে।' আবার কেউ বলল, 'জংশনে গেছে।'

তারপর বেরোলো এক বিশাল মিছিল। বাঁশে ঠ্যাঙচারটে বেঁধে বয়ে নিয়ে চলল জনতা। আর বাঘের গায়ে হাত রেখে হেঁটে চললেন জবরদস্ত মৌলবী জুহা সাহেব। তাঁর পরণে লম্বা সাদা আচকান, পায়ে সাদা পাজামা, মাথায় আরবি টুপি ঘিরে পবিত্র পাগড়ি এবং হাতে কারুকার্যখচিত লাঠি। অকুতোভয়ে সরকারি আদেশ অমান্য করে তাঁকে নিয়ে বেরোল জনতা। ভিড়ের ভিতর থেকে জুহাসাহেবকে ইংরেজ সরকার ছিনিয়ে নেওয়ার হাঙ্গামা ও উৎসাহ কি পাবেন এতটুকু?

সন্ধ্যা নাগাদ সেই বিচিত্র শোভাযাত্রা আরও দীর্ঘকায় হতে হতে সদরে পৌঁছল। কালেক্টর বাহাদুরের কুঠির সামনে সে এক লোকসমুদ্র!.....

যাই হোক, এই চমৎকার কাজের পুরস্কারস্বরূপ জুহা মৌলবী সরকারের নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পেলেন, এটাই বিশেষ ঘটনা! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে কাঠবেড়ালির সাঁকো বাঁধার মতো ব্যাপার হলেও এই ব্যাঘ্রবধ যথোচিত মর্যাদা পেয়েছিল বলা যায়। পরিণামে মৌলবী আবার যথারীতি উড়ো পাখির মতো দেশ-দেশান্তর চক্কর দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর জেহাদের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। কারণ, ততদিনে পারিবারিক দুর্দশা বেশ ঘোরতর হয়েছিল। এবং তিনি বলতেন, 'জান বাঁচানো একটি ফরজ (অবশ্যপালনীয়) কাজ। এটা আল্লাতালার আদেশ।'

এরপর লোকে তাঁকে বলত 'বাঘা মৌলবী।' কেউ কেউ বলত, 'বাঘমারা মৌলবী।' তবে উনি নিজে 'শেরে হিন্দুস্তান' খেতাবটা পেলেই খুশি হতেন। কারণ, প্রতি ধর্মসভায় তিনি তাঁর বাঘ মারার কাহিনীটি খুঁটিয়ে বর্ণনা করতেন এবং বাঘটিকে একটি প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতেন। বলতেন, 'শেরটা ছিল আসলে খোদ শয়তান—যে শয়তানকে আল্লা একদা বেহস্ত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজও ফেরেস্তারা (দেবদূতগণ) যাকে আসমানে জ্বলন্ত পাথর ছুঁড়ে ভাগিয়ে দেয়।' আকাশে উল্কাপাতের কথাই বলতেন তিনি।

বলাবাহুল্য, এসব কারণে তাঁর পসার শিষ্যকুলে বেড়ে গিয়েছিল। সত্যি তো, বাঘা বাঘা বন্দুকবাজ যাকে ঘায়েল করতে পারেনি, তাকে একজন নিরীহ মৌলবী কীভাবে নিকেশ করলেন? ঈশ্বরের দেওয়া ক্ষমতা ছাড়া এ কি সম্ভব? নিঃসন্দেহে জুহাসায়েব এক 'বুজুর্গ' (অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ), তাঁর কেরামতির মাহাত্ম্য স্বীকার করতেই হয়। এবং যেখানে তিনি যেতেন, বাঘের চামড়াটা বিছিয়ে তাতে বসতেন।

কিন্তু ঠিক সেদিনই সবার অগোচরে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল—যা আরও মারাত্মক।

সন্ধ্যার নিঝুম স্টেশনের কোয়াটারে গোরাং ডাক্তারের মেয়ে গোরা স্টেশন মাস্টারকে বিদ্রূপ করতে গিয়েছিল। তাছাড়া কেন আর যাওয়া?

স্বর্ণকে যেতে দেখেছিল শুধু একজনই—সে বালক আনন্দ। জানলায় বসে সে সব লক্ষ্য করছিল। স্টেশনে ছোটবাবু বাঙালি প্রৌঢ় মানুষটি ও খালাসি দুজন আসন্ন আপট্রেন নিয়ে ব্যস্ত। প্লাটফর্ম একেবারে খাঁ-খাঁ। কোন যাত্রীই ছিল না। তারপর ট্রেনটা আসে। ট্রেন যায়। জনাতিন যাত্রী নামে। তারাও চলে যায়।

হেরুর ছেলে যখন ঘুমে ঢুলছে, তখন লেডি ডাক্তার ফিরে আসে। বিস্রস্ত চেহারা, হাঁপ সামলাচ্ছে। চাঁদঘড়ির বউ নুন চাইতে এসে নাকি কেমন হতচকিত অবস্থায় দেখে তাকে। অনেক পরে সে কথাটা বলেছিল—কিন্তু কেউ তাতে আমল দেয়নি।

পরদিন খবর রটে যায়, গোরা স্টেশনমাস্টার জর্জ হ্যারিসন বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করেছে।.....

কিন্তু এমন যদি হয় যে স্বর্ণই তাকে বিশেষ এক মুহূর্তে খুন করে বসেছিল? হয়তো স্বর্ণকে ধর্ষণ করতে যাচ্ছিল, কিংবা স্বর্ণ ধর্ষিতা হয়েছিল—-তারপর বন্দুকবাজের বন্দুকটি তুলে নিয়ে.....

কারণ, তদন্তকারী অফিসার বলেছিলেন, 'আশ্চর্য, এভাবে বুকে গুলি করে আত্মহত্যা! সচরাচর এমন করে না কেউ। যেন এটি এক হত্যাকাণ্ড!'

তখন ফোরেনসিক বিজ্ঞান এত উন্নত হয়নি। তাহলে বন্দুকের ট্রিগারে আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করে বলা যেত হত্যা, না আত্মহত্যা।

এবং এও ঠিক যে চাঁদঘড়ির বউ অনেকরাতে লেডিডাক্তারকে খিড়কির পুকুরে স্নান করতে দেখেছিল।

দেহের অশুচিতা থেকে মুক্তির প্রয়াস?

আমাদের বর্তমান সময়ের যুক্তিজ্ঞান নিয়ে পিছনের দিকে এগোলে কিছুই কাজ হয় না। মানুষের কোন স্থায়ী শাশ্বত যুক্তি নেই—শুধু যুক্তিবোধ নামে এক বিচ্ছিন্ন বা শূন্য পাত্র আছে মাত্র।

মানুষ নিজের কাছে কী অসহায়, কী নিঃসঙ্গ! অন্ধকার রাতে এই নির্জন টিলায় বসে

আকাশ দেখতে দেখতে আমাদের তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিকের এটাই ক্রমাগত মনে এসে আছড়ে পড়ে।

ক্রমশ এই অন্ধকার কিছু সরে একাংশ মুক্ত হল। এক পরিচ্ছন্ন উজ্জ্বল রোদের দুপুর ফুটে উঠল। প্রত্নতাত্ত্বিক দেখতে থাকলেন। হ্যাঁ, ধীরে ধুলোউড়ির মাঠ দিয়ে হেঁটে চলেছে একটি সাত আট বছরের ছেলে। কোথায় চলেছে সে?

ইয়াকুব সাধুর ভিটেয় সে আনমনে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে পাশের শ্মশানের দিকে চলেছে সে। তার হাতে একটা গাছের ডাল। ছেলেটি চঞ্চল হয়েছে এবার। নাচতে নাচতে এগোচ্ছে। প্রকৃতির এই রাজ্যে সে এখন একটি মুক্ত সত্ত্বা। সে গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর শ্মশানবটের তলায় এল। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। কী যেন মনে পড়ল। একজায়গায় নরম ধূসর মাটি সরাতে থাকল। ডালটা দিয়ে খুঁড়ল। অনেকটা খোঁড়ার পর কী একটা তুলে নিয়ে দেখেছে সে।

লেডিডাক্তার আসছে ওপার থেকে গাঁওয়াল সেরে। তখন বিকেল হয়েছে। পাড়ে সে থমকে দাঁড়ায়। আনন্দ না? হতভাগার মন পড়ে আছে সাধুর ভিটেয়। আবার চলে এসেছে এখানে। ওদিক বাড়িঘরের দরজা হয়তো হাট করে খোলা। সর্বনেশে ছেলে তো!

রুষ্টা স্বর্ণ এগিয়ে আসে দ্রুত।....'আনন্দ, আনন্দ! এখানে আয়!'

আনন্দের সামনে নরম মাটির স্তূপ। একপাশে কীসব জড়ো করা। শেকড়বাকড় তুলছে হয়তো। বুনো স্বভাব আর যাবে কোথায়?

আনন্দ হাতে তুলে নিয়ে দেখায় তাকে এবং দাঁত বের করে হাসে।

'ওসব কী রে?'

সে জানে না! চকিতে দেখে নিয়ে শিউরে ওঠে স্বর্ণ। এ যে সোনার গয়না! এখানে পোতা কেন? কে পুঁতেছিল? ছেলেটা টেরই বা পেল কী করে? সে ওকে কাঁধ নাড়া দিয়ে বলে—'কেমন করে পেলি? তুই জানতিস?'

ছেলেটি বলে, 'হুঁ। খেলতে খেলতে দেখেছিলাম—সেই কবে।'

'হুঁ। সাধুবাবাকে বলিসনি বুঝি?'

'উঁহু। বলেছিলাম তো। মারতে এসেছিল। খুঁজেই পাইনি।'

'এখন পেলি যে?'

'পেয়ে গেলাম।'

'এগুলো কী জানিস?'

'কী?'

'সোনা। সোনার ইংরিজি কী?'

'গোল্ড।'

'বাহাদুর ছেলে! এগুলো কে পুঁতেছিল জানিস?'

'না।'

'তোর বাবা—ডাকাতবাবা!'

'সাধু?' বলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

'না রে হাঁদারাম, না। তোর আসল বাবা! ডাকাত ছিল সে। নে—ধুলো ঝাড়। ওঠ। আয়, এবার আমরা মজার খেলা খেলব।'

দুজনে গঙ্গার দিকে যায়! তারপর ঠিক একদিন যেমন করে আঁরোয়া জঙ্গলের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলেছিল, তেমনি করে গঙ্গার দহে ছুঁড়তে থাকে গয়নাগুলো—কিন্তু আজ একা নয়। ছেলেটিকেও কিছু দেয়। মহাসুখে দুটি প্রাণী দিনাবসানে এই ত্যাগের খেলায় মেতে থাকে কিছুক্ষণ। সব শেষ হলে দুজনেই হাতের ধুলো ঝাড়ে এবং পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে। তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে ধুলোউড়ির মাঠ পেরিয়ে দুটি মুক্ত মানুষের মতো ঘরের দিকে হাঁটতে থাকে।....

একুশ

অন্ধকার রাতে এক অন্ধ রেলগাড়ি

সে বছর বর্ষা খুব জমে উঠেছিল। স্বর্ণের উঠোনে লকলক করে লতিয়ে উঠে সবজিলতা, সন্ধ্যামণির ঝাড়ে ফুল ফোটে, গজিয়ে ওঠে ঘাস আর আগাছার ঝাড়। তার উদাসীন দৃষ্টিকে চমকে দেয় ওই আগুয়ান সবুজ ষড়যন্ত্রজাল। আঁরোয়ার জঙ্গলে চারদিক থেকে লতাপাতায় ঘিরে ফেলা অনেক আচ্ছন্ন নির্জীব গাছ সে দেখেছে। তারপর একদা শুধু দাঁড়িয়ে থাকে একটা ধুসর কংকাল, বাকলে ফাটল, খড়িখড়ি ও উদ্দেশ্যহীন একটা অস্তিত্ব শুধু। স্বর্ণ শিউরে ওঠে। নিজের অস্তিত্ব শুদ্ধ গোটা বাড়িটা আক্রান্ত।

আনন্দর দুষ্টামির শেষ নেই। বারবার তাকে খুঁজে আনতে হয়। কেউ ধরে দিয়ে যায়—'এই দেখুন, সৃষ্টিছাড়া ছেলেটা কোদলার ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোমরে দড়ি বেঁধে রাখুন ডাক্তারদিদি!'

একদিন সন্ধ্যার ট্রেনে তাকে কাটোয়া জংশন থেকে কুড়িয়ে এনে দিয়ে গেলেন এক গার্ডসায়েব। স্বর্ণকে এ লাইনে রেলের লোকজন সবাই চেনে।

এরপর তাকে সবসময় চোখে চোখে রাখতে হয়। পাদরির ভয় দেখাতে হয়। কিন্তু পাদরি সাইমনও আর ডরায় না ছেলেটা। অকুতোভয়ে তার আস্তানার সামনে দিয়ে কতবার আনাগোনা করেছে। দূর থেকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে। কিন্তু ফাদার সাইমন এখন তল্পী গুটানোর তালে আছেন। যারা সব খ্রিস্টান হয়েছিল, ভেতর-ভেতর গোবর খেয়ে জাতে ঢুকছে ফের। তাতে স্বদেশী বাবুদের আনাগোনা বেড়েছে তল্লাটে। ফাদার সাইমন চলে যাবেন। তাই পলাতক শিকারটির প্রতি তাঁর আগ্রহ আর নেই।

সেই সময় একসকাল দশটায় চাঁদঘড়ি খবর আনল। আপে তিনপাহাড়ি স্টেশন থেকে সুধাবাবু টেলিগ্রাম করেছে। সুধাবাবু এখন স্টেশন মাস্টার। চিরোটির নতুন স্টেশনমাস্টারকে অনুরোধ করেছে যথাস্থানে বার্তাটি পৌঁছে দিতে।

বার্তাটি হল : ভোর ছ'টায় গোরাংবাবু আচমকা মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং ডাক্তার এসে পড়ার আগেই মারা যান। উন্মাদ আশ্রম থেকে লাশ ডেলিভারি নিয়ে সুধাময় অপেক্ষা করছে স্বর্ণলতার। বাবার লাশটি সে নিয়ে যাক। কারণ, গোরাংবাবুর বরাবর ইচ্ছে ছিল, কোদলাঘাটের প্রিয় পরিচিত শ্মশানেই তিনি পুড়বেন।

স্বর্ণ তখনই বেরিয়ে পড়েছিল। আনন্দকেও সঙ্গে নিয়েছিল। পরের আপ ট্রেন দুপুর একটায়। তার আগে মাথা খুঁড়লেও কিছু করার নেই।

তিনপাহাড়ি পৌঁছতে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা বেজে যায়।

সুধাময় বলেছিল পৈতে ছুঁয়ে, বিয়ে করবে না এবং স্বর্ণের ভাই হয়ে থাকবে। প্রথম প্রতিজ্ঞাটা সে রাখতে পারেনি। বিমলা নামে এক দজ্জাল মোটাসোটা মেয়ের পাণিগ্রহণ করে ফেলেছিল। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটা অবশ্য রাখতে অসুবিধা হবার নয়।

ভাইয়ের কাজ অনেকটাই সে করল। নিজের আসার অসুবিধে ছিল, সেজন্য খুব দুঃখপ্রকাশ করল। এবং একটা মালগাড়ির পিছনের দিকে গার্ডের কামরার সামনে একটা খালি বগি ছিল, তাতে গোরাংবাবুর লাশটা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। গাড়ি ছাড়ার মুখে বলে গেল—'কীভাবে পৌঁছলেন, সব জানাবেন।' তারপর গাড়িটা চলতে শুরু করলে পাশে কিছুক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে এলোমেলো কিছু কথাও বলল। শেষে বলল—'কী মুশকিল! এঞ্জিনটা কানা দেখছি যে। ওহে গার্ডসায়েব, আলোর কী হল?'

গার্ডসায়েব বললেন—'বিগড়েছে। জংশনে গিয়ে দেখব'খন।'

স্বর্ণ আর আনন্দ আসছিল গার্ডসায়েবের সঙ্গে। এঞ্জিনে আলো নেই শুনে স্বর্ণের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু গার্ডসায়েবটি বাঙালি। বিনয়ের অবতার। ঝিরঝিরে বৃষ্টির রাতে সুন্দরী স্ত্রীলোককে পরলোক-তত্ত্ব বোঝালেন। সান্ত্বনা দিলেন মুহুর্মুহু। বললেন, 'তবে যদ্দিন আছি তদ্দিন লাইফটা কাজে লাগানো ভালো। আমরা কেউ কেউ বুঝি না। যেমন দেখুন না, এই আমি। শুধু গাড়ির পেছনে পাথরের টুকরোর মতো নিজেকে ঝুলিয়ে দিয়েছি। ঘোরো এখন খামোকা কাঁহা কাঁহা মুল্লুক, ঘট ঘটাং ঘট ঘটাং! বলুন না, মাল যাচ্ছে গাড়ি যাচ্ছে তো আমি শালার কী? অহিভূষণ অহিভূষণই আছে। রেলের গার্ড। চালাকির আর জায়গা পায়নি! কে কাকে গার্ড দেয়? বলুন না আপনিই বলুন?'

শোকাতুরা স্বর্ণ কিছু বলতে পারে না। কিছু বুঝতেও পারে না। এত কাছে মৃত্যুর গন্ধ নিয়ে বসে থাকতে তার অস্বস্তি হয়। সব গুলিয়ে যায়, জীবন ও মৃত্যুর যা কিছু ব্যাপার।

সুধাময় বলেছে, 'আপনি তো এখন মুক্ত। কেন শোক করবেন? এবার নতুন দমে ছুটতে শুরু করুন। দেখবেন, পিছুটান না থাকলে কত জোরে দৌড়ানো যায়। আমি টের পেয়েও নিজেকে সামলাতে পারিনি। আটকে দিয়েছে খুঁটিতে। '

সুধাময় তাকে আপনি সম্বোধন করেছে। সুধাময়ের বউ বিমলা খুব একটা আলাপ করেনি। কোনওভাবে জেনে থাকবে যে এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তার স্বামীর কিছুকিঞ্চিৎ ঢ্যামনামো ছিল। হয়তো সুধাময় নিজেই নিজের উৎকর্ষ বোঝাতে সে প্রসঙ্গের অবতারণা করে থাকবে বউয়ের কাছে। বিমলা হিংসুটেপনা দেখিয়েছে সন্দেহ নেই। মেয়েদের চাহনি ও হাবভাবের যাবতীয় কোড ডিসাইফার করতে মেয়েরাই পারে। স্বর্ণর তখন হাসির মন ছিল না বা ক্রোধেরও। তাই এড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু ফেরার পথে খচখচ করছিল কাঁটা।

'—তা এই বুঝি আপনার ছেলে?' বলেই জবাব না শুনে অহিভূষণ গার্ড আনন্দকে কোলে টানেন।—'কী নাম বাবা খোকা? কোন ক্লাসে পড? স্কুলের নাম কী?

আনন্দ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরে যায়। খোলা জায়গাটায় রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ায়। বৃষ্টিতে ভেজে। অহিভূষণ হাঁ হাঁ করে উঠেছিলেন। '—পড়ে যাবে, পড়ে যাবে খোকা!'

স্বর্ণ ডাকে—'চলে আয়। ভিজছিস কেন?'

'ছেলেরা দুষ্টুই হয়। আমিও কি কম ছিলাম?' গার্ডসায়েব বলেন। এসময় আনন্দ দৌড়ে ফিরে আসে। মুখে হাসি। গার্ডসাহেব ফের বলেন—'নাম বলোনি, আড়ি দাও।' কড়ে আঙুল বাড়ান তিনি. আনন্দ তাকায়ও না।

স্বর্ণ নামটা বলে দেয় ভদ্রতাবশত। '—আনন্দ।'

'আনন্দ! বাঃ বেশ নাম! আনন্দ। আনন্দ কী?'

স্বর্ণ নির্দ্বিধায় বলে দেয়—'রায়।'

গার্ডসায়েব অপ্রস্তুত হাসেন।...'হ্যাঁ, তাও তো বটে। সুধাবাবু বলেছিল, আপনারা ব্রাহ্মণ। এইরে! আবার জোর লাগল বিষ্টিটা! দরজা আটকে দিই।'

দরজা আটকে দিয়ে তিনি বড় সিন্দুকের মতো বাকসের পিঠে বসলেন। আনন্দ জানলায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকে। স্বর্ণ বলে—'পৌঁছতে ভোর হয়ে যাবে, তাই না?'

'ভোর কী বলছেন? গুডসট্রেনের এই তো ঝামেলা। আজিমগঞ্জ জংশনে কতক্ষণ আটকাবে ঠিক নেই। লুপ লাইন কিনা! আমার তো মনে হচ্ছে সকাল আটটা বাজতে পারে, আবার আগামী দিন সন্ধ্যা ছটায় পৌঁছানোও বিচিত্র নয়।'

স্বর্ণ অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয় একটু। কিছু বলে না।

'জংশনে কেউ যেন টের না পায় যে ডেডবডি যাচ্ছে! শালা সায়েবদের মর্জি বোঝা বড্ড কঠিন। তবে ভাববেন না। বাই দা বাই, এত রাতে ডেডবডি নামাবার লোক পাবেন কোথায় বলুন তো?'

স্বর্ণ কথাটা ভাবেইনি। এখন একটু চমকে ওঠে। তাই তো!

'আমি আপনাকে সাহায্য করব, বরং। ভ্যাকুয়াম ব্রেক করে গাড়ি দাঁড় করাব। তারপর ঠিক আছে, ভাববেন না। বামুনের মড়া। ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

স্বর্ণ ভাবে, চাঁদঘড়ি কি আসবে না তার ডাকে? দাহ করার ব্যবস্থায় কোনও অসুবিধে হবে মনে হয় না। চাঁইপাড়ায় খবর দিতে দেরি শুধু।

গার্ডসায়েবটি অনবরত বকবক করে। একটু থামলে ভাল হয়। থামে না। ঘটাং ঘট ঘটাং ঘট শব্দের সঙ্গে চাপা বৃষ্টির শনশন শব্দ মিশে একঘেয়েমির অন্ত নেই। বমিভাব আসে স্বর্ণের। সে হেলান দিয়ে চোখ বুজে থাকে।

অগত্যা গার্ডসায়েব আনন্দকে নিয়ে পড়েন।....

আজিমগঞ্জ জংশনে আসতে সত্যিসত্যি অনেক রাত হল। ঘন কালো রঙ লেপটে আছে চারদিকে—তার মধ্যে আলোর কিছু ফুলকি। গঙ্গার স্টিমারেব ভোঁ শোনা যাচ্ছিল। অহিভূষণ টানাটানি করে নিয়ে যান আনন্দকে। বাচ্চা ছেলের না খেলে চলে? বাইরের সান্টিং লাইনে মালগাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাশেই ঘন জঙ্গল তার ওপাশে কুলে-কুলে ভরা গঙ্গা। ফাঁকে-ফাঁকে আলো চিকমিক করছে দূরে। উল্টো পাশে স্টেশনটা নিঃঝুম। জোর বৃষ্টি হচ্ছে। স্বর্ণ চুপচাপ জড়োসড়ো বসে থাকে। শীত শীত করছে এবার। সামনের কুলিবগীব দরজা আটকানো রয়েছে। একটু পরে ঝোপে শেয়াল দৌড়ে লাইনের ওপাশে যাচ্ছে দেখা গেল। তখন স্বর্ণর বুক কাঁপে, জানলা গলিয়ে ঢুকে পড়বে না তো গোরাংবাবুর কাছে?

সময় আর কাটতে চায় না। বৃষ্টি ছাড়ে না, বাতাস থামে না। গঙ্গার স্টিমার দুর্জ্ঞেয় কারণে মাঝে মাঝে ভোঁ বাজায়। তারপর গার্ড সায়েব আর আনন্দ এল। গার্ড সায়েবের

হাতে একটা মাটির মালসা। শালপাতায় ঢাকা। আনন্দর মুখ প্রসন্ন। কাছে এসে ফিসফিস করে সে—'ভাত মাছ ডাল তরকারি সব খেলাম। মা, তুমি খাবে না?'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে স্বর্ণ মাথা নাড়ে।

অহিভূষণ বলেন—'প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আপনি একটু আধটু খেয়ে নিন—এতে দোষ নেই। ধরুন।'

স্বর্ণ তীব্র আপত্তি করে।—'না না।'

'না কেন? কখন ছাড়বে ব্যাটারা ঠিক নেই। দু'ঘণ্টা পরে লাইন ক্লিয়ার পেতে পারি শুনলাম। আপনি এগুলো....'

'না।'

আরও কিছুক্ষণ অনুরোধের পর অহিভূষণ মালসাটা ওপরে বাঙ্কে তুলে রাখেন। আনন্দের দিকে তাকিয়ে বলেন—'কী? ঘুম পেয়েছে তো? হু—না পেয়ে পারে?' তারপর সেই বড় বাকসোটার ওপর কম্বল বিছিয়ে দেন।

আনন্দ অমনি শুয়ে পড়ে। অহিভূষণ স্বর্ণকে বলেন—'আপনারও তো শোওয়া দরকার। ওই বেঞ্চে শোন। একটা চাদর দিচ্ছি।'

স্বর্ণ বলে—'থাক শোব না।'

আনন্দর কাছে হেলান দিয়ে বসে অহিভূষণ গল্প করতে থাকে। তার জীবনী শোনান। সুধাময়েরই এলাকার লোক তিনি। তবে কোনও বন্ধন নেই, খুব মুক্ত মানুষ। ঘরসংসারের সাধ তাঁর নেই। বেশ তো আছেন! গাড়িতে গাড়িতে ঘুরছে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক। সবখানেই ঘর, সব্বাই আপনজন। ঈশ্বর যাকে এত বড় সংসার দিয়েছেন, সে আর কোন তুচ্ছ সংসারে আটকাতে চাইবে বলুন আপনি? এবার আপনার ঘুম পেয়েছে নির্ঘাৎ? পায়নি? আপনিও দেখছি রেলমানুষ হয়ে গেলেন! একবার হল কী, এমনি বৃষ্টির রাত। আসছি মোতিহারির দিক থেকে। সিগনাল না পেয়ে মাঠের মধ্যে মালগাড়িটা দাঁড়াল। দাঁড়াল, দাঁড়িয়েই রইল। খুব বিপজ্জনক সময় এগুলো। ডাকাতি ওদিকটায় প্রায় হয়। মালগাড়ির দরজা ভেঙে মাল লুট করে ব্যাটারা। বুঝলেন? যে-সে ডাকাত নয়, ঘোড়ায় চড়া ডাকাত সব। তা সেই মাঠে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিজতে ভিজতে—বললে বিশ্বাস করবেন না, এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েছেলে হাজির! আমি তো হতভম্ব। এই মাঠের মধ্যে বৃষ্টিতে এ কোত্থেকে এল রে বাবা? এসেই লাফ দিয়ে ওখানটায় চড়ে বসল। বললাম—কে আপনি? কী চান? বেশ ভদ্রলোকের মেয়ে। দিব্যি হাসছে। কোনও কথা নেই মুখে। ভাবলাম, নির্ঘাৎ পালিয়ে যাচ্ছে বাড়ি থেকে। যাই হোক, বৃষ্টির মধ্যে বেচারা আর যাবেই বা কোথায়? বললাম—স্টেশনে গিয়েই কিন্তু নামিয়ে দেব। কোনও কথা শুনব না। শুধু হাসে সে। পাগল নয় তো? সন্দেহ হল। কিন্তু বুঝতে পারলাম না। তীক্ষ্ণদৃষ্টে চোখ দুটোর দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। মানুষের এমন চোখ হতে পারে, ভাবা যায় না। অদ্ভুত নীলচে জ্বলজ্বলে দৃষ্টি। অস্বাভাবিক। ইতিমধ্যে সিগনাল সবুজ হতেই গাড়ি চলতে শুরু করেছে। সামনের স্টেশনটা ছোট। গাড়ি দাঁড়াবে না। গাড়ি ইচ্ছে করলে

আমি অবশ্য থামাতে পারি। কিন্তু এমন হতচকিত অবস্থা যে স্টেশন কখন পেরিয়ে গেল। তারপর দেখি, মেয়েটি নিজের পরনের কাপড় খুলতে শুরু করেছে। আমি আরও হতভম্ব হয়ে মুখটা ঘোরালাম অন্যদিকে। টের পেলাম ও সম্পূর্ণ উলঙ্গ। বুঝলেন? একেবারে নেকেড। তখন গাড়ি বেশ জোরে ছুটছে। আমি জেনে গেছি, এ পাগল ছাড়া কিছু নয়। জোর করে শাড়ি পরানোর জন্যে যেই গেছি, অমনি বেরিয়ে গাড়ি থেকে লাফ দিল! এই দেখুন, গায় কাঁটা দিচ্ছে। হ্যাঁ—লাফ দিল অন্ধকারে। একটা চেঁচানি শুনতে পেলাম যেন। কী করা উচিত ভাবছি হঠাৎ দেখি—আশ্চর্য, সেই উলঙ্গ মেয়ে ওখানটায় রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে তেমনি দৃষ্টি। আর এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, ওর গায়ে এক ফোঁটাও বৃষ্টি লাগছে না—শুকনো একেবারে। অমনি আমি ফেন্ট হয়ে গেলাম। তারপর কী হয়েছে জানি না। জ্ঞান যখন হল, দেখি ভোরের আলো ফুটেছে। গাড়ি সমানে চলেছে। সে এক আশ্চর্য ঘটনা!'

স্বর্ণ আস্তে বলে—'ভূতপ্রেত?'

'তাছাড়া কী বলব? কে কখন কী বেশে দেখা দেয়, বলা খুব কঠিন। এই যেমন আপনি'....গার্ডসায়েব হাসতে থাকেন। 'কে বলবে আপনি কী?'

অগত্যা স্বর্ণ একটু হাসে মাত্র।

'সত্যি। কিচ্ছু বলা যায় না! এমন তো হতে পারে, আমি যখন আনন্দকে নিয়ে খেতে গেলাম, তখন অন্য কেউ আপনার চেহারায় এসে ঢুকেছে।'

'আমি গেলাম কোথায়?'

'আপনাকে....ধরুন, মেরে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছে। বিশ্বাস নেই কিচ্ছু!'

স্বর্ণ শিউরে ওঠে এতক্ষণে। না—ভূতের জন্যে নয়। সে ছেলেবেলা থেকে নিজের জোরে মানুষ। বনবাদাড় সন্ধ্যাসকাল নির্জনতা গভীর রাত তার জীবনের সঙ্গে একাকার। একলা থাকা যার অভ্যাস বরাবর, তার কাছে ভূত আসতে সাহস পায় না। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে, এই গাড়ির এঞ্জিনে কোনও আলো নেই। কোথায় নিয়ে যাবে তাকে এই অন্ধ ট্রেনটা?

একটুপরে স্বর্ণ বলে—'আমাকে মেরে ফেলা কি খুব সহজ মনে করেন?'

অহিভূষণ মাথা দুলিয়ে বলেন—'পাগল নাকি! ওটা কথা নয়! তবে কী জানেন, প্রেতশক্তি বলে একটা কিছু তো আছেই। বাসনাকামনা নিয়ে যে মরে যায় সে কি মরেও মরে?'

এই সময় লাইন ক্লিয়ার এল। খালাসি চলে গেল। একটু পরেই গাড়ি ছাড়ল। অহিভূষণ বেরিয়ে গিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ফাঁকা পাটাতন থেকে নিশান দোলাতে থাকেন। হুইসল বাজান। স্টেশন এলাকা পেরিয়ে যেতে থাকে গাড়ি।

ফিরে এসে বলেন—'আর তো এসেই গেলেন! মধ্যে তিনটে স্টেশন মাত্র। টানা গেলে একঘণ্টাও লাগবে না। ঠিক জায়গায় ভ্যাকুয়াম ব্রেক কষব।'

রেল লণ্ঠনটার দম বাড়িয়ে দেন গার্ডসায়েব। এই ভুতুড়ে আলো ছাড়া আর কোনও আলো নেই। কিন্তু আবার অস্বস্তি জাগে স্বর্ণর। বৃষ্টি কমছে না, দরজা বন্ধ না করলে বাতাসের ঝাপটা আসছে পাটাতনের দিক থেকে। বৃষ্টির ছাঁটে মেঝে ভিজে রয়েছে। সে পা দুটো তুলে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে। তারপর দেখে গার্ডসায়েব তার সাদা রেলকোট খুলল। তারপর দরজাটা ভাল করে আটকে দিল।....

অহিভূষণ বলেছিলেন—কে কাকে গার্ড দ্যায়!

এক প্রবল ও অতর্কিত প্রেমাবেগের গোড়ায় হিংসার চাপ ছিল কম। ক্রমে হিংসা হুহু করে এসে পড়েছিল। ধস্তাধস্তিতে চলন্ত মেঝের পাটাতন প্রচণ্ড কেঁপেছিল। মাটির মালসাটা এবং আরও কিছু খুচরো জিনিস উল্টে পড়েছিল। অহিভূষণ পায়ে পা জড়িয়ে সাড়ে তিনহাত নারীমাংসকে ধরাশায়ী করতে লড়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হতভাগা ছেলেটার ঘুম এত করেও ভাঙেনি।

বাইরের দুর্যোগের মধ্যে এঞ্জিনের বাঁশি আবছা শোনা যাচ্ছিল। তারপর বেগ কমতে কমতে গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। তখন অহিভূষণের দুটো হাতেই দাঁতের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত। গেঞ্জি তলপেটে ঝুলছে। ইতিমধ্যে রেললণ্ঠনটাও উল্টে যায় এবং বাতি নেভে। কাচ ভাঙে। তারপর অন্ধকারে ধুন্ধুমার উপদ্রব শুরু হয়।

স্বর্ণর শাড়িটা কোমর থেকে মেঝেয় ছড়ানো, সেমিজের ওপরদিকটা ফালা ফালা হয়ে ঝুলে পড়ল। তার বুকের ওপর আঁরোয়া জঙ্গলের সেই ভুতুড়ে বাঘটার মাথার মতো একটা মাথা নেমে এল। তখন স্বর্ণ মেঝেয় পড়ে গেল। অহিভূষণের ভারী শরীর তার ওপর চেপে বসল। আর অহিভূষণের গোঙানি শোনা গেল—'একবার মাইরি বলছি—মাত্র একবার।'

হঠাৎ তাঁর প্রেমজর্জরিত গোঙানি একটা প্রচণ্ড চিৎকারে ছত্রখান হয়। আ আঁ আঁ আঁ আঁ! স্বর্ণর দুইহাত প্রেমিকপুরুষটির ভাইটাল প্রত্যঙ্গে একটা কিছু ঘটায় নিশ্চয়। নেতিয়ে পাশে পড়ে যান ভদ্রলোক।....আঁ....আঁ....আঁ...আঁ! আরও নিষ্ঠুর চাপ এবং বীভৎস চিৎকার ও ছটফটানি। স্বর্ণ উঠে বসতে বসতে আবার মোচড় দেয়। আঁউ..উ...উ....উ। অহিভূষণ প্রচণ্ড চেঁচিয়ে চুপ করে যায়।

অন্ধকারে হাঁফাতে হাঁফাতে ওঠে স্বর্ণ। হাতড়ে-হাতড়ে শাড়িটা পায়। বুকের কাছে সেমিজে গিঁট পাকায়। তারপর শাড়ি জড়িয়ে আনন্দকে ডাকে। আন্দাজে এগিয়ে তার গায়ে ধাক্কা দেয়। ছেলেটি ঘুমে ডুবে আছে। সাড়া পায় না। তাকে খামচাখামচি করে। টেনে ওঠায়। কিন্তু সে আবার গড়িয়ে পড়ে কম্বলে।

এই সময় হুইসল দিয়ে আবার চলতে শুরু করে রাতের মালগাড়ি। তখন সাবধানে দরজা খোলে স্বর্ণ। জোরে বৃষ্টি পড়ছে। খোলা পাটাতনে বাতাসেরও ঝাপটানি প্রচণ্ড। ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে আসে সে। একটা স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। গতি কম থাকায় প্লাটফর্মের ল্যাম্পপোস্টে নামটা পড়া যায়। খাগড়াঘাট রোড। তাহলে এসে গেল

চিরোটি! একটু ভেবে নেয় সে। একটা নদী পড়বে সামনে। এখন বর্ষায় কুলেকুলে ভরে আছে নিশ্চয়। স্বর্ণ এবার নিজের কাজের পরিণাম হিসেব করতে গিয়ে প্রচণ্ড শিউরে ওঠে। এবার তার হু-হু করে কান্না আসে। প্রচণ্ড কাঁদে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। নির্ঘাৎ লোকটাকে সে মেরে ফেলেছে। তারপর সেই কান্নার মধ্যে অহিভূষণকে টানতে টানতে বের করে খোলা পাটাতনে, রেলিঙের কাছে নিয়ে রাখে। সামনে রেলিঙে দুপাশে ফাঁকা। ঠেলে দিলেই গড়িয়ে নিচে পড়বে। আবার আতঙ্ক আর দ্বিধা জাগে। তখন চোখের জল মোছে। কান পাতে কখন সামনের দিকের চাকাগুলোয় চেনা সেই গুমগুম আওয়াজ শোনা যাবে।

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে যায়। আর সেই সময় হঠাৎ অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে ট্রেনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেরু বাউরিকে দৌড়তে দেখে। সামনে চলেছে সেই বিশাল ছায়া, স্বর্ণের দিকে মুখটা ফেরানো। স্বর্ণ চেঁচিয়ে ডাকতে চয় তাকে। গলায় বোবা ধরে যায়। সে হাঁফাতে থাকে। তার মনে হয়, হেরু তাকে কিছু বলছে। সে বুঝতে পারে না। হেরু কি পালিতবাবুর মতো আরেকটি লম্পটকে শাস্তি দিতে চাইছে? স্বর্ণ মনে জোর পায়।

হ্যাঁ, সামনের দিকে চাকায় যেন সেই প্রত্যাশিত শব্দটা উঠছে। গুমগুম গুম গুমা..... বিসর্জনের ঢাকের শব্দ যেন, এঞ্জিনের বাঁশি বাজছে তীক্ষ্ণ জোরালো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে অজস্র সূচের মতো, দমকা বাতাস এসে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিচ্ছে শাঁ ...আঁ....আঁ.....প্রকৃতি পরিব্যাপ্ত শোকে পাগল হয়ে হাত পেতেছে কি নিজের ভ্রষ্ট সন্তানকে লুফে নিতে? গুম গুম গুম গুম.....আবার সামনে কোথাও বেজে ওঠে হাজার হাজার ঢাক অন্ধকার রাতকে আরো অন্ধকার করে দিয়ে চলে আলোহীন ভয়ঙ্কর কালো এক ট্রেন, হুইসল বেজে ওঠে বুকফাটা চিৎকারের মতো, বৃষ্টির ফোঁটা রক্তপাত হয়ে ঝরে, বাতাস আসে নিষ্ঠুর হুংকার দিয়ে শাঁ....আঁ....আঁ....আঁ...

ঠোঁট কামড়ে ধরে স্বর্ণ। মাথা ঘুরে ওঠে। ঝুঁকে যায় সে অহিভূষণের দিকে। একটা হাত একটা পা ধরে প্রচণ্ড জোরে ঠেলে ফেলার চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে অহিভূষণের অবচেতনা থেকে কী এক শক্তি ফুঁসে ওঠে। তাঁর মূর্ছার ঘোর কেটে যায়।

তারপরেই স্বর্ণের মনে হয়, অহিভূষণ পড়ে যাওয়ার মুখে আচমকা ধরে ফেলেছেন তার একটা পা। কিন্তু তখন আর ওই পতনশীল অন্ধ শক্তির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনার মতো এতটুকু শক্তি নেই স্বর্ণের শরীরে।

তাই অহিভূষণ যাবার সময় স্বর্ণকে নিয়েই চলে যান। একটি ও আরেকটি চিৎকারকে চাপা দিয়ে অন্ধকারে ছুটে যেতে থাকে শব ও শস্যবাহী এক অন্ধ রেলগাড়ি।

ছেলেটা তখনও ঘুমিয়ে আছে।.....